

প্রকাশক—

শ্রীসারদাচরণ ঘোষ ।

১৭ নং ঢাকাপট, বড়বাজার ; কলিকাতা ।

প্রথম সাত ফর্মা—কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে ;  
দ্বিতীয় সাত ফর্মা—ফাইন আর্ট প্রেসে ;  
তৃতীয় ছাব্বিশ ফর্মা—কাস্টিক প্রেসে ;  
চতুর্থ এক ফর্মা—কলিকাতা প্রেসে ;  
অবশিষ্ট মেট্রিকাল প্রেসে মুদ্রিত ।

এন্ট্রোভার—

হাফটোন—ইউ, রায় ;

উডব্লক—কে, বি, পাল প্রভৃতি

সোনায় রূপায় ছাপা চক্চকে বাক্মকে বাঁধাই—তিন টাকা ;

প্যাক্ট বোর্ডে বাঁধাই—আড়াই টাকা ।

---

এই গ্রন্থকার-সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত

**রামায়ণ ও মহাভারত ।**

( সরল—সটীক ও স্থলভ সংস্করণ । )

হাফটোন চিত্রযুক্ত ; বাক্মকে বাঁধাই—মূল্য আট আনা ।

প্রকাশক—সরকার এণ্ড কোং ।

৫৪৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

# চাক্ষুজাতি।

(জাতীশ চিত্র ও ইতিবৃত্ত।)

“পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম—অপার্থিব ধন,  
ছাড়া’তে সভ্যতাদায়  
পশেছে অরণ্যে, হায় !  
প্রেমের আবহ ওই জুমিয়া-জীবন।”  
—নবীনচন্দ্র।

—::—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম্. আই, আর, এম্ ;  
প্রণীত।

অগাধ প্রকৃত্তবিন্দু ও সুবিখ্যাত পণ্ডাটক  
রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই ;  
মহোদয়ের ভূমিকা সমেত।

১৩১৬





শ্রীশ্রীযুক্ত রাজা ভুবনমোহন রায় ।

জন্ম—৬ই মে, ১৮৭৬ : রাজ্যভিষেক ৭ই মে, ১৮৯৭ রথীন্দ্র ।





RANGAMATI RAJBARI  
CHITTAGONG HILL TRACTS.

৫ই এপ্রিল, ১৯০৯ ইংরাজী;

২৩শে চৈত্র, ১৩১৫ বাঙ্গালা।

প্রিয় মহাশয়,

পরম প্রীতির সহিত আপনার উপহারখানি গ্রহণ করিলাম, এই নিমিত্ত আন্তরিক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছিল, কেহ যেন পটবিশেষে আমাদের চাক্‌মাজাতির আগত বিগত সকল ঘটনাই অতি নিখুঁতরূপে অঙ্কিত করিয়া সম্মুখে ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ আপনি চাক্‌মাজাতিকে কত ভালবাসিয়া থাকেন, তাহা এতদ্বারা অধিকতররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আপনার অপূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসু-ক্ষমতা—সর্বোপরি অসাধারণ বর্ণনাশক্তি প্রভাবে চাক্‌মাজাতি এমনি উপাদেয় হইয়াছে যে, অপরের তু কথাই নাই—চাক্‌মাগণেরও প্রত্যেকে স্বজাতিপক্ষীয় কিছু না কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করিবে; এবং এই কঠোর যত্ন ও পরিশ্রমের গুরুত্ব সমগ্র চাক্‌মাসমাজ অতি কৃতজ্ঞ অন্তরে চিরদিন স্মরণ করিবে। ইতি

ভবদীয়

( স্বাক্ষর ) শ্রীভুবনমোহন রায়,

চাক্‌মারাজা।

# নিবেদন—

বাল্যকাল হইতে পুণ্যবতী জননীর শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া প্রাতঃস্মরণীয় কালিন্দী রাণীর আলৌকিক চরিত্রকথা শুনিতে শুনিতে কতদিন যে অশ্রুবারিতে তাঁহার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না; সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় বিস্তৃত জীবনী জানিবার এক আগ্রহ-বীজ এই মনঃসুন্দরে উপস্থিত হয়। তাহার পর সংসারের কত যাতায়াতিতে এ জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কে তাহার অবধি করে? অবশেষে যখন অবস্থার অঙ্ক এক আবর্তনে এই রাণীমাটি গভর্ণমেন্ট উচ্চাংরাজীস্থলে সহকারীশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসি, তখন পুনরায় সেই বাল্য-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠে। আমার এই চাকরী ভাল কি মন্দে নির্মিত হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে ইহা নিশ্চিত যে—এখানে না আসিলে উক্ত আশাবীজ অঙ্কুরিত না হইতেই দারুণ দারিদ্র্যদহনে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

আজ আমার এই কাষের অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল। প্রায় প্রথম বৎসরের স্থানীয় ভাবগতিকের সহিত পরিচিত হইতেই কাটিয়া যায়; সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য একরূপ স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। অনন্তর এই পাকিস্তানপ্রদেশের ইতিহাস সঙ্কলনেও প্রেরণা জন্মে। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলাম যে, স্থানীয় প্রধান শাসনকর্ত্তামহোদয় স্বয়ংই একাধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আমি তদনুরূপ সঙ্কলনে বিরত হইয়া দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ইতিবৃত্তের সহিত মহীয়সী মহিষা কালিন্দীরাগী এবং তদীয় রাজবংশের তথা সমগ্র চাকমা সমাজের বিস্তারিত বিবরণীপূর্ণ বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে তৎপর হই। কিন্তু হায়, অর্থ কি ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তির পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইতে যাওয়া কি বিষম বিড়ম্বনা, তাহা যদি কেহ কখনও আমার ভ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, তবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ দুরারোহ শৈলশৃঙ্গ, দুর্গম পার্বত্যপথ, দুজের পাহাড়ী-রহস্য—অগ্নি পেরে কা কথা—পার্বত্য দেশবাসী আমার পক্ষেও বহু অন্তরায় ঘটাইতেছিল! তথাপি বলিতে কি, কর্ম্মক্লান্তজীবনের প্রাণপণ শ্রম, কষ্টোদ্ভূত অর্থ ইত্যাদি দরিদ্রসম্বল যাহা কিছু অকাতরে প্রদান করিয়াও, অনেক স্থলে হতাশ হইতে হইয়াছে। আমি যে অজ্ঞাত জনমণ্ডলীকে দেশের সমক্ষে আনিয়া পরিচিত করিতে এত যত্নলীল, তাহার কিস্ত তাহাতে কেমন এক ভীতিপূর্ণ সঙ্কেত বোধ করিতেছিল, তদ্বারা বড়ই বেগ পাইয়াছি। এমন কি তাহাদের অভাব অভিযোগের সংবাদ লইতে গিয়াও আমার বহু বাধা পাইতে হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ অনির্বচনীয় কষ্টে প্রায় চারি বৎসর কালের অক্লান্ত চেষ্টায় উপাদান সংগৃহীত হইলেও, অতি শক্তিতভাবে সঙ্কলন কার্যে প্রবেশ করিয়াছি। কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে এই উদ্যম সম্ভবতঃ অভিনব, সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ কোন একখানি জাতীয় ইতিবৃত্তের সংবাদ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। প্রযুক্ত বা পুস্তিকাকারে কোন কোন জাতীয়কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, তৎসমুদয়ের ধারাবাহিক কোন শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিরাট একটি জাতি-পরিচয়ের তুলনায় তথাকথিত বিবরণী অতীব সামান্ত। এই গ্রন্থও তৎপক্ষে ঘণ্টে নহে, তবে তদ্রূপযোগী করিতে লেখক যথাযথ যত্ন করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র সাধনা! এবং গত এই কয় বৎসরের দুঃসহ শ্রমসাধনার ফলে—সুন্দর পাঠক-পাট্রিকাগণের হৃদয়পটে অপূর্ব্ব রহস্য সমাচ্ছন্ন বক্ষ্যমান পার্বত্যজাতির এক অস্পষ্ট ছায়া চিত্রণে সমর্থ হইলেও তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন।

প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কতিপয় বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ভারতী, প্রবাসী, সাহিত্য, কল্লতরু, বৌদ্ধবন্ধু, পরিষৎপত্রিকা প্রভৃতি বিবিধ মাসিক পত্রে প্রযত্নাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—যেন ভ্রমপ্রমাদ বিশোধিত হইয়া যায়। পরন্তু তাহার অমূল্য সমালোচনা এবং সম্পাদক ও পাঠকবর্গের আকুল-আগ্রহই অনন্তর ইহাকে পুস্তিকাকারে মূদ্রণে অধিকতর সাহসী করিয়াছে। এপক্ষে সর্ব্বোপরি চাকমাজাতির মুকুটমণি শ্রীশ্রীভূত রাজা ভুবনমোহন রায় বাহাদুরের নাম সর্ব্বাগ্রে স্বর্ণাক্ষরে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে তদীয় সাহায্যকল রহিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপিখানিও তিনি বহুকষ্ট স্বীকারে দেখিয়া দিয়াছেন এবং মদীয় উৎসর্গ গ্রহণের উত্তরে যে মন্তব্যলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার, বাস্তবিক

গুণগ্রাহিতাবে আশীর্ষিত প্রশংসিত করা হইয়াছে। মুদ্রাক্ষণব্যয়েও তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, ইত্যাদি বহুকারণে কেবল গ্রন্থখানি তাঁহার উৎসর্গ করিয়াই আমি কৃতজ্ঞতামুক্ত নহি, তাঁহার এই অপার স্নেহোপকারের কথা চিরকাল গৌরবের সহিত স্মরণ করিব। মুদ্রাক্ষণ-ব্যয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীযুক্ত জিলেটন দেওয়ান এবং আরও কতিপয় মহোদয়ের প্রদত্ত সাহায্য বহুপরিমাণে উপকার করিয়াছে।

আমার সাহিত্যজীবনের পরমবন্ধু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয়ের স্নেহমুকুট ইহজীবনে পরিশোধিত হইবার নহে। বলিতে কি, তদীয় সনির্বাক উত্তেজনাতেই এই অকিকিংকর সাহিত্যসেবা স্বত্বাধীন জীবনের বিরল অবসরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থখানি প্রণয়নেও তিনি বহু নৈরাশ-কাতরতায় আশ্বাসোদ্বীপনা প্রদান করিয়াছেন; এবং বিশেষ ভ্রম স্বীকারে পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া দিচ্ছিলেন। সংগ্রহকার্যে পরমস্নেহভাজন জ্ঞান জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার আমার প্রধান সহায়। আমি তাহা হইতে অকৃষ্টিতচিত্তে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্নিমিত্ত চাকমা সমাজের উপরোক্ত নেতৃত্ব এবং বর্তমানে ডেপুটী ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত প্রিয়হৃদয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান, বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান প্রভৃতি অনেকেরই সমীপে আমি তৎক্ষণাৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বার্মিজভাষার অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সহযোগী শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণ্ড অংজাই মহোদয় হইতে যে সাহায্য পাইয়াছি, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ব্যতিরেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমার অপর উপায় নাই। কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় এবং মিশনারী ডাক্তার জি. ও. টেইলার আমার কটোগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিশেষ অশুগৃহীত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমি স্থানীয় প্রধান মিশনারী রেভঃ জি. হিউজ, “বান্দীকিরঞ্জয়ের” ইংরাজী অনুবাদক শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন সেন বি. এল. প্রভৃতি আরও অনেকের আশুকুলা লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে স্থানীয় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আফিসের মেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত আমাচরণ বিখাস ও সহযোগী শিক্ষক শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার ভট্টাচার্য্য বি. এ. মহাশয়ব্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তাঁহাদের সমীপে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অনন্তর লিপিতেও প্রাণ অবশ হইয়া পড়ে, গ্রন্থ প্রণয়নের এই কয় বৎসরে মদীর বক্ষে কয়টা হৃদয় শেলাঘাত পড়িয়াছে, প্রতি চোটেই যেন পঞ্জরাবলী দীর্ঘ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ ৬ই পৌষ, ১৩১৩ সাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফিসের নাজির প্রিয় হৃদয় বতীন্দ্রমোহন দাস মহোদয় অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি আমার অকাতরভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পরন্তু ইহার জন্ম এত ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বদিনও খবর লইয়াছিলেন : সেই বৎসরেই দ্বিতীয় শেলাঘাত আশৈশব বন্ধু জমিনার-কুমার দীনেশচন্দ্র নন্দীকে চাড়াইয়া। ২৬শে চৈত্র (মঙ্গলবার) আমার এই দুর্বিপাকের দিন। একই পরাণে হাসিয়া খেলিয়া—একই বৃক্ষের শাখাত্বয়ের স্থায় সে, আমি ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন শিশুকাল হইতে একত্রে বন্ধিত হইতেছিলাম, অর্থাৎ, দুইজনে কৃতান্তের নির্দম পদাঘাতে ফুলফলে বিভূষিত না হইতেই তাহার একটি ভাঙ্গিয়া পড়িল; এবং সঙ্গে সঙ্গে অসময়ে ছিন্নশাখ বৃক্ষের মত অবশিষ্ট দুইজনের স্বয়ং চূরমার হইয়া গেছে!! তৃতীয় আঘাতে কেবল আমি নহি, সমগ্র বঙ্গভূমি তথা আসাম-হিমাচল ব্যাধিত। বিগত ১০ই মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের পূর্ণশশী মহাকবি শ্রীমন্নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় বহুকালের আবর্তনে চিরদিনের নিমিত্ত অন্তিমিত। হায়, এই পুস্তকের ৪১শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হওয়ার পর তদীয় পুণ্যময় নামের সহিত আর ‘শ্রী’ যোগ করিতে পারি নাই। অনন্তর মুদ্রাক্ষণ প্রায় শেষ হইয়া আসার পর, গত ৭ই আষাঢ় অত্রতা ডেপুটী ইন্সপেক্টর ৮গগনচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় অকস্মাৎ আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন; তাঁহার নিকট হইতেও আমি এই পুস্তকের জন্ম বহু সাহায্য লাভ করিয়াছি। আজ ইংরাজী জীবিত থাকিলে কত যে আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের পরম আদরের এই গ্রন্থ গ্রহণ করিতেন, মুদ্রাক্ষণ সমাপ্ত করিয়া তাহা যতই প্রাণে জাগিতেছে, অঙ্গগতি আর সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এই সঙ্গে অব্যবহিত পূর্ববর্তী শিশুপুত্র ও মেহমতী খুড়ীকুরাণীর ছরণনেয় শোকস্তুতি আর অধিক লেখা অসাধ্য করিয়া তুলিল!!!

সদীর কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি এখনও শেষ হয় নাই। বরং বাঁহাদিগের অনুকম্পায় এই সাধারণ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখই রহিয়া গিয়াছে। এ নিমিত্ত অগাধ প্রভুত্ববিন্দু এবং অপ্রসিদ্ধ পর্বাটিক রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই. মহোদয়ের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ কর্তব্য ছিল। তৎকৃত ভূমিকায় এক পক্ষে যেমন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য তথ্য অতি সহজভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, পক্ষান্তরে তাহাতে তিনি ভারতেতিবুদ্ধের প্রকৃতি ও পরিচয় আলোচনার স্বকীয় গভীর গবেষণাকল প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বারা দেশের ইতিহাসচর্চার এক নূতন উচ্ছ্বাস ছুটিবে, আশা করা যায়। অনন্তর স্থানীয় সুপারিণ্টেন্ডেন্ট মিঃ আর, এইচু, স্নেইড্‌ হাচিন্সনের নাম বলা প্রয়োজন। অপরাপর সাহায্য ব্যতীত তাঁহার অনুকম্পায় এই পুস্তকের পক্ষে যে একটি গুরুতর ভ্রম সংশোধন করিতে পারিয়াছি, ততোধিক সন্তোষের বিষয় আর নাই। আমি পূর্বে সেলাল রিপোর্ট হইতে এই জিলা ও তদধীন মার্কেলাদির পরিমাণ কল গ্রহণ করিয়াছিলাম, বহিতেও তদনুসারে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উক্ত মহোদয়ের গভীর অনুসন্ধান কলে যে বিশুদ্ধ কেরকল স্থির হইয়াছে, শুদ্ধিপত্র ও মানচিত্রে তদনুসারেই সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। তদ্ব্যতীত বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের অনুগ্রহে অত্রস্ত শাসন-বিধানানুসার একাংশের অনুমোদন এবং শাসনকর্তাদিগের তালিকাদি প্রাপ্ত হওয়াতেও গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং স্বল্প সাহিত্য পরিষৎ ইহাকে তাঁহাদের গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া স্বার্থই গৌরবান্বিত করিয়াছেন। “পরিষৎ” স্বীয় ব্যয়ে উৎকীর্ণ করটী ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াও অশেষ উপকার করিয়াছেন। ইত্যাদির নিমিত্ত ইঁহাদের সকলেরই সমীপে গ্রন্থকার অপরিমিত কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

সর্বোপরি ধন্যবাদ পরম মঙ্গলময় বিধাতার। একমাত্র তাঁহারই করুণাশলে, বিশেষতঃ মুদ্রায়ন্ত্রের লোহকবল হইতে প্রায় দেড় বৎসর পরেও গ্রন্থখানি উদ্ধার করিতে পারিয়াছি। পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেছেন, আমার ভাগ্যকলে ইহা পাঁচখানি প্রেস ঘুরিয়া, তবে বাহির হইল। প্রথমে প্রিয় দক্ষিণাবাবুর কমলা প্রেসে সাঁতমাস পর্যন্ত ঘুরিয়া, মুক্তি পাই; দ্বিতীয় প্রেসেও প্রায় ছয়মাস যাবৎ ঘুরিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু এই ফাইনবার্ট প্রেস হইতে যে গহিত ব্যবহার পাইয়াছি, তাহা বলিতে ঘৃণা হয়। জানি না তাঁহার মফস্বলবাসী দরিদ্র স্কুল মাস্টার পাইয়া এরূপ করিলেন, অথবা গ্রাহকমাত্রেই সহিত এরূপ ব্যবহার! তৃতীয় শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রেসে নিয়মিতরূপেই কাজ পাইতেছিলাম, কিন্তু অনন্তর তিনিও বা কেন আমার পরিত্যাগ করিলেন, বুঝিলাম না। অবশেষে মেটকাক্‌ প্রেসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনরূপে রক্ষা লাভ করিলাম। তজ্জন্ত ইঁহাদের নিকট আমি সাতিশর কৃতজ্ঞ। পরন্তু মুদ্রায়ন্ত্রের এইরূপ গণ্ডগোলে যে শুদ্ধিপত্র ব্যবহৃত আমি ঘৃণার সহিত দেখিতাম, তাহা এই গ্রন্থলাটেই মুদ্রিত করিতে হইল। আশা করি তজ্জন্ত পাঠ্যবর্গ এই গ্রন্থবিড়ম্বিত লেখককে ক্ষমা করিবেন। ইতি।

১লা আগষ্ট, ১৯০৯ ; }  
রাঙামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম। }

গ্রন্থকারস্ব।

## ভ্রম-সংশোধিনী ।

পাঠকবর্গের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা যেন পাঠ্যরসের পূর্বেই নিম্ন-নির্দেশানুসারে গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত করিয়া লন, নতুবা অবধা ভুল ধারণা জন্মিয়া গেলে—উভয়েরই পক্ষে অহিতকর হইবে। তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে সহজবোধ্য ত্রুটিগুলির উল্লেখ করা হইল না।—

পৃঃ ও পং	মুদ্রিত	বিস্তৃত	পৃঃ ও পং	মুদ্রিত	বিস্তৃত
৮৩	B. journal,	S. journal			পংক্তির "ক্রমে",
১০৫	সহস্র সহস্র যোজন শত শত মাইল				হইতে সমস্ত ও
১১১৪	ডোলদগর	টোলদগর			পংক্তি আসিবে)
২৪.১৬	চতুর	চঞ্জের	১৮৪১২	শোবহা	শোবাহা
৩০.১৩	মহুজাগিরি	মনুজাগিরি	১৮৯১২৬	তাঁহাদিগরে	তাঁহাদিগকে
৩৩৭	ত্রিপুর	ত্রিপুর	১৯৩১০	কান্ত হনুশেরকে ( এই দুই শব্দের	মধ্যে পরবর্তী
	সৈন্তবাহিনীকে	বাহিনীকে			পংক্তির 'তাঁহার'
৪৩.৬	৫১৩৮	৫০৭৪০৪			শব্দটা আসিবে)
৪৫১২	২৪২১	২৪৮৫০২			
	৭৬৩	৯৮৯			
১২০	২০৬৪	১৮৩৪০৫	২০১১০	সরোবরে	সরোবর
১	৬২০	৩৬২.৩	২২১১২৭	মুখ	মুখের
৪৬/২৫	২৯.৪	১৮-৮৬	২৪২১২৫	কর্তব্যামুশাসন	কর্তব্যামুশাসক
	৩০.৬	২৪০.১	২৪৩১০	ইহরে	ইহরে
৪৮১২	শগের	ছনের	২৮২২৪	হর না	হর
৫১১২৪	(thek) থেক	ছেক	১২৭	১৩৮৫	১৩৪১.২
৫৬১৭	লোহকাণ্ডোয়া	লোহকাণ্ডোয়া	২৮৩১০	সমিহিত	সন্নিহিত
১২১	লে হাকদা	লোহাকদা	৩০১১৮	( মাজি'নের 'সহিত' হেভি: উঠিয়া	যাইবে )
৭৯১৩	কর্পাসের করে	কর্পাসকরের	৩০২১৩	"ছায়ো"	"ছায়োনা"
৮০১২	( ৩ )	( ১ )	৩০৩১২২	বেদ	বেধ
১২৭	( এই টীকা উঠিয়া যাইবে । )		৩০৬৬	গো-চরণ	গো-চারণ
১২৯	( ৩ )	( ১ )	৩১২১৫	কনষ্টাবল	কনষ্টাবলের
১০৩১৭	মানুষে:	মানুষের	৩২৪১৬	অনুকরণ	অনুকরণে
১১৫ ২৬	হাকিম	হামিদ [ চল্লি ।	১২৫	'জেথৈ'	"জেথৈ"
১২৬১২	শ্রীযুক্ত নীলচন্দ্র	পরলোকগত নীল-	৩২৭১৯	( ব্রহ্মা )	'হ'
১৪	শ্রীযুক্ত ইন্দর	পরলোকগত ইন্দর	৩২৯১২৯	'হ'	'হ'
১৬	পাশ্চাত্য	পার্বত্য	৩৪০১৪	লুয়েগৈ	লুয়েগৈ
১৪৩১২৩	৮৯৮	১৮৯৮	৩৪২১০২	মগল	মোগল
১৩৬১৫	৩৪	৩৪	৩৪৩১২৪	তাম্বুন	তাম্বুন
১৫৬১৮	পরিচ্ছেদ	পরিচ্ছেদ	১২৮	দিনলাই	দিনাই
১৬৬১২৩	কাঠ	কষ্ট	১৩২	চিংমং	চিংমং
১৭৭১২০	একন	এমন	৩৪৪১২	তা-ঝিরোয়ে তা-ঝিরোয়ে	
১৮১১০	সংমিশ্রণে পাওয়া ( এই দুই শব্দের	মধ্যে পরবর্তী		১ ( ১৩৭ হইতে ২৩৭ পংক্তি পাদটীকার	যাইবে )
	পৃষ্ঠার	ষষ্ঠীয়	৩৪৬৮	রাজ	বাজ



পৃঃ ও পৃঃ	মুদ্রিত	বিশুদ্ধ	পৃঃ ও পৃঃ	মুদ্রিত	বিশুদ্ধ
১১১	ঘরা	ছরা	৩৭৪।২	কাপড়ন	কাপড়ান
৩৪১।২৮	বর্ণাশুদ্ধিতে	বর্ণাশুদ্ধিতে	৩৭৬।২২	ভজদাক	ভজিদাক
৩৪৮।২৭	৩০টী	২৬টী	৩৭৭।৩০	জুপের	জুমের
( ৩১ ও ৩২শ পংক্তি টীকা; উত্তরা শেষে )			৩৭৮।২২	মখান	মযাক
	যাইবে।		৩৭৯।১৯	আররে	আরেয়ে
৩৬০।১৭	ভবাকল	ভফাকল	৩৮২।৪	নিছিরোইৎ	নিছিরেইৎ
৩৬২।১১	ঘহবধ	ঘহবিধ	১২০	জুমানা	জুমান
৩৬৪ ৩	ছাক্	চাক্	১২৪	খাদৎ	যাদৎ
৩৬৮।২	হইয়	হইয়া	৩৮৫।১৮	অন্ত্যের	মন্ত্যের
৩৭৪।১৩	ধানাদি	ধনেদ	৩৮৯।২৪	যে	যগন

## চিত্রসূচী ।

ত্রীশ্রীযুত রাজা ভুবনমোহন রায় ( হাফ্টোন )	...	উৎসর্গলিপি ।
পার্সিত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র ( লিথো )	...	প্রারম্ভপত্র ।
চাক্‌মাপরিবারের গুপ্ ( হাফ্টোন )	...	২ পৃষ্ঠা
গৃহচিত্র ( হাফ্টোন )	...	৪৮ ,,
ঘরের নক্সা ( উডব্লক )	...	,, ,,
সিংহধ্বজা ( ছাপ ) মুদ্রা	...	৬৯ ,,
কতেখাঁর	...	,, ,,
শুকদেব রায়ের	...	৭৩ ,,
জানবক্সখাঁর	...	৭৬ ,,
জব্বরখাঁর	...	৮১ ,,
ধরমবক্সখাঁর	...	৮৩ ,,
কালিন্দীরাগীর স্বাক্ষর	...	১০৮ ,,
মহামুনির মন্দির ( হাফ্টোন )	...	১১২ ,,
মহিলার কাষ্ঠবহন	...	১৬৫ ,,
শবের রথটানা	...	২৩১ ,,
বস্ত্রবয়ন	...	২৯৮ ,,
চাক্‌মা বর্ণাবলী ( উডব্লক )	...	৩২৭ ,,
চাক্‌মাবর্ণে ছইটীবাফা,,	...	,, ,,

# সূচীপত্র ।

ভূমিকা—

...

...

...

(পৃষ্ঠা) ১/০

## প্রথম পরিচ্ছেদ ।

- [ ১ ] জাতীয় পরিচয় ।—সভ্যতা—শারীরিক গঠন—মঙ্গোলীয় সমস্তা—মূল নির্দেশ  
—সিদ্ধান্তবিশেষ—জনশক্তি—মুসলমানীশদের আধিক্য—চাক্ষা  
• ( ১—৯ পৃষ্ঠা ) নামের ব্যুৎপত্তি ।

- [ ২ ] প্রাচীন কাহিনী ।—চম্পকনগর—চম্পকনগরের উপাখ্যান—চম্পকনগরের  
অবস্থান নির্দেশ—তিসপতী ব্রহ্মা—মঘরাজা জয়—ব্রহ্ম অধিকার—প্রত্যাঘর্ষন—উপনিবেশ স্থাপন  
—একখানি পত্র—ইতিহাস—চাক্ষা ও বাঙ্গালী—বাঙ্গালী বিজয় চাক্ষা সমাজের বিরুদ্ধে  
অভিযান পাশবিক কৌশল—মোহজাল—ফাঁদে বন্দী—অনুগ্রহ—দৈন্যাক জাতির হৃষ্টি—মূল

( ৯—৪২ পৃষ্ঠা )

- চাক্ষারাজ্য—মংজামু হইতে নিতাড়ন—চট্টগ্রামে আশ্রম—চট্ট-  
গ্রামে শক্তিত্বের সংঘর্ষ—চাক্ষা রাজাকে পুনর্জর—উপাট্টকন  
—উপাধিলাভ—মুসলমানাধিকার পুনরায় মঘাবীনে—অধিনায়ক—বোমাং রাজগণের বিবরণী—  
দিপুরার পরাভব—মঘ ও পর্তুগীজ অত্যাচার—অলিকদম—প্রাচীন বাসস্থান—মঘ রাজার  
পত্র—চাক্ষা আখ্যা মুক্তকথা—সীমানির্দেশ—শুকবিলাস—রাউন্যা—রাজকীয় কীর্তিপীঠ—  
পার্কতা চট্টগ্রামে বিস্তার—রাঙামাটি—বর্তমান রাজবাটি ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

- [ ১ ] আবাসস্থান ।—পার্কতা ত্রিপুরার বিস্তার—পার্কতীয় গ্রামের অবস্থা—  
( ৩৪—৫০ পৃষ্ঠা ) স্বজাতীয় প্রজা—সার্কেল বিভাগ—বেশাঙ্করে বাধা—জুমিরাদের  
স্থান পরিবর্তন—স্থায়িনিবাস—আবাসপ্রথা—ঘরের বিবরণ—  
মইনঘর ।

- [ ২ ] লোকসংখ্যা ।—পুরুষ ও স্ত্রী সংখ্যা—সার্কেল ভেদে—অনুপাত—বিভিন্ন সৈল্য-  
( ৫০—৫১ পৃষ্ঠা ) রের সংখ্যা—বৃদ্ধির গড়

- [ ৩ ] বংশবিভাগ ।—শাখাতথা—বৈন্যাক বিভাগ—ছাক্ষুস্প্রদায়—উৎস্রা কাহিনী  
—“গোজি” ও গোছা—অপূর্ব আখ্যা—বংশবিভাগ—“গোছা”  
( ৫১—৬২ পৃষ্ঠা ) বিস্তার—“গোছা” তালিকা ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

- [ ১ ] রাজাবলী এবং তাঁহাদের কার্য্যালোচনা ।—ইতিহাসের দুর্গতি—বোর্ডের  
পত্র—স্বাধীনতা—পাগলারাজা—“কাটুরা কস্তার আমল”—রাজনির্দাসন—স্বায়ত্বশাসন—প্রভুত্ব  
—রাজা কতে থা—জজাল থা—রাজা সেরমুখ থা—ইংরাজাধিকার আরম্ভ—রাজা শুকদেব থা

( ৬৩—১২৯ পৃষ্ঠা )

- রাজা সের দৌলত থা—ভিত্তিহীন সন্দেহ—রাজা জ্ঞানবজ্র থা  
—পত্র—রথুখা—ইজারাদার প্রথা—বন্দোবস্ত—রাজবে তকা  
প্রবর্তন—বন্দোবস্ত—রাজা টকর থা—রাজা জকর থা—রাজা ধরম বজ্র থা—প্রজারঞ্জন—

ধর্মভাব—মহারাজ ভট্টাচার্য—অপূর্ব মিলন—বিবাহ—সন্তানলাভ—সোঁকাস্তর—Court of wards—শুকলাল খাঁ—রাণী কালিন্দী—ক্ষমা—বন্দোবস্ত—হরিশ্চন্দ্রের বিবাহ—জেলাগঠন—বিচার ব্যবস্থা—ইংরাজ গভর্ণমেন্ট—প্রাচীনসীমা—রাজকীয় স্বত্ব—অনুযোগ—উড়োচিঠি—হনন চেষ্টা—অপবাদ খণ্ডন—মঙ্করাজার বিবরণ—সৌহৃদ্য—মঙ্করাজগণ—নির্ধ্যাতন চেষ্টা—কালিন্দী রাণী ও বাঙ্গালী কর্ণচারী—কমিশনারের মন্তব্য—অতিরঞ্জন—কর্তৃপক্ষের বিরোধ—নয়বলি—মাহুয়ের তালুক—পাট্টা—পারিবারিক কর—জুমকরনির্ধারণ—কর্ণফুলীর গুরু—রাণীর কার্য—ধর্মভাব—নিত্যপূজা—পাপতত্ত্ব—প্রারচিত্ত—মসজিদ নির্মাণ—মহামুনি প্রতিষ্ঠা—প্রস্তরলিপি ধর্মপ্রচার চেষ্টা—অর্ঘ্যযাত্রা—ছোটলাটের মন্তব্য—রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর—সিঙিনালা আবাদ—নার্কেল বিভাগ প্রস্তাব—আবেদন—ডে: কমিশনারের মত—হরিশ্চন্দ্রের বাঙ্গালী ভাষা—জমা বৃদ্ধির প্রস্তাব—কোঙ্গিলগঠন—লীলাসঙ্গ—বিভিন্ন শাসন—রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়—খেলাং প্রদান—ছোটলাটের বক্তৃতা—সংক্ষিপ্ত জীবনী—কার্য।

[ ২ ] রাণী ও কুমার জীবনী।—স্বর্গগতা রাণী দহামহী—পুত্রকন্ঠা—শিল্প—বর্তমান  
( ১২৯—১৩৪ পৃষ্ঠা ) রাণী—কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়—সোঁজাত—জমিদারী—  
স্বাধীন ব্যবসায়।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ ১ ] রাজনীতি—শাসনপ্রথা—রাজকীয় উৎসব।—অধঃপতন—বিচার—  
( ১৩৫—১৪০ পৃষ্ঠা ) ক্ষমতা—শাসন ব্যবস্থা—জুম রেজেন্টারী—করের বিবরণ—  
জাতীয় বিধান—রাজকাৰ্য্যালয়—রাজকীয় উৎসব—রাজগোলাম।

[ ২ ] তালুক ও তালুক দেওয়ান—সীমা ও পরিমাণ—তালুক ও তালুক  
( ১৪৩—১৪৫ পৃষ্ঠা ) দেওয়ান।

[ ৩ ] মৌজাগঠন ও হেডম্যান নিয়োগ।—মৌজাগঠন—দেওয়াও তালুকদার  
( ১৪৫—১৫১ পৃষ্ঠা )—অতীত অধিকার ও ব্যবস্থা—Headman—অধিকার—বিচার  
ক্ষমতা—নিয়োগ—মৌজা ও হেডম্যান।

[ ৪ ] কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী।—জীবনী—৮ইশানচন্দ্র  
( ১৫১—১৫৯ পৃষ্ঠা ) দেওয়ান—৮নীলচন্দ্র দেওয়ান—৮গিরিশচন্দ্র দেওয়ান—শ্রীযুক্ত  
কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান—শ্রীযুক্ত জিলোচন দেওয়ান—শ্রীযুক্ত রাজ-  
চন্দ্র দেওয়ান।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ ১ ] শ্রমবিভাগ ও কুলসর্ঘ্যাদা।—শ্রমবিভাগ—কুলসর্ঘ্যাদা—খিসা—কারবারী—  
( ১৬০—১৬৭ পৃষ্ঠা ) ওঝা—রায়ত—শিল্পশ্রম—নাগিতের কার্য—খোপার কার্য—  
কাষ্ঠারণ—তরকারী অন্বেষণ—ধানভান—মহিলাগণের শ্রম-  
সহিত্তা—প্রবে আকোংসর্গ।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

- [ ১ ] জাতীয় চরিত্র ।—একতা—সরলতা—বিশ্বাস—সত্যপরায়ণতা—দান—অভি-  
 ( ১৬৮—১৭৬ পৃষ্ঠা ) ধেরতা—ভেজ ও শক্তি—সংযম—মিতব্যয়িতা—বিলাসিতা—  
 পরিকার পরিচ্ছন্নতা ।
- [ ২ ] জ্ঞী-স্বাধীনতা ।—জ্ঞী স্বাধীনতা—অভিনবত্ব—“স্বাধীন সর্বত্র গতি অথচ  
 ( ১৭৬—১৭৮ পৃষ্ঠা ) সংবত” ।
- [ ৩ ] দাম্পত্য প্রেম ।—দাম্পত্য প্রেম—পক্ষীদম্পত্য—“পতিপত্নী এক চিত্ত একই  
 ( ১৭৮ পৃষ্ঠা ) জীবন ।”

## সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

- [ ১ ] ধর্ম ।—ধর্মমঙ্গলা—রাজার নেতৃত্ব—জড়োপাসনা—উপবীত রহস্য কত্রিগত—  
 ( ১৭৯—১৯০ পৃষ্ঠা ) স্বর্ঘ ও চক্রবংশ—লৌহিতিক কত্রিয়—মহাবান ধর্ম—হিন্দু  
 ধর্মের পুনরুত্থান—বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রবর্তন—হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম  
 —হিন্দুধর্মের শেখাবস্থা—নানাদর্ম—দেবতা—পূজা ও মন্ত্র—শাস্ত্র—‘ক্যাং’ বা বিহার—‘রডী’,  
 ‘লোথক’ ও ‘ঠাকুর’—সাধারণ যাজক—শীলচরণ ।
- [ ২ ] পক্ষ নিয়মাদি ।—পক্ষ ও নিয়ম—শিব—তীর্থযাত্রা—উদ্ভাস্ত নৃত্য—তীর্থ-  
 কলক—আমুদিক কক্ষ—পূর্ণিমাত্রত—নবান্ন—‘চুঙুলাং’—‘মা-লক্ষ্মীমা’ পূজা—হোইরা বা কালা  
 ( ১৯১—২০৩ পৃষ্ঠা ) ইরা পূজা—শিবপূজা—নবগ্রহ পূজা—কের পূজা—সত্যপীরের  
 সিমি—‘ধর্মকাম’—‘হাজার বাতি’—‘আমিংটং’—চক্রবাহ—  
 ‘টাকোনে’ৎসর্গ—গাভীদান ও ঘাটছাড়া ।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

- [ ১ ] সমাজবিধি এবং জ্ঞী-আচার ।—প্রয়োজনীয়তা—শিষ্টাচার—ভোজনপ্রথা—  
 চুলে বস্ত্র—চূষনবিধি—অনুষ্ঠ সমিতি—অবাধ মিলন—স্বাভিচারে দণ্ড—বিচার—দাম্পত্যবিচ্ছেদ  
 ( ২০৪—২১৩ পৃষ্ঠা ) —পার্শ্বন বিধি—‘গারের পানি ভাঙন’—‘গঙ্গাপূজা’—জাতাশৌচ  
 ও প্রসবে ব্যবস্থা—অশৌচ বিধি—‘বুরপারন’—‘মাথা ধোওয়া’  
 —‘বুরপরা পূজা’—অর্ঘ্য ও আলীকাদি ।

## নবম পরিচ্ছেদ ।

- [ ১ ] দশকর্ম—প্রাথমিক কর্তব্য ও বিবাহ ইত্যাদি ।—দশকর্ম—নামকরণ ও  
 অন্নগাশন—কর্ণবেধ—দীক্ষা—যৌবনোৎসব—বিবাহ—অবিবাহিত তালিকা—বিবাহিত তালিকা  
 বিধবা ও বিপ্লবক তালিকা—বিবাহে সম্বন্ধে বিচার—শ্রেণীবিভাগ—প্রস্তাবনা—বন্দোবস্ত—  
 ( ২১৪—২৩০ পৃষ্ঠা ) অবিবাহ দিনের কাব্য—পাত্রী তুলিরা আনিয়া বিবাহ—অভ্যর্থনা  
 কস্তাযাত্রী—উগ্রাহ ক্রিয়—শুদ্ধিবিধি—বিদায় সভা—জামাতার  
 প্রতি উপদেশ—বিবাহের ‘ছুইদ’ ভাঙান—বর তুলিরা নিয়া বিবাহ—গৃহভ্রামতা—মনোমিলনে

বিবাহ—যৌবন ও যুবক যুবতী—প্রণয়ে পলায়ন—সম্মতিতে বিবাহ—হতাশপ্রণয়—একটি চিত্র—  
গাংশালাব্রত ।

[ ২ ] অন্ত্যেষ্টি, হাড়ভাঙ্গান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান ।—শবসংস্কার—সম্বন্ধচ্ছেদ—  
( ২৩০—২৩৬ পৃষ্ঠা ) রথটানা—শবদাহ—হাড়ভাঙ্গান—সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধ—বার্ষিক শ্রাদ্ধ  
—পিণ্ডদান ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] প্রাচীন সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ দারণা ।—সংস্কার—ফল—সংস্কার চেষ্টা—  
( ২৩৭—২৪২ পৃষ্ঠা ) অমঙ্গল সূচনা—নিষেধ ব্যবস্থা—বিশেষ বিধি—স্বপ্নফল—  
বিবিধ ।

[ ১ ] প্রবাদ বাক্য ।—প্রবচন লহরী ( ২৪২—২৪৬ পৃষ্ঠা )

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] আহাৰ্য্য ও পানীয় । খাদ্যবিচার—আহার পদ্ধতি—চাউল—দাল—শাক—  
( ২৪৭—২৫৮ পৃষ্ঠা ) তরকারী—ফল—শুকটী—মংসা—মাংস—ডিম—শামুক ও কীট-  
পতঙ্গ—লবণ—লঙ্কা—মরিচ—তৈল ও মসলা—পিষ্টক—ভাজা  
পোড়া—জল—দধিহৃৎ—হুয়া—তামাক—পানাদি ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] চিকিৎসা ও শুল্কবিদ্যা ।—চিকিৎসা—চিকিৎসক—শুল্কবিদ্যা—চিকিৎসা শাস্ত্র—  
কবচ ও মন্ত্রপ্রযোগে চিকিৎসা—“কু”—মুক্তিযোগ—অবধৌতিক চিকিৎসা—ব্রতপূজাদি দ্বারা  
( ২৬০—২৭০ পৃষ্ঠা ) চিকিৎসা—মন্ত্র—এদাদাগাণা—সংবাদা পূজা মাটিশুকর—  
সাঁজবুড়া—চেলানুকর—কালপূজা সাতনিথিক—চালনিথিক  
—খামমানা—পাড়াবন—বিশেষ রোগ—রোগ ও বিকলাঙ্গ ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] পোষাক পরিচ্ছেদ ও গহনা ।—উদার অমুকরণ—পুরুষ পরিচ্ছেদ—স্ত্রী-পরি-  
( ২৭১—২৭৫ পৃষ্ঠা ) ছন্দ—সজ্জা—গহনা ।

[ ২ ] অজ্ঞাত আবশ্যকীয় সরঞ্জাম ।—আসবাব—‘তাগল’—‘মাড়ি কোড়নী’—  
‘বাইচ’—‘চুচাং’ তাগল—‘চারি’—‘হুল’—‘বারাং’—‘দিংরা’—‘কাগোরাং’—‘পুল্যাং’—‘কুকং’  
( ২৭৫—২৭৯ পৃষ্ঠা ) ‘ফুলবারাং’—‘ছাবরা’—‘তলই’—‘লুই’—‘ঝোঙা’—‘জে-চেই’  
‘ভুগুচেই’—‘রামচেই’—‘আংচেই’—‘ভুব’—‘চালুনি’—‘ছামোরা’  
—‘মজাং’—‘ডুলা’—‘আড়ি’—‘সেরী’—‘ধুলন’—‘ডাবা’—‘মাট্যাংকা’—‘চড়কা’ চড়কা ও ধুহু’  
—‘হাড়ী’—‘পাতিলা’—‘তলইন’—‘বড়া’—‘টংকি’—‘সাঁকো’—‘সারবীশ’ ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] জুম-হল বৈজ্ঞানিক চেষ্টা ।—কৃষি—সমাজের আসক্তি—চেষ্টা—জুম—ফলা-

কল—কর্তন ও দাহন—‘অনুী ছুতা’—বপন—‘বীজপতন’—‘কোমরছুতা’—‘মিরছুতা’—  
 (২৮০—২৯২ পৃষ্ঠা:) জুমপুজা—পাহারা—ফসল সংগ্রহ—জুমে ব্যায়—আর—জুমিয়া  
 পরিবারের খরচ—জুমিয়ার অভাব—হল—চাষে সাহায্য—  
 চাষের বিস্তার—ইক্ষু, তামাক ও সরিষার চাষ—বৈজ্ঞানিক চাষ।

[ ২ ] উৎস্র দ্রব্য।—ধাতু—ভুট্টা—তিল—সরিষা—কার্পাস—তামাক—আউক—  
 (২৯২—২৯৩ পৃষ্ঠা) আল—কচু—তিরিতরকারী—লক্ষা ও ‘বাহর’।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

[ ১ ] শিল্প।—শিল্পাসক্তি—শিল্প পরিমাণ—শিল্পে সাহায্য।  
 (২৯৪—২৯৫ পৃষ্ঠা)

[ ১ ] বস্ত্রশিল্প।—শিল্পশাসন—উন্নতি—‘পি’ধন’—‘খাঁদি’—‘খবং’—‘কর্জাল’—  
 (২৯৫—৩০০ পৃষ্ঠা) ‘পানের খলা’—‘গামছা পানি’—‘তৈইলা’—‘আলাম’—‘বগি’  
 বয়ন—প্রণালী।

[ ২ ] বেতের বুনন।—বাঁশের নাম—‘ডলু’ বাঁশের কাজ—‘সিতিয়া’ বাঁশের কাজ—  
 (৩০০—৩০২ পৃষ্ঠা) ‘লোখা’ বাঁশের কাজ।

[ ৩ ] নৌকা গঠনাদি।—নৌকার কটি—নৌকা খোদা।  
 (৩০২—৩০৩ পৃষ্ঠা)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

[ ১ ] পশুপালন।—পালনে পোষণ—গরু, ছাগল ও মহিষ—শুকর—কুকুর—হরিণ  
 (৩০৪—৩০৬ পৃষ্ঠা) —পক্ষী।

[ ২ ] শিকার।—শিকার-নীতি—শিকারাস্ত্র—সজ্জা—সম্মী—শিকারের মাংস।  
 (৩০৬—৩০৮ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাপর সাধারণ ব্যবসায়।—উপজীব্য—বৃত্তি—দাসত্ব—কর্ণচাচী—সম্মিলিত শ্রম  
 (৩০৯—৩১৪ পৃষ্ঠা) বিভিন্ন শ্রম—নানা পুত্ৰ—বাণিজ্য—ব্যবসায়ের সাধারণ পুত্ৰ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

[ ১ ] শিক্ষা (দ্বীশিক্ষা)।—শিক্ষার পরিমাণ—প্রবিধি—ছাত্রধরা—পুরস্কার—কল—  
 (৩১৫—৩২০ পৃষ্ঠা) দ্বীশিক্ষা।

[ ২ ] ভাষা—বর্ণাবলী বিশ্লেষণ।—অপরাপর ভাষার সহিত সাদৃশ্য সাক্ষাৎভৌমিক  
 ভাষা—ভাষা ভেদ—চাক্কা বাঙ্গালা—সংস্কৃত শব্দ—পালি শব্দ—বাঙ্গালা শব্দ—আর্যীয় আস্থান  
 (৩২০—৩২২ পৃষ্ঠা) —সংখ্যা গণনায়—ক্রিয়া বিভক্তি—সর্কানাম—ক্রিয়াক্রপ—বর্ণা-  
 বলী—শ্রাটন, ব্রফা এবং চাক্কা—ব্রফা ও চাক্কা—স্বরবর্ণ—  
 বাঙ্গলবর্ণ—স্বর সংযোগ—হসন্ত বিধান—ফলা—অপরাপর ভাষার শব্দ।

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

[১] কবি ও কবিতা ।—কবিতা ও সঙ্গীত—কবিতার কথকতা—কবি ও কথক—  
কবিগ্রন্থ—ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান—কপতি ও মেনকা—ধনপতি ও রাধামোহন—  
( ৩৩০—৩৪৭ পৃষ্ঠা ) চাটগাঁছাড়া—দিগ্বিজয় যাত্রা—দেশজয়—রাধামোহনের মৃচ্ছা—  
রাধামোহনের স্বদেশ যাত্রা—রাজা সমরগিরি—বিংরগিরির  
খেদ—ব্রহ্মদেশে উপ-নিবেশ স্থাপন—অপরূপ কথ্য ।

[২] বারমাস ।—কিরীটবির বারমাস ( ৩৪৭—৩৫২ পৃষ্ঠা ) ।

[৩] ছড়া ।—চন্দ্রের আবাহন—সুমপাড়ানির গান—বৃষ্টি প্রার্থনা—“বিহুতি” কথা—  
( ৩৫২—৩৫৮ পৃষ্ঠা ) “ভেং ভেররীর” গান—কাটনের ডাক ।

[৪] হৈয়ালী ।— ... ( ৩৫৮—৩৬০ পৃষ্ঠা ) ।

## বিংশ পরিচ্ছেদ ।

[১] ক্রীড়া ।—ক্রীড়া—পুরাতনের আদর—শিশুক্রীড়া—“ইজিবিজি খারা”—“কভাঝাঃ  
( ৩৬১—৩৬৬ পৃষ্ঠা ) খারা”—“পলাপলি খারা”—“পুংপুংখারা”—“বুদ্ধিমান খারা”—  
“বরচাক বাহির চাক খারা”—“পন্ডিখারা”—“ঘিলা-নাং-মাদ-  
কুমীর-শামুখ খারা”—“ওহুখারা”—“পোরখারা”—তাস-পাশা “গোকখারা”—জুয়াখেলা—  
“তুঘুরী খারা” ।

[২] কোতুক ।—কোতুক—মদ্যোৎসব—নাচ—বাজী-পোড়ান ইত্যাদি ।

( ৩৬৬—৩৬৭ পৃষ্ঠা )

[৩] বাজ ।—বাদ্য—শিঙা—“ধুধুগ”—“জান্দুরা”—“খেংগর”—“ঢুল”—বংশীও মুরলী ।

( ৩৬৭—৩৬৯ পৃষ্ঠা )

[৪] সঙ্গীত ।—সঙ্গীত...ভাবচতুষ্টয়—শোভাপান—উদাসী শিবচরণ—“গোজেনের লামা”

( ৩৬৯—৩৮৪ পৃষ্ঠা ) “উভগীত”—ভক্তিভাব—উদাসভাব—বিরহভাব—প্রেমভাব—  
গীত—বিস্ময় সঙ্গীত—সঙ্গীতে অমুরাগ ।

## উপসংহার ।

[ ১ ] বাঙ্গালী-সংস্রব ... ( ৩৮৫ পৃষ্ঠা ) ।

[ ২ ] মিশনারী চেষ্টা ... ( ৩৯০ , )

[ ৩ ] ইংরাজাধিকারের ফল ... ( ৩৯৭ , )

# ভূমিকা ।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে অগতের আদর্শ তাহা কেবল গিরি, নদী, নিখার বা শীতোষ্ণ ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদনিচয় লইয়া নহে, সর্ব ধর্মের একত্র সমন্বয়, সর্বোপরি মানসিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ হইতে আদিম মানবীয় সরলতা ও প্রকৃতি-নির্ভরতা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার যুগপৎ সংসর্গে এস্থান স্মরণাতীত কাল হইতে সমগ্র ভূমণ্ডলে রমণীয় ও লোভনীয় হইয়া আছে । প্রাচীন জ্ঞানোজ্জ্বল হোমহবির্গন্ধ-পূত দিবা যুগ হইতে আড়ম্বরদীপ্ত বাষ্প-ধূমাচ্ছন্ন বর্তমান কালে অবতরণ করিলে—অপর সহস্র পরিবর্তনের সংঘর্ষণেও ভারতের সেই “বসুধৈবকুটুম্বকম্” নীতি জীবন্ত রহিয়াছে দেখিয়া প্রাণ শান্ত হয় ! দেশের সহিত দেশের—সমাজের সহিত সমাজের—প্রাণের সহিত প্রাণের পরিচয় ঘটাইতে পারে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, নতুবা আপনা আপনি হাসিয়া খেলিয়া—খাইয়া শুইয়া পশু-পক্ষী জীবনও চলিয়া যায় না কি ? রেল জাহাজের বিস্তারে যাতায়াতের ক্লেশ লাঘব হইতে পারে, মনের তাহাতে কি আসে যায় ? তাহার অনাবিল filmএ বিভিন্ন প্রাণের প্রীতিময় চিত্রপুঞ্জ যত অধিক প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, হৃদয়-ভার ততই লঘুতর হইয়া যায় । তখন তুমি আর কেবল তোমার নহ, বিশ্ব তোমার বাড়ী ঘর—নিখবাসী তোমার ভাই-ভগিনী ; দেখিবে, তোমার স্মৃতি ছুঁতে—উত্থান পতনে নিখিল বিশ্ব বিচলিত হইয়া উঠিতেছে !

ভারতের বেদ, পুরাণ, সংহিতা, উপনিষদ ইহাই আমাদের দিন দিন শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হইতেও আমরা অতীত সমাজের সেই অস্পষ্ট আভাব প্রাপ্ত হইতেছি । যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের “কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিনী” ভিন্ন ভারতের অপর কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ অধুনা বর্তমান নাই । কিন্তু তদ্বারা ইহা নিশ্চিত বলা যায় না যে, অগতের নব্বয়তমজ্ঞানে ভারতে ইতিহাস লিখন প্রথা তৎপূর্বে প্রচলিত ছিল না । পরন্তু উপযুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে কুমারিকা হইতে সূদূর তিব্বত ভূমি পর্য্যন্ত এবং আরব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত—বিশাল ভূভাগের জলে স্থলে সর্বত্রই ভারতেতি-বৃত্তের জরাজীর্ণ পৃষ্ঠাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে । পাঠক্রমের অজ্ঞতা হেতুই আমাদের অতীত কাহিনী ঘোর অন্ধতমসচ্ছন্ন বোধ হয় । বস্তুতঃ এই সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অধ্যয়ন করিবার সুযোগ বা অবসর পাঠকের নাই,



পক্ষান্তরে তাদৃশ বিশৃঙ্খল পৃষ্ঠাসমূহ হইতে পাঠোদ্ধার করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। বহু দিন হয়, প্রাচ্য পণ্ডিত কর্ণেল টড্ মহোদয় 'রাজস্থানে'র ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে এক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ সেই পথ ধরিয়া হইলে, ভারতের সকল স্থানের পুরাবৃত্ত ভাগ সংগৃহীত হইলে, দেশের এক মহৎ অভাব সূচিত।

বর্তমান গ্রন্থকার অধিকতর কঠোর অবস্থানিচয় হইতে এই জাতি বিশেষের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন দ্বারা সাহিত্য ক্ষেত্রে অপর এক অভিনব আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতের অভ্যদয় সম্পন্ন অপর্যাপ্ত জাতির তুলনায় এই নগণ্য প্রান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মাজাতি সামান্য বিবেচিত হইলেও, ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, সভ্যতা-অসভ্যতা এবং উন্নতি-অহুন্নতির অভ্যন্তর প্রদেশে বাহিরাবরণ ও বাহুল্যতা পরিহার করিয়া সকল জাতির সকল শ্রেণীর প্রাণের গতি একই ভাবে চলিয়াছে। এবং যে প্রবৃত্তি লইয়া জীব মানব শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহাও সমস্ত human feelings and passions—সুখ-দুঃখ-হিংসা-দ্বेष-অমুরাগ-বিরাগ পূর্ববৎ স্থির রহিয়াছে। ত্রিশছয় বর্ষ পূর্ববর্তী Papyrous পত্রের উপর হস্তনিধিত যে এক পুরাতন গর মিশর দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এই উক্তির সত্যতা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়। তাহা উপলব্ধ হইলে আর্য্য আনার্য্য সভ্য অসভ্য প্রাচ্য প্রতীচ্যের কোন বিভাগই থাকে না—সকলকেই নিজের অংশমাত্র বলিয়া জ্ঞান হয়। সকলের অন্তর্গতি একই দিকে প্রধাবিত, এবং সকলকেই বিশ্ব বিধাতার সমদৃষ্টির সমক্ষে একই প্রাণে অমু-প্রাণিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা মুখে 'ভাই ভাই—ঠাই ঠাই, ভেদ নাই—ভেদ নাই' ইত্যাকার বাহা বলি না কেন, সেই এক প্রাণ ভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের অতি অন্নই আছে। বাহাদিগকে কখনও দু'চক্ষে দেখি নাই, এমন কি বাহারা সাদা কি কালো তাহাও জানি না, তাহাদিগের নিমিত্ত প্রাণের কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ ক্ষম্মিবার সম্ভবনাও ত দেখিতেছি না! আমাদের মধ্যে বাহারা অধিকতর সন্দেহ তাঁহারা Hunter, Risley বা স্থানীয় ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের গ্রন্থ হইতে সেই অজ্ঞাত ভাই ভগিনীদের সংবাদ লইয়া থাকেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, কোন ভিন্ন জাতীর চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পার্শ্ববর্তী জাতিরও বহুকাল কাটিয়া যায়, তাদৃশ স্থলে বিদেশীয় লেখকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলীন জাতি বিশেষতঃ জটিল পর্তুগীজ রহস্য সম্বন্ধে সামান্য কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার কত আশা করা যাইতে পারে। তবে তাঁহারা যে স্বাভাবিকী অমুসন্ধিৎসা-

গুণে দেশের এই অনাদৃত জাতি সম্বন্ধে এত শ্রম স্বীকার করিতেছেন, তাহাতেই অগণ্য ধন্যবাদ ; তাঁহাদের হইতে দেশের প্রতি আমাদের বহু কর্তব্য শিক্ষা করিবার আছে ।

এক্ষণে দেখিব, আমাদের বর্তমান গ্রন্থকার ইহাতে কিরূপ কৃতকার্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন । পার্শ্বত্যাগ জাতি সম্বন্ধে সাধারণত লোকের নানারূপ ভ্রান্ত মত ও বিশ্বাস শুনা যায় ; আভ্যন্তরীণ অবস্থানান্তরিত্য ইহার এক মাত্র কারণ এই গ্রন্থালোচিত যাবতীয় বিষয়ের সারসংগ্রহ করিয়া দিয়া পুস্তকের রসভঙ্গ করিতে না চাহিলেও, পাঠকবর্গকে একটা স্থল পরিচয় দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । এই পক্ষে আমাদের আশা আছে, তাঁহারা স্থচীপত্রখানি দেখিলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন । একটা জাতি সম্পর্কে ভাষার যতটা পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, তিনি তাহা আশাতীতরূপে চিত্রিত করিয়াছেন । এবং বিষয়গুলি এমননি সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, মূল গ্রন্থখানিকে সহজেই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা, প্রথম খণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত—ইহাই ইতিবৃত্ত ভাগ । এই অংশে গ্রন্থকারের গভীর তত্ত্বানুসন্ধান এবং আয়াকান, ব্রহ্ম, তিব্বত, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক সাহিত্যের বহুল সমালোচনের পরিচয় পাওয়া যায় । এবং এই উপলক্ষে কেবল চাক্‌মাজাতির নহে, অধিকন্তু পূর্বোক্ত প্রদেশাদির ও অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে । বিশেষতঃ তদীয় আলোচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে চলিয়াছে দেখিয়া আশা করা যায়, ইহা রাজা-প্রজা, স্বজাতি-বিজাতি সকলের তুল্যরূপ প্রীতি আকর্ষণ করিবে । দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত—সামাজিক ভাগ, এবং তৃতীয় খণ্ডে মূল গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ তাহা সভ্যতা ভাগ । অর্থাৎ কোন অপরিচিত জাতির সংবাদ যেক্রমে লওয়া স্বাভাবিক, গ্রন্থকার যেন তেমন কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সম্মুখে রাখিয়া, যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় যথাক্রমে বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন । এই শেষ দুই খণ্ডে লেখকের ত্রয়োদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ততোধিক বর্ণনা শক্তি অধিকতররূপে পরিষ্কৃত । জানিলেও জানাইবার, দেখিলেও দেখাইবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই থাকে । আমি পুনরায় বলি, সেই শক্তি বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে । এবং তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন-উপলক্ষে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ও গ্রন্থটিকে পূর্ণতা প্রদান করিতে কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থের অল্প মাত্র স্থল পাঠ করিলেই সহজে উপলব্ধি হয় । আরও আশ্বাসের কথা, গ্রন্থখানি চাক্‌মাজাতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইলেও,

ইহাতে সমগ্র পার্কৃত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্ব ও স্থলরূপে আলোচিত হইয়াছে।

চাক্‌মাদিগের সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম, ইহারা পার্কৃত্য চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী নহে। বহুকাল ধরিয়৷ ইহারা স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে, এবং এক সময়ে পার্কৃত্য সমস্ত প্রদেশের শৈলশেখরে শেখরে প্রকৃতির সরল শিশুর স্থায় স্বেচ্ছাভিলাষে বিচরণ করিতেছিল। লেখক তিব্বতীয় ও দার্জিলিংবাসী লিঙ্গুদিগের কেবল বংশ-আখ্যায় ইহাদের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু আচার-ব্যবহার প্রভৃতি আরও বহু প্রকারে উভয় সমাজে সোসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। তিব্বতের মহাযান ধর্মই যে চাক্‌মাদিগের আদি ধর্ম ইহাদিগের আধুনিক জীবনেও তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর লেখকের বঙ্গীয় প্রাচীন বর্ণমালার সহিত ব্রহ্ম ও চাক্‌মাবর্ণের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া দেশের সমক্ষে এক অপূর্ব তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন; ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, এইরূপ ঐতিহাসিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় তত্ত্বগর্ভ সর্বোৎকর্ষ কোণ গ্রন্থ এযাবৎ কোন জাতি সম্বন্ধে প্রণীত হয় নাই, বিশেষতঃ বাঙ্গালার ইহাই সর্বপ্রথম Antiquatic গ্রন্থ। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস সাহিত্য ও সমাজে এই গ্রন্থ সকলেরই সাদর সম্বর্দ্ধনা লাভ করিবে।

অধিক আর কি লিখিব, গ্রন্থকার বয়সে নবীন হইলেও প্রবীণাধিক ষোণাতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি “Indian Research Society”র জনৈক বিশিষ্ট সভ্য। আশা করি তাঁহা দ্বারা দেশের আরও বহু পুরাতত্ত্ব দেশের সমক্ষে উদ্ধার লাভ করিবে। এবং তিনি জাতীয় ইতিহাসের যে সম্বন্ধে প্রদান করিলেন, তাহাতে প্রত্যেক দেশহিতৈষী অন্ততঃ স্বজাতির ইতিহাস সকলনে হইলেও ত্রুটি হইবেন। তরুণ লেখককে বৃদ্ধের এই সম্বেদাশীর্বাদ—সুখস্বাস্থ্যের সহিত চিরায়ু লাভ করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করুন। ইতি—

লাসাভিলা ;

দার্জিলিং ।

}

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস ।





# চাক্ৰমাজাতি ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] জাতীয় পরিচয় এবং [ ২ ] প্রাচীন কাহিনী ।

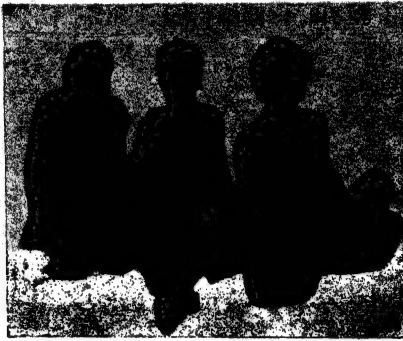
[ ১ ]

বর্তমান সভ্যতার নৈকষ-পরীক্ষার পার্শ্বতীয় জাতিসমূহের মধ্যে চাক্ৰমাদিগের একতম শ্রেষ্ঠ আসন স্বীকার করা বাইতে পারে। বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্প-সাহিত্যে ইহাদিগের শক্তি সভ্য জাতিরই প্রায় সমকক্ষ ; এবং উন্নতি ও সম্ভাবজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি মিঃ হজ্‌সন ( Mr. Hodgson)-প্রমুখ কোন কোন বিদেশীয় ঐতিহাসিক কেবল অনুমানবলে ইহাদিগকে আদিম অসভ্য—বর্ষর-(Aboriginal)-শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন (১), এ কেমন অবিচার ? ভারতের যাবতীয় পুরাবৃত্তকাহিনী যৌর তমসাজ্ঞন ; উপর্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রাচীন নিদর্শনাবলী ও বিলুপ্তপ্রায়। তাই বলিয়া উপযুক্ত প্রমাণ-পরীক্ষা ব্যতিরেকে কেবলই অনুমানে ঘুরিলে, ঐতিহাসিকের দায়িত্ব চুকিবে কেন ? সত্যবটে, প্রমাণের উচ্ছ্‌জ্বল-আবর্তে পড়িয়া অনেক সময়ে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয়। তখন সেই মীমাংসা পাঠককেও বুদ্ধিতে দেওয়া উচিত। নতুবা অভিজ্ঞতার উচ্চ-আসনে দাঁড়াইয়া অকুটি সঞ্চালনে স্পষ্ট—নিঃসন্দিগ্ধভাবে বক্তৃতা করিয়া গেলে, নিরীহ পাঠককে প্রতারণা করা হয় মাত্র। তাঁহারা 'যে তিমিরে—সে তিমিরে'ই পড়িয়া রহেন ! বর্তমান পুস্তকেও যে সে

(১) Vide :—

- I. Bengal Asiatic Society's Journal, No. 1—1853.
- II. The Calcutta Review, October—1869.
- III. Census Report—1901.

দোষ ঘটিবে না, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে যথাসাধ্য সাবধান রহিলাম—এই পর্য্যন্ত। তাঁ' ছাড়া প্রবোধের কথা এই যে, এই পুস্তক প্রণয়নে স্থূলত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে কঠোর যত্নস্বীকারের ক্রটি হয় নাই। উপস্থিত চাকমাজাতির উৎপত্তি, স্থিতি বা পরিব্যাপ্তিমূলক এ যাবৎ যে সমুদয় বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্বারা ইহারা যে অনার্য্য নহে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন করা যায়। সে সমুদায় বাদ-বিচার যথাক্রমে আলোচিত হইতেছে।



ইহাদিগের মুখমণ্ডল গোলাকার; নাসিকা নত ও চিপটি; গওদেশের অস্থি উন্নত; বক্ষঃ প্রশস্ত; বাহ্যগল মাংসল; জন্মাদেশ অতিশয় স্থূল ও স্তূৰ্ণ (বোধ হয় পৰ্ব্বতারোহণ ও অবরোহণই ইহার প্রধানতম কারণ শারীরিক গঠন।

হইবে); সর্কোপরি অক্ষিগোলকের কপিলাভাস এবং বক্রদৃষ্টি ইত্যাদি লইয়া শরীর বেশ দৃষ্টপুষ্টি, বলিষ্ঠ ও স্তূৰ্ণ বটে, কিন্তু সুগঠিত নহে! শারীরিক উপাদানগুলির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই। বর্ণ গৌরবত—কিন্তু লাবণ্যবর্জিত। অপরতঃ কেশভূষণেও ইহারা নিতান্ত অসৌভাগ্য। পুরুষেরা বিরলশৃঙ্গ—অগ্রহীন (১) বলিলেও চলে। রমণীসমাজেও আঙুল্ফলিষিত কেশদাম স্বপ্নের অগোচর। এককথায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মঙ্গোলিয়ান-সংজ্ঞার সহিত অক্ষরে অক্ষরে ইহাদিগের সাদৃশ্য রহিয়াছে। “বঙ্গীয় জাতি ও বংশ”

(১) যে ছ'এক গাছি উঠে, অনেকে তাহাও 'চিমটা'র সাহায্যে উৎপাটিত করিয়া ফেলে।

( Tribes and Castes of Bengal ) নামক পুস্তকে সার্ব রিজলী মহোদয় নানা প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন যে \*,  
 \* Page—168.  
 এতাদৃশ শারীরিক গঠন এবং বর্ণগত সৌসাদৃশ্য ইহাদিগকে  
 মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত করা যায় । তৎসমর্থনার্থে তিনি ইহাদের শব্দকরা ৮৪৫  
 জনের মঙ্গোলীয় চেহারা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্যও দিয়াছেন । পক্ষান্তরে  
 পণ্ডিত ( Herr Verchow ) হার ভারতো মহোদয় বলেন, এই পরিমাপ  
 কোনও জাতিরই আকৃতিগত তুলনার পক্ষে যথেষ্ট নহে ।

পরন্তু আমরা মানবজাতির ককেশিয়ান, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি ভিত্তিহীন  
 বিভাগগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিতে সম্মত নহি । জলবায়ু এবং মানসিক-  
 বৃত্তি ও ব্যবসায়াদিভেদে জীবের নিত্য পরিবর্তন ঘটতেছে । তাহা দেখিয়া  
 ওনিয়াও, বিভিন্ন প্রদেশবাসী—বিভিন্নবৃত্তিক মানবগণের বর্ণ ও আকারগত বিভিন্ন-  
 তায়—বিভিন্নবংশভুক্ত নির্দেশ করা কদাপি সম্ভব বোধ হয় না । পাশ্চাত্য  
 পণ্ডিতমণ্ডলী হম্বু, মাসিকা ও করোটির গঠন এবং সংস্থান-বৈষম্য দেখিয়া যে  
 চীন ও মঘ ( কিরাত )-দিগকে মঙ্গোলীয় স্থির করিয়াছেন, মনু-সংহিতা প্রভৃতি  
 বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে তাহাদিগকে ভূতপূর্ব ভারতবাসী বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়াই  
 জানিতে পারা যায় ( ১ ) । সুতরাং চাক্‌মাগণ মঙ্গোলীয় কি না এবংবিধ  
 প্রশ্নের শীর্ষমাংসা আমরা আদৌ প্রয়োজনীয় মনে করি না ।

চাক্‌মাদিগের জাতীয় ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমত দেখাইতে  
 হইবে, তাহাদের আদিম বসতিস্থান কোথায়, এবং কিরূপেই বা তাহারা বর্তমান  
 অধ্যুষিত স্থানসমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে । পণ্ডিতপ্রবর এক্‌, মুলার  
 ( F. Muller ) ব্রহ্মদেশ, আরাবান ও পার্শ্বতা  
 চট্টগ্রামনিবাসী জাতিমাত্রকেই “লোহিতিক”(২) † Allgemeine ethnographic,  
 P.—405.  
 বংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন † । অর্থাৎ

(১) “সাহিত্যসংহিতার” ১৩১২ সালের ‘জাতি’ সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত মন্তব্য বাহির  
 হইয়াছে ।

(২) Lohitic—from Lohita, ‘red’ a name of the Brahmaputra  
 believed by Lassen to have reference to the east and the rising sun.  
 (Ind. Alt. i, 667, note.)



ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী প্রায় সমুদায় জাতির মূলশাখা লোহিতা—  
নামান্তরে ব্রহ্মপুত্র ( যারকিও-সাংপো ) নদের তীরভূমি হইতে আগত।  
অপর্যাপ্ত নরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে “তিব্বতী ব্রহ্মা” নামেও অভিহিত  
করিয়া থাকেন। এই ‘লোহিতিক’ বা ‘তিব্বতী ব্রহ্মা’ সংজ্ঞার সহিত বক্ষ্যমাণ  
চাক্‌মাজ্‌জাতির সম্বন্ধনির্ণয় করিবার পূর্বে, “পার্কতাচট্টগ্রাম এবং তত্রতা অধিবাসি-  
বৃন্দ” ( The Hill Tracts of Chittagong and  
the Dewellers therein )-প্রণেতা—এই পার্কতা-

চট্টগ্রামেরই ভূতপূর্ব ডিপুটি কমিশনার কাপ্তেন টমাস হার্বার্ট লুইন ( Captain  
Thomas Herbert Lewin )-কৃত শ্রেণীবিভাগের আলোচনা সমীচীন মনে  
করি। তিনি এই পার্কতাচট্টগ্রামের অধিবাসিবর্গকে ব্রহ্মদেশীয় নামানুকরণে  
“খায়ংখা” এবং “টংখা” শ্রেণীদ্বয়ে বিভাজিত  
করিয়াছেন\*। শব্দদুইটি ব্রহ্মভাষাজ ; ‘খায়ং’

\* Page—28.

অর্থ নদী, ‘টং’ অর্থ পর্বত, আর ‘খা’ বা ‘ছা’ শব্দের অর্থ সন্তান। অতএব যাহারা  
নদীকূলে বাস করে, তাহাদিগকে “খায়ংখা” অর্থাৎ ‘নদীর সন্তান’ এবং পর্বত-  
শৃঙ্গবাসিগণকে “টংখা” অর্থাৎ ‘পাহাড়ের সন্তান’ বলা যায় (১)। এই সংজ্ঞামতে  
চাক্‌মাগণকে তিনি “খায়ংখা” শ্রেণীরই অন্ত-  
ভূত (২) করিয়া গিয়াছেন†। গ্রুণ্ডয়েডেল

† Page—62.

সাহেব ( Herr A. Grunwe'el ) বলেন, ইহা কেবল বাহ্যভাবে নহে, কার্যতও  
এই প্রথা তাহারা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া থাকে। কিন্তু ( Herr Verchow )  
ভারতের সাহেবের মতে এই সকল বিভাগ তাহাদের ( বর্তমান ) নদীকূলে আবাস ও

(১) “রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস” লেখক শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ “খায়ংখা”গণকে  
মধ্যবংশজ এবং “টংখা”দিগকে কিরাতবংশজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শেষে আবার তিনি  
কাপ্তেন লুইনের মতে মত দিয়া বলিয়াছেন—“খায়ংখা”বংশের একটা শাখা চাক্‌মা নামে পরিচিত”  
(৩৩৩ পৃষ্ঠা); তবে কি তিনি চাক্‌মাগণকে মধ্যবংশজ বলিতে চাহেন? অন্তত আমরা মধ্য এবং  
কিরাতদিগকে অভিন্নজাতি বলিয়াই জানি।

(২) কাপ্তেন লুইনের এই মন্তব্য হইতে “চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত”কার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত  
“ইয়ংখা” অর্থাৎ “খায়ংখা” শব্দের এক ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করিয়া চাক্‌মাজ্‌জাতিকে বুঝাইয়াছেন।  
উাহার মতে “টংখা” মিশ্র ও সঙ্কর জাতি।

পার্কত্যা বাসস্থান অনুযায়ী হইয়াছে ; এতদ্বারা আদিম বসতি বা কোন বিশেষবিধি কিছুতেই অনুমান করা যায় না । আমরাও এই শেথোক্ত মত সমর্থন করি ।

শারীরিক গঠনাদি দেখিয়া আবার কেহ কেহ সন্দেহ করেন, ইহারা আরাকান হইতে উৎপন্ন (১) ; বাঙ্গালীদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে । তাঁহারা এই সিদ্ধান্তসমর্থনকল্পে ইহাও সিদ্ধান্তবিশেষ ।

বলিতে চাহেন যে, চাকমাগণ সম্প্রতিমাত্র আরাকানী ভাষা ছাড়িয়াছে । বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে । তাহা হইলে এখনও আমরা চাকমাভাষায় প্রচুর মবীশক পাইতাম, কিন্তু ইহা একপ্রকার নাই বলিলেও হয় । পঞ্চাস্তরে রিজলী মহোদয় বলেন\*, “এতৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণও অতিশয় দুর্বল । কেন না, আমরা \* Tribes and castes of Bengal, P.—168. যতদূর জানি, অল্পকাল মাত্র হইল আরাকানে লোকবসতি আরম্ভ হইয়াছে !” তবে কিনা ইহারা যে এক সময়ে আরাকানে বসবাস করিতেছিল, তাহাতে কোন ভুল নাই । তথা হইতে অনুকৃত বর্ণাবলী এথাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে ।

ইহাদিগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতিমূলক এক্রপ নানাবিধ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় । মঘেরা বলে, ইহারা মোগলবংশধর । কোন সময়ে চট্টগ্রামের (মুসলমান) উজীর কতকগুলি সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া আরাকানরাজ-বিরুদ্ধে অভিযান করেন ।

তাঁহারা পথিমধ্যে এক বিপুলসংখ্যক “ফুঙ্গী” (২) কুটীর-পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন । তখন ফুঙ্গী উজীরকে তদীয় আশ্রমে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহাৰ্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । কথা রহিল, অতি সত্বরেই ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে । তাহাতে উজীরও সম্মত হইলেন । কিছুক্ষণ পরে পাকের বিলম্ব দেখিয়া তিনি জনৈক সৈনিককে তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন । সে আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করতঃ দেখিল, ফুঙ্গী একটি পাত্রে চাউল ও মাংস দিয়া উনানের উপর স্থাপন

(১) পরন্তু তারকচাঁদ ও (কোন অনুমানবলে জানি না) লিখিয়াছেন, “ইয়ংখা (অর্থাৎ চাকমাগণ) আরাকান বংশসম্ভূত ।” ‘চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত’, পৃষ্ঠা—৫ ।

(২) ফুঙ্গী—বৌদ্ধ যাজক বা মঠাধ্যক্ষ ।

করিয়াছেন; কিন্তু উনানে কাঠ দেওয়া হয় নাই। তৎপরিবর্তে ফুলী পাত্রনিরে পদদ্বয় রাখিয়াছেন,—অঙ্গুলীসমূহ হইতে অগ্নিশিখা উখিত হইতেছে। সে এই অলৌকিক দৃশ্যে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রভুকে আসিয়া সমুদয় বিবৃত করিল। ইহাতে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, ‘তাদৃশ প্রক্রিয়ায় কখনও অন্ন পরিপক হইতে পারে না।’ অনন্তর তিনি সৈন্তগণকে পুনর্বার্তার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। এদিকে সেই দিশুদ্ধচেতা ফুলী অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি অতিশয় মন্বাহত হইয়া সসৈন্তে উজীরকে অভিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের প্রতি এক যাদুময় তেজঃ প্রেরিত হইল। তাহারই ফলে আরকানরাজের সৈন্তসম্মুখে উপনীত হইলে তাঁহাদের চিত্তবল বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল,—অন্যাসেই পরাজিত এবং বিপক্ষের হস্তে বন্দীভূত হইলেন। আরকানেশ্বর এই মোগলগণকে স্থানীয় অধিবাসীদের হইতে পত্নী গ্রহণের অনুমতি দিয়া স্বীয় রাজ্যে দাসস্বরূপে স্থাপন করিলেন। ইহারাই ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমান চাক্‌মাজাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই জনশ্রুতির পরিপোষকতায় কাপ্তেন লুইন দেখাইয়াছেন যে, ১৭১৫ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জামুল খাঁ, সেরমুক্ত খাঁ, সেরদৌলত খাঁ, জানবক্স খাঁ, জব্বর খাঁ, টব্বর খাঁ, ধরমবক্স খাঁ প্রভৃতি চাক্‌মাজপতিবর্গ “খাঁ” উপাধি (১) পরিগ্রহ

করিতেন। তদানুযায়িক ইহাও উল্লিখিত হইতে পারে যে, মুসলমানী শব্দের এই সময়ে তাঁহাদের কুলবধূগণেরও ‘বিবি’ খেতাব প্রচলিত আধাঙ্গ।

ছিল। এখনও অশিক্ষিত সাধারণে ‘সালাম’ শব্দে অভিবাদন করে এবং আশ্চর্য্য বা খেদনূচক আবেগে ‘খোদা’র নাম স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও কেবল এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়া কখনই ইহাদিগকে মোগল-প্রসূত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ চট্টগ্রামে মোগলশাসিকার স্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল, আড়াইশত বৎসরেরও কম; ইহার দেড়শত বৎসর পূর্বে হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। পূর্বোক্ত প্রবাদ সত্য হইলে

(১) এই ‘খাঁ’ উপাধি সম্বন্ধে আবার কেহ কেহ বলেন, চাক্‌মাজিগণের জ্যৈষ্ঠ রাজা চট্টগ্রামের কোন মুসলমান উজীর পরিবার হইতে বিবাহ করার এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা পুরুষপুরুষসম্বৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই।

চাক্‌মাজাতির উৎপত্তিকাল তিন শত বৎসরের অধিক হইতে পারে না, সুতরাং ইহা একেবারে অসম্ভব । বোধ হয়, চট্টগ্রামে মুসলমান-প্রাবল্য-সময়ে এই করদ-রাজত্ববর্গ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার “খাঁ”, “বিবি” প্রভৃতি সম্মানান্বিত খেতাব গ্রহণ করিয়াছেন (১) । এমন কি ইহাদের জড় কামান ও কালুখাঁ, কতেখাঁ-প্রভৃতি গৌরববাচক ‘খাঁ’ আখ্যা (২) লাভ করিয়াছিল । সেই সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত দু'একটা মুসলমানী সংস্কার এবং ‘আদব-কায়দা’ ও প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহা অবশ্য মানিয়া-লওয়া যায় ।

ব্রহ্মদেশীয়েরা ইহাদিগকে ‘ছাক্’ বা ‘ছেক্’ নামে নির্দেশ করেন । কুকিরা ও ( ৩ ) ডাকে—“টুইছেক্” । তাহাদের ভাষায় “টুই” শব্দের অর্থ ‘জল’ ; সুতরাং তাহাদিগের মতেও ইহারা—জলতীরবাসী জাতি । সম্ভবতঃ চাক্‌মাগণকে কর্ণকুলী ও তাহার করদ চেষ্টা, শুভলং, কাচালং প্রভৃতিতীরে বসবাস করিতে

(১) পরন্তু এই সকল উপাধি হয়তঃ কেহ কেহ মুসলমান সম্রাট ইহাতেও পাইয়া থাকিবেন । কেন না দেখা যায়, হুসেনসাহ খাঁর সম্রাট গোপীনাথ বহুকে ‘পুরন্দর খাঁ’ এবং সভাসদ পণ্ডিত মালাধর বহুকে ‘গুণরাজ খাঁ’ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত বীণেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—“সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল ; ‘পুরন্দর খাঁ’ ‘গুণরাজ খাঁ’ এই সম্বন্ধে রাজদত্ত খেতাব ।”—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ( ২য় ) ১৪৯ পৃঃ । যাহা হউক এগুলি আধুনিক বর্ণপুচ্ছাপেক্ষা যেন অধিকতর মূল্যবান মনে হয় ।

(২) পাতিয়ালা রাজ্যেও একপ ‘খাঁ’ উপাধিধারী একটা কামানের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার নাম কুড়ি খাঁ । ১৮৪৫-৪৬ অব্দের যুদ্ধে ইংরেজ হস্তে পতিত হয় ।

(৩) কুকি আখ্যাটি পূর্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের দ্বারা তাহাদিগের “কু-কু-কু—কি-কি-কি” শব্দ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে । কেননা তাহাদিগকে কোন বিষয় বা স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণতঃ উত্তর দেয়, ‘কু-কু-কু’ অর্থাৎ সে কি বা সেখানে কি—‘কি-কি-কি’ এখানে কি বা এখানে এই ! পরন্তু বিগত সেলান্ রিপোর্টেও লিখিত হইয়াছে,—“The word Kuki is really a generic term used by the people of the plain to denote the hill-men, other than Tiperahs and Chakmas” (Report on the Census of Bengal, P. 420 ) । কাছারবাসিনগ ইহাদিগকে “লুহাই” নামে অভিহিত করিত । কাপ্তেন লুইস এই শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—“লু” অর্থ সমুদ্র, এবং ‘হাই’ ক্রিয়ার অর্থ কাটা অর্থাৎ বাহারি মাথা কাটে । যাহা হউক পদার্থশেষ্ট তাহা হইতেই “লুহাই” (Lushai) বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।

দেখিয়াই কুকিগণ টুইছেক আখ্যা প্রদান করিয়াছে (১)। বলাবাহুল্য এই আখ্যা ও কাণ্ডেন লুইনেরই মতানুবর্তিত। কর্ণেল (২)

ফেইরি (Colonel Phayre) আরাকানের

\* Bengal A. B. Journal—

No. 145 of 1844.

ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন \*, ‘রাজা-ওং’ অর্থাৎ

আরাকানের রাজমালাতে পাওয়া যায়, বারানথি (বর্তমান বারানসী)র রাজপুত্র যুবরাজ কোমিসিং পিতাকর্তৃক ব্রহ্ম, শান (বর্তমান শ্রাম) এবং মালয়জাতি-অধ্যুষিত দেশসমূহের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইলে, তিনি বর্তমান ছান্দোয়ানগরের নিকটবর্তী আরাকানের প্রাচীন রাজধানী রামায়তীনগরে আসিয়াছিলেন। এখানে

তিনি পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে নানাজাতীয় লোক  
চাক্‌মান মের  
ব্যুৎপত্তি।  
আনয়ন করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা সর্কাদৌ উপজীবিকা  
প্রার্থনা করে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের নাম রাখিলেন—‘ছেক্’

(৩)। ইহারাই ক্রমে রাজকীয় ইতিবৃত্তে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ৩৫৬ মধ্যক্বে (১৯৪-৯৫ খৃঃ অঃ) রাজা ন্যা-সিং-ন্যা-তৈন এই ছেক বা ছাক্‌দিগেরই সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন। ইহার তিনশত বৎসর পরে রাজা মেংদি, শ্রাম এবং ছাক্‌দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি আরাকানের প্রান্তসীমায় ছাক্‌ সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদিগের আচার-ব্যবহার চাক্‌মাদিগের সহিত নানাস্থলে বিভিন্ন হইলেও, মূলতঃ সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। এই ‘ছাক্’ নামটি যেন ‘চাক্‌মা’ নামেরই রূপান্তরমাত্র। সার রিজলিও “ছাক্—ছাক্‌মা” - চাক্‌মা” রূপে মূল নির্দেশ করিয়াছেন।

কাণ্ডেন লুইন বলেন †, “চাক্‌মা নামটা চট্ট-  
গ্রামের অধিবাসীদিগেরই দ্বারা প্রদত্ত।” কিন্তু

† The H. T. of Ctg. and the  
dwellers therein, P. 62.

(১) পঞ্চাস্তরে কুকিগণ পর্বতশীর্ষে বাস করে বলিয়াই ইহাদের প্রতি ঈর্ষী অস্তিত্বা প্রদান করিয়া থাকিবে।

(২) ইনি পরে “Sir Arthur” উপাধি পাইয়াছিলেন। History of Burma নামে ইহার একখানি পুস্তকও আছে।

(৩) আত্মক-আরাকানে এই একই বর্ণধ্বন্যসে ‘ছেক্’ এবং ‘ছাক্’ উচ্চারণপদ বৈষম্য রহিয়াছে। অনেকই ‘ছাক্’ উচ্চারণের পক্ষপাতী।

চট্টগ্রামের জনসাধারণ অদ্যাপি ‘চাক্‌মা’ ও ‘জুমিয়া’ (১) আখ্যায় পার্শ্বক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারে নাই। মঘ, ত্রিপুরা প্রভৃতিকে বাদ রাখিয়া প্রধানতঃ চাক্‌মাগণকেই অধিকাংশ চট্টগ্রামবাসী “জুমোয়া” (জুমিয়া) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এমন কি কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনও “জুমিয়াজীবন” লিখিতে গিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎকৃত অবকাশরঞ্জিনীতে (১৭২ পৃষ্ঠা—হিতবাদী-সংস্করণ) ‘জুমিয়া’ শব্দের টীকা দেখিলেই ইহা সহজে উপলব্ধ হয়। অপর “চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত”-লেখক তারকবাবুর ভ্রম আরও স্পষ্টতর ! তিনি লিখিয়াছেন (“ইয়ংথাগণ) জাতিতে জুমিয়া, ইহারা অনেকাংশে সুসভ্য ; ধর্ম্মে বোদ্ধ। চাক্‌মারাণী কালিন্দী এই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন (৫ পৃষ্ঠা)।” ফলতঃ জুমোপজীবী পার্শ্বতাজাতিমাত্রকেই যে ‘জুমিয়া’ বলা হয়, তাঁহারা সেই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল চাক্‌মাজাতিবিশেষকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং লুইন মহোদয়ের অনুমানের সার্থকতা কোথায় ? পক্ষান্তরে ইহারা নিজে বলিয়া থাকে, তাহাদিগের আদিম বসতিস্থান—‘চৈম্পানগো’ বা চম্পকনগর হইতে ‘চাক্‌মা’ নামের উৎপত্তি। রাজ্যবিস্তারমানসে রাজপুত্র এদিকে আসিয়া ছিলেন, আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই ; উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রহিয়া গিয়াছেন। এথাবৎ যত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, সমুদয়ই তাহাদের এই উক্তির অনুকূলে। আমরা ক্রমে ক্রমে সে সকল উপস্থিত করিতেছি। ব্রহ্মদেশে অধিবাসকালে তদেশীয়েরা ইহাদিগকে (দীর্ঘউচ্চারণে) “ছাক্‌মা”, সংক্ষেপতঃ—“ছাক্‌” নামে অভিহিত করিয়া থাকিবে। আর কর্ণেল ফেইরি-বর্ণিত যুবরাজ কোমিসিংহের প্রতিপত্তিবর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়াই সন্দেহ জন্মে।

[ ২ ]

এক্ষণে এই চম্পকনগর যে কোথায় অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করাই বিষয় সমস্তা ! কেহ কেহ ইহাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মগধ অর্থাৎ বর্তমান বেহার রাজ্যে নির্দেশ করিয়া থাকেন (২)। সেখানে ইহাদিগের পূর্বপুরুষ চক্রবংশীয় ক্ষত্রিয়

(১) জুমিয়া—বাহায়া “জুম্” করে। “জুম্” কবিরই প্রক্ৰিয়াবিশেষমাত্র। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

(২) তাহাদের যত চম্পকনগর সম্ভবতঃ চীনদেশীয় পর্যটক ফা-হিয়ান্‌বর্ণিত চম্পারাজ্য। তিনি ৪২৪ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। বর্ণনার আছে,—বর্তমান ভাগলপুরের

ছিলেন ; স্থায়ী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এই পার্বত্যপ্রদেশ অধিকার করিয়া

চম্পকনগর।

এখানে বসবাস এবং স্থানীয় অধিবাসী মণদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধ চালাইতে থাকেন। কিন্তু আমরা এই ভিত্তিহীন অনুমানের উপর আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি। কোথায় ভাগলপুর, আর কোথায় বা পার্বত্যচট্টগ্রাম—সহস্র সহস্র যোজন ব্যবধান। প্রবল পরাক্রান্ত মোগলসাম্রাজ্যের বন্ধের উপর দিয়া সম্পূর্ণ অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিল, অথচ ইতিহাসের সুস্পষ্ট আলোকে ছায়ামাত্র পড়িল না ; ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ? ভক্তি এই দ্বাদশ শতাব্দীতেও যে তাহার আরাধনায় বিচরণ করিতে ছিল, তদ্রূপ ইতিবৃত্তে ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর একদলের মতে এই চম্পকনগর মালকারণ-নিকটবর্তী ;

সুতরাং চাক্‌মাগণ মালয়বংশজ \* । কিন্তু

\* The H. T. of ctg. and the dwellers therein, P. 62.

কল্পনাব্যতীত তাহাদের অপর কোনও প্রমাণ

নাই, অতএব ইহাও গ্রাহ্যতঃ গ্রহণ করিতে পারি না। পরিশেষে চাক্‌মা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধরক্ষিত আধ্যাত্মিকাবিশেষের উল্লেখ দেখাইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতেছি।

ইহারা উৎসব-আমোদে কথকদিগের প্রমুখ্যৎ “ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যান” এবং “চাটগাঁ-(১) ছাড়া” নামক পূর্বপুরুষের প্রাচীন কাহিনী স্মৃতিশর আশ্রয় এবং ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া থাকে। এই দুইটিতে আধ্যাত্মিকার গন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা হইতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারা যায়। এই গ্রন্থের শেষভাগে কাহিনীদ্বয়ের মূল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ; বর্তমান প্রবন্ধের নীমাংসাকল্পে এস্থলে সংক্ষেপে মাত্র তাহাদের সার-ভাগ উল্লিখিত হইল। “ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যানে” আছে, কোন সময়ে “চম্পক নগরে উদয়গিরি নামে জনৈক রাজা ছিলেন।” পুনরায় সেই প্রশ্ন ! পরন্তু ইহাতে উপাখ্যানকার চম্পকনগরীর অবস্থান নির্ণয়ের পথ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার

অনতিদূরে অবস্থিত কম্পাপুরী বা কর্ণপুরের রাজধানী—চম্পারাজ্য। ( See also Bishop Biganelli's Life of Gautama—P. 430, 2nd Edition. )

(১) প্রাচীন চাটগাঁ হইতে বর্তমান চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

করিয়া দিয়াছেন । যতদূর দেখা যায়, ইহা ত্রিপুরাদেশেরই অন্তর্গত (১) ।

উপাখ্যান । কেননা, উপাখ্যান পাঠে জানা যায়, ‘রাজা উদয়গিরির দুই পুত্র, বিজয়গিরি ও সমরগিরি (২) । দক্ষিণে মধ্যাধীশ্বরের

রাজ্যবিস্তারে বাধা দিবার নিমিত্ত যুবরাজ বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামোহন-সমভি-  
বাহারে তবিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন । কিন্তু রাধামোহন প্রিয়তমা পত্নী  
ধনপতির সনির্বন্ধ অমুরোধে যুদ্ধযাত্রার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, নিকটবর্তী  
ত্রিপুরাপাড়ায় জয়নারায়ণ ষোয়াঝার সন্নিধানে প্রতিনিধি অমুসন্ধানের জ্ঞাত  
গিয়াছিলেন ।’ চম্পকনগর অপর কোন দেশে হইলে পার্বগ্রামে ত্রিপুরাপাড়া  
থাকিবার সম্ভাবনা কোথায় ? বিশেষতঃ এই বর্ণনায় জলপথে চট্টগ্রাম আসিতে মেঘনা-  
দরিয়ার (৩) উল্লেখ আছে । তদ্বারাও চম্পকনগরকে ত্রিপুরার অন্তর্গতঃ সমীপস্থ

চম্পকনগরের বলিয়া প্রমাণিত হয় । ইহা ছাড়া, চাক্‌মানিগের জাতীয়  
অবস্থান নির্দেশ । কাহিনীর আরও দুইটি কারণে আমরা এই চম্পকনগরকে  
ত্রিপুরার অন্তর্গত মনে করিতে পারি । ইহাদের গানে আছে—

“ডোমে বাজায় ডোললগর,

কিরিঘাইয়ম্ (৪) নূরনগর ।”

ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ “নূরনগর” পরগণার কথা সম্ভবতঃ সকলেই অবগত  
আছেন । দ্বিতীয়তঃ ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরার গোমতীনদীর উৎপত্তি বিবরণটিও  
রূপকথাচ্ছলে সবিশেষ প্রসিদ্ধ, উনবিংশপরিচ্ছেদে তাহা আমূল প্রদত্ত হইল ।

(১) সাহিত্যবিদ্রীষ্টকৃত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” এই চম্পক-  
নগরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলে সেইখানেই চাঁদসদাগরের আবাসভূমি ছিল ।  
তাহাদের করনায় লখীন্দরের দৌহ-বাসর-ভিত্তিও তথায় হুত্ৰাপা নহে । সে বাহা ইউক্ তৎসম্বন্ধে  
অনেক মতভেদ আছে । (১৭৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংস্করণ) ।

(২) কেহ কেহ এই বিজয়গিরি ও সমরগিরিকে ত্রিপুরাধিপতি দেবমাণিক্যের পুত্র বিজয়-  
মাণিক্য ও অমরমাণিক্যের সহিত অভিন্ন করিয়া করেন । কিন্তু নামগত এই সামান্য সাদৃশ্য  
ভিন্ন ইহাদের জীবনীতে কোন মিল পাওয়া যায় না ।

(৩) ‘দরিয়া’ মুসলমানী শব্দ, অর্থ সমুদ্র । উপাখ্যানকার মেঘনার মহান্ পরিদর দেখিয়া  
সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাকিবেন ।

(৪) কিরিয়া ঘাইব অর্থাৎ অত্যাবৃত্ত হইব ।



ত্রিপুরারাজ্যের সহিত ইহাদিগের কোনকালে সম্বন্ধ না থাকিলে, সমাজের সহিত জড়িত হইয়া এ সকল কাহিনী থাকা কি সম্ভব হইতে পারে? এই সঙ্গে আরও বলা যায়, চাক্‌মারমণীগণ ত্রিপুরামহিলাদের অনুকরণেই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। ইত্যাদি কারণে আমাদের উপযুক্ত বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদক উইল্‌সন সাহেব লিখিয়াছেন, এই ত্রিপুরা, নেয়াখালি ও আরাকান প্রদেশ লইয়া পুরাকালে সুন্দরদেশ গঠিত হইয়াছিল (১)। সুতরাং ত্রিপুরার চম্পকনগরবাসী চাক্‌মাগণের দৃষ্টি চট্টগ্রাম ও আরাকানের উপর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। এক্ষণে আমরা মুলার (Mr. Muller) সাহেবের সেই ব্রহ্মপুস্ত্রনে আগত লৌহিতিক (২) জাতির সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধও স্বীকার করিতে পারি। এই মতে ত্রিপুরায় তাহাদের প্রাচীন উপনিবেশ-স্থাপনও অযৌক্তিক নহে। বিশেষতঃ শ্রীহট্টের দক্ষিণপ্রান্তে এক চাক্‌মাসম্প্রদায় অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আপনাদিগকে “উত্তরের চাক্‌মা” এবং বক্ষ্য-মাণ জাতিকে “দক্ষিণের চাক্‌মা” বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীহট্টের চাক্‌মাগণকেও ইহাদের শাখাবিশেষ স্বীকার করা যায়। এবং মূল চাক্‌মাজাতিকেও নরজাতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের সংজ্ঞায় “তিব্বতী ব্রহ্মা”-বংশসম্ভূত বলা হইতে পারে। এক্ষণে ইহাদের বিস্তৃত পর্যালোচনা করা যাক।

উক্ত উপাখ্যান “চাটগাঁ-ছাড়া” অর্থাৎ ‘চট্টল বর্জ্জন’ কাহিনীর অবতরণিকা মাত্র। শেষোক্ত আখ্যায়িকায় তাহারা কিরূপে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণী আছে। হুঃখের বিষয় এই ঘোরতর যুদ্ধরাশিপরিপূর্ণ বিচিত্র আখ্যানভাগে

(১) ইহা অবিধাস করিবারও কারণ নাই। মহাকবি কালিদাস “রঘুবংশ মহাকাব্যে” স্বল্পদেশকে পূর্বসাগরের উপকূলে ‘তালিষনপূর্ণ শ্রামায়মান’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়প্রবৃত্ত সম্রাট রঘু—

“পৌরস্ত্যানেবমাক্রামন্ তান্‌স্তান্‌ জমপদান্‌ জয়ী।

(স্বল্পদেশং) শ্রাপ তালীষন শ্রামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ ॥” ৩৪, ৪র্থ সর্গ।

(২) “রাজমালা”-লেখক আবার এই লৌহিতিক সম্প্রদায়কে হিমালয়, পূর্বপ্রান্ত এবং মধ্যভাগে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মতে গারো, ত্রিপুরা, কাছারী ও মণিপুরী প্রভৃতি পূর্বপ্রান্তশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এই চাক্‌মাগণও “পূর্বপ্রান্ত লৌহিতিক”-শ্রেণীভুক্ত হইবে।

সমন্বিতক কোনও সুবিধা নাই। কেবল এইমাত্র বলিতে পারা যায়, তখনও চট্টগ্রামে মঘরাজার প্রভুত্ব প্রসারিত হয় নাই। ইহা অনুমান—চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর কথা হইবে। পক্ষান্তরে এই “চাটিগাঁ-ছাড়া”র চম্পকনগরও চট্টগ্রাম হইতে অত্যধিক দূরবর্তী নহে। সুতরাং এতদ্বারাও ত্রিপুরাদেশেই চম্পকনগরের অবস্থান বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। “চাটিগাঁ-ছাড়া”র আছে :—

‘যে সময়ে যুবরাজ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এদিকে মঘরাজ অমঙ্গলাশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। বিজয়গিরির অভিযান।

জ্যোতিবেত্তার নিকট জানিতে পারিলেন, উত্তরে শত্রু জন্মিয়াছে। কিন্তু গুপ্তচর পাঠাইয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। এদিকে বিজয়গিরি (অপর প্রতিনিধি অভাবে) সেনাপতি রাধামোহনকেই লইয়া অভিযান করেন। কালাবাঘা প্রদেশে (১) তদীয় শিবির সংস্থাপিত হইল। মঘদেশ জয়ের নিমিত্ত বিপুল সৈন্যসহকারে রাধামোহনই প্রেরিত হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা সমুদ্রও পাইয়াছিলেন। এইরূপে সৈন্যে তিনি কৈংগাং-তীরে (২) আসিয়া মঘরাজ-সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। মঘরাজা সন্ধি চাহিলেন না। অবশেষে যুদ্ধ পরাজিত ও বশীকৃত হন।

‘মঘদেশ-জয়ের পর রাধামোহন খ্যায়দেশ (৩) বিজয়ের নিমিত্ত ছুটিলেন। সেখানে “জালি পাগজ্যা” (৪) নামক স্থানে গিয়া সকলে বিশ্রাম লাভ করিল।

(১) বর্ণনা পাঠে মনে হয়, কালাবাঘা প্রদেশ—চম্পকনগর ও চট্টগ্রামের মধ্যভাগে, যেখানে প্রদেশেরই অনতিদূরে অবস্থিত।

(২) কেবল চাক্‌মার কেন, সমস্ত পূর্ববঙ্গেই “গাং” শব্দে নদীকে বুঝায়। শব্দটা বোধ হয় “গঙ্গা” হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) খ্যায়জাতির আবাসস্থান। অগা্যপি আরাকানে এই জাতি বিরল নহে। ইহাদের রমণীগণ পরমাংশুরী; কিন্তু সমস্ত বদনমণ্ডলে ‘উল্‌কি’ চিহ্নিত করিয়া অপূর্ব সুবস্মা ঢাকিয়া রাখে। কথিত আছে, পুরাকালে অত্যাচারী মঘরাজার ক্রুদ্ধ হইতে অধলাগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই ঈদৃশী ঘাঘরা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ক্রমে সেই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে।

(৪) জালি পাগজ্যা—বৃক্ষবিশেষ। এই জাতীয় একটি গাছ অত্যন্ত স্থান্যারচর বাজারের নিকটেও আছে। সম্ভবতঃ এই গাছ অধিক ছিল বলিয়াই তদনুসারে স্থানের নাম হইয়াছে। কথিত আছে, খ্যায় জাতির উক্ত বৃক্ষের উপরই বসবাস করিত। বৃক্ষের প্রসার দেখিলে ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

ক্রমে খ্যাতদেশও বিজিত হইল। অতঃপর রাধামোহনের রাজ্যজয়-লিপ্সা এতই বাড়িয়া যায় যে, অচিরে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত অক্সাদেশ (ব্রহ্ম) জয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু এখানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথমযুদ্ধে

রাধামোহনের  
ব্রহ্মজয়।

সেনাপতি মূর্ছিত হইয়া পড়েন। শেষে দৈববলে অনাময় হইয়া পুনরায় দ্বিগুণিত তেজে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ;

অক্সাদেশও অধিকৃত হইল। তদনন্তর প্রত্যাবর্তন-পথে অনায়াসেই কাঞ্চনপুর (১) হস্তগত করিলেন। তখন আবার পূর্বদিকে কুকি-রাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা হইল। রাধামোহনের আগমন সংবাদে কুকিরাজ প্রস্তর নির্মিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ক্রমাগত পঞ্চদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের পর কুকিরাজ পরাভূত হইলেন।

‘দিগ্বিজয়যাত্রার শেষ করিয়া সেনাপতি রাধামোহন যুবরাজসমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কালাবাঘাপ্রদেশ হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলে, মঘরাজা ‘পুনরায় চাকমারাজ আসিতেছেন’ শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাম্রাজ্যেইকূলে রাধামোহনের সহিত বিজয়গিরির সাক্ষাৎ হয়। তখন

সেনাপতি স্বদেশ-গমনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন।  
প্রত্যাবর্তন।

যুবরাজ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদন করেন।

প্রায় বার বৎসরের (২) পর রাধামোহন স্বদেশ-প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

‘বিজয়গিরির দিগ্বিজয়-যাত্রার পর বৃদ্ধ রাজার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে! সিংহাসন শূন্য থাকিলে পাছে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সমরগিরি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধামোহনের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পাইয়া সমরগিরি

তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার কুশলাদি  
সমরগিরির সহিত  
সাক্ষাৎ।

বলিলেন যে, ‘তিনি নিশ্চয়ই আগামী অগ্রহারণ মাসে প্রত্যাবর্তন করিবেন।’ তদনন্তর সমরগিরি রাধামোহনের প্রমুখাৎ বিজিত রাজ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করিলেন।

(১) ইহা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী বর্তমান কাঞ্চননগর হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে আরাকান হইতে জনৈক সযাধিপতি হস্তরাজা হইয়া কতিপয় প্রজার সহিত এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

‘এদিকে বিজয়গিরি নবরাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা বিধান করিয়া সেই অগ্রহায়ণ মাসেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন । কিন্তু যখন কালাবাঘা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, অনেক দিন হইল বৃদ্ধ পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন সমরগিরিরই হস্তগত হইয়াছে ; তখন তিনি কিরূপে গিয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে অভিবাদন করিবেন—এই লজ্জা এবং মনঃকোভে অধীর হইয়া আর অগ্রসর হইলেন না ! তখন বড়ই মর্শ্বপীড়িত কণ্ঠে বলিয়া-

বিজয়গিরির  
আক্ষেপ ।

ছিলেন—‘যে দেশে এহেন অবিচার, (জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্তমানে কনিষ্ঠ রাজ্য পায়), সেখানে আর বাইব না । অতএব সৈন্ত-

গণ, চল পুনরায় ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যাই !’ এইরূপ বহু আক্ষেপ করিয়া বিজয়গিরি ব্রহ্মদেশে সসৈন্তে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । সৈন্তগণকে তত্রতা অধিবাসীদের হইতে পত্নীগ্রহণের অনুমতি দিয়া নিজে রূপে-গুণে বরণীয়া “আরি” (পরী) জাতীয়া এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন । ক্রমে বিজিত রাজ্যের ধর্ম এবং আচার-পদ্ধতিগুলিও তথাকথিত চাক্‌মা-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া গেল ।’ এইরূপে চট্টগ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ায় কবি আখ্যায়িকার নাম “চাটিগাঁ-ছাড়া” রাখিয়াছেন । কিন্তু চাক্‌মাজাতির প্রধান মূল চম্পক-নগরেই পড়িয়া রহিল । শ্রীহট্টনিবাসী বর্তমান চাক্‌মাগণ এই বংশ-সম্মত হইবে । পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এই পুস্তকে তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না । ইহাতে কেবল বিজয়গিরির অনুসৃত চাক্‌মাদিগের বিবরণই লিপিবদ্ধ হইবে।—

“চাটিগাঁ-ছাড়া” উপাখ্যানবিশেষ বটে, কিন্তু ইহাতে কল্পনার অব্যাহত-প্রভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । মানি আমি, ঐতিহাসিকের আসরে উপাখ্যানের আদর নাই ; ছন্দঃ এবং পদমিলনের জন্য হইলেও কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি প্রয়োজন হইয়া পড়ে । কিন্তু তাহারও কৈফিয়ৎ আছে । “চাটিগাঁ-ছাড়া” যেই ছন্দে বিরচিত, তাহার পদমিলনের নিমিত্ত কবিকে বড় একটা ভাবিতে হয় নাই ; অথচ মিত্রাক্ষর । শেষ পঙ্ক্তিতে যাহা বর্ণনা করিতে হইবে, তাহারই অন্ত্যবর্ণবিশিষ্ট যে কোন একটি অর্থশূন্য বাক্য পূর্বে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । সে যাহা হউক, এই সুদীর্ঘ বৎসরাবলীর পরেও “চাটিগাঁ-ছাড়ার” প্রমাণমূলক সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় । চট্টগ্রামের কমিশনার অফিসে ব্রহ্মসম্রাট তরবার ১৭৮৪ খৃঃ আদে স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আছে । ইহা চট্টগ্রামের তদানীন্তন

শাসনকর্তার নিকট উভয় রাজ্যের মধ্যে অবাধবাণিজ্য  
ব্রহ্মসম্রাটের পত্র।

চালাইবার প্রার্থনায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রখানি সুদীর্ঘ;  
বাহ্যভায়ে এখানে মাত্র প্রয়োজনীয় অংশের মর্ম্মানুবাদ তুলিয়া দিলাম।—

\* \* \* \* \*

“চট্টগ্রাম মোগলরাজ্য এবং অমরপুর-রাজ আখাং দামা (১) কর্তৃক আঘাতিত ও’ অধুষিত  
হয়। এখানে তাঁহারা চতুঃশতাব্দিক দুইসহস্র সাধারণ উপাসনামন্দির ও চতুর্বিংশতি জলাশয়  
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আখাং দামার সিংহাসনাধিরোহনের পূর্বে এই দেশ ‘ছত্রধারী’ উপাধি-  
যিশিষ্ট নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তাঁহারা অনেক উপাসনামন্দির প্রস্তুত এবং প্রত্যেক  
জাতীয় লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে যাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রভূত ইহাদিগের সময়ে  
রতনপুর, ছুর্গাদি, আরাকান, ছুর্গাপতি, রামপতি, চৈদক, মাহনীণি, মানাং প্রভৃতি দেশের  
অধিপতি রাজা ছিরীতমাছাকের অধিকারের পূর্বে এদেশের শাসনব্যবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। তাঁহার  
সময়ে জ্ঞায়পরতা ও কার্যদক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য নিরূপিত হইত : তাঁহার শাসনে প্রজাবর্ণ  
সুখী ছিল। তদানীন্তন সাধুগণের বজ্র-দ্বারাও তিনি অসুগৃহীত হইতেন। ই’হাদেশে মধ্যে  
বুদ্ধনামা একজন তাঁহার আশাস্তিমুখে গেলে, রাজা তৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে,  
তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যেন একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দেন। এই প্রার্থনামতে  
ধোয়ামার্চি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বর্ণ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তুতাদি বর্ষিত হইয়াছিল। এসমুদয়  
প্রাপ্ত স্বর্ণযাজকের রক্ষণাবেক্ষণে ভূমধ্যে প্রোথিত ছিল। লোকে এইখানেই দেবতাগণকে  
পূজা করিতে আসিত। পর্য্যটক ও যাত্রীদিগের সেবার নিমিত্ত রাজা ঐ মন্দিরে ভূতাদির  
বিশেষ বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। রাজা নিজে পাঁচখানি গ্রহপাঠেই সময় কাটাইতেন। ধর্ম্ম-  
শাস্ত্রানুসারে নিবিষ্ট অসং আচার ও কার্য্য হইতে তিনি সতত বিরত ছিলেন, এবং তদায়  
ধর্ম্মযাজকগণ হংস, পারাষত, ছাগল, শূকর, মোরগ প্রভৃতি জীবের মাংস খাইতেন না। দুর্গুর্গ,  
চৌধা, ব্যক্তিচার, মিথ্যা ও পানদোষ এ সময়ে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল।

\* \* \* \* \*

“দম্মা ও জ্ঞায়পরায়ণতার সহিত প্রজাশাসন করতঃ আমি—ছিরীতমাছাকের  
আইন ও রীতি নীতি যথার্থই প্রতিপালন করিয়াছি।”

(১) কাপ্তেন লুইনের মতে, অমরপুর—জিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের নামান্তর  
এক যুবরাজ অর্থাৎ “দার্ম্ম” উপাধি হইতে “দামা” হইয়া থাকিবে। কিন্তু “রাজমালায়”  
দেখিতে পাই “অমরপুর অমরমণিক্যের রাজধানী বিবিড় অরুণা মধ্যে গোমতীনদীর তীরে  
অবস্থিত। জিপুরার অন্যান্য রাজধানী অপেক্ষা অমরপুর ব্রহ্মার নিকটবর্ত্তী।” (৫ পৃষ্ঠা।)

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশীয়েরা চাকমাগণকে ছাক্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ছিরীতমাছাক্ রাজা বিজয়গিরির অনতিপরবর্তী উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মদেশের আবহাওয়ায় এত পরিবর্তন ঘটিতেছিল যে, নামটা পর্যন্ত রক্ষা পায় নাই। কোথায় উদয়গিরি বিজয়গিরি প্রভৃতি, আর কোথায় তাহাদিগেরই বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিরীতমা! অতঃপর আমরা এইরূপ ইয়াংজ, চোফু, চোতু প্রভৃতি বংশধরদিগের কথা উল্লেখ করিব। এস্থলে প্রাচীন নরপতিগণের শাসনবিধির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাহারা কেবল অর্থ ও রক্তপিপাসু ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে এজার চরিত্রশোষণ ও ধর্মসাধনের পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ চাকমাধীশ্বর ছিরীমতার শাসনপ্রণালী এত উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল যে, বহুশতাব্দী ধরিয়া শত্রুরাজগণও তাহা আদর্শরূপে মানিয়া চলিয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মরাজ্যের চাকমা অধিপতিবর্গের শাসনবিবরণী বর্ণিত হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত “চুইজং-কা-থাং”এর মধ্যে দেখিতে পাই, নিরাট ব্রহ্ম-সাম্রাজ্য তিন প্রধানভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের অধিপতি ব্রহ্মরাজ স্বয়ং; অপর দুই অংশ চাকমা ও ময়রাজার শাসনাধীনে ছিল বলিয়া কীর্তিত।

এতদ্ভিন্ন ইহাতে চাকমাগণসংক্রান্ত বিশেষ কোন ঘটনার ব্রহ্ম ও আরাকানের উল্লেখ নাই। অতঃ “দেঙ্গা ওয়াদি—আরেনদুং” অর্থাৎ ইতিহাস।

“আরাকান কাহিনী” আনাদিগের প্রধান প্রামাণ্যগ্রন্থ। আরাকানাদীশ্বরের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় ইহা নানা দেশের তথ্য পরিপূর্ণ। আমাদের দেশীয় ইতিহাসের সহিত হু’একস্থলে ইহার সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তদীয় সাক্ষ্য কোন ভ্রটি পাওয়া যায় না। এই সভ্যতার প্রদীপ্তালোকেও ঐতিহাসিকের নিকট নিরপেক্ষ বর্ণনা পাঠবার আশা বড় অল্প। একই দৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন চস্মায় বিভিন্নবর্ণে প্রতিকলিত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, আর হতভাগ্য পাঠক দেখিতে দেখিতে ভ্রান্ত, পড়িতে পড়িতে উদ্ভ্রান্ত এবং ভাবিতে ভাবিতে প্রভ্রান্ত হইয়া মজিয়া রহে! ‘অন্ধের

হস্তীদর্শন’ কাহিনী-বোধ করি অনেকেই অবগত আছেন। ঐতিহাসিক রহস্ত।

সুতরাং স্বরূপ তত্ত্ব পাইতে হইলে, আমাদিগকে সমস্তই একীভূত করিয়া একটি অভিনব সংগ্রহ গঠন করিতে হইবে। সুখের বিষয়—

আজকাল এই শ্রেণীর দুই চারিখানি পুস্তক বাঙ্গালাতেও দেখা দিতেছে, তাহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

“দেঙ্গা ওয়াদি-আরেদফুং”তে ৪৮০ মতাব্দে, খৃষ্টীয় ১১১৮-১৯ সনে চাক্কা-দিগের সর্বপ্রথম উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। “এ সময়ে পেঁগো (আধুনিক পেণ্ড) দেশে আলং-চিছু নামা জনৈক রাজা ছিলেন। পশ্চিমের বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া চাক্কাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করে। পেঁগোরাজ স্বীয় প্রধান মন্ত্রী (কোরঙ্গী)কে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া চাক্কা ও বাঙ্গালী।

যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলে, একটা সারসপক্ষী একখানি মৃতপ্রাণীর চর্ম্ম মুখে লইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। তিনি তাহাকে ধরিয়া রাজার শিবিরে লইয়া গেলেন; এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সারস—বাঙ্গালী, ও চর্ম্মখানি—চাক্কা, উভয়ের মিত্রতা ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ও চাক্কাগণ এই সারসের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করিবে। রাজা মন্ত্রীর এ হেন যুক্তিগর্ভ আশ্বাসবাক্যে অতিশয় আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহাকে একটা হস্তী উপহার প্রদান করেন। অনন্তর চঠাং চতুর্দিকে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিল, পবিত্র “মহামুনি”মূর্ত্তি (১) শ্বেদসিক্ত হইলেন; ঘন ঘন অশনি নিপাত—অকালবৃষ্টি—বজ্রায় সমস্তাং চাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া এই অমঙ্গল শাস্তির নিমিত্ত পুরোহিতকে শতমুদ্রা প্রদান করিলেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে আনালুক্কা

(১) বুদ্ধদেব, জন্মস্থান কপিলাবস্তুনগরে “শাক্যামুনি,” লঙ্কায় “চন্দ্রমুনি” (চাইদামুনি), এবং ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ আকিরায়ে “মহামুনি” আখ্যায় অভিহিত ও পূজিত। প্রাচ্যতত্ত্ব মূর্ত্তিবিদ্যে মধ্যযুগের সাংখ্যিক অর্থায় সাধারণ মন্তব্যেরই মত। কিন্তু মহামুনিকে দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। উচ্চতায় যেন আকাশ ছুঁইয়াছে, পরিধানে কপিলবস্ত্র, ধ্যানবিস্মিত নয়নযুগল, নবদ্বারের বৃত্তি নিরোধে—নিষাভ-নিমল্লম্ব সাধনাভ্যাসের সেই ঘিরাটমূর্ত্তি ঘিরাটভাষেরই সূচনা করে। কর্ণেলফেইরী বলেন (Bengal Asiatic Society's Journal—No 1451, 1844 A. D.) আরাকানরাজা ছান্দা-খু-তিয়া গৌতম (অর্থাৎ চতুর্থ) বুদ্ধের অনুকরণে মহামুনি-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন।” শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধদেবের উচ্চতা পরিমাণ ৮০ হাত। মহামুনি মূর্ত্তিতে শাস্ত্রমত যতদূর সম্ভব রক্ষা পাইয়াছে। চট্টগ্রামেও এতদনুকরণে দুইটা মহামুনিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

নামক পেণ্ডরাজার শাসন সময়ে পুনরায় বান্ধালী ও চাক্‌মাগণ মিলিয়া উথিত হয় । রাজা পঞ্চাশ হাজার সৈন্ত লইয়া দাক্ষাজিয়াকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন । দাক্ষাজিয়া যাত্রা করিয়া সম্মুখে দেখিলেন, একটা বক ও একটা কাক ঝগড়া করিতেছে, অবশেষে বক কাকের ডানা ভাঙিয়া দিল । তিনি রাজার নিকট আসিয়া-ইহা বিবৃত করিলেন । মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, এই কাক বান্ধালী এবং বক আমরা । ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ নিশ্চিত । সেনাপতি অমিত-উৎসাহে যুদ্ধারম্ভ করিলেন । পাঁচদিন অবিরাম যুদ্ধের পর বান্ধালী ও চাক্‌মাগণ পলায়ন করে ।” ( ১৭—১৯ পৃষ্ঠা । )

“অনন্তর কুতুবদিয়ার উত্তরে বান্ধালীগণ এবং আরাকানের অন্তর্গত ক্রিন্দেন পাহাড়ের চাক্‌মাগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিল । আরাকান রাজার দুই মন্ত্রী পরামর্শ স্থির করিলেন যে, বান্ধালী ও চাক্‌মাগণ বাহাতে নিশ্চিতে না পারে—তজ্জন্ত আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে । বান্ধালীদিগকে জয় করিতে পারিলে চাক্‌মাগণকে বশে আনিতে কোন কষ্ট হইবে না । কিন্তু বান্ধালীরা বেগতিক দেখিলেই পলাইয়া যায় এবং প্রায়শঃই অশান্তি উৎপাদন করে । সুতরাং যেরূপে তাহাদিগের সমূহ বল বিধ্বস্ত হয় সেই কৌশল খেলিতে হইবে । এই নিমিত্ত পঞ্চসহস্র ‘বালাম নোকা’ ( ১ ) প্রস্তুতপূর্ণ করিয়া একদা নিশাভাগে বান্ধালীদের জাহাজাদি চলিবার পথে ডুবাইয়া রাখা হয় । বর্তমান মাতামুড়ি নদীর মোহনায় চান্দাজা ও মুখাজা নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে দশসহস্র সৈন্য থাকে । অত্রদিকে প্রকাণ্ড বংশভেলায় বারুদ, গোলা এবং বহুসংখ্যক নৈনিক-পুত্তলিকা স্থাপন ( ২ ) করিয়া ভাটার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয় । বান্ধালীরা মনে করিল, ঐ বৃক্ষি মনসৈন্ত আসিতেছে । তাহারা বান্ধালী-বিজয় ।

অনতিবিলম্বে জাহাজে চড়িয়া গোলাবর্ষণতৎপর হইল । ভেলা যতই নিকটতর হইতেছিল, তাহারা আরও অধিকরূপে গোলাক্ষেপণ করিতে লাগিল । পরিশেষে এই গোলার অগ্নিতেই ভেলাস্থিত বারুদ-গোলাদি

( ১ ) এই নৌকাগুলি আকারে সূর্যহৎ । এক এক নৌকার ৩৬ শত মণ বোঝাই ধরে । সমুদ্রপথেই প্রায় বাতায়ত করিয়া থাকে । চট্টগ্রামেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট ।

( ২ ) গুনা বার চীন-জাপান-যুদ্ধে হুচতুর জাপানীগণ এইরূপ কৃত্রিম সৈন্ত স্থাপন করিয়া অহিনেন-বিতোর চৈনিকগণকে প্রতারিত করিয়াছিলেন ।



অলিয়া সসৈন্যে বাঙ্গালীদিগের জাহাজ বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে অতি সহজেই বাঙ্গালী-বিজয় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে চাকমারাজ উপায়সূত্র না দেখিয়া মঘরাজার অধীনতাস্বীকারপূর্ব্বক বহুমূল্য উপঢোকন প্রেরণ করেন। মন্ত্রী মঘরাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, চাকমারাজার সহিত সথাস্থাপনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বাঙ্গালীদিগের কূটবুদ্ধিতেই চাকমারাজ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।”

( ২৪-২৫ পৃষ্ঠা । )

“১৯৫ মঘাব্দে ( ১৩৩৩-৩৪ খৃঃ অঃ ) আরাকানাদিপতি মেঙ্গদি (১) সমীপে লামনচুগী নামা জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ দিলেন, উচ্চরক্ষের চাকমারাজা নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি প্রধানমন্ত্রী ( কোরেঙ্গী ) বাজাঙ্গাছাংগ্রাটের অধীনে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া চাকমারাজার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন।

চাকমারাজার বিরুদ্ধে অভিযান।  
পরে ‘রিজার্ড’ হইতে আরও বিংশসহস্র সৈন্য তাঁহার সাহা-  
য্যাগ্ধে দিলেনঃ। কিন্তু ছাংগ্রাই আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ  
করিয়া তংখংজার শাসনকর্ত্তা হিজ্জচুর অধীনে দশহাজার এবং  
তত্কাল শাসনকর্ত্তা বেমাচুর সঙ্গে দশহাজার সৈন্য দিয়া মংক্রমের পথে, জান্দোয়াজার  
শাসনকর্ত্তা ছাদোয়ংএর তত্ত্বাবধানে দশহাজার দিয়া ছাবংকামার পথে, দালাকের  
শাসনকর্ত্তা কাচুওর সহিত দশহাজার সৈন্য দিয়া দালার পথে, রুজাঙুরং নামক  
শাসনকর্ত্তাকে দশহাজার সৈন্য দিয়া রুচ্চাকুইর পথে, মাইয়ংএর শাসনকর্ত্তা থেচুকে  
দশহাজার এবং চিপোংজাব শাসনকর্ত্তা লাচুইর অধীনে দশহাজার সৈন্য দিয়া  
ছালোকোর জলপথে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নিজে বিশ হাজার ‘রিজার্ড’ সৈন্য,  
পঞ্চাশ হাজার অপরাপর সৈনিক এবং ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী কুলী সমভিব্যাহারে  
চানীর পথে যাত্রা করিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রস্তুত হইয়া  
রহিলেন।

“এতদিন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তংখংজার শাসনকর্ত্তার নিকটেই

পেগো রাজ্য থাকিবে। পেগুরাজ বাধা দিতে চাহিলে  
পাশষিক কোশল।

তোমরা বলিবে ‘আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই;  
মঘরাজ মিত্রতাস্থাপনের নিমিত্ত এক পরমা স্নন্দরী রমণী উপহার লইয়া

আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।’ পরে তোমরা স্বীলোকটাকে সুসজ্জিত করাইয়া দেখাইও। দালাল পথযাত্রী ক্যচুংকেও এইরূপে জামরাজাকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সঙ্গে এক একটা সুন্দরী রমণীও দিয়াছিলেন। অনন্তর মন্ত্রীপ্রবর ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, তিনি স্বয়ং চাক্‌মারাজার রাজধানী ( উচ্চব্রহ্মের ) মহিচাগিরি আক্রমণ করিবেন, সুতরাং উচ্চ ও নিম্ন ব্রহ্মের সকলে সাবধান থাকিবে। যখন যাত্রা পটে, যেন অবিলম্বে তাঁহার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয়।

“মন্ত্রী ছাংগ্রাই তংদাম্মুনগরে উপনীত হইয়া চান্দাই নামা জনৈক শাসন-কর্ত্তাকে একখানি পত্রসহ চাক্‌মারাজ-দরবারে দত্তরূপে পাঠাইলেন। পত্রে উল্লিখিত হইল, মঘরাজা এক পরমা রূপবতী যুবতীর সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। চান্দাই নিজমুখেও এতাদৃশ বিবরণী বেশ সাজাইয়া শুছাইয়া বলিলেন। চাক্‌মারাজা ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া চান্দাইকে যথোচিত

চাক্‌মা-রাজার  
পুরস্কার।

পুরস্কৃত করিলেন। এবং প্রধানমন্ত্রীর নিমিত্ত একটা হস্তী, একখানি স্বর্ণহার, একখানি সুবর্ণ বাঁতি, দুইটি ঘোড়া, সুবর্ণ-মণ্ডিত রেকাব ও জিন, এবং একটি সোনার “থোকদান” (১)

পারিতোষিক লইয়া স্বীয় মন্ত্রী ব্রাচ্মীকে পাঠাইলেন। ব্রাচ্মী আসিতেছেন শুনিয়া ছাংগ্রাই সৈন্তবাহিনী পোচন্দাওর পাহাড়ে লুকাইয়া রাখিলেন; নিজে মাত্র কয়েকজন লোক লইয়া রহিলেন। ব্রাচ্মী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এক সুন্দরী রমণী প্রদর্শিত হইল। অনন্তর এই যুবতীকে লইয়া যাইতে লোকজন পাঠাইবার নিমিত্ত পত্র দিয়া ব্রাচ্মীকে বিদায় করিলেন। ব্রাচ্মী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজার কাছে সুন্দরীর অলৌকিক রূপলাবণ্য বর্ণনা এবং ছাংগ্রাইএর ( কুটনীতি-প্রসূত ) পরিচয়ানুসারে—যুবতীকে মঘরাজ মেজদির সহোদরা বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। পরিচয় শুনিয়া চাক্‌মারাজা আরও আশ্চর্য্যবিত্ত হন, এবং বিশেষ আড়ম্বর সহকারে রাজসহোদরাকে আনয়নের জন্ত অনেক লোকজন পাঠাইলেন। মন্ত্রী ছাংগ্রাই এই রমণীর সহিত একশত হস্তীও চাক্‌মারাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিতে ঢাকার শাসনকর্ত্তা রেয়ংকে দশহাজার সৈন্ত লইয়া সঙ্গে প্রেরণ করেন।

(১) থোকদান—“ধুধু” কেলিয়ার পাত্র বিশেষ।

কিন্তু রেয়ংকে গোপনে বলিয়া দিলেন, চাক্‌মারাজা নৃত্যগীতাদি অতিশয় ভাল-বাসেন, মদ্যাসবীর জায় অপরিদিকে দৃষ্টি থাকে না ; সুতরাং সুযোগ পাইলেই আপন সুবিধা করিয়া লইবে । পরে “কাঁইচার” (১) শাসনকর্তা ওয়াণ্ট্‌বোর সঙ্গেও দশসহস্র সৈন্ত দিয়া পশ্চাদিক্ হইতে আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইলেন ।

“এদিকে রজনীসন্ধ্যাগমে চাক্‌মারাজ ইয়াংজ অনললুন্ধ পতঙ্গপ্রায় প্রমোদ-নিকেতনে নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত আছেন, এমন সময়ে, রেয়ং যুবতীকে আনিয়া তদীয় করে সমর্পণ করিলেন । রাজা অতিশয় আনন্দের সহিত মোহজাল ।

যুবতীকে পার্শ্ববর্তী আসনে উপবেশন করাইয়া পুনরায় আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন হইলেন । রাত্রি প্রায় বারটার সময় রেয়ং চতুর্দিকে আক্রমণ করেন । ওয়াণ্ট্‌বোও পশ্চাট্টাগের জঙ্গলপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ছাংগ্রাই এইরূপে দলে দলে ক্রমশঃ অপর সমুদয় সৈন্ত পাঠাইয়া পরিশেষে দলবল সহ স্বয়ং যোগদান করিলেন । এখানে তাঁহাদিগকে কোন যুদ্ধক্ৰেশ পাইতে হয় নাই । অতি সহজেই চাক্‌মারাজ ইয়াংজ এবং মধ্যমপুত্র চোফ্রু ও কনিষ্ঠপুত্র চোতুকে বন্দী করিয়া মহাচাগিরির পর্বতাকীর্ণনগরমধ্যবর্তী রাজপ্রাসাদ অবরোধ করেন । সেখানেও বিনাক্রেশ যুবরাজ চকুং, রাণী তিনজন,

দুই রাজকন্যা এবং দাসদাসীগণকে বদ্ধ করিলেন । কাঁদেবন্দী ।

অতঃপর মল্লিপ্রবর ছাংগ্রাই ৬৯৫ মধ্যাকের ( বাঙ্গালা ৭৪০ সাল ) ২রা মাঘ চাক্‌মারাজা এবং তদীয় তিনরাণী, তিনপুত্র, দুইকন্যা ও দাসদাসীদিগের সহিত রেয়ংকে মঘরাজ মেঙ্গদিসমীপে পাঠাইয়া দেন । এইরূপে চাক্‌মারাজা অতি সহজেই মঘরাজার করতলগত হইল । অবশেষে ১৩ই মাঘ বিজিত রাজ্য হইতে পঞ্চাশটি হস্তী, কুড়িটি গয়াল, অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং দশসহস্র চাক্‌মা প্রজা লইয়া প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

“মল্লীবর রাজ্যল্যা ছাংগ্রাইর কর্মদক্ষতায় অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আরাকানধিপতি মেঙ্গদি তাঁহাকে “মাহা-উছা-ওয়ালা” অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ খেতাব ও একখানি

---

(১) চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর কিয়দংশ কাপী বা কাঁইচানামে কথিত । সম্ভবতঃ এখানে চট্টগ্রামের শাসনকর্তাকেই নির্দেশ করা হইয়াছে ।

স্বর্ণমণ্ডিত পাকী পুরস্কার প্রদান করেন ; এবং হস্তীর মথরাজার অনুগ্রহ ।

উপর চড়িয়া যাতায়াতের অনুমোদন করিলেন । ইহা ছাড়া তাঁহার পুত্র আংজাউর সঙ্গে চাক্‌মারাজার কনিষ্ঠাকন্তার বিবাহ দিলেন । জ্যেষ্ঠাকন্তা চমিথা কে মেঙ্গদি নিজেই রাখিয়া দেন । অনন্তর চাক্‌মারাজ ইয়াংজকে আরাকানের অন্তঃপাতী কামুছা নামক স্থানের কাক্যাজাতির আধিপত্য অর্পণ করেন । তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চজুং ও মধ্যমপুত্র চোফ্রুর হস্তে যথাক্রমে কিউমেজা ও মিজা দেশের শাসন-কর্তৃত্ব দেওয়া হয় । এবং কনিষ্ঠপুত্র চৌতুকে কাংজা নামক স্থানের জলকর-তহনীলভার দিয়া নিকটে রাখেন । চাক্‌মা-রাজপুত্র তিনজনেই মথরাজার বিশেষ তত্ত্বাবধানে রহিলেন । অপর দশ সহস্র চাক্‌মা প্রজাকে

দৈন্যাক জাতির আরাকানের অন্তঃগত ‘এংথাং’ এবং ‘ইয়ংথাং’ নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইল । সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্বতন

উপাধি পরিবর্তিত করিয়া “দৈন্যাক” আখ্যা প্রদান করিলেন ।

“এতাদৃশী অধীনতায় জীবনযাপন রাজপুত্রত্রয়ের ক্রমেই অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল । ৭০৫ মষাকে ( ১৩৪৩৪৪ খৃঃ অঃ ) মেঙ্গদি

চাক্‌মা-রাজপুত্রের  
পলায়ন ।

লিম্‌ক যাত্রা করিলে, তাঁহারা তিনব্রাতাই একত্রযোগে পোচন্দাও পার হইয়া উচ্চব্রহ্মে পলাইয়া গেলেন । মথরাজা

ইহা শুনিয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না । অনন্তর জ্যেষ্ঠব্রাতা চজুং ভূতপূর্বক-বিশিষ্ট প্রজাগণকে লইয়া মংজাম্র নামক স্থানে রাজত্ব আরম্ভ করেন । মধ্যম ব্রাতা চোফ্রু কাজম রাজার নিকট হইতে “মংরেণো” খেতাব এবং প্রথমরাজার আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন । কনিষ্ঠ চৌতু চাথাং নামক রাজার অধীনে থাকিয়া ক্রমে ৭২৪ মষিতে ( ১৩৬২-৬৩ খৃঃ ) “তারদ্যা” উপাধি ও আমাত্র দেশের শাসনভার লাভ করেন ।” ( ২৬-৩০ পৃষ্ঠা । )

ইতিহাসই যদি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে যে, উচ্চব্রহ্মের মইচাগিরিতে চাক্‌মারাজার প্রাচীন রাজধানী ছিল । তথায় তাঁহার প্রাধিকারেরও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । নতুবা তাঁহাকে দমনের নিমিত্ত আরাকানাধিপতির স্নচতুর বজ্রী রাজাক্যা ছাংগ্রাই প্রায় দুইলাক সৈন্য লইয়াও তাদৃশ কুরুচিপূর্ণ প্রত্যারণা খেলিতে গেলেন কেন ? আমরা ইতঃপূর্বে দেখাইয়াছি, কতকগুলি চাক্‌মা বাক্সালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া মথরাজার

বিরুদ্ধে বারম্বার উপদ্রব করিয়াছিল। ইহাদিগের সহিত শেষোক্ত চাক্‌মারাজ্যের সম্বন্ধ কতদূর ছিল, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে আরাকানের সীমান্ত প্রদেশে বাঙ্গালী বসতির সন্নিধানই যে কতিপয় চাক্‌মার বাস ছিল— তাহা নিশ্চিত। আর ইহারাই মঘরাজা কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রপীড়িত হইয়া মইচাগিরির অভ্যুদিত বল পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহাও অসম্ভব নহে। “চুঁইজুং-ক্য-থাং”এ ব্রহ্মদেশে চাক্‌মারাজ্যখণ্ডের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন সীমানির্দেশ নাই। মইচাগিরিই বোধ হয় সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মইচাগিরি বিজয়ের পর আরাকানাধীশ্বর চাক্‌মারাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাঁহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়ে। বলিতে কি, আর উঠিতেই পারিলেন না। নানাবিধ চিকিৎসার ফলে রোগের উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু নিরাময় হইল না! সেই দীর্ঘ-জীর্ণ জীবনে আর বল ফিরিয়া

পাওয়া গেল না—অধিকন্তু দিন দিন শক্তি তর্ক হইতে মূল চাক্‌মারাজ্য।

লাগিল! যাহা হউক, এখানে আমাদের আর একটা কথা খুলিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রাক্তন বর্ণনায় দেখা গেল, চাক্‌মারাজ ইয়াংজকে অপর এক স্বতন্ত্রজাতিরই আধিপত্য দেওয়া হইয়াছিল। এবং রাজপুত্রগণের মধ্যে চাক্‌, এবং চৌতু বিজাতীয় রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। সুতরাং কেবল যুবরাজ চতুর হস্তেই দলিতাবশেষ চাক্‌মাদিগের আধিপত্য ছিল; অর্থাৎ মংজান্ন, তখন একমাত্র প্রকৃত চাক্‌মারাজ্য। অন্তর্গত, এই বিপ্লবে চাক্‌মাজাতি হইতে দশ সহস্র লোক দৈন্যকন্যানে অপর এক শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তাহারা সন্নিহিত নিকটবর্তী জাতিসমূহের সহিত বিবাহসম্বন্ধও চালাইয়া থাকিবে। বর্তমানে আচার-ব্যবহারে চাক্‌মাদিগের সহিত তাহাদের বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিয়াছে।

কিন্তু কালক্রমে চাক্‌মাদিগের এই অবশিষ্ট রাজ্যও রহিল না। কিয়ৎকাল পরে \* “আরাকানের প্রধান মন্ত্রী পাক্‌জাঙ্গা

“দেজ্যাওয়াদি-আরেকুং,” ১২২ পৃষ্ঠা।

রাজাকে জানাইলেন যে, ‘উচ্চব্রহ্মের চাক্‌মারাজ

মংছুই বৌদ্ধধর্মের আচার-নীতি রক্ষা করিতে চাহেন না; তিনি তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করেন। সৎলোকের উপদেশমতেও চলেন না, অসৎ লোকের পরামর্শ ধরিয়া কার্য্য করেন। পাপকার্য্যের প্রতিই তাঁহার অনুরাগ অধিক। তাঁহার কোন ধর্ম্মই নাই। অধিকন্তু মঘরাজার উপর

এযাবৎ তদীয় পূর্বপুরুষের নির্যাতন-ক্রোধ রহিয়াছে । এই সংবাদে মঘরাজ বিচলিত হইয়া মংজামু হইতেও চাক্‌মারাজকে তাড়াইলেন । তখন তিনি উপায়ান্তরবিহনে মংজামু হইতে প্রজাবর্গসহ আরাকানেরই অন্তঃপাতী কলোদাঁই নদীকূলে

বিতাড়ন ।

চাকোই-ধাঁও নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন ; কিন্তু

এখানেও তাঁহার অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই । কিছুকাল যাইতে না যাইতেই মংছুইর পুত্র মরেক্যজের সহিত আরাকান-পতির পুনরায় সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় ।”

“এই যুদ্ধে মরেক্যজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং তাহাতেই বাধ্য হইয়া তিনি প্রজাবৃন্দসমভিব্যাহারে “দেব্যাওয়াদি-আরেকুং”, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা । বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হন ( ৭৮০ মঘাব্দ,

১৪১৮-১৯ খৃঃ অঃ ) । বাঙ্গালার ( চট্টগ্রামের ) নবাব তাঁহাদিগকে বারখানি

চট্টগ্রামে আশ্রয় ।

গ্রামে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন । তথায়

বহুদিন ধরিয়া তাঁহারাই হীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন ।

অনন্তর ক্রমে সেখানেও তাঁহাদের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয় ।” চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী মাতামুড়ি নদীকূলে “অলিকদম (১)” নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়,—অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে ।

এখানে আসিয়া অবধি উক্ত পৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে আর কোন গোলযোগের নিদর্শন নাই । ষোড়শ শতাব্দির প্রারম্ভে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল ( ১৫১২ খৃঃ অঃ ) । তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও মঘ—জাতিত্রয়ের

চট্টগ্রামে শক্তিত্রয়ের

সংঘর্ষণ ।

কৃষিরধারণ চট্টগ্রাম রঞ্জিত হয় । ত্রিপুরার মহারাজা ধনা

মাণিক্যের বিশ্বস্ত সমরনীতিজ্ঞ সেনাপতি মহাবীর রায় চয়চাগ হুমুমান-মুর্তিশোভিত, বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ সুলতান সৈয়দবংশীয় আলাউদ্দিন ওয়াদ্‌দিন আবুল মুজাফর হুসেনসাহের (২) সৈন্তগণ অর্দ্ধচন্দ্র-রঞ্জিত, এবং প্রবলপরাক্রান্ত আরকানাধিপতি

(১) ‘অলিকদম’ অধুনা পার্শ্বতঃ চট্টগ্রামের ‘শম্ম-মাতামুড়ি রিজার্ভ’ ভুক্ত হইয়াছে ।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাসে হুসেনসাহকে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন । আমরা কেবল এখানে তদীয় জীবনীর কয়েকটি বিশেষ কথা “চৈতন্তচরিতামৃত”-কারের সংগৃহীত সংবাদ হইতে সংক্ষেপে পাঠকগণকে জানাইতেছি । দেখা যায় ইহা—“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” এবং “মুন্সিদাবাদের

মেং রাজার সৈন্যসমূহ ব্যবহৃত-লাঞ্ছিত পতাকাহস্তে চট্টলের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শেষ কালে মুসলমান ও মঘদিগের ভূজগর্ষ খর্ব করিয়া সেনাপতি চরচাগ চট্টলবন্ধে বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপন করেন। কিন্তু প্রবল বিক্রম হুসেনসাহ চিহ্নাতে নিবস্ত হইলেন না। পুনঃপুনঃ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধণা করেন।

পক্ষান্তরে ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকানরাজ্য অতিশয় মর্মান্বিত হইয়াছিলেন। অনন্তর বৈরনিষ্ঠাতনমানসে তিনি বলসংগ্রহে তত্পর রহিলেন। এ সময়ে 'অলিকদমের' চাক্ষুসরপতির উপরও তদীয় দৃষ্টি নিপতিত হইল। অবশেষে ৮৭৯ কি তৎপূর্ব মঘাদে

“দেব্যাওয়ারি-আরেনফুং।”

(১৫১৬-১৭ খৃঃ অঃ) “মঘরাজার সেনাপতি

ছেন্দুইজা চাক্ষুসধীশ্বরকে পরাভূত করেন। তৎকালে চট্টগ্রামসহরে মুরাচিন চাক্ষুসরাজ্যকে নামা শাসনকর্তা ছিলেন। আরাকানধিপতি ছাঙ্গেরী পুনর্জয়। নামক মন্ত্রী অধীনে চারিহাজার সৈন্য দিয়া স্থলপথে চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়াই মুরাচিন নারায়ণগঞ্জে

ইতিহাসে”ও স্বীকৃত হইয়াছে। হুসেনসাহ প্রথমে চাঁদপাড়া অঞ্চলের হুবুছিরায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জমিদারের সামান্য ভূতামাত্র ছিলেন। একদা কর্তব্যকার্যে অবহেলা অশ্রদধান করায় হুবুছিরায় তাঁহাকে ঘেঁরাঘাত করেন। অনন্তর তিনি চাঁদপাড়ার একজন কাজী-মুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, এবং তদবধি ষণ্ডরবাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে কাজীর অনুরোধক্রমে রাজসরকারে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে উজিরীপদে উন্নীত হন। শেষে ১৪৯৪ খৃঃ অর্কে সম্রাট মুজাফরসাহ নিহত হইলে গোড়ের সম্রাট হইলেন। সিংহাসন অধিকার করিয়া হুসেনসাহ দ্বালাপ্রভু হুবুছিরায়কে বিন্ধিত হন নাই। তাঁহার সম্মান বক্ষিত করিয়া তাঁহাকে চাঁদপাড়া গ্রাম নিকরস্থলপে দিতে চাহেন। তাহাতে সেই নিষ্ঠাবাদী ব্রাহ্মণ অধীকৃত হইলে একজানা মাত্র কর ধাওয়া করেন। সম্রাট হুসেন পূর্বে উড়িষ্যার অনেক দেবদেবীমূর্তী ভগ্ন করেন; কিন্তু তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার শাসনকাল আকবরের সময়ের ন্যায় আদরণীয়। অন্ততঃ তিনি বঙ্গসাহিত্যেরও উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। ‘পরগলীভারতের’ ভূমিকায় আছে,—

‘দুগুণি হুসেনসাহ হ’এ মহামতি। পক্ষম গোড়িতে যার পরম দুখ্যতি ॥

অল্পশত্রে দুগুণিত মহিমা অপার। কলিকালে হরি হৈষ কৃষ্ণ-অবতার ॥’

ঐকরনশী বিরচিত ভারতে আছে—“মসরতসাহ (পুত্রের নাম)-তাত অতি মহারাজ।

রামচন্দ্র মিহালপালে সব প্রজা ॥”

পলাইয়া যান ; সুতরাং চট্টগ্রাম অতি সহজেই ছাদেগ্রীর হস্তগত হয় (১)। তখন মঘরাজা কিছুদিন এই বিজিত রাজ্যে বাস করিলেন। পরে ৮৭৯ খ্রিঃ এই পৌষ ( খৃঃ অঃ ১৫১৭ ) জিরোমরাজা নামধেয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঢাকার গমন করেন। এই সময়ে অন্তরিক্কে মঘরাজপুত্র ইয়েমং সম্বীপ, হাতীয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় সৈন্তসামন্তের সহিত ( নোয়াখালির অন্তর্গত ) লক্ষীপুরে গিয়া রহিলেন।

“১৫ই মাঘ ( ১৫১৮ খৃঃ অঃ ) চাকমারাজ চতুই বস্ত্রতাস্বীকারপূর্বক আরকানরাজ-সম্মীপে তৎপ্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসন-কর্তার যোগে দুইটী মঘরাজাকে খেতহস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। মঘরাজ ঢাকার উপঢৌকন। থাকিয়া ৮৮০ মঘাকের ৬ই জ্যৈষ্ঠ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ধাবাংগ্রীর নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজা ইহার কিছুপূর্বে ছেলুইজাকে ধাবাংগ্রীর কাষে চট্টগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন। ছেলুইজা আসিয়া দেখিলেন যে, ধাবাংগ্রীর পত্র সম্পূর্ণ সত্য নহে,—চাকমারাজা যে হস্তিঘর উপহার পাঠাইয়াছেন, সেইগুলি বস্ত্রতঃ খেতহস্তী নয় ; কাল হাতীরই গায়ে চূণ মাখাইয়া গুলবর্ণ করা হইয়াছে। তিনি ঈদৃশী প্রতারণার অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া এতৎ উপহারসহ আগত চাকমারাজার মস্তিচুটুয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরন্তু ধাবাংগ্রী বুঝাইয়া দিলেন যে, ‘ইহা চাকমারাজার শঠতা নহে ; এদেশে খেতহস্তী পাওয়া যায় না—তাই তিনি এপ্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ খেতহস্তী না হইলে আরাকানাদীশ্বরের যথোচিত উপঢৌকন হয় না, ইহা চাকমারাজ অবগত আছেন। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণরূপে মার্জনীয়।’ তথাপি ছেলুইজার ক্রোধের উপশম হইল না, তিনি মস্তিগণকে ছাড়িলেন না। ক্রমে এ সংবাদ মঘরাজার কানে পৌছিল। তিনি ছেলুইজাকে ধাবাংগ্রীর হস্তে পুনরায় চট্টগ্রামের শাসনভার রাখিয়া চাকমামস্তিগণ ও হস্তী-

---

(১) “রাজমালা” গ্রন্থকারও বলেন, “মহারাজা ধনুমানিক বৎকালে হুসেনশাহের সহিত সময়ে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় আরকানপতি নিকিষাদে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৫৩৯ শকাব্দে ( ১৫১৭-১৮ খৃঃ ) পূর্ব গীজলমণকারী জন, ডি. সেলঘের আরাকানরাজকর্তৃক আহৃত হইয়া চট্টগ্রাম পরিদর্শনপূর্বক মঘরাজ্যে গমন করেন। ৩৩কালে চট্টগ্রাম আরাকানপতির হস্তে ছিল।” ( ৫১ পৃষ্ঠা। )



হুইটিসহ ঢাকায় তৎসমীপে যাইতে আদেশ দিলেন। ছেন্দুইজা ভয়ে তখন মন্ত্রীদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে লইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা উভয়পক্ষের বিবরণী শুনিয়া ছেন্দুইজাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন,—‘তুমি রাজবংশসম্বৃত হইয়াও, পণ্ডিত ধাবাংগ্রী যাহা বলিলেন, মূর্খের মত, জনলীর মত—অহঙ্কারে হিতাহিত বিচার না করিয়া, তাহা শুন নাই। সুতরাং আরও কিছুকাল জ্ঞানীব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা-লাভ করহ।’ অতঃপর একটি উদাহরণ দিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রামের মহাপাঙ্গাগ্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং চাক্‌মারাজার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টি হইয়া তাঁহাকে “কোংলাগ্র” (সদাশয়) খেতাব ও মন্ত্রিগণকে বাঙ্গালীদিগের ব্যবহারানুরূপ বহুমূল্য পোষাকাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ৮৮১ মহাব্দের ১৩ই মাঘ (১৫২০ খৃঃ অঃ) আরাকানপতি ঢাকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে, চাক্‌মারাজ কোংলাগ্র “ছাজাং-ইয়ু” নামী তদীয় হুহিতাকে উপহার অর্পণ করিলেন।” (৫৪-৫২ পৃষ্ঠা।)

১৫২০ খৃঃ অব্দে ধল্মমাণিক্যের কনিষ্ঠপুত্র দেবমাণিক্য ত্রিপুরারসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১৫২২ খৃষ্টাব্দে মহরাজ গজাবদিকে পরাজিত করত চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে হসেনসাহের উপযুক্ত পুত্র সুলতান নাছিরদিন মহরতসাহ (১) স্বর্গগত পিতৃদেবের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত সেনাপতি

(১) হসেনসাহের রাজত্বের নায় তদীয় কৃতী সম্ভানের শাসনকালও সর্বত্র প্রশংসনীয়। তিনিও বাংলাভাষার অতিশয় উৎসাহদাতা ছিলেন। পণ্ডিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর তৎকৃত মহাভারতে লিখিয়াছেন,—

“শ্রীকৃত নাগক সে যে নসরত ধান।

রচাইল পাকালী যে গুণের নিদান ॥”

এই ‘ভারতপাকালী’তেও তিনি সাহিত্য-জগতে চিরপরিচিত থাকিবেন। এতদ্বিত্ত চট্টগ্রামে তাঁহার প্রভূত যশঃসৌরভ ছিল। এমন কি, হসেনসাহের পরিচয় দিতে শ্রীকরনন্দী ‘নসরতসাহ-তাত’ লিখিয়াছেন, ইহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ আরও বহুকাল ধরিয়া চট্টগ্রামের জন-সাধারণ তদীয় স্মৃতি রক্ষা করিবে। বৈকল্পদাবলীতেও তাঁহার কথা আছে,—

“সে যে নসির সাহ জানে।

যারে হানিল মদন বাণে ॥” (‘সাধনা’—প্রাধণ, ১৩০০।)

পরাগলখাঁ (১) এবং তৎপুত্র ছুটিখাঁ (২) বাহুবলে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করিয়া-  
ছিলেন (৩)। এসময়ে চাকমারাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী কাহার অঙ্কশায়িনী ছিলেন,

(১) পরাগলখাঁ হুলতান হুসেনসাহেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন;—

“নৃপতি হুসেন সাহ গোড়ের ঈশ্বর। তান্ হক্ সেনাপতি হওন্ত লঙ্কর ॥

লঙ্কর পরাগল খান মহামতি। হুবর্ণ বসন পাইল অথ বায়ুগতি ॥

লঙ্করী ঘিঘর পাই আইবস্ত চলিয়া। চাটিগ্রামে চলিলেন হরষিত হৈয়া ॥

পুত্র, পৌত্র রাজ্য করে খান মহামতি। পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি ॥”

ইহা “পরাগলীভারতের” ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত। পরাগল খাঁর অনুজ্ঞাক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মহর্ষি জৈমিনির ‘ভারত সংহিতা’ অবলম্বন করত এই মহাভারত প্রণয়ন করেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সুতরাং পরাগলখাঁর নাম সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। ইহা ছাড়া ফেণীতীরে (চট্টগ্রাম) মিরেশ্বরী থানার অধীন “পরাগলপুরে” “পরাগলের দীঘি” ও পরাগলখাঁর প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে যে “লঙ্করের দীঘি” আছে, তাহাও বোধ হয় এই লঙ্কর পরাগলখাঁর খনিত।

(২) “পরাগলীভারতে”ও আছে,— “তনয় যে ছুটি খান পরম উচ্ছল।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল ॥”

বাস্তবিক ছুটি খাঁ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। অমিত বাহুবলের স্বায় বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অসীম অনুরাগ দেখিতে পাই। পিতার অনুকরণে শ্রীকরনন্দী দ্বারা তিনি মহাভারতের অর্থমেধপর্ব অনুবাদ করাইয়া লয়েন। কবিবর শ্রীকরনন্দী প্রভূয় গুণ-বর্ণনার লিখিয়াছেন;—“লঙ্কর পরাগল খানের তনয়। সমরে নির্ভর ছুটি খান মহাশয় ॥

আজানুলখিত বাহু কমললোচন। শিলাস হৃদয়ে মন্ত গজেন্দ্র গমন ॥

দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা। শৌর্য্যে বীর্য্যে গাভীর্য্যে নাহিক উপমা ॥”

কবির আশ্রয়কথা—“অর্থমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়। সভাধাণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥

দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার। সধারোক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার ॥

তাহান আদেশ মালা মন্তকে ধরিয়া। শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া ॥”

বর্ণনার কল্পনার অবাধগতি আছে বটে, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নতুন রত্নখনি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) নহরতসাহার চট্টগ্রাম-বিজয়কীর্ত্তি অদ্যাপি কেন, আরও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এদেশে জাগ্রত রহিবে। তিনি সর্বপ্রথমে যেখানে কটক সংস্থাপন করেন, তাহা (চট্টগ্রাম সহর হইতে ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত—বর্তমান গ্রন্থকারের জন্মভূমি) “কতে (খা) বাদ” অর্থাৎ বিজয়স্থান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তথায় হুলতান এক মসৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায়

ইতিহাসলেখকগণ তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া না গেলেন, ইহা বোধ হয় অসম্ভব যে, চট্টগ্রামের সৌভাগ্যনেমির পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চাক্ষুসরাজের অদৃষ্টও পরিবর্তিত হইতেছিল। চট্টগ্রাম অধিকারের পর নছরতসাহ সেনাপতি পরাগলখাকে তাহার শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়মাণিক্য রাজা হইয়া চট্টগ্রাম পুনরায় অধিকার করেন। পরে ইহার আধিপত্য লইয়া ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাধিপতি উদয়মাণিক্যের সহিত মোগলদিগের যোঁরতর যুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরাসৈন্য এবং মাত্র ৫ হাজার মুসলমান-সৈনিক বিনষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম মোগলদিগের অধিকারে যায়। কিন্তু তাহারাও অধিক দিন ইহা ভোগ করিতে পারেন নাই; ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরকানাধীশ্বর মেংফালাং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ত্রিপুরা লুণ্ঠনপূর্বক মেঘনাতীরে বিজয়পতাকা উড়ান করেন।

এই যুদ্ধের কিছুকাল পরে ( ১৫৯৯ খৃঃ অব্দ ) “তোঙ- ( ব্রহ্ম ) রাজ আরাকানের ( মল্লজাগিরি ) সমীপে উপচোকন  
 “দেঙ্গাওয়াদি-আরেনদুং”, ১৬০ পৃষ্ঠা।  
 দরাসহ খিদুংজা ও কাহাজা নামক দুই জন  
 দূতকে পত্র লইয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রস্তাব ছিল, যদি মঘরাজ

আধ মাইল এক শ্রমও দেওয়ার তিনচতুর্থাংশ হইবে। পার গুলি প্রায় পাহাড় সমান, মধ্যভাগে শীতকালেও ১২ হাতের অধিক জল থাকে। ইহা ( নছরত বাহাদুর ) “বড় দীঘি” আখ্যায় চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট পরিচিত। এতদ্বিধ দীঘিরই সন্নিকটে তিনি যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা কালের করালগ্রাসে ভূমিসাৎ হইয়াছিল; কিছুদিন হইল স্থানীয় মুসলমান অধিবাসিবর্গ তাহার ধ্বংসস্থান করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, হুলতান নছরতসাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়া বুদ্ধা মাতুলসমীপে তাহার কোন্ সংকার্যে অভিলাস আছে, জানিতে চাহেন। তিনি একটা দীঘিকা খননের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। নছরতসাহ প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি যতদূর পর্যন্ত অজ্ঞাতভাবে ইচ্ছিত পারিষেন, ততদূর দীঘ দীঘিকা খনিত হইবে। পুত্রের মহৎ সংকল্পে আশাতীত সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধা জননী চলিতে আরম্ভ করেন। অনেক দূর গেলে, হুলতানের সতীর কৌশলজালে পড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। ততদূর দীঘ দীঘিকা খনন ও তৎপাথে প্রাপ্ত মসজিদ নির্মাণ করাইয়া নছরতসাহ তৎক্ষণাতঃ সন্বেশপূর্বক বলিলেন, ‘আজ আমি মাতৃদণ্ড পরিশোধ করিলাম’। ইহা বলিতে না বলিতেই শব্দিক মসজিদ ভাঙিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু নছরতসাহার এই অপদ্রষ্টা সম্বন্ধীয় কিঞ্চদন্তীতে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কি না, অবগত নহি।

সাহাব্যবাহনে পেগু রাজ্য অধিকার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় যুবতী কন্যা ও বেতহস্তী উপহার প্রদান করিবেন। আরাকানাদিগণিতি ইহাতে সম্মত হইলেন এবং চাক্‌মারাজ কোংলাপ্র, কুকি, ত্রিপুরা, বুকং, রোয়াঙ্গা, খিসা প্রভৃতি সামন্তনরপতি ও বাদ্‌লায় বার দেশের শাসনকর্তাকে উপযুক্ত লোকের

চাক্‌মারাজার  
অধিনায়কত্ব ।

করিলেন। সকলে গিয়া উপস্থিত হইলে চাক্‌মারাজার অধীনে ত্রিশহাজার সৈন্য ও ময়রাজার এক মন্ত্রী থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ১৬০ মণিতে (খৃষ্টীয় ১৫৯৮-৯৯ অব্দে) যুদ্ধযাত্রা

করিয়া মুন্‌দামা নগরের দীর্ঘশানকোণে ছারোয়াত্রাঙা খালের পথে কামল পাহাড়ের উপর চাক্‌মারাজ কোংলাপ্রকে পূর্বোক্ত ত্রিশহাজার সৈন্যসহ রাখিলেন। অতঃপর চাক্‌মারাজার খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়াতে তিনি নিকটবর্তী (গ্রামের রাজধানী) ব্যাককরাজার উপরে আপতিত হইলেন, এবং রাজার কনিষ্ঠভ্রাতা নাচাময়কে ধৃত করিয়া আরাকানাদীশ্বরের সম্মুখে আনিয়া দেন (১)।”

(১) পক্ষান্তরে আরাকানাদীশ্বর ও ব্রহ্মরাজের সম্মিলিত শক্তি পেগু রাজকে পরাজিত করে। ব্রহ্মরাজ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আরাকানরাজকে ৩০০০ ঘর তাইলং প্রজা এবং বিজিত রাজার পুত্র ও কন্যাকে উপহার প্রদান করেন। আরাকানাদিগণিতি সেই বন্দিনী যুবতীর পাণিগ্রহণ করত তাহার স্ত্রীখুইনাং এর পরিবর্তে চুমাজী নাম প্রদান করেন। এই পরিণয় হইতে বন্দিগণও অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকে। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে আরাকানাদীশ্বর তদীয় শ্যালিককে (পেগু রাজপুত্রকে) চট্টগ্রামের শাসনভার অর্পণ করেন। তাহার তিনপুরুষ পরে (ইতিমধ্যে বুকটরাজও থাকিছেন) মঙ্গল্যার পুত্র হারিও চট্টগ্রামের অধিনায়ক হন। বর্তমান বোমাং-রাজবংশের কতকগুলি প্রাচীন কাগজপত্র হইতে জানা যায়, ১৭১০ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ উজিয়া পশ্চিম প্রদেশীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানোপলক্ষে এখানে আসিলে হারিও তাহার সহিত মিলিত হন। ইহাতে উজিয়া হারিওকে বোমাজী উপাধিতে ভূষিত করেন। পরন্তু বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের ১৮২৮ ইংরাজীয় ৫৪৩ A. D. নম্বর পত্রে দেখা যায়, “the first chief of the Bohmong's family having been a Burmese Boh who fled into the tracts from the king of Ava!” সে বাহা ইউক বোমাং হারিওর জীবিতকালে তদীয় পুত্র ছাদাঙ্গু পক্ষ প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র কোংলাঙ্গু হারিওর পরে উত্তরাধিকারিণী লাভ করেন। অনন্তর ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে বোমাং কোংলাঙ্গু বোমগলগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া আরাকানরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পরে ১৭৭৪ অব্দে, ইংরাজেরা চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি প্রত্যাগমন

অতঃপর এদিকে ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমরমাণিক্য ( ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে ) সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া ( ১৬০৯-১০ খৃঃ অব্দে ) পুনরায় আরাকানপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন । তাহাতে মঘরাজ বার বার পরাজিত

হইয়া পর্তুগীজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । এইবার অমরমাণিক্য ।

তাহাদের সহায়তায় ত্রিপুরারাজ পরাভূত হয় । অমরমাণিক্য আবার আক্রমণের চেষ্টা করিলে, আরাকানপতি এক বৎসর যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করেন । ত্রিপুরারাজ ইহাতে সন্মত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত

করতঃ চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশবর্তী রামু, ঘোমু, ইদঘর, ইয়ুচ্চা, মাতামুড়ি, লামা প্রভৃতি নানা স্থানে বাস করিবার পর অবশেষে ১৮০৪ অব্দে শম্ভুনদীর তীরবর্তী ম্যাছি খালে বসতি স্থাপন করেন । ১৮১৩ অব্দের আগষ্ট মাসে খ্যানট্রৈ নামক আরাকানের জনৈক দহা ২০০ উচ্ছৃঙ্খলাচারী লোক লইয়া পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে এত উপদ্রব করিতে থাকে যে, তাহাতে তত্রতা অধিবাসিগণ পলাইয়া যায় । বোমাং কোলাফুর ছয় পুত্র ছিল । জ্যেষ্ঠ ছাধানফুর ৪০০ লোক লইয়া তাহাদিগকে এদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তাড়াইয়া দেন । অনন্তর ১৮১৯ অব্দে তিনি বোমাং হইয়া ১৮২২ অব্দে বাসস্থান বর্তমান বান্দরবনে স্থানান্তরিত করেন । ১৮২৩ অব্দে ছাধানফুর বনজুগী-সর্দার রেরচুলুমকে জয় করিলেন । একগানি প্রাচীন কাগজে দেখা যায়—১৮২৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ভয়ঙ্কর মনুষ্যখাদক ব্যাঘ্রের উপদ্রবে চতুর্দিকে বহুতর ক্ষতি হইয়াছিল । ইহার পদচিহ্নের ব্যাস নাকি আয় দেড়হস্ত পরিমিত ছিল । ইহাকে কেহই হত্যা করিতে পারে নাই, পরন্তু আশ্চর্য্যরূপে অদৃশ্য হইয়াছিল ! ১৮৪০ অব্দে ছাধানফুর মৃত্যু হয় । প্রচলিত প্রথা মতে তদীয় শব আলাইবার জন্য আধারে স্থাপিত হইলে হঠাৎ এমন ভয়ানক ঝুট আসে যে, বন্যা আসিয়া সমগ্র বান্দরবনকে ডুবাইয়া দেয়, অধিবাসিগণ তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে উঠিয়া কোনরূপে আশ্রয়লাভে পারিয়াছিল ; কিন্তু শবাবধি বন্যায় পূর্ববাসস্থান ম্যাছিখালের বিধৌত অশ্রুশ্রুতিতে লইয়া আসে । অবশেষে তথায় সেই শব তদীয় পত্নীর অশ্রুশ্রুতি পার্শ্বে প্রজ্জালিত হইল । তৎপরে অক্টোবর মাসে কোলাফুর বোমাং হন । কিন্তু তিনি তৎপরিচালন কার্য্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ দেখিয়া আপনা হইতেই এই ভার পিতৃব্যপুত্র মংফুর হস্তে পরিত্যাগ করেন । বংফুর ১৮৭২ অব্দের লুসাই অভিযানে ইংরাজগভর্নমেন্টকে বিস্তর সাহায্য করেন । ১৮৭৫ অব্দের নবেম্বর মাসে তদীয় সর্ব কনিষ্ঠ সহোদর ছাইলও বোমাং পদে অভিষিক্ত হন । তিনিও ১৮৮৯-৯০ অব্দের লুসাই অভিযানে কুলি প্রভৃতি যোগাইয়া ইংরাজ গভর্নমেন্টের সহায়তা করিয়াছিলেন । তৎকালে তিনি “ক্যাচারীং-চুরেলুইয়া” অর্থাৎ ‘মাননীয় স্বর্গপণ্যবীতধারী রাজা’—এই বার্ষিক উপাধি এবং এক স্বর্ণ হার গভর্নমেন্ট হইতে প্রাপ্ত হন । ১৯০২ অব্দে ওরা মাজু তাহার মৃত্যু হয় । অনন্তর তদীয় ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত চোলাফুর চৌধুরীই বর্তমান বোমাং রাজা ।

হইলেন । কিন্তু অনতিবিলম্বেই শুনিতে পাইলেন, মঘরাজ্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন । তখন তিনি স্বীয় তিন পুত্রকে বৃহৎ একদল সৈন্তের সহিত পাঠাইলেন । তাঁহারা আসিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে, মঘরাজ ভয়ে গজদন্তবিনির্মিত একটা রাজমুকুট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন । কিন্তু এই মুকুট-গ্রহণের নিমিত্ত কুমারগণের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হইল ; আরাকানাদীশ্বর সেই সংবাদ শ্রবণে স্বেযোগ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, ত্রিপুরসৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করতঃ, পর্তুগীজদিগের

পৰ্তুগীজবীৰ্য্য ।

সাহায্যে উদয়পুর লুণ্ঠনপূৰ্ব্বক ত্রিপুরাকে সৰ্ব্বস্বান্ত করিয়া যান ( ১৬১০-১১ খৃঃ অঃ ) । ইহার পর চট্টগ্রাম আর ত্রিপুরার অধীন হয় নাই । অন্ততঃ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অমরমাণিক্যের পৌত্র ত্রিপুরাপতি যশোধরমাণিক্য দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের মোগলসৈন্যকর্তৃক পরাভূত হন ।

চট্টগ্রাম মঘরাজার কুক্ষিগত হইল ( ১ ) বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ পর্তুগীজদিগের প্রাধান্য সবিশেষ বৰ্দ্ধিত হইল । যে সময়ে মঘ ও পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামবাসীদিগকে জালাতন করিতেছিল, সেই সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইসলামখাঁ মসহৌদী

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন । সঙ্কটে পড়িয়া মঘ ও পর্তুগীজ তত্রত্য মঘ-শাসনকর্ত্তা মুকুটরায় ইসলামখাঁর অধীনতা স্বীকার অত্যাচার । করেন । কিন্তু কিছুদিন পরে মঘরাজ আবার চট্টগ্রাম

অধিকার করিয়াছিলেন । অনন্তর সায়েস্তাখাঁ বাঙ্গালার কর্ত্ত্ব পাইয়াই মঘদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন । তিনি পর্তুগীজদিগের প্রাধান্যদর্শনে তাহাদিগকে নানা প্রলোভনে ( ২ ) বশে আনিয়া ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন ( ৩ ) ।

( ১ ) এই সময় ( সম্ভবতঃ ১৬১৪ খৃঃ অব্দ—পেণ্ডরাজ-পুত্রের শাসনকাল ) হইতে চট্টগ্রামেও ‘মঘ’ অঙ্গের প্রচলন আরম্ভ হয় ।

( ২ ) পরন্তু মার্মানের মতে সায়েস্তা খাঁ ধমক দিয়া পর্তুগীজদিগকে বশীভূত করেন ( Vide—Marshman's History of Bengal, p. 36 ) । কিন্তু পঞ্চাটক বার্মিনার স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, সায়েস্তা খাঁ উৎকোচের প্রলোভনে পর্তুগীজদিগকে ভুলাইয়া শেষে কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলে প্রতিশ্রুতিপালনে কুণ্ঠিত হইলেন । ( Bernio's travels in the Mogul Empire—Vol. I, p. 203. ) ।

( ৩ ) হাণ্টার ( Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VI—p. 113 ) প্রমুখ অধিকাংশ সূত্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মতে নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া

এইরূপে আরাকানীধীশ্বরও চিরদিনের নিমিত্ত চট্টগ্রাম হারাইলেন। কিন্তু ক্ষুদ্রতম চাক্‌মারাজ্য ইত্যবসরে স্বাভাব্য লাভ করিয়াছিল; মোগল-সম্রাটের দৃষ্টি এই পার্শ্বত্যরাজ্যের প্রতি নাও পড়িয়া থাকিবে।

বলা বাহুল্য, “দেক্ষাওয়াদি-আরেনকুং”ও অতঃপর চাক্‌মারাজ্য আর কোন সংবাদ রাখেন নাই। অবশ্য চট্টগ্রামের ইতিহাস তজ্জ্ঞ যাহা কিছু দারী! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পার্শ্বতীয়গণের প্রতি প্রাচীন ইতিহাসে কোনও সহানুভূতির পরিচয় নাই। ঐতিহাসিকেরা কেন যে ইহাদিগকে তাঁহাদের আলোচনা হইতে বাদ রাখিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ দেখি না। সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক অবলম্বন হারাইলাম; কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ আশ্রয়ভ্রষ্ট নহি। ইতিহাস অতীতের প্রারম্ভ সীমান্তপ্রদেশে আনিয়া ছাড়িয়া পলাইয়াছে! কষ্টে-কষ্টে আর কিয়দূরমাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেই আমাদের লক্ষ্যমন্দিরের শৃঙ্গমণি পরিলক্ষিত হইবে। এই পথটুকু অপরিচিত এবং দুর্গম হইলেও একিবারে অগম্য নহে। বিশেষতঃ সংবাদ পাইয়াছি, আমাদের গন্তব্য পথের স্থানে স্থানে সেই পরিচিত প্রাচীনমন্দিরের ইট, স্তম্ভ, বরগা, কড়িকাঠ প্রভৃতি যথেষ্ট রহিয়াছে; গত কয়েক বৎসরের সামান্য অবসরে দ্রুত কাল তাহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারে নাই!

উপরি উক্ত কথাগুলির বিশদব্যাখ্যাস্বরূপে এস্থলে লিখিতে হয়, পূর্বে আমরা “অলিকদমে” চাক্‌মারাজ্যের রাজধানীস্থাপনের উল্লেখমাত্র করিয়া আসিয়াছি। প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, রাজবস্ত্র, দীর্ঘিকা, ইত্যাদি

অত্যাধিক তাঁহাদের মহতী কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। পরন্তু  
অলিকদম। এই সমুদয় প্রাচীন ঐশ্বর্য্য যে অপরের নহে, তাহা পূর্বোক্ত

---

“ইসলামাবাদ” আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহার কারণ, ইসলাম খাঁ মস্‌হৌদী চট্টগ্রাম জয় করিয়া খাঁর গৌরবচিহ্ন স্মরণীয় রাখিতে এই নামকরণ করিয়াছিলেন ( Marshman's History of Bengal )। শেষোক্ত মত গ্রহণ করিতে ঐতিহাসিকদিগের আপত্তি কি, বুঝিলাম না! “চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত”কার তারকবাবু দেখিতেছি অপর এক সত্য আধিকার করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহভাবেই লিখিয়াছেন, সারেন্তাখাঁর প্রিয়পুত্র “উমেদখাঁর চট্টলখিজরে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপিত, ও তাহা হইতেই এই স্থানের ইসলামাবাদ নাম বিদ্যোবিত হইল।” ( ৩৩ পৃষ্ঠা )

ঐতিহাসিকভিত্তি ব্যতিরেকে বেশপ্রচলিত জনশ্রুতিও বিশেষরূপে সঙ্গ্রহণ করে । এই সেইদিনও অলিকদমের নিকটবর্তিনী মাতামুড়িনদীজলে চাক্‌মাবর্ণাঙ্কিত করে একটি বুদ্ধপ্রতিমূর্তি লামাষ্টেনের হেড্‌কনষ্টেবল শ্রীযুক্ত নীলকমল বড়ুয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন । অনন্তর চট্টগ্রামের মানচিত্রখানি খুলিলে সহজেই চাক্‌মাদিগের গতি ও বিস্তৃতির সন্ধান পাওয়া যায় । ইতিহাস তাহা তুচ্ছ করিতে পারে ; কারণ ইহাতে কামান-গোলাদির প্রবল সংঘর্ষণ নাই, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তারবিহীন টেলিগ্রাফের দ্বারা সংবাদপ্রেরণের সুবিধাও ছিল না । কিন্তু ভূচিত্র তাহা আপনার বক্ষোদেশ হইতে মুছিয়া ফেলিতে সাহস করে নাই । “পৃথিবী সর্ব্বসংহা” তাই বৃষ্টি তচ্চিত্রগুলিও এ সমুদয় কাঁটাকম্পাসের চিহ্ন যত্নসহকারে জড়াইয়া ক্লুতার্থ হইয়াছে । সত্যকথা বলিতে কি, আমাদের দেশের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে আজও অনেক বাকী । জানিবার অনেক কথা ফুটিয়া বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে, অথচ সাধারণের গোচরীভূত হইবার উপায় নাই । বর্ত্তমানে সংবাদ ও সাময়িকপত্রের দ্বারা তদভাব কথঞ্চিৎ দূর হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও ‘তখন-তখন’ মাত্র—স্থায়ী নহে । অধুনা বঙ্গের অনেক লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন । যদি তাঁহারা ‘যা-তা’ না লিখিয়া এদিকে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ সকলেরই ক্লুতজ্ঞতাভাজন হইবেন এবং তাঁহাদের যশোভাতিও অধিকতর উজ্জল হইবে—সন্দেহ নাই ।

কাম্বোজারের দক্ষিণে ‘জুমিয়াপাড়া’ নামে দুইটা গওগ্রাম আছে । এই দুই জুমিয়াপাড়ার মধ্যস্থলে ‘মঘ-পাড়া’ নামক অপর একটি প্রাচীন গ্রাম দেখা যায় । পূর্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রামবাসীদিগের নিকট প্রধানতঃ চাক্‌মারাই ‘জুমিয়া’

নামে পরিচিত । সুতরাং প্রথমোক্ত গ্রামদুইটা— চাক্‌মাগণ  
প্রাচীন বাসস্থান ।

এবং শেষগ্রাম যে মঘগণ কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম অধুষিত হয়, তাহা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে । এই স্থানগুলি আরাকানের সীমান্তপ্রদেশের অতি সন্নিকটে অবস্থিত । চাক্‌মারাজ আরাকান হইতে বিভাজিত হইয়া চট্টগ্রামের নবাবের কাছে এই সমুদয় গ্রাম লইয়াই

বারমেশে বসতি স্থাপনের অল্পমতি লাভ করিয়া থাকিবেন ।  
মঘরাজার পত্র ।  
আর সেই সময় কতিপয় মঘও যে চাক্‌মাদিগের অল্পসরণ



করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। ইহার সাক্ষিতিনশত বৎসর পরেও আরাকানের অবশিষ্ট কোন কোন চাক্ষুস এবং তত্রত্য মঘগণের একযোগে পলায়নসংবাদ পাওয়া যায়। : ৭৮২ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মসম্রাট সম্পূর্ণরূপে আরাকান জয় করেন, সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ পাইয়া বহুসংখ্যক আরাকানবাসী নিরীহগণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনপূর্বক চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আরাকানের শাসনকর্তা, চট্টগ্রামের সরদার (Chief)-সমীপে সেই সকল দুষ্ট লোকদিগকে প্রত্যর্পণের নিমিত্ত বন্ধুভাবে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এবাং চট্টগ্রাম কমিশনার আফিসে রক্ষিত আছে। ইহাতে পাওয়া যায়,—

\*        \*        \*        \*        \*        \*        \*

\*        \*        \*        \*        \*        \*        \*

\* \* “ডোমকান চাক্ষুস, কি-কোপা লাইছ, মুরঙ্গ, এবং অপর কতিপয় আরাকানবাসী এক্ষণে আপনার সীমান্তপর্বতে আশ্রয় লইয়াছে। অধিকন্তু তাহারা নাক্দনদীর মোহনায় জনৈক ইংরাজকে হত্যা করিয়া সঙ্গে বাহা কিছু ছিল, অপহরণ করিয়া নিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি সসৈন্তে তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আপনার সীমায় আসিয়াছি। তাহারা দস্যুতাচরণের দ্বারা সম্রাটকে অমান্ত করিয়া, স্বরাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছে।

“ইহাদিগকে এবং যে সকল মঘ কোন সময়ে দেশ হইতে পলাইয়া আসে—তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া আপনার কর্তব্য নহে, আপনার রাজ্য হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই আপনার উচিত। তাহা হইলে আবাদিগের যজ্ঞ অকুর থাকিবে, এবং পথিক ও বাবসায়িগণ নিরাপদ হইবে।

“যদি আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া না দেন, তবে আমি প্রয়োজনানুরোধে সশস্ত্রসৈন্যদলের সহিত, তাহারা আপনার রাজ্যে যে কোন অংশে থাকুক—খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হইব।

“মহশ্বপ ওয়াছিন দ্বারা আমি এই পত্র পাঠাইলাম। ইহা পাইয়া হইতে আপনার রাজ্য হইতে আমার প্রজাগণকে তাড়াইয়া দিবেন, অথবা যদি তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহেন, তবে অবিলম্বে উত্তর পাঠাইবেন।”

‘জুমিরাপাড়া’র প্রায় ১৭ মাইল উত্তরে ‘ধাঁমাইপাড়া’ অস্থাপি বর্তমান। চাক্ষুসদিগের প্রতাপশালী সম্রাট ‘ধাঁমাইগোছার’ বসতি হইতে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। ইহার কিকিছুত্তরেই ‘ধূর্ঘাদীঘি’ ‘ধূর্ঘা’-বংশের স্থতিরক্ষা

করিতেছে । এতদ্বিন্ন ধামাইপাড়া ও ধূর্যাদীঘির মধ্যভাগে দুইটি ‘পাগলাবিল’ (১) বাঘধালী নদীর দক্ষিণে সমুদ্র প্রান্তে ‘পাগলামুড়া, এবং ‘গাভুরমুড়ি’ নদীর নিকটবর্তী আর একটি ‘পাগলাবিল, প্রভৃতি কীতিপীঠসমূহ চাক্কাদিগের প্রাচীন নরপতি ‘পাগলারাজাকে’ অমর করিয়া রাখিয়াছে ।

অলিকদমের নিকটবর্তী নদীত্রয়—‘মাতামুড়ি’, ‘গাভুরমুড়ি’ এবং ‘বড়ামুড়ি’ নামে প্রখ্যাত । ইহাদের সকলেরই সাধারণ আখ্যা ‘মুড়ি’ অর্থাৎ ‘মুড়া’

চাক্কা-আখ্যা । (পাহাড়)-নিঃসৃত । শ্রোতাবেগানুসারে মাতা, গাভুর

(যুবক) এবং বুড়া (বৃদ্ধ) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ।

‘গাভুর’ শব্দটি চাক্কাদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত, এখনও তাহাদের সমাজে (অবিবাহিত) যুবককে নির্দেশ করিতে ইহা ভিন্ন তেমন কোন শব্দ নাই । অপরত, চাক্কাগণের মধ্যে দেখা যায়, গুণ বা কার্য্য লইয়া ব্যক্তি বা বংশ প্রভৃতির আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে । সুতরাং শ্রোতের বেগে—মাতা, বুড়া ও গাভুর কল্পনায় বিশেষণ ঠিক করিয়া, পাহাড় (মুড়া) হইতে প্রবাহিত শ্রোতস্বতীর ‘মুড়ি’ অভিধা ইহারাই দিয়াছে—নিশ্চিত অনুমান করা যায় । এবং চাক্কাগণ যেরূপ অনুকৃতিবাদী তাহাতে, নাকের (নাসিকার) স্থায় ‘টেক’ (বাক) দেখিয়া বর্তমান “টেক্‌নাকের” (২) নাম ও ইহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত—সহজে বুঝা যায় (৩) ।

এই ‘মাতামুড়ি’ নদীতে অলিকদমের কিয়দূতরে ‘তৈনছরী’ নামী উপনদী আসিয়া পতিত হইয়াছে । ইহারই তীরভূমিতে মঘদিগের (সম্ভবতঃ সেনাপতি

(১) মাঠবিশেষ । এদেশে এমন কি চট্টগ্রামেও মাঠকে “বিল” বলা হইয়া থাকে ।

(২) টেক্‌নাক্—চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশবর্তী উপদ্বীপবিশেষ ।

(৩) কেবল ইহা নহে, চাক্কাগণ তখন যে সকল স্থানে ছিল, এখানে আসিয়াও তাহাদের সেই পূর্ববাসস্থানের নামানুকরণে সোয়ালক্ (শুভলঙ্কের অপর নাম), রাইল্‌খাং, চারিখাং, খারিখাং, সাবেক্‌খাং, লাবেক্‌খাং প্রভৃতি নামকরণ করিয়াছে । এবং এখানে, তাহাদিগের প্রদত্ত রাঙাপান্ডা, মাণিকছরী, ঝগড়াবিল প্রভৃতি নূতন আখ্যাও যথেষ্ট । পরন্তু ইহাদের অনুকরণ প্রবৃত্তি এতই প্রবলা যে, এই পার্বত্য চট্টগ্রামেই ৫৬ মাইল অন্তরেও একনামে দুইলাঙ্গার আখ্যা বিরল নহে ।

প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র।

ছেন্দুইজার) সহিত চাক্‌মারাজার ষোরতর যুদ্ধ হয়।  
এতৎসম্বন্ধে একটি গান আছে।—

\* \* \* \* \*

“যুদ্ধ হৈল তৈনছরী—

মোড়ের মাথায় যে দিলাক্,

ছ’ন রাজার মিল হলাক্ ॥”

অর্থাৎ ‘তৈনছরীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যখন নদীর মোড়ের মাথায় গর্ভস্থ চর ভাসিয়া উঠিল, তখন—শীতকালে উভয় রাজার মধ্যে সখ্যস্থাপিত হইল।’ এই বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আর এই অলিকদমেরই পার্শ্ববর্তী পর্ব্বত-নিঃস্রতা বাঘখালী নদীর উত্তরপারে “চাক্‌মাকুল” এবং দক্ষিণ পারে “রাজাকুল” নামে দুইটা প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে।

সীমানির্দেশ।

গুনা যায়, মঘরাজার সহিত চাক্‌মাপতির বিবাদ মীমাংসিত হইয়া এই বাঘখালী নদী উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ফলতঃ, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ পাওয়া যায় না। যতই বিরুদ্ধ প্রমাণ খুঁজিয়াছি, বিশ্বাস ততই দৃঢ়তর হইয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, বাঘখালীর উত্তরতীরে ‘ওয়াংঝাগোছার’ প্রাচীন বসতিস্থান ‘ওয়াংঝামুড়া’ মস্তক উত্তোলন করিয়া অতীতগৌরব ঘোষণা করিতেছে।

অনন্তর ‘গাভুরমুড়ি’ দিয়া ক্রমশ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে নদীতীরের অনতিদূরে ‘রাজাবিল’ নামে প্রকাণ্ড মাঠ এবং তাহার প্রায় ১৫ মাইল ব্যাধানে ‘রাজবাড়ী’ অভিধেয় গ্রাম ও ‘তক’ উপনদীর ‘রাজঘাটা’ প্রকৃতি পাওয়া যায়। এসকল স্থান এখনও চাক্‌মারাজার জমিদারীভুক্ত রহিয়াছে। পরে শঙ্খনদ পার হইয়া খালবিশেষের দ্বারা কিছুদূর আসিলে শিলকনায়ী উপনদীর উৎপত্তিস্থলে উপনীত হওয়া যায়। এই শিলকতীরে ভূতপূর্ব্ব চাক্‌মারাজা শুকবিলাস।

শুকদেব রায়ের অক্ষয় যশোমন্দির “শুকবিলাস” অবস্থিত।

অতাপি তদীয় ‘বিলাস’পুরীর ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা, দীঘি, এবং চতুশাখ্য বেষ্টিত পরিখা ইত্যাদি প্রাচীন রাজমহিমা দর্শকসাধারণকে জামাইতেছে। ইহাও অতাপি চাক্‌মারাজার শাসনাবধীন।

শিলক যে স্থানে আসিয়া কর্ণফুলিতে (১) আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে রানুনিয়া পরগণা অবস্থিত। সাধারণে ইহাকে “রাউণ্ডা” বলে। চাকমাগণ পরিত্যক্ত জুমকে “রাণ্ডা” নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং সহজেই

প্রতীত হইতেছে যে, চাকমাদিগের আবাদিত জুমের ‘রাণ্ডা’র “রাউণ্ডা” বা লোকবসতি হইয়াছে। অল্পমান ৩০০ তিন শতাব্দী পূর্বে রানুনিয়া।

এই পাহাড়ময়দেশ ব্যাঘ্র-ভক্ষকের ক্রীড়াস্থল ছিল। এখনও এদেশের সর্বত্র আবাদ হয় নাই, এবং আম-কাঁঠাল-প্রভৃতি গ্রামোপযোগী বৃক্ষাদিও প্রাচীন নহে। অত্রতা “গোয়াইর বিল” (২) জঙ্গলাকীর্ণ দেখিয়াছে, এমন অনেক লোক অদ্যাপি জীবিত পাওয়া যায়। নূতন আবাদিত জমির ন্যায় রানুনিয়ার উর্বরতা চট্টগ্রাম ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ। অন্তর্লিষ্ট অনেক দরিদ্র এখনও

(১) কর্ণফুলী—লুসাইপর্বতের অন্তর্গত লুংলের অনতিদূরবর্তী পর্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০ মাইল। কর্ণফুলী উপসত্তিহীন হইতে প্রায় ১৩৫ মাইল পথ গিরিকন্দরের কোলে কোলে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্রযোনার আসিয়া সমতলভূভাগ পাইয়াছে। ঠেগা, বড়হরিণা, কাচালং, শুভলং, ঢেঙ্গী, রাইন্থাং, কাপ্তাই, শিলক, ইচ্ছামতী ও হালদা প্রভৃতি ইহার সর্বপ্রধান উপনদী; তন্মধ্যে শেষোক্তটাই প্রধান। কর্ণফুলীর উত্তরতীরে—প্রায় মোহনাইর সন্নিধানে চট্টগ্রামনগর অধিষ্ঠিত। পূর্বেই একস্থলে খলিগাছি, ইহার কিয়দংশ ‘কাঁইচা’ বা ‘কাফী’ নামে প্রথিত। কিন্তু ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সমুদ্র কর্ণফুলীসদৃশী একমাত্র কাঁইচা নামেই উল্লিখিত আছে। ষোড়শ ইহা দেখিয়াই কাপ্তেন লুইস লিখিয়াছেন (A fly on the wheel—P. 184.), “ইহার আদিম নাম ‘কাঁইচা খাল।’ কর্ণফুলী নামকরণ সম্বন্ধে তিনি একটি আখ্যানও বলিয়াছেন। তাহা যথা—“কোন সময়ে চট্টগ্রামের জনৈক মুসলমান শাসনকর্তার বেগমের ‘কর্ণফুল’ (নিয়কর্ণান্তরণবিশেষ) এই নদীজলে পড়িয়া যায়। বেগম তাহা উদ্ধার করিতে যাইয়া জলমজ্জিত হইয়াছিলেন। তদনুসারে ইহার ‘কর্ণফুলী’ আখ্যা হইয়াছে।” কিন্তু এদেশে প্রসিদ্ধি আছে, দক্ষ্যজ্যোত্সুকপ্রাণী সতীদেহ স্নেহে লইয়া জোলান্যথ যখন ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ভগবতীর কর্ণফুল, কেশী (উর্দ্ধকর্ণান্তরণ-বিশেষ) ও শম্ব—গংগাতীর চট্টগ্রামের নদীতিনটিতে পতিত হইয়াছিল, সেই হইতে নদীত্রয়ের বর্তমান নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) গোয়াইর বিল—একটি প্রকাণ্ড মাঠ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ৩ মাইল হইবে; এখনও সম্পূর্ণ আবাদ হয় নাই। বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইলে সমুদ্রপ্রায় বোধ হয়।

সুবিধা পাইলে তথায় গিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে। চট্টগ্রামে একটি কথাই রহিয়াছে,—

“হাতে কাঁচি (১) কোমরে দা,

ভাত খাইলে রাউণ্ডা যা।”

সারার্থ এই—‘যদি স্বচ্ছন্দে উদরনিম্পত্তি করিবার আশা কর, তবে হাতে কাঁতে ও কোমরে দা লইয়া রান্নানিয়ায় যাও।’ এই বাক্যে আরও কিছু সত্য আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কৃষির উপকরণ দা এবং কাঁতে মাত্র সঙ্গে লইবার উপদেশ আছে; এই দুইটী জুমিয়াদের অন্ত্যোপকরণ। অতএব সহজেই ধরা যায়, কৃষকগণ তদ্দেশে চাক্‌মাদিগেরই অনুসরণ করিয়াছিল।

রান্নানিয়ায় চাক্‌মারাজার বিস্তৃত অধিকার এবং অপরাপর প্রধান প্রধান দেওয়ানগণেরও ‘ছোট বড়’ অনেক প্রাচীন জমিদারী রহিয়াছে। এখানে রাজকীয় কীর্তিপাঠ। ভূতপূর্ব চাক্‌মারাজা ধরমবক্স খাঁর মহিয়সী মহিষী কালিন্দীরানীর স্থাপিত (পদ্মোয়া) “রাজারহাট” ও “রাণীর হাট” এবং ‘ধামাই গোছার’ কীর্তি-চিহ্ন “ধামাইর হাট” স্বদূর ভবিষ্যৎ ধরিয়া চাক্‌মা-প্রভাব ঘোষণা করিবে। সম্ভবতঃ রাজা জানবক্স খাঁই এখানে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কালেক্টর সার

হেনরী কটনের (২) মতও এইরূপ (৩) দেখা যায়। অনন্তর জানবক্স খাঁই বোধ হয় রাজধানীস্থাপিত গ্রামের নাম “রাজানগর” রাখেন। রাজবাড়ী অবশ্য ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে। সম্মুখে “রাজার দীঘি” পরবর্ত্তী রাজা টক্কর খাঁ কর্তৃক খোদিত হইয়াছিল। তৎপাশ্বে যে অল্প একটি “রাজার হাট” আছে, তাহা রাজা টক্কর খাঁর কীর্তি বলিয়াই অনুমিত হয়।

‘জুম’ চাক্‌মাদিগের সর্বপ্রধান উপজীব্য। এজন্য তাহাদিগের আবাসস্থানের স্থিরতা থাকেনা। কেননা, এক বৎসর যেখানে জুম করা হয়, ৫৬ বৎসর যাবৎ পতিত না থাকিলে তাহাতে আর জুম করা চলে না। তাই নিম্নত

(১) চট্টগ্রামে ‘কাঁতে’কে সাধারণত ‘কাঁচি’ বলা হয়।

(২) সার হেনরী কটন পরে আসামের চিফ্‌ কমিশনার হইয়াছিলেন। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ভারতহিতৈষী। এক্ষণে স্বদেশে (লন্ডনে) থাকিয়াও সতত ভারতবাসীর সম্বলচেষ্টায় নিরত।

(৩) Revenue History of Chittagong—p. 189.

নতুন স্থানে কুম্ভক্ষেত্র অস্থলস্থান আবশ্যক হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানও

পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আবার কুম্ভের নিমিত্ত পাহাড় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রেরণ। এই কারণে চাকমাগণ ক্রমে পার্বত্যচট্টগ্রামে (১) ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পরন্তু রাজধানী বহুকাল ধরিয়া রাজনগরে

ছিল। পরে যখন চাকমাগণের প্রায় সকলেই এই পার্বত্যপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন শাসনকার্যের দৌর্য্যার্থ সম্ভবতঃ রাজা জব্বর খাঁ পার্বত্য-চট্টগ্রামের প্রায় মধ্যবর্তী কর্ণফুলী নদী দ্বারা ত্রিপাৰ্বতীতে রাঙামাটিতে (২) এক অস্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। রাজা মধ্যে মধ্যে পরিদর্শনোপলক্ষে আসিলে এখানে থাকিতেন। এইরূপে রাজা ধরমবল্ল খাঁর সময় পর্যন্ত চলিয়া

যায়। তদীয় মহিয়সী মহিষী কালিন্দীরানীর শাসনকালে, রাঙামাটি।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি পার্বত্যচট্টগ্রামের ব্রিটিশ-প্রতিনিধির বাসস্থান ও গবর্ণমেন্টের যাবতীয় অফিসাদি চক্ৰঘোনা হইতে রাঙামাটি উঠিয়া আসে। তখন রাণী বাধা হইয়া তদীয় অস্থায়ী আবাসশৈল ইংরাজ-কর্তৃপক্ষকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে এখনও চাকমাধীশ্বরের সন্ম-রোপিত দুইটা কাঁঠাল গাছ রহিয়াছে। এই রাজবাসস্থানেরই ভিত্তির উপর ব্রিটিশ শাসনকর্তার সূর্য্য “বাংলা” অধিষ্ঠিত হয়। কান্তেন লুইন ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা-কালে “Barn-House” ( খামার বাড়ী ) নামকরণ করিয়াছিলেন ( ৩ )।

(১) এইস্থান আদিমকালে কুকিদিগের বিভিন্ন শাখার অধিকারে ছিল। চাকমাগণের আশ্রয়্য ভাঁহারা ক্রমেই উত্তর-পূর্বাভিমুখে সরিয়া গিয়াছে।

(২) কবিবর ঈশ্বরকৃষ্ণদেব সেনের কাব্যগ্রন্থে এই উপনগরী “রক্তমতী” নামে লাভ করিয়াছে। সম্ভবতঃ রাঙামাটিনারী কুম্ভ উপনগরী ও কর্ণফুলীনদীর সম্মিলনেরই পার্ববর্তী স্থান রাঙামাটি নামে প্রসিদ্ধ। এই পার্বত্যপ্রদেশের স্থানগুলির নামকরণে ইহাই সাধারণ নিয়ম। রাঙামাটি চট্টগ্রাম হইতে নদীপথে ৬৫ এবং স্থলপথে ( হাটহাজারী ও রাউজান দ্বারা ) ৪৬ মাইল। কমিশনারের “সোরালা” (Swallow) নামক টিমার সচরাচর বৃহস্পতিবার আসিয়া শনিবার প্রত্যাবৃত্ত হয়; তাড়া—সর্ব নিয়ন্ত্রণীর এক টাকা। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান নগর। স্তম্ভরং খানা, আদারত ও কোলদারী ফিচারাল, জেলখানা, পোষ্ট ও টেলিগ্রামঅফিস, জেলাস্কুল, ইত্যাদি সবই আছে। সর্বোপরি ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর; বাহ্যিক মল্ল নহে। একেই এহলে জমপৌলক্ষে আসিয়া থাকেন।

(৩) A fly on the wheel—p. 373

অনন্তর রাণী কালিন্দী কর্ণফুলীর পরগণায় অশ্বর এক আবাস স্থান নির্মাণ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজন না ঘটিলে তিনি রাজ-বর্তমান রাজবাটী।

নগরের বাড়ী পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যু হইলে, দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণের প্রস্তাবে বিভাগীয় কমিশনার ইহাও উল্লেখ করেন যে \* “যদি কাহাকেও জাতি- \* Letter No. 988, dated—  
বিশেষের সর্বময় কর্ত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া 10-12-1873.

হয়, তাঁহার পদোচিত সম্মান অব্যাহত রাখিতে হইলে—তাঁহাকে সেই জাতির মধ্যে বাস করিতে হইবে, প্রজাগণ যেন সহজেই তাঁহার নিকটে যাইতে পারে। সুতরাং বাবু হরিশ্চন্দ্র ডেপুটী কমিশনারের শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যেই থাকিবেন (১)। চট্টগ্রামে তাঁহার কিছু জমিদারী আছে। ডেপুটী কমিশনার বলেন, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছেন। জাতিবিশেষের কর্ত্ত্বরূপ গুরুতর ভার হইতে কিঞ্চিদূর থাকিতে (২) তিনি (রাজনগর) ‘দেশে’ (২) থাকিতেই ইচ্ছা করেন।” তদানীন্তন লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুর কমিশনার মহোদয়ের এতাদৃশী প্রস্তাবনার আদেশ দিলেন যে†, “দেখা যায় পাহাড়ে চাক্‌মানিগের মধ্যে থাকিয়া রাজকীয় কর্ত্তব্য + Letter No. 154, dated—  
পালন হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য 21-1-1874.

হইবে। এবং তিনি কালিন্দী রাণীর জায় বাঙ্গালিগণ দ্বারা (যাহাদিগকে চাক্‌মাগণ বিন্দুমাত্র ভালবাসে না) পরিবেষ্টিত হইয়া ‘দেশে’ বাস করিতে ইচ্ছা করেন। সেই নিমিত্ত ইচ্ছা বলা যায় যে, পার্শ্বভীষণগণের মধ্যে বাস করিবার জন্য তাঁহার সহিত বন্দোবস্তির এক সর্ত্ত থাকিবে, এবং তজ্জন্ত তাঁহাকে জেল করাও হইবে।” সেই কারণে রাজধানী রাঙামাটিতে স্থানান্তরিত হয়; এবং তদবধি চাক্‌মারাজগণ এখানে স্থায়িরূপে বসবাস করিতেছেন।

(১) লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুরের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর পত্রের এইরূপ আদেশ ছিল।

(২) এই পুস্তকে চাক্‌মানিগের অন্তর্করণে ‘দেশ’ শব্দে পার্শ্বভীষণগণের বহির্ভূত চট্টগ্রামাদির সমতল দেশ (Plain) বুঝানো হইয়াছে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] আবাসস্থান, [ ২ ] লোকসংখ্যা,

[ ৩ ] বংশবিভাগ ।

[ ১ ]

পার্কত্যাচট্টগ্রামের পরিমাণকল ৫১৩৮ বর্গ মাইল। এই ক্ষুদ্র এলাকায় আসিয়াও চাক্‌মাদিগের বিস্তার-বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই। এই নিমিত্তই বোধ হয়, কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক ইহাদিগকেও স্থিতিহীন জাতি (Nomadic tribe)-ভুক্ত করিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর হইতে ইহারা পার্কত্যাচত্রিপুরায়ও

আশ্রয় গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছে। কাপ্তেন লুইনের মতে পার্কত্যাচত্রিপুরায় বিস্তার। কালিন্দীরানীর অত্যাচারই ইহাদের এদেশ পরিত্যাগের প্রধান কারণ। আবার তাঁহার পরবর্তী ডেপুটি কমিশনার

মিঃ এ. ডব্লিউ. পাউয়ার বলেন\*, “অধিক সংখ্যক চাক্‌মা ২ নম্বর সার্কেলের কেন্দ্রীভূত হইয়া বসবাস করে। তাহারা নিজের ভোগদখলেই

\* Letter No. 317, dated -  
20-4-1876.

অত্যন্ত হইয়াছে। যখন কয়ের দাবী হয়, তখনই নদীপথে পার্কত্যাচত্রিপুরায় চলিয়া যায়।” কিন্তু “রাজমালা”র দেখিতে পাই†, “চীন-লুসাই অভিবাসনকালে ‘কুলিধরার’ ভয়ে প্রায় দশ সহস্র চাক্‌মা পার্কত্যা চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরায়

† প্রথমভাগ, চতুর্থ অধ্যায়—৩১ পৃষ্ঠা।

উপনীত হইয়াছিল।” এইরূপে ‘নানামুনির নানামত’ থাকিলেও আমরা পুনরায় বলিব, জুন্দের নিমিত্ত নিত্য নূতন ভূমির প্রয়োজন হওয়াতেই তাহারা বাধ্য হইয়া এদেশে -ওদেশে ঘুরিতেছে। তথাকার ভূমির উর্বরতাও কিঞ্চিৎ অধিক থাকিবার সম্ভব। জীবিকানির্ভার অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য বুলিলে



লোক তৎপ্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মদীয় এই বাক্যের সমর্থনকরে বলিতে পারা যায়, জুমোগবাগী উৎকৃষ্ট ভূমির লোভে গত ৩৪ বৎসরে প্রায় চারি পাঁচ সহস্র পরিবার চাকমা, গভর্নমেন্টের “শান্তির” ভর উপেক্ষা করিয়া, মাইনরী রিজার্ভে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা জেল খাটিতে প্রস্তুত, তথাপি জুমের জন্ত যে উৎকৃষ্টভূমি পাইয়াছে, তাহা ছাড়িতে চাহে না। অগত্যা গভর্নমেন্টকেই বাধ্য হইয়া “রিজার্ভ” ছাড়িয়া দিতে হইতেছে! সে যাহাই হউক, বর্তমানে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরার মাত্র চাকমাদিগের বসতি আছে। কিন্তু কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামেই ইহাদের সংখ্যা অপর দুই জিলার সম্মিলিত সংখ্যার প্রায় নয়গুণ হইবে। ময়, ত্রিপুরা, মুকং, পাখোজ, বনজুগী ইত্যাদি লইয়া এই পার্বত্য চট্টগ্রামের যাবতীয় অধিবাসীসংখ্যার প্রায় তৃতীয়াংশেরও অধিক চাকমা। আর যে সকল চাকমা অত্মাপি চট্টগ্রামে আছে, বলাবাহুল্য তাহারা—জুমের প্রলোভনে পড়িয়া যাহারা অন্তত যার নাই, তাহাদেরই বংশধরমাত্র।

পার্বত্য অঞ্চলের লোকবসতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি লইয়া বিভিন্ন “আদম” (গ্রাম) গঠিত; কারণ পরস্পরের আচার ব্যবহারে এমন কি কথাবার্তার পর্য্যন্ত পার্থক্যনিবন্ধন বিশেষ অন্ত্রবিধা পাৰ্বত্য গ্রামের বটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সমাজ না থাকিলেও নয়, পরকীয়-নির্ভরতা মনুষ্যের এক বিশেষ ধর্ম। আমরা সমাজ-জীব। সমাজ না থাকিলে যেন বাঁচিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়ায়। কিন্তু জুমের লাঞ্ছনায় এই পার্বত্যরাজ্যের “আদম” গুলিতে পরিবার সংখ্যা তত অধিক থাকিতে পারে না। ৫০৬০ এর অধিক পরিবার বেষ্টিত “আদমের” সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বিগত সেন্সাসরিপোর্টে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৯৬ থানি গ্রামের মধ্যে ৫০০ শতের অনধিক লোক বিশিষ্ট ২১১, তদধিক হাজার পর্য্যন্ত লোক লইয়া ৬৬, হাজার হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত লোকের ১৮, এবং সর্বোপেক্ষা উর্ব্বসংখ্যা ২৩৭০ জন লোকবিশিষ্ট একখানিমাত্র গ্রাম আছে। “আদমের” প্রতিষ্ঠাতা বা আদমবাসীদিগের প্রধানতম ব্যক্তির নামেই “আদম” প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রথম পরিকল্পনায় দেখাইয়া আসিয়াছে, চাকমারাজা ও (রিগ্রাছ প্রেজিড) বোম্বাইরাজ্য বহুদিন হইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনও পরিচালনা করিতেছেন। অবশ্য ইংরেজাধিকারে ময়দিগের পাঠলাংছা প্রেজী হইতে উত্তরাংশের জন্য অপর

এক সরকার (chief) নিয়োজিত হন, তিনি যন্ত্রাঙ্ক (১) নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে ইহার

কেবলমাত্র বহু জাতির উপরেই কর্তৃত্ব করিতেন। প্রজা  
স্বাধীন প্রজা।

যেখানে থাকুক না কেন, স্বাভাবিক রাজার বক্তৃতা স্বীকারে  
 বাধ্য ছিল। অনন্তর যখন এই রাজাদিগের সার্কেল (Circle) নির্দিষ্ট হইবার

প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, সেই সময়ে কাপ্তেন লুইস বলেন \*—“\* \* \* সত্যবটে, সামান্য কয়েক ঘর চাকরা কেণীকুলে (প্রস্তাবিত

মণ্ড সার্কোলে) বাস করিতেছে। কিন্তু \* Letter No. 532, dated—

তাহাঙ্গিকে (চাকমাসিংগের শাসন কর্তী  
কালিন্দী) রাণীর সাক্ষেপে উত্তির বাইতে আদেশ দিতে পারা যায়।" সুভরাং

তাহাদিগকে জাতীয় শক্তির শাসনাধীনে রাখিতে মাননীয় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেরও  
প্রথম দৃষ্টি ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের

সার্কুল বিভাগ : না। সেপ্টেম্বর বঙ্গীয়গভর্ণমেন্ট চাকমা সার্কুল, বোমাং সার্কুল

এবং মণ্ড সার্কেলের সীমা (২)

নির্দ্ধারিত করেন +। তাহাতে স্থিরাঙ্কিত হয়

যে, রাজগণ স্বয়ং সার্কলের এলাকাধীন গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী ভিন্ন অপরাপর

(২) ইংরাজী Bohmong এবং Mong শব্দের অনুকরণে বোম্বাং ও মঙ, লিখিতে হইল। সাধারণে ইং হারা 'পোম্বাংরাজী' ও 'মাম্বাংরাজী' নামে প্রসিদ্ধ।

(২) বর্তমানে—

চাকমাসার্কেলের পরিমাণ ২৪২১ বর্গমাইল, উন্নয়ণে ৭৬৩ বর্গমাইল গভঃ বিজার্ত ;

বোঝা	" "	২০৬৪	" "	৬২০	" "	" "
মণ্ড	" "	৩৫৩	" "	বিজ্ঞান নাই।		

১৯০১ অব্দেব আদিসমুহ্যারী মতে অধিবাসী সংখ্যা.--

চাক্ষা সার্কেল	বোমাং সার্কেল	মণ্ড, সার্কেল
চাক্ষা	৩৬২০৭	১৯৪২
মণ্ড	৬২২৩	২১৭৭৩
জিপুরা	১৬২৭	৩২০৩
হুকি	৬৭৮	১৪৬৮
হুমি	১	—
হুলং	৩০৮	১০২৩২
পাখো ও বনজুগী	—	১৩৭
মসলমান	২০৪৬	২৭২৮

প্রজামাত্রকেই শাসন করিতে পারিবেন। সুতরাং এই অধিকারে বাস করিলে জাতিবর্ণ নির্কিংশেবে তত্ত্বং প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে (১)। ইহাতে বিজাতীয় রাজার অধীনে জাতিগত আত্যন্তরীণ বিচারাদি ভাল চলিবে না আশঙ্কা করিয়া প্রজাসাধারণ বিচলিত হইল; তাহারাই ইচ্ছামত সার্কেল হইতে সার্কেলান্তরে ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে এত বিশৃঙ্খলা ঘটতেছিল যে, ১৮৯২ সালের আইনদ্বারা গভর্ণমেন্ট উক্ত সার্কেলবিভাগ দৃঢ়তর করিবার কালে চাষাদিগের নিমিত্ত এক বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। যথা;—

“(বোড়শ)—দেশান্তর গমন ও তজ্জনিত অনুপস্থিতি এবং পলাতকগণ।

“চাষী রায়তের এক সার্কেল হইতে অন্য সার্কেলে পরিবর্তন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হইলেও তৎকর্ত্তিত অনুৎসাহ প্রদর্শিত হইবে। কোন চাষীরায়ত সে যে সার্কেল, তালুক এবং মৌজা ছাড়িতে ইচ্ছা করে, তাহার যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত দেশ পরিবর্তন করিতে পারিবেক না। চিক্, তালুকদেওয়ান ও হেডম্যান ইমুশ দেশান্তর গমনের ইচ্ছাযুক্ত দায়িক এবং তদীয় সম্পত্তি (স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ) এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তি পর্যন্ত আশঙ্ক রাধিতে পারিবার ক্ষমতাস্বামী। পলায়িত কালের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে কোনও পলাতককে পূর্বপরিভ্রান্ত সার্কেলে পুনর্বাসিত করিতে দেওয়া হইবে না।”

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, “জুম” চাক্ষুসগণের প্রধান উপজীবিকা; সুতরাং ইহাদের প্রায় অধিকাংশই জুমিয়া প্রজা। পরবর্ত্তী নিয়মে গভর্ণমেন্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জুমের উপযুক্ত ভূমির নিমিত্ত তাহারাই সার্কেলান্তরে যাইতে বাধ্য হয়। একবার কয়েক পরিবার মিলিয়া কোন নূতন স্থানে “আদম”

স্থাপন করিলে, সেখানে থাকিয়া যে কয়েক বৎসর জুমোপ-  
 জুমিয়ারের  
 স্থান পরিবর্তন। যোগী ভূমি পাইতে পারে—ততকাল বেশ স্থায়ী আবাসের  
 মত ‘মায়া-মমতা’ দেখায়; আর কাঁঠালের গাছপাধ্যস্ত

হিলু ও অপর	১৬৯২	১৭৮৩	৩৮১
মোট	৪৮৭৯২	৪৪০৭২	৩৮৯৮
অতিবর্গমাইলে	২৯.৪	৩০.৬	৪৮.৮

(১) পরন্ত ১৮৯৮ ইংরাজীর এক গভর্ণমেন্টপত্রে (No. 543 P. D.) দেখা যায়, রাণী কালিন্দীই এ সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টকে প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কেননা তিনি ১৮৬৯ অব্দে বোম্বাইরাজকে শঙ্খনদীর দক্ষিণপার্শ্ববর্তী চাক্ষুসপ্রজার উপর তাহার কোন দাবি নাই বলিয়া এক লিখিত একরার নামা প্রদান করিয়াছিলেন। নতুবা এই পত্রে সরকার পক্ষ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যাত্রা চাক্ষুসরাজই সমগ্র চাক্ষুসজাতির অধিনায়ক ছিলেন।

তুলিয়া থাকে । ৪।৫ বৎসর পরে তথা হইতে ভূমির ভূমি সংগ্রহ হুসাধা হইলে “আদম” বানী সকলের পরামর্শ ক্রমে স্থানান্তরে গিয়া অপর এক নূতন “আদম” সংস্থাপিত করে । তাহাতে মন্ত-ভেদ হইলে কোন কোন পরিবার অপর “আদমে” বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । আবার কোন নূতন পরিবার আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়া থাকে । এইরূপে একই জীবনে কত যে পরিবর্তন-রূপে সঙ্ঘ করিতে হয়, তাহা নির্ণয় নাই ।

বিষয়, বর্তমানে অনেকে লাঙলের চাষেরদিকে মনোযোগ দিয়াছে । ইহাতে, আবাস করিয়া তুলিতে পারিলে প্রতিবৎসর এক ভূমিতেই চাষ চলে । সুতরাং তদ্বারা একস্থানে স্থায়ী ভাবে থাকিবার সুবিধা পাওয়া যায় । এই কারণে সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই চাষ ধরিতেছেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্থায়ী বাড়ীও বিনির্মিত হইতেছে । তবে এখানকার জমিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই । তাই অনেকে পরিপাটী ‘বাড়ীঘর’ করিতে সাহস করে না । পক্ষান্তরে স্বাভাবিকের প্রতি মমতা না জন্মিলে স্থান পরিবর্তনের লোভও অসম্বরণীয় হয় । বস্তুতঃ ভাসমান জীবন কতই না কষ্টদায়ক !

“আদমের” পরিবারগুলি ধ্বংসস্বভাব ঘন সরিষিষ্ট । এমন কি, অধিকাংশ “আদম” দেখিতে একবাড়ী বলিয়া ভ্রম হয় । অনেক পরিবারে একাধিক গৃহ নাই । একানবর্তী পরিবারে লোকসংখ্যা অধিক হইলে আবাস প্রথা ।

মাত্র ততোধিক গৃহ প্রয়োজন হয় । কেবল ধনবান ও সমাজে সম্ভ্রান্ত মহাশয়দের “ঢেঁকীশাল” ( ঢেঁকীঘর ), “গরুর উরা” ( গোয়ালঘর ) প্রভৃতি ছ’এক খানি অতিরিক্ত গৃহ থাকে । সচরাচর প্রধান গৃহ প্রায় চারিহাত উচ্চ মঞ্চোপরি প্রস্তুত হয় । “ঢেঁকীশালা”দি অতিরিক্ত ঘরগুলি ব্যতীত আর সমস্তই একমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই সমতল মঞ্চে “ইজর” ( আলিনা ) ও গঠিত হইয়া থাকে । ‘উঠানামা’র নিমিত্ত সদর ও খিড়কির পথে দুই খানি “সাঁকো” ( ধাপ্ ) দেওয়া হয় । এই সিঁড়ি রাত্রিকালে গাছের হইলে উঠাইয়া এবং বাঁশের হইলে সরাইয়া রাখে, যেন চোর অথবা কোন হিংস্রজন্তু উঠিবার সুবিধা না পায় । এই সকল মঞ্চগৃহ দেখিতে বড়ই সুন্দর । চলাফেরা, কাজকর্ম সমস্তই যেন বিতলের উপর হইতেছে । জলভোলা এবং দৈন্যপ্রয়োজন ব্যতিরেকে বড় একটা নামিতে হয় না । সাধারণ পরিবারে এই মঞ্চের নিম্নে ঘোরগ ও শুকরের “লর” থাকে ।

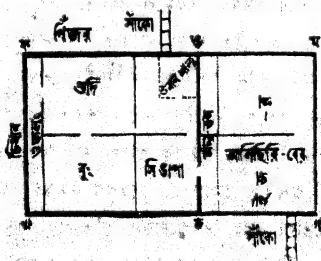
সম্ভবতঃ হিংস্রকক্ক হইতে আত্মরক্ষা করিতেই বকের ব্যবস্থা হইয়া আসিয়াছে।



মতান্তরে - ব্রহ্মদেশবাসী হইতে ভাহারা ইহা অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ হয়। কারণ, অপরাপর পার্শ্ববর্তী জাতির মধ্যেও এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পাহাড়ীদের কেহ কেহ বলে, মৃত্তিকার শয়নে অকালে চুল পাকিয়া যায়; তজ্জন্ত বাসগৃহ মঞ্চ-বিশিষ্ট হওয়াই প্রযুক্ত। ইহা অবশ্য আত্মরক্ষিক যুক্তি। জানিনা, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কতদূর কার্য্য করিতেছে। সে বাহাইউক অল্পনা সন্ধান্ত পরিবার হইতে মঞ্চ ব্যবস্থা উঠিয়া যাইতেছে, এবং তাঁহাদের গৃহগুলি ও বাঙ্গালী-বাঙালী' অনুকরণে সংস্কার লাভ করিতেছে।

ঘরগুলি প্রায়ই বাঁশদ্বারা প্রস্তুত।

অনেক সন্ধান্ত স্থায়ী অধিবাসী গাছের খুঁটি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। “কুরুক্ষপাতা,” “পিডালিপাতা,” বাঁশপাতা এবং শনের ছানিই সচরাচর প্রচলিত। বাঁশ চতুর্দিকে স্থলভ হইলেও ভদ্বারা ছানি অত্যাঁপি দেওয়া আরম্ভ হয় নাই। সাধারণ পরিবারের ঘরবাণি প্রায়শ নিম্নোক্ত নক্সায় গঠিত।—



বলাবাহুল্য এই ঘরগুলির দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থই বৃহত্তর। চিত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা যথা—

ক খ গ ঘ একই মঞ্চে নির্মিত। গ ঘ ও চ “ইজর” অর্থাৎ সমুদ্রীয় প্রাঙ্গণ, স্তম্ভরাজ ইহা সম্পূর্ণ অনাবৃত। ইহার মন্ডের বাধারীগুলিতে কিছু কিছু বাক থাকে; বাহির হইতে আসিয়া পা হুইলে তাহাতে জল পরিষ্কারের বিবরণ। পড়িতে পারে। “ইজর” ভিন্ন অপসারণের উপর অর্থাৎ ক, খ, চ, ও, একখানি দোচালা গৃহ। গৃহ-মন্ডের মঞ্চে বাগের চাঁচাড়িগুলি এমন সুন্দরভাবে পাতি হয় যে, তত্পরি গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা করে। চাল কিছু নীচ; ইজরের কতেকাংশ গৃহবহির্ভূত চালের দ্বারা রক্ষিত থাকে; সেই চাঁচড়তলাকে “চানাতল” বলা হয়। “ওজলং” বারেকা বিশেষ। তত্ত্ব সমুদ্র গৃহ চারি প্রধান কামরার বিভক্ত। “ওদি”—শয়ন কক্ষ; “বুং” বা “কুদি”—ভাণ্ডারখানা, গোলা ইত্যাদি; “সিঙাপা” অতিথি-অভ্যাগতের নিমিত্ত রক্ষিত এবং অবশিষ্ট কামরার কিয়দংশ ঘেরিয়া “উনানশাল” অর্থাৎ পাককক্ষ প্রস্তুত হয়, বাকী অংশে বসিয়া আহাৰাদি চলে। “ওদি” বা সিঙাপার মধ্যস্থলে ইবছল একটি বেদী রাখা হয়, তাহাতে শীতকালে অগ্নিরন্ধা করিয়া থাকে। “ওজলঙের” বহিঃপার্শ্বের নাম “চিখান”, এবং বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগকে “পিজর” বলে। বিবাহিতের সংখ্যা লইয়াই শয়নকক্ষ কমবেশ হয়; অবিবাহিতেরাও “সিঙাপা”র থাকে। “সাঁকো” (সিড়ি) সচরাচর একখানি গৃহের সমুখে এবং অপসারণ একখানি “উনানশালের” পার্শ্ব দিয়া থাকে। বর্তমানে কোন কোন বাড়ীতে অবরোধ-প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা হইতেছে। “ইজরের” মধ্যস্থানে বেড়া (“আলহিরিবের”) দিয়া অন্তর-মহল বিভাগ করে; একপার্শ্বে ক্ষুদ্র একখানি দ্বার থাকে মাত্র। এবং “সিঙাপা” ও “উনানশালের” মধ্যবর্তী দ্বার বন্ধ করিয়া তাহা “ইজর” ও “উনানশালের” মধ্যে খুলিয়া লয়। কিন্তু ভ্রম পরিবার ভিন্ন সাধারণ চাকরাগণ যদৃচ্ছাক্রমে এবিধ পর্দা খাটাইতে পারে না। তজ্জন্ম তাহাদিগকে রাজাহুমোদন গ্রহণ করিতে হয়।

আমদের এই ঘর ভিন্ন, কুমিরাগণ বস্ত্রপত্তর উপদ্রব হইতে কুল রক্ষা করিবার নিমিত্ত কুম্ভক্বেত্রের মধ্যস্থিত উচ্চতর শৃঙ্খলগিরি আর একখানি গৃহ প্রস্তুত করে, যেন তাহাতে থাকিয়া সমুদ্র কুম্ভক্বেত্র পর্যবেক্ষণ করা চলে। পাহাড়ের শৃঙ্খলশ্রেণী নির্মিত হয় বসিয়া চাকরাগণ ইহাকে



অনুগাত ।

চাকমা সার্কোলে জীলোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক বটে, কিন্তু বোম্বাং সার্কোলে তাহার বিপরীত । চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য জিলায় জীলোকের পরিমাণও চাকমা সার্কোলের নহিত আর সমান হইতে হইবে ।

পক্ষান্তরে ইহাদিগের মোট সংখ্যা—

১৮৭২ সালের গণনার ২৮,০০৭ ;

১৮৮১ „ „ ২২৬ ;

১৮৯১ „ „ ৪২,৪৪৬ ;

১৯০১ „ „ ৪৯,৭১৮ ।

আশ্চর্যের বিষয়, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার এই ২২৬ জন মাত্র দ্বিতীকৃত হইয়াছে । ১৮৭২ সালে ২৮,০০৭ এবং ১৮৯১ সালেও ৪২,৪৪৬ ; সুতরাং এতদূরত্বের মধ্যবর্তী সময়ে কিরূপে এত কমিয়া বাইতে পারে ? প্রত্যুত সাদ্ধ রিজলীও লিখিয়াছেন \*, “আমর সন্মারিতে

এরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে যে, তাহার কোন \* Tribes and castes of Bengal, P.—172.

কারণ দিতে পারি না ।” গণনার এত ভুল হওয়াও অসম্ভব । এইমাত্র অসুস্থমান করা যায়, গণনাকারিগণ পার্বত্যপ্রদেশের চাকমাদিগকে অপর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছেন । এক্ষণে ১৮৭২ সাল ইহাতে

১৯০১ সাল পর্য্যন্ত মূল হিসাব করিলে, এই গত ২৯ বৎসরে বৃদ্ধিরগড় ।

শতকরা বার্ষিক ২.৬৫ জন বাড়িয়াছে ; তাহাতে কিন্তু শেব দশবৎসরের বৃদ্ধির গড় বার্ষিক শতকরা ১.৭৪ জন মাত্র ।

[ ৩ ]

কোন কোন ইতিহাসলেখক বিশেষতঃ কাস্টেন লুইস এবং ভরীর অসুস্থজী পার্শ্ব রিজলী চাকমাভাষিক তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখাইয়াছেন ; যথা,—

চাকমা, টাংচিয়া এবং মৈংনাক । কিন্তু আদ্যাকানের ইতিবৃত্ত পাঠ্য-তথ্য ।

লেখক কর্ণেল ফেইরী (Thek) থেক্ অর্থাৎ চাকমা ও মৈংনাকদিগকে পরস্পর বিভিন্ন জাতি বলিয়া নির্দেশ করেন । তিনি বলেন \*, “মৈংনাকেরা ” থিঙ্-না-নাগো”

নায়ে পরিচিত হের । \* X X X সন্তবতঃ † Bengal Asiatic Society's Journal No 117, P. 1841.

তাহারা দানরূপে আগত বাদ্যাদিগের সন্তান-

সন্ততি হইবে ; কাসে—আবহাওয়ার পরিকর্তনে আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য



গিয়াছে। ইহার বোধস্বাভাবী।” কাণ্ডেন লুইন ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন \*, “আমার মূঢ় বিশ্বাস, \* ‘The Hill Tracts of Chittagong জিলি ( কর্ণেল কেইরী ) ভুল করিয়াছেন। and the Dwellers therein, P.—64-65.

দৈন্যকেরা যে চাক্‌মাগণেরই অন্যতম শাখা, তাহা সর্ববাদি-সম্মত। অত্‌য়ান ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা জানবর খাঁর শাসনকালে দৈন্যকেরা পিতৃকুল পরিত্যাগ করিয়াছে। বিবাহসম্বন্ধীয় গোলযোগই ইহার প্রধান কারণ। রাজা তাহাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত বিবাহ চালাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা পুরুষগণসম্মত প্রথার বিরোধী। একনা তাহারা অস্বীকৃত হয় এবং পলায়ন করে। যাহা হউক, এক্ষণে দৈন্যকেরা ক্রমে ক্রমে ভূতপূর্ব স্বজাতীয়দিগের সন্নিহিত হইতেছে। কক্সবাজারের পাহাড়ে কয়েক পরিবারের বাস দেখা যায়। তাহারা এখনও পূর্বস্থিতি রক্ষা করিতেছে। তাহারা বলিয়া থাকে,—তাহাদের পুরুষপুরুষগণ কর্ণফুলী-তীরে বাস করিত। যদিও দীর্ঘকাল আরাকান-বাস-নিবন্ধন তাহারা তত্রত্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে বিকৃত বাঙ্গলাশব্দও অনেক আছে।” বঙ্গোত্তরাংশ, সারি রিজুলীও স্বত্বল্লে ইহার অত্মসরণ করিয়াছেন (১)।

সত্যকথা বলিতে কি, ইহার সকলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দৈন্যকেরা চাক্‌মা-জাতির শাখাবিশেষ, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু তাহাদের এই বিভিন্নতা ঐতিহাসিক-ভ্রম।

যাইতেছে, ইহার মূল ভ্রমহেতু। “দেঙ্গাওরা-আব্দেঙ্গুং” অর্থাৎ ‘আরাকান-কাহিনী’ হইতে পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, খৃষ্টীয় ১৬০০-০৫ বনে আরাকানাদেশের মেলদির প্রধান মন্ত্রী উচ্চত্বশ্চের মইচাগিরিতে চাক্‌মারাজাকে পরাসিত করিয়া, ১০০০০ চাক্‌মা-প্রজার সহিত তাঁহাকে লপরিবারে বন্দী করিয়া আনেন। এই প্রজাগণকে আরাকানের অস্তঃপাতী ‘এংখ্যং’ এবং ‘ইংখ্যং’ নামক স্থানদ্বয়ে বসতি করিতে দেওয়া হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্বতন উপাধিও ধর্ম্মবর্ত্তিত করিয়া “দৈন্যক” আখ্যা দিয়াছিলেন। কর্ণেল কেইরী কেন ইহা জানিতে পারিলেন না, বুঝিলেন না। পক্ষান্তরে কাণ্ডেন লুইন কিরূপে দৈন্যক ও টংচ্যাংদিগকে বিভিন্ন দেখাইতেছেন, তাহারা বিস্মিত

হইতেছি! অনেক প্রাচীন চাক্ষুশকেও বিভ্রান্ত করিয়া দেখিয়াছি, 'বৈশ্বাক' শব্দটীও তাহাদের অজ্ঞত। পরন্তু যদেরা টংচল্যাদিগকেই 'বৈশ্বাক' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই হই নামের জাতি নিশ্চিতই অস্তিত্ব। কাপ্তেন লুইন বৈশ্বাকদিগের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, কলকাতার নিকটবর্তী পাহাড়-বাসী ছাক্- (Tsac—Burm.) দিগের প্রতিই হাক্-সম্প্রদায়। লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাদের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ চাক্ষুশ-সদৃশ্য আছে, কিন্তু কথাবার্তার মনোভাষা বর্ণে, এবং আচারমতে বৈলক্ষণ্যও বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। মামতভরী না হইলে ইহারা বিবাহ করিতে পারে না; সেই কারণে অবিবাহিত জী-পুরুষের সংখ্যা অত্যধিক। বিবাহের পণ্যস্বরূপ কঙ্কাকর্জকে সহস্রাধিক ডিম দিতে হয়। ইত্যাদি—

অনন্তর কাপ্তেন লুইন টংচল্যাদিগের অপর কাহিনী বলিয়াছেন\*, "১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ধর্মমন্ডল খাঁ \* The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein, P.—64-66. রাজস্বকালে ৪০০০ টংচল্যা চট্টগ্রামের পার্বত্য গংগ and the Dwellers therein, P.—64-66. প্রদেশে আনিয়াছিল, তাহারা কাপ্তেনের

তাহাদের অন্ততমকে দলপতি মনোনীত করিতে চাহে; কিন্তু রাজা ধর্মমন্ডল খাঁ ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ার অধিকাংশ আরাবানে টংচল্যা-কাহিনী। প্রত্যাবর্তন করে। বর্তমানে (১৮৬৯ খৃঃ অব্দে—এখানে) ইহাদিগের সংখ্যা ২৫০০। প্রাচীনেরা আরাবানী ভাষার আলাপাদি করে; পরবর্তী পুরুষ অন্যদের (অর্থাৎ চাক্ষুশদিগের) অধিকরণে বিকৃত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া থাকে।" ইহার সহিত আমাদের মত সম্পূর্ণ এক নহে; বাহা কিছু সামান্য আপত্তি, সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা

রহিল। অপর একজন লেখক (১) বলেন †, "পার্বত্যচট্টগ্রাম ও চাক্ষুশভাষা"—  
† "অস্ত্রলী", ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১১৫ পৃঃ।  
"পিতার ভৃত্যসংবাদ শ্রবণের পর বিজয়গিরি)"

আর যদ্যে না হইয়া লক্ষ্যভাবে আরাবানরাজের সহিত আরাবানেই অবস্থান করেন। এই সবই তংচল্যাগণ অর্থাৎ আরাবানের পাহাড়ী জাতির অপর এক সম্প্রদায় তাহাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া চাক্ষুশ অধিকরণে কথাবার্তা

(১) বর্তমান জাতিতে পারিয়াছি, ইনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সুন্দরবনের প্রবীণ ভেড়ুজী-ইন্সপেক্টর জীবক পদ্মনাথ বর্দুয়া।

কহিতে শিবিলেও, চাক্‌মাগণ উহাদিগকে আপন সমাজভুক্ত করিয়া নয় নাই; এমন কি, বিবাহাদি কার্যে কোনরূপে উহাদের সহিত সঙ্গ হইয়া নাই। চাক্‌মাগণ সাধারণতঃ উহাদিগকে একটুকু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। প্রবন্ধলেখক ‘আরাকানের পাহাড়ী—তংচলীয়াদিগের’ আর কোন পূর্ব বিবরণ দেখাইয়া যান নাই। কিঞ্চিৎ অসুধাবন করিলেই মনে হয়, তাহার এ ধারণা—‘দেয়্যাওয়াদি-আয়েসকু’ এর বর্ণনার সামান্ত রূপান্তর মাত্র। ‘এংখ্যং’ ও ‘ইয়ংখ্যং’ বাসী দৈন্যাকেরাই ‘আরাকানের পাহাড়ী—তংচলীয়া’ হইবে। অতএব এক্ষণে আমরা আরও দৃঢ়তার সহিত দৈন্যাক এবং তংচলীয়াদিগকে এক অভিন্ন জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

যাহা হউক আলোচিত মূল চাক্‌মাদিগের বিবরণী-বিশ্লেষণই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সকল শাখার সহিত উহাদের সামাজিক কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদিগের কথা লইয়া অবধা করয়ক্কেপ “গোষ্ঠী” ও “গোছা”। নিম্নরোজন। বর্তমানে চাক্‌মাগণ বহুবিধ “গোষ্ঠীতে” (বংশে) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার নানা “গোষ্ঠী” হইতে কতিপয় পরিবার লইয়া ভিন্ন ভিন্ন “গোছা” (১) গঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন “গোষ্ঠীর” যে কয় পরিবার এক স্থানে বাস করে, তাহার অধ্যুষিত স্থান, সন্নিহিতা নদী, বা দলের প্রধান ব্যক্তির নাম কি তদীয় পৌরুষ-প্রসিক্ষিত “গোছার” আখ্যাত ও পরিচিত হয়। অদ্যাপি অপরিচিত চাক্‌মাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে,—“তুমি কার গোছা” অর্থাৎ কোন্ গোছা-ভুক্ত? উত্তরে যে গোছার নাম করে, তদ্বারা জানিতে পারা যায়—তাহারা কোন প্রসিদ্ধ দলপতির ক্রমতাধীন! এমন কি, বাড়ী কোথায়,—তাহারও অনেকটা ধারণা ইহাতে জন্মে। কালক্রমে এক গোষ্ঠীর লোক নানা গোছার অধিকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং “গোষ্ঠী” পরিচয়ে “গোছার” শুধু জামিবার সুবিধা এক্ষণে নাই। এক “গোছার” কোনও “গোষ্ঠী”-সম্বৃত কেহ যদি অপর “গোছার” অধীনে গিয়া বাস করে, কিছু কাল পরে যখন পূর্ববর্তী “গোছার”

(১) সংস্কৃত ওহ পদ হইতে বাঙ্গালার গোছা শব্দ উৎপন্ন। চাক্‌মাদিগের এই “গোছা” অর্থাতঃ সমস্ত শব্দ-সম্বন্ধ। কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ এত বিকৃত যে, “গোছা” বলিতে “গোবা” এবং “গোষ্ঠী” বলিতে “গুড়ি” ওয়ার।

সহিত তাহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক চলিয়া যায়, তখন হইতে তাহাকে শেষাবস্থায় “গোছার” অভিহিত করা হয়। কিন্তু পুরুষের “গোষ্ঠী” কোন রূপেই পরিবর্তিত হয় না; বিবাহে স্ত্রীলোকের অবস্থা গোষ্ঠীভুক্ত ঘটে। যদি কোন বিধবা শিশু সন্তান লইয়া ভিন্ন গোছা ও ভিন্ন গোষ্ঠীতে পুনঃ পরিণীতা হয়, তখন হইলে সেই মহিলার “গোষ্ঠী” ও “গোছা” পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু পূর্বস্বামীজ শিশুর পিতৃ-গোষ্ঠী অক্ষুণ্ণ থাকিলে। তাহার। যতদিন ব্যবহৃত মাতার “গোছার” তত্ত্বাবধানের মধ্যে, ততদিন তাহাদের “গোছার” পরিচিত হয়; অনন্তর স্বাধীন ভাবে অন্য “গোছা” অবলম্বন করিলে তাহা পরিবর্তিত হইয়া যায়। এক কথা—শিশুকুল লইয়া “গোষ্ঠী” এবং বাসস্থান-ভেদে “গোছা” আখ্যাত হইয়া থাকে। অধুনা মোজা-বিভাগ হইয়া বংশমর্যাদা-নির্বিশেষে যোগ্যতা বিবেচনায় ‘হেডম্যান’ (Headman) নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হওয়াতে গোছা-বিচারে ক্রমেই অসুবিধা ঘটতেছে। কালে বোধ হয় “গোছা” আখ্যাই বিলুপ্ত হইবে।

চাক্ৰাদিপের বংশ বিভাগে তিব্বতীয় এবং বার্জিলিওর শিশুমিগের সহিত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে (১)। নাশগুলিতে পূর্বপুরুষের আশ্চর্য্য সাহসিকতা এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকটিত হয়। কোন “গোষ্ঠীর” পূর্ব অপূর্ব আখ্যা। পুরুষের কাহারও উপবেশনে ‘পিড়া’ জ্বলিয়াছিল, একজন তবীয় বংশধরেরা “পিড়াভাঙা গোষ্ঠী” নামে পরিচিত। সেইরূপ জনৈক কুড়ে ব্যক্তির “গোষ্ঠী” “কুর্বা” (২) বিশেষণে আখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ ‘কুত’, ‘কাঁকড়া’ ‘রগলাগলা’ ইত্যাদি নানান “গোষ্ঠী” আছে। অবশ্য বংশের প্রধান ব্যক্তিরই বিশেষত্ব লইয়া ‘গোষ্ঠীর’ বিশেষণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। “গোছার” আখ্যাও দলপতির গৌরব প্রকাশক, বা-আবাসস্থানের (৩), কি সম্মিহিতা নদীর নামসম্বন্ধ হয়।

ধুঁড়্যা, কুর্যা, ধাবানা, পিড়াভাঙা ইত্যাদি নেতৃচতুষ্টয়ের নামানুসারেই সর্ব প্রথমে চারিটা গোষ্ঠী গঠিত হয়। এই চারি গোষ্ঠী লইয়াই বংশ বিভাগ আরম্ভ

(১) Vide—Tribes and castes of Bengal, P. 59.

(২) ইহারা এবং চট্টগ্রামেরও কোন কোন স্থানের লোকেরা কুড়ে অর্থাৎ অলসকে কুর্যা বলিয়া থাকে।

(৩) অবশিষ্টের মধ্যেও বসতি স্থানে ইত্যাদির বংশের আখ্যা হয়।

হইয়াছিল। ক্রমে তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তৃত—অতিবিস্তৃত হইয়া স্বাধীন

বংশ বিভাগ। তবে স্ব স্ব নামানুসারে গোষ্ঠীর নাম প্রচার করে। স্থল-

বিশেষ বা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লইয়া রহস্য করিতে করিতেও তৎবংশধরেরা সেই কৌতুক-গর্ভ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। যেমন,—কেহ খুব বেশী কলা খাইত, তাহার বংশীয়েরা “কলা গোষ্ঠী”, এক পরিবারে সাত মহোদর ছিল, তাহাদিগের বংশধরেরা “সাত ভাইয়া গোষ্ঠী” প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র চাকমা সমাজ কত যে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে নির্ণয় করা দুঃস্বপ্ন। আমি বহুল চেষ্টার এ যাবৎ ১৩৩ ত্রয়োত্রিংশত্যাধিক শত সংখ্যক গোষ্ঠীর সন্ধান পাইয়াছি। যথা—ধূর্য্যা, নিনাক্যা, কাঠোয়া, রামনালিকা, মুলিখাজা, ভেলে, কান্তুরা, বোয়া, নাহুকতুয়া, শোয়াকামাধ্যা, কোমরেং, জান্দর, গুইয়া, তুলা, ধাবানা, মিঠা, নোয়ানা, কার্কুরা, সিংহাসর্প, আনক্যা, কলা রাঙাছিলন্যা, বান্দালী, সেবাধ্যা, স্কুরা, মানিয়া, চাদং, করম্যা, সল্যা, পঁচা, ইচাপঁচা, দ্বাংথং, বাননচেগে, কাঁকড়া, শেঠা, পুংঝা, চগড়া, মুখচোরা, পিড়াভাঙ্গা, কুঁয়া, বালকা, বরৈবেচা, কলাচেম, কাঙ, তিনভেদা, বড়কুঁয়া, ছোটকুঁয়া, চায়া, বঁগা, ভবা, তদেগা, সামঝা, সাতভাইয়া, সুরেখরী, পেডংছারী, নেকাব, তেতৈরা, আউনাপুনা, কাউয়া, তদং, ভূত, কাক্দড়া, অমরী, ভিক্দিলা, ওয়াংঝা, গজাল, লৌহঝাওরা, নাদকতুল, হাগরা, ভেঙেয়া, বৃংচেগে, মেস্তর, লুলাং, ভূকমা, চেগে, বহলা, বান্যাব, ঝব, গোদা, সিঙিরাপুনা, চৈলানী, চাটৈ, দোজা, কপাল্যা, সম, সর্দার, কাঙনিকাল, বেংকাবা, করল, কাশমাশিক, হাতীপুংঝা, ইন্দুরভালা, কালাপিলাবাপ, ভুলা, কালাবাঝা, পিঙরভাঙা, কাল, শেয়া, রসিরী, বাবুয়া, গজাল্যা, মানাইয়া, লে হাকদা, বাখওঝা, কয়েংগিরি, ভগতপ, সেবেরা, নারাপ, ধেচোয়া, আমু, শিকা, রাক্কোয়াবাপ, আঙগিকণা, রণপাগলা, কাকিনা, কাটোয়া, জাদি, পার্কোয়া, বরৈয়া, সরইয়া, জাল্যা, শেলছা, শেলপাতা, চান্তন্যা, পৈয়ব, মুলিয়া, তালুকদার, খাটাল, চেলীপুনা, মেন্দর, চর্কড়া, বৈষচরা, কালা-পেনজাঙি ইত্যাদি। এরূপ গোষ্ঠী আরও বে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, থাকিলেও তৎপরিমাণ আভি-সাময়িক হইবে।

ধূর্য্যা, কুঁয়াদি নেতৃগণ তাহাদিগের উপর প্রভুত করিত, তাহারাও চারি হলে বা “সোছার” বিভিন্ন ছিল, এবং তৎসমূহের “সোছা”ও অসংখ্যক হানের নাম,

বা অধিনায়কের নাম কি বিশেষই অথবা দলের কোন বিশেষ কার্যানুসারে নানাবিধ আখ্যায় প্রসিক্তি লাভ করিয়াছিল। পুর্য্যার বর্ণ উজ্জ্বল এবং গলা ও পা লম্বা ছিল বলিয়া, তাহার অধীন লোকদিগকে অপরেরা “বগা (বক) গোছা”র লোক বলিত। কুর্য্যার দল তৈনছরীতীরে বাস করিত বলিয়া, তাহার “তৈগা গোছা” নামে অভিহিত হয়। ধাবানার গোছার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তাহার মুড়িনদীর তীরে বাস করিত বলিয়া “মুনিমা গোছা” নাম হইয়াছে; অপর কাহারও মতে ধাবানা অতি পবিত্রাচারী ছিলেন,—তজ্জন্ত তাঁহার দলের আখ্যা “মুনিমা গোছা” দেওয়া হইয়াছিল। পিড়াভাণ্ডার দলের যাহারা নদীপথে লামিয়া গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহার “লাম্মা গোছা” নামে অভিহিত; আর যাহারা ধাইয়া অর্থাৎ পলাইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের আখ্যা—“ধামাই গোছা” হয়। এইরূপে প্রাচীন চারিগোছা হইতে ক্রমে শাখা প্রশাখায় বদ্ধিত হইয়া বর্তমানে একত্রিশ গোছা পর্য্যন্ত হইয়াছে। এস্থলে তত্তৎ গোছা ও গোষ্ঠী-গুলি লইয়া ইহাদের সমাজের আধুনিক অবস্থা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল।—

গোছার নাম ও যথাস্থত তত্তৎপত্তি বিবরণ।	প্রত্যেক গোছাভূক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম।	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম।
১। বগা গোছা— এই গোছার সর্দারের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, এবং পা ও গলা লম্বা ছিল। তজ্জন্ত তাঁহাকে সকলে “বগা” (বক) নামে ডাকিত।	পুর্য্যা, নিনান্দা, কাঠোয়া, রাম- দালিকা, মুলিখাজা, ভেলে, কাতুয়া, বোয়া, নামুকতুয়া, পোয়াকামাখ্যা ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত হর্য্যচন্দ্র তালুকদার।
(ক) দার্য্যা গোছা— এই গোছার সর্দার মাখায় ভীম- রাজের পালক গুজিত বলিয়া।	কোমরেং, নামুক- তুয়া, কাতুয়া। ইত্যাদি।	,, নবীনচন্দ্র তালুকদার।
(খ) পোমা গোছা—	জান্দর, গুইয়া, তুদা ইত্যাদি।	,, রাজকুমার তালুকদার।

গোছার নাম ও যথাক্রমে তত্ত্বপত্তি বিবরণ।	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম।	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম।
(গ) পোয়া গোছা— এক সময়ে কোন গ্রামের বয়োবৃদ্ধ- গণ জুম কাটিতে গিয়াছিল; বাড়ীতে শিশুসন্তানেরা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। এমন সময়ে কুকিরা আসিয়া সেই গ্রাম আক্রমণ করে। শিশুগণ একমাত্র “কামঠা গুলি”র সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া, অপূর্ণ বীরত্ব পূর্ণ সেই বালকগণের বংশধরেরা বালক অর্থাৎ “পোয়া” গোছা নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ ধরমবজ্র খাঁর সময় এই গোছার তালুকদার অল্প বয়স্ক ছিল বলিয়া, মহারাজ এই গোছার লোককে পরিহাস পূর্বক ‘পোয়া গোছা’র লোক বলিতেন, সেই হইতে এই আখ্যা।	কাকিনা, ফাটোয়া, কয়লু ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত নীলরথ তালুকদার।
(ঘ) চেক্‌কবা গোছা—		“ বিজয়গিরি তালুকদার।
(ঙ) লচ্চর গোছা—	ভিদ্দিলী, ওয়াংকা, গজাল, পিড়াভাড়া ইত্যাদি।	“ পঞ্চারাম তালুকদার।
২। তৈয়া গোছা— তৈনছরীর তীরে বসবাস হইতে।	কুর্খ্যা, পুর্খ্যা, মুলিয়া, পৈয়ব ইত্যাদি।	“ কৈলাসধন তালুকদার।
(ক) ওয়াংকা গোছা— ‘ওয়াংকা বিল’বাদীদিগের আখ্যা।	কাঁকড়া, শেঠ্যা, পুংকা ইত্যাদি।	“ রাজা ভুবনমোহন রায়।
(ক-১) ফেহুংজা গোছা—	মুলিয়া, কপালা, পুংকা, কাশমাণিক, ইন্দুরতালা, কালা- পিলাবাপ ইত্যাদি।	“ পূর্ণচন্দ্র দেওয়ান।
(খ) বড়চেগে গোছা—	খাট্যাল, লোহা- কদা, চেলীপুনা, ইন্দুরতালা, পুংকা ইত্যাদি।	“ চন্দ্রধন তালুকদার।

গোছার নাম ও যথাশ্রুত তদ্বৎপত্তি বিবরণ ।	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম ।
(গ) কান্তেই গোছা—	মেন্দর, কালা- পেনজাঙি ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র তালুকদার ।
(ঘ) বুংছা গোছা—	কাঁকড়া, মৈষচরা, চর্কড়া ইত্যাদি ।	„ পুরখী দেওয়ান
৩। মুনিমা গোছা— মুড়ি নদীর নামানুসারে ষা পমিত্রা- চারী বলিয়া ।	ধাবানা, মিঠা, নোয়াত্তা, কার্কায়া, সিংহাসর্প, আনন্দ্যা, কলা, রাঙাছিলত্তা, বাদালী, সেবার্যা, সকুয়া, মানিয়া, চাদং, করুয়া, সল্যা, পঁচা, ইচা- পঁচা, ক্ষাংথং, বামনচেগে ইত্যাদি	„ রাজচন্দ্র দেওয়ান
(ক) মুনিমাচেগে গোছা—	সকুয়া, শেলপাত্যা, শেলছ্যা ইত্যাদি ।	„ কিনাধন তালুকদার ।
(খ) ফাক্সা গোছা—	বালকা, বরৈবেচা, কলাচেম, কাঙ, তিনভেদা, বড়- কুয়া, ছোটকুয়া ইত্যাদি ।	„ রমণীমোহন দেওয়ান ।
(গ) আমু গোছা— সল্যা আমুর নামানুসারে ।	গোদা, ধুয়া, মঘ, সিঙিরাপুনা ইত্যাদি	„ মানিকচন্দ্র তালুকদার ।
(ঘ) চেগে গোছা— হুংখ্যা চেগের নামানুসারে ।	লুলাং, ভুরুমা, কাঁকাড়া, ধাবানা, বহলা, বাত্খাব, পিড়াভাঙা, মঘ ইত্যাদি ।	„ হুয়ামগি খিসা ।
(ঙ) থেয়ংচেগে গোছা—	চৈদানী, চানৈ, দোজা, কপালা- সম, সর্দার, কাণ্ডনি- কাল, বেংকাবা ইত্যাদি ।	„ নীলচন্দ্র দেওয়ান ।



গোছার নাম ও যথাক্রমে তৎপত্তি বিবরণ।	প্রত্যেক গোছাভূক্ত গোষ্ঠীগুলির নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম।
(চ) লেবা গোছা— উচ্চারণে জড়তা-নিবন্ধন এই দলের প্রধান ব্যক্তির আখ্যা 'লেবা' দেওয়া হইয়াছিল।		শ্রীযুক্ত ভাগ্যধন তালুকদার।
(ছ) উচ্ছুরী গোছা—		„ শশিকুমার দেওয়ান।
(জ) নারাগ বা কুরাকুট্যা গোছা— ইহাদের উপর রাজ্যে মোরগ কুটির ভার ছিল বলিয়া শেলোক্ত আখ্যা হইয়াছিল। পরে ইহার পার্কীত্যা ত্রিপুরায় পলাইয়া গিয়া তত্রতা মহারাজ কর্তৃক 'নারাগ' খ্যাতিলাভ করিয়াছে।	নেন্দাব, সুরেশ্বরী, তেতৈয়া, আউনা- পুনা, পঁচা, কাউয়া, ভদং, ভূত, কাক- দড়া, অমরী ইত্যাদি।	„ গঙ্গামাণিক দেওয়ান।
(ঝ) বোম গোছা—	আমু, পার্কোয়া, জাদি, সরইয়া, বরৈয়া, বাদালী, পিড়াভাঙা ইত্যাদি	„ অভয়াচরণ তালুকদার।
(ঝ-১) রাঙী গোছা— রাঙী পানসরী নামক ব্যক্তির নামানুসারে।	লৌহ কাভোয়া, ভেঙেয়া, বুংচেগে, কাল, পিড়াভাঙা, মেন্দর, চেগে ইত্যাদি।	„ কর্ণচন্দ্র তালুকদার।
(ঝ-২) কুদুগা গোছা—	ভুলা, কালাবাধা, কাল, পিঙরভাঙা, ইত্যাদি।	„ হরিধন দেওয়ান।
৪ (ক) লাম্বা গোছা— লাম্বা গিয়াছিল বলিয়া।	পিড়াভাঙা, চায়া, বগা, ভবা, তদেগা, সামঝা, সাত- ভাইয়া ইত্যাদি।	„ যুবরাজ দেওয়ান।
(ক-১) পেডংহারী গোছা—	পেডং ছারী, কুর্খা, মুলিয়া, পৈয়ব ইত্যাদি।	„ কিনারাম তালুকদার।

গোছার নাম ও যথাক্রম তত্ত্বপত্তি বিবরণ ।	প্রত্যেক গোছাভুক্ত গোষ্ঠীগুণের নাম	প্রত্যেক গোছার প্রধান ব্যক্তির নাম ।
(ক-২) হাইয় গোছা—	কুর্যা, ধুর্যা, মুলিয়া, পৈয়ব, জাল্যা, সল্যা, পিড়াভাঙা, তালুক- দার ইত্যাদি ।	শ্রীযুক্ত নীলধন তালুকদার ।
(খ) ধামাই গোছা— ধাইয়া অর্থাৎ পলাইয়া গিয়া ছিল বলিয়া ।	চাভন্যা, স্কুয়া, হাগরা, হাতী, পিড়াভাঙা, সুরে- খরী, বাঘওঝা, করেংগিরি, আঙ- নিকণা, রাক- কোয়াবাপ, নাদক- তুল, কাকড়া ইত্যাদি ।	,, কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ।
(খ-১) চাঁদগ গোছা—	সর্দার, শেষা, রসিরী ইত্যাদি ।	,, নীলকান্ত দেওয়ান ।
(খ-২) বাবুরা গোছা—	বাবুরা, গজাল্যা, মানাইয়া, লোহা- কদা, ভগতপ ইত্যাদি ।	,, অক্ষয়মণি তালুকদার ।
বড়ুয়া গোছা*— পূর্বে বাঙ্গালী বড়ুয়াগণ রাজা- লয়ের ভূতাকর্ষ করিত। ইহাতে অনুবিধা ঘটতেছে দেখিয়া, পাগলা রাজার সময়ে দেওয়ান-তালুকদারেরা পরামর্শ করতঃ তৎক্ষণ্য বিভিন্ন গোছা হইতে প্রায় দেড়শত প্রজা দিয়া এই গোছা সৃষ্টি করত। ক্রমে ইহাদিগের বংশ বর্দ্ধিত হইয়া অধুনা প্রায় সহস্র পরিবার হইয়াছে। বড়ুয়াদের কাব্য করিত বলিয়া, ইহাদের আখ্যাও 'বড়ুয়া গোছা' হইয়াছে ।	প্রায় সকল গোষ্ঠীর লোকই এই গোছায় আছে ।	,, ভৈরব চন্দ্র দেওয়ান ।

\* এই গোছা রাজপাড়ালিয়া নামেও প্রসিদ্ধ। ইহারা পূর্বকালে রাজার সিপাহী  
শাস্ত্রীর কার্যও করিত; ইত্যাদি ভাষ্য কব্দের জন্ত জরুর হইতে মুক্ত ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের

ধূঁয়া, কুঁয়া, ধাবানা, গিড়াভাও “গোষ্ঠীর” সম্মান অত্যাধিক অক্ষুন্ন রহিয়াছে। “মুনিমা-গোছার” “ধাবানা-গোষ্ঠী” বহুকাল যাবৎ রাজবংশ-গৌরব ভোগ করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষরাজা ধরমবক্স খাঁর কোন সুসন্তান না থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মহিষী কালিন্দী রাণীর হস্তে শাসনভার আইসে; তিনিও পরলোক গমন করিলে দৌহিত্র—“ওয়াংকা-গোছার” “কাকড়া-গোষ্ঠী” জ হরিশ্চন্দ্র রায় সিংহাসন লাভ করেন। সেই হইতে এই “কাকড়া-গোষ্ঠী”ই রাজবংশ হইয়াছে। “কুরাকুট্যা-গোছার” “নেন্দাব গোষ্ঠী”র সঙ্গেই রাজপরিবারের বিবাহ-সম্বন্ধ সমধিক প্রচলিত। ভূতপূর্ব রাজা ধরমবক্স খাঁর তিন বিবাহ এবং বর্তমান রাজা বাহাদুরের উভয় বিবাহ এই বংশের সহিত হইয়াছে। বর্তমানে মুনিমা, ধামাই, ওয়াংকা, তৈজা, বগা, কুরাকুট্যা ও লাক্ষ্মী গোছা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হয়। কোন্ নিগূঢ় কারণে জানিনা, “ধামাই-গোছা” এবং “কুরাকুট্যা-গোছা”র মধ্যে চিরবৈরিতা চলিয়া আসিতেছে। মেলা-মজলিসে এই দুই দলের সাক্ষাৎ ঘটলেই সংঘর্ষে অবশ্যম্ভাবী; নিতান্ত কারণ না পাইলে ‘গায়ে পড়িয়া ঝগড়া’ লাগিয়া যায়! ইহাতে একদল অত্যদলের যথাসাধ্য অনিষ্ট করিতেও ছাড়ে না। ১৩১১ সনের (রাজানগরের) ‘মহামুনি মেলায়’ আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি, একদিনের মধ্যেই ৮ বার মারামারি লাগিয়াছিল! কারণ খুজিয়া পাইলাম, একদল যথানিয়মে দক্ষিণ হইতে বাম-অভিমুখী মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে ছিল, বিক্রমপক্ষ তদ্বিপরীত দিগাভিমুখে প্রদক্ষিণের চেষ্টা করিয়া সংঘর্ষে ঘটাইয়াছে। এবম্বিধ কলহকালে “ধামাই-গোছা”র সহিত “বড়ুয়া-গোছা”ও যোগদান করে, কিন্তু তথাপি “কুরাকুট্যা-গোছা”র পরাজয় কম হয়।

---

রাজত্বের প্রথমাংশেও ইহাদিগকে কোমর দিতে হইত না; পালাক্রমে রাজ-বাড়ীতে পাহাড়া দিত, ও অপরাপর কর্ত্ত করিত। অনন্তর একদা তাহারা দেওয়ান ভৈরব চন্দ্রের প্ররোচনায় একটী শিকারলক বড় হরিণের রাজ-প্রাঙ্গাণ দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, রাজা বাহাদুর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের উপর করদায়া করেন। তদবধি অপরাপর রায়তের দ্বায় ইচ্ছাও জন্মদিলে খাজানা দিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে রাজার খাস মোজাওঁই রাখা হইয়াছে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] রাজাবলী

এবং

তঁাহাদের কার্য্যালোচনা ;

[ ২ ] রাণী ও কুমার জীবনী ।

[ ১ ]

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বিজয়গিরি, ছিরীতমা ছাক্, ইয়াংজ, চজুং, মংছুই, মরেকাজ, চমুই ( কোংলাফ্র ) প্রভৃতি কতিপয় চাক্‌মা রাজার শাসন বিবরণী দেখাইয়াছি। তঁাহাদের মধ্যে মধ্যে আর ও যে কত রাজা নথর প্রভুত্ব পরিচালনা করিয়া অতীত গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, জানিবার উপায়

নাই ! ততোধিক আক্ষেপের বিষয়, বর্তমানের অনতিদূরবর্তী ইতিহাসের দুর্গতি। শতাধিক বৎসরের চাক্‌মারাজগণ সংক্রান্ত কোন সংবাদ

পাইতেছি না । “দেঙ্গাওয়াদি-আরেদকু” ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত খোঁজ-খবর রাখিয়াছে। তাহার পর আরও প্রায় ৬৫ বৎসরকাল ধরিয়া আরাকানাধিপতি চট্টগ্রাম শাসন করেন ; কিন্তু ‘আরাকানের রাজ-মালা’য়ত দানীন্তন কোন বিবরণীতেই চাক্‌মারাজ্য সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই (১)। অনন্তর চট্টগ্রামে মোগলদিগের শেষ প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়।

(১) অস্ত্র আছে,—বাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র হুজা বংকালে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ত্রিপুরেশ্বর কলাগ মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র নক্কত্র রায় ( রাজ্য পাইয়া নাম ধরিয়াছিলেন—ছত্র মাণিক্য ) সিংহাসনারূঢ় জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন ( ১৬৫৯ খৃঃ অব্দ )। গোবিন্দ মাণিক্য ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অদ্যাপি কাচালঙের মাইয়নী সরিষীতে এই ত্রিপুরা-রাজার সর্বোত্তর, সুকল-বৃক্ষ, অটালিকার ভগ্নাবশেষ চিহ্ন রহিয়াছে ( The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein—P. 6 )। এতদ্বিরূপ কাম্যার যুগের নিকটে,

তাঁহাদের কোন কাগজ পত্রেও ইঁহাদের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। পরন্তু ইংরাজ-রাজের “রেভেনিউ বোর্ড” ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগের

কমিশনার বাহাদুরের নিকট ১৪৯৯ নম্বর পত্রে বোর্ডের পত্র (কিয়ৎশ)। লিখিয়াছেন;—“The Rajahs of the Chitta-

gong hills were originally appointed by the suffrages of the Joomiahs, Kookees, and other inhabitants and not by the sovereign of the country as usual. They were all independent, paid no tribute or revenue to the Mogul Govt. until the Muggy year 1077 M. S. 1715 A. D.”

ইহার অর্থ:—“পূর্বে পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়া, কুর্কি এবং অপরাপর অধিবাসীদিগের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইতেন; সাধারণতঃ যেইরূপ “দেশের” ভূপতি (১) কর্তৃক হইয়া থাকে, এখানে সেরূপ নহে। তাঁহারা সকলেই স্বাধীন ছিলেন; ১০৭৭ মঘী—১৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগল গভর্ণমেন্টকে রাজস্ব বা খাজনা দেন নাই।” সুতরাং মোগলাধিকারের এই কয়েক বৎসর যে

যে চাক্‌মা রাজা স্বাধীন ছিলেন, তাহার বিশেষ চাক্‌মারাজার স্বাধীনতা। প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু কোন সময়ে কি স্বযোগে

যে তিনি বা তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না।” অনুমানে বোধ হয়, মঘ রাজার প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা যে মুকুট রায় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ মসহোদীর আক্রমণে ভীত হইয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন, তাঁহারই দুর্বল-শাসনে চাক্‌মারাজা স্বাধীনতা হস্তগত করিয়াছিলেন। আরাকানরাজ পুনরায় চট্টগ্রাম অধিকার করেন বটে, কিন্তু দুর্বল মোগলের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে, এই পার্শ্বত্যা রাজ্যের প্রতি তাদৃশী দৃষ্টি নাও রাখিতে পারেন। কেননা দেখা যায়, অতঃপর অল্পতম শত্রু ত্রিপুরারাজ বিপ্লবাবিভূত হইলেও তিনি নীরব ছিলেন।

কাচালঙের মোহনা সমীপে, ও চেঙ্গীর ইটছরীতে ইষ্টকম্পের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। যতদূর সম্ভব এসকল স্থানে মঘদিগের “জাদি” কিংবা ত্রিপুরাদের দেবমন্দির ছিল। অনেকে এ সমুদয়কে চাক্‌মারাজার প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাই ইহা এখানে জানাইয়া রাখা হইল।

(১) এখানে সম্ভবতঃ কোন উচ্চতম রাজশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই স্বাধীন-কালের কেবলমাত্র একজন রাজার কীৰ্ত্তি-কাহিনী এখনও জাগ্রত দেখিতে পাই। তিনি “পাগলা রাজা”

পাগলা রাজা । আখ্যায় সাধারণ্যে বিদিত । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, চট্টগ্রামের দক্ষিণ ভাগে “পাগলা বিল” “পাগলা মুড়া”

প্রভৃতি পাগলা রাজার যশঃস্তুত সমুদয় তদীয় নাম অঙ্কত রাখিয়াছে । বস্তুতঃ তথায় পাগলা রাজার ‘নাম-ডাক’ খুবই অধিক । “বগা-গোছার” “মূর্য্যা গোষ্ঠী”—সমুত্ত শ্রীযুক্ত সূর্য্যচন্দ্র তালুকদার গ্রন্থকারের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন ;—“দক্ষিণে শঙ্খ-মাতামুড়ির ( তীরবর্তী ) মঘেরা চাক্‌মা রাজাকে ‘পাগলা রাজা’ বলিয়া ডাকে, এবং পাগলা রাজার লোক বলিলে অনেকে ভয় করে । আমি যখন মাতামুড়ি যাই, তখন মঘেরা পাগলা রাজার নাম তুলিয়া থাকে ও অনেক ভয় করে । তৈন ছরার মুখে পাগলা রাজার ঘরভিঠা আছে বলিয়া আমাকে বলিয়াছিল । সেই ঘর-ভিঠার

ঘর-ভিঠা ।

মাঠও আমাকে দেখাইয়াছে । সেই মাঠটী আমিও দেখিয়াছি ; তথায় পাগলা রাজা বলিয়া অনেক খাতি আছে ।” এই মাঠে এক সময়ে মঘরাজার সহিত চাক্‌মারাজার যে যুদ্ধ লাগিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে ।

পাগলা রাজার প্রকৃত নাম কি—সে খবর কেহই রাখে নাই । পরন্তু

কিংবদন্তী । “পাগলা রাজা” আখ্যা হইবার কারণ এবং তদা-

নুসঙ্গিক অনেক কথা লইয়া সুদীর্ঘ কিংবদন্তী প্রচ-

লিত আছে । শুনা যায়, তিনি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন, ও নিরন্তর কঠোর রুচু-সাধনায় তৎপর থাকিতেন । এসম্বন্ধে একটি গান আছে ;—

“মুনি তপসী ধ্যান গরে (১) ।

পাগলা রাজা আপন চিং-কল্‌জা (২)

থৈ-নাই (৩) স্যান (৪) গরে ॥”

অর্থাৎ “পাগলা রাজা আপন হৃদপিণ্ড বাহির করিয়া স্নান এবং মুনি-তপস্বী ( প্রায় ) ধ্যান করিতেন ।” তাঁহার এই সাধনা অতি গোপনে হইত ।

আরাধনাকালে ‘উকি’ দেওয়া পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল ।

কুচ্ছ সাধনা ।

একদা রাণী কোতুহলাক্রান্তা হইয়া স্বামীর গুপ্ত-সাধনার কারণানুসন্ধানে অভিলাষিণী হইলেন । রাজা ধ্যান-মন্দিরের

( ১ ) “গরে”—করে । ( ২ ) “চিং-কল্‌জা”—হৃদপিণ্ড । ( ৩ ) “থৈ নাই”—থসাইয়া, বাহির করিয়া । ( ৪ ) “স্যান”—স্নান ।

দ্বার বন্ধ করিবার অব্যবহিত পরেই মহিষী পশ্চাদ্বর্তী জানালার ফটকে যাহা দেখিলেন, অচিন্তনীয় ব্যাপার—রাজা অস্ত্রাদি বাহির করিয়া ধোত করিতেছেন! তদদর্শনে বিস্ময় ও ভয়-বিহ্বলা রাণী ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রাজার সাধনা ভঙ্গ হইল; কিন্তু তিনি অস্ত্রগুলিকে আর যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারিলেন না। এই কারণে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়িল। ক্রমে তিনি যথার্থ পাগল হইলেন; লোকজনকে কাটিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। প্রজাগণ প্রাণতয়ে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পলা-  
কাটুয়া কন্ডার আমল। ইতে লাগিল। সমুদয় রাজ্য ব্যাপিয়া রাষ্ট্র-বিপ্লব

হুচিত হইল! অবশেষে রাণী গতান্তর না দেখিয়া কতিপয় প্রধান ব্যক্তির পরামর্শে রাজাকে নিহত করেন এবং দৈবজ্ঞান প্রভাবে পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা সন্দেহ করিয়া সেই শব বর্তমান “পাগলামুড়া” হইতে পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত করেন। এই গর্হিত কার্যের নিমিত্ত রাণীর বড় দুর্নাম রটিয়াছিল। এখনও তাঁহার শাসন-সময়কে “কাটুয়া কন্ডার আমল” অর্থাৎ ‘হত্যাকারিণী কন্ডার শাসনকাল’ বলা হয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলে “পাগলারাজা” শিশুদের কাছে অজ্ঞাপি জুজু সদৃশ—নাম করিলে তাহাদের যাবতীয় আবদার থামিয়া যায়!

‘পাগলা রাজার কোন সন্তানসম্ভতি ছিল না। তাঁহার হত্যার পর কিছুদিন বিধবা মহিষী রাজত্ব চালাইয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইলে রাজ্যভার কাহার হস্তে সমর্পণ করা যায়, মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। অনন্তর সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়, তৈনছরীর মুখে (মোহনায়) একটি বংশসিংহাসন স্থাপন করা হউক। কোন নির্দিষ্ট দিনে

ধূর্য্যা, কুর্য্যা, ধাবানা, পিড়াভাঙা প্রভৃতি চাক্ষু-  
 রাজ-নির্বাচন।

জাতির সর্বপ্রধান নেতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি সর্ব প্রথমে আসিয়া তাহাতে অধিরোধ করিতে পারিবেন, রাজ-সিংহাসনও তাঁহার হইবে। নির্দিষ্ট দিনে সর্বাপ্রে ধূর্য্যা আসিয়া প্রোক্ত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পরে ধাবানা এবং ক্রমে পিড়াভাঙা ও কুর্য্যা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ধূর্য্যার এক বিষম বিভ্রাট ঘটয়াছিল! তিনি রাত্রিভাগে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিধান করিতে ভুলে প্রণয়িনীর বক্ষো-বন্ধন

বস্ত্র (১) দ্বারা “খবং” (পাগড়ি) বাঁধিয়াছিলেন (২) ; প্রভাতালোকে তাহা দেখিতে পাইয়া সকলে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন । ইহার ফলে ধুর্য্যার রাজত্ব লাভ ত দূরের কথা, অধিকন্তু সমাজের উচ্চ পদবী হইতেও অধঃচ্যুত হইলেন । তাঁহার উপাধি ‘তালুকদার’ হইয়া গেল । ধাবানাই রাজ-সিংহাসন লাভ করিলেন । তদবধি কালিন্দী রাণী পর্য্যন্ত এই বংশই পুরুষানুক্রমে রাজত্বভোগ করিয়া (৩) গিয়াছেন । অধিকন্তু শুনা যায়, তৎকালে পিড়াভাঙা অর্থাৎ ধামাই গোছার নেতা রাজার দক্ষিণ-মন্ত্রী এবং কুর্যা অর্থাৎ তৈজা গোছার নেতা বাম-মন্ত্রী নিৰ্ব্বাচিত হইলেন ।

পরন্তু পাগলা রাজার অত্যাচার এবং প্রজাগণ কর্তৃক রাজনিৰ্ব্বাচন কথার প্রতিকূলে কোনও তর্ক পাওয়া যায় না । প্রবাদ যেখানে কালের করাল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তথায় তাহাকে আর বিশ্বাস না করিবার কথা কি ? সুতরাং মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবার পূর্বেই যে পাগলা রাজা রাজত্ব করিতে ছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায় । কারণ, স্বাধীনতা না থাকিলে কেহই তাদৃশ ভীষণ অবাধ অত্যাচার

(১) চাকমাগণ ইহাকে “খাদী” বলে । তদ্বিবরণ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে ।

(২) এই “খবং” সম্বন্ধেও দিস্তারিত মন্তব্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে ।

(৩) আবার কেহ কেহ এই রাজনিৰ্ব্বাচন কাহিনী সেই প্রাচীন উপকথা অনুসরণে বর্ণন করিয়া থাকেন । তাঁহাদিগের সাক্ষ্য শুনা যায়, পাগলা রাজকে হত্যার পর বহুদিন ধরিয়া চাকমাগণ অরাজক অবস্থায় পড়িয়া ছিল । অনন্তর, নিতান্ত অসুবিধা দেখিয়া সকলের পরামর্শমতে প্রাচীন রাজবংশে কেহ আছে কিনা—অনুসন্ধান চলিতে থাকে । রাজবংশের কেবল এক বিধবা একমাত্র পুত্র লইয়া জৈনিক মন্দিরে তখনও জীবিত ছিল । সেই সময়ে একদা উক্ত বিধবা স্বীয় সন্তানকে বৃক্ষচ্ছায়ায় রাপিয়া গৃহকর্তার সহিত জুমের কাজ করিতেছে, এমন সময়ে গৃহকর্তা সেই মঘ তাহার নিকট দিয়া যাইতে দেখে—বালকের শিরো-পরে ফণাষিভার পূর্বক এক সর্পরাজ ছায়া প্রদান করিতেছে । মঘ অগ্রসর হইতেই সাপটী চলিয়া গেল । অন্তঃপর সেই মঘ বালকের দোভাগ্য সমাগত বৃক্ষতে পারিয়া, ক্রোড় গ্রহণ করতঃ তাহার মাতৃ-সমীপে লইয়া যায়; এবং ভবিষ্যতে কোন দিন তাহাদের অবস্থা-পরিবর্তন ঘটিলে, যেন সে বা তাহার পরিবার সাহায্য লাভ করিতে পারে—এবংবিধ প্রতিজ্ঞা করাইয়া, তৎপর সমুদয় বিবৃত করে । এই কথা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে । প্রাপ্তস্ত রাজবংশধর-অনুসন্ধিৎসুরা ইহা জানিয়া বালককে হস্তিপৃষ্ঠে গ্রহণ পূর্বক আনয়ন এবং সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন ।



করিতে সমর্থ হয় না। যদি পাগলা রাজার উপর মোগল বা অপর কোন শক্তির প্রাধিকার থাকিত, তবে নিশ্চিত তাঁহারা ইহাতে বাধা দান করিতেন, এবং রেভেনিউ বোর্ডের পত্রেও অবশ্য তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যাইত। এস্থলে অত্যাচারিতেরাই হস্তক্ষেপ করিয়াছিল মাত্র। অধিকন্তু বোর্ডের পত্র দ্বারা জানা যায়, পূর্বে পার্শ্বতা চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়াপ্রভৃতি অধিবাসীদিগের সম্মতি ক্রমে নির্বাচিত হইতেন; সাধারণতঃ যেরূপ সমগ্র দেশের ভূপতি দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকে, এখানে সেরূপ নহে। উক্ত রাজ-নির্বাচনেও তাদৃশী প্রথা অবলম্বিত দেখা যায়। মাননীয় বোর্ড যে তাহা জানিয়াই এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতেও বা অবিধায়া কি আছে?

রাজবংশের তথানির্গয়ে ঐতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব হইতে কি সাহায্য লাভ হয়, চেষ্টা করা যাউক। তবে ভারতের অদৃষ্ট প্রত্ন-তত্ত্ব।

বৈগুণ্যে সেই পথও তেমন সুগম নহে। এই পক্ষে রাজভবনে একটি কামান এবং কয়েকটি মুদ্রা (ছাপ-মোহর) মাত্র পাইয়াছি। পূর্বে “কালু খাঁ” ও “ফতে খাঁ” নামধেয় দুইটি কামান ছিল। একদা নিশাকালে দৈবযোগে “কালু খাঁ” পার্শ্ব-প্রবাহিতা কর্ণফুলী-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে (১)। সেই রাত্রে রাজা স্বপ্নেও ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। “ফতে খাঁ” বর্তমানে রাজপুরীর বিচারগৃহ-পার্শ্বে পড়িয়া আছে। হায়, তাহার প্রবল হৃদ্বারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত প্রভাব-গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! অগ্নি নির্দাপিত হইলে অঙ্গারের আর মূল্য কি? আজ “ফতে খাঁর” অবস্থা স্মরণ করিলে বোধ হয়, ইহা শত শত নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ।

(১) রাঙামাটি নাম্নী ক্ষুদ্র উপনদী যেখানে আসিয়া কর্ণফুলীতে আত্মদগ্ধরণ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিন্নিয়ে প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। ইহার জল খুব গভীর, তাই স্থানীয় কথায় ‘কুম’ নামে আপ্যাত। সাধারণে ইহাকেই “(কালু খাঁ) কামানের ‘কুম’ নামে অভিহিত করে। গুনিয়াছি, কেহ কেহ এই বিংশ শতাব্দীর প্রবল বৈজ্ঞানিক প্রতাপের মধ্যেও রাত্রিকালে ঐ জলাশয়পৃষ্ঠে কামানের খেলা দেখিয়া ভীষণ ভয় পাইয়াছে। এবং বিধ কথ্য লিপিবদ্ধ করিতে বাইরা কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় হয়ত গ্রন্থকারও বাতুল পদবাচ্য হইতেছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত আস্থা না থাকিলেও দেশের এবং দেশের মধ্যে যাহা জানা যায়—তাহা লিখিয়া যাইতে বাধ্য।

যে কয়েকটি মোহর আছে, তন্মধ্যে দুইটি কেবল রাজকীয় চিহ্নচক ।



তাহার একটির প্রতিকৃতি পার্শ্বে রহিল ।

অপরটি একই ছবির ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র । সম্ভবত ইহা “সিংহধ্বজা” হইবে ।

পুরাকালীন রাজগণ হনুমানধ্বজ, সূর্য্য-বাণ, চন্দ্রবাণ প্রভৃতি নানা চিহ্নাঙ্কিত ছাপ ব্যবহার করিতেন, অধুনা তাহা কেতনপৃষ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে । আর

আটটি মুদ্রা পারসিতে উৎকীর্ণ । তন্মধ্যে বহু চেষ্টাতেও দুইটির পাঠোদ্ধার করা যায় না ; অপর একটিতে খোদিত আছে :—“আম্মা হু রাক্ষী” অর্থাৎ



‘পরমেশ্বর পালন কর্তা’ । পারসি-লিখিত অবশিষ্ট পাঁচটির মধ্যে প্রাচীনতম মুদ্রার প্রতিকৃতি পার্শ্বে প্রদত্ত হইল ।

ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে :—

“ফতে খাঁ

স্মরণীয় ঋণীদের ১৭১৪-১৫ সনে “ফতে খাঁ” নামক জনৈক চাকমা ১১৩৩ হিং রাজার শাসন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে । এতদ্ভিন্ন হোয়াগ্গার কিয়দুর উপরে কর্ণকুসীর তীরভূমি অত্য়াপি “ফতে খাঁর চর” নামে প্রসিদ্ধ । পূর্বে যে “ফতে খাঁ” নামধেয় কামানের কথা লিখিত হইয়াছে, শুনিতে পাই, তাহা এই “চরে” পাওয়া যাওয়াতেই উহা “ফতে খাঁ”র নামে অভিহিত । সম্ভবতঃ এক সময়ে এই “চরে” চাক্‌মারাজ “ফতে খাঁ”র সহিত যোগলের সংঘর্ষ লাগিয়াছিল ; তদবধি ইহা “ফতে খাঁর চর” আখ্যা পাইয়াছে । আর ইহাও সম্ভব, উক্ত যুদ্ধে পরাজিত পক্ষ যে কামান ফেলিয়া পলায়ন করে, পরে তাহা চাক্‌মারাজার হস্তগত হয় ।

পক্ষান্তরে প্রাণ্ডক্ত রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে প্রকাশ,—“১০৭৭ মঘী ইংরাজী ১৭১৫ খৃঃ অব্দে রাজা জাবুল খাঁ (১) কিছু ‘কার্পাস-ফতে খাঁ বা জল্লাল খাঁ ।

কর’ (২) দিবার বন্দোবস্তে—ফরকসাই এবং মহম্মদ

(১) আবার কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন, “জামোল (Jamaul) খাঁ” ( The H. T. of Ctg. and the Dewellers therein—P. 64) । কিন্তু সমুদয় চাক্‌মা-সমাজে তিনি জল্লাল খাঁ নামেই পরিচিত । জাতিগত দিক্‌ত উচ্চারণে বিদেশীয়গণ ভ্রমে পড়িবারই সম্ভাবনা ; তাই আমরা উাহাকে জল্লাল খাঁ নামেই প্রকাশ করিলাম ।

(২) ‘কার্পাসকর’ অর্থাৎ করস্বরূপ প্রদত্ত কার্পাস । পূর্বকালে বিনিময় ব্যবস্থা এত

সাহ হইতে জুমিয়া দিগের সহিত নিয়-প্রদেশের বেপারীদের বাণিজ্য চালা-  
ইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে বলিয়া রাখি যে, কাপ্তেন

\* The Hill Tracts of Chittagong  
and the Dwellers therein, P.—63.

লুইন লিখিয়াছেন \* :—“জামোল খাঁ

প্রায় ১৭১৫ খৃঃ অব্দে মোগল উজির দুমক সাহকে প্রথম কার্পাস-কর দেন।  
কিন্তু আমরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তা দিগের তালিকায় দেখিতে পাই, ১৭১২ খৃঃ  
অব্দের পর চট্টগ্রামের নবাবী পদ উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে নায়েবী পদের সৃষ্টি  
হয়। মীর এওজি, এয়াছিন খাঁ, অলিবেগ খাঁ ও মীরজা বাকর—এই  
চারিজন নায়েব ১৭১৩—২৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চট্টল শাসন করেন।  
সুতরাং উক্ত দুমক সাহ কে ? সে যাহা হউক, ফতে খাঁ এবং জল্লাল  
খাঁর শাসন বিবরণ এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, এই নামদ্বয়ে কিছুতেই বিভিন্ন  
ব্যক্তির কল্পনা করিতে সাহস হয় না। কেননা ফতে খাঁর মৃত্যুর যখন ১১৩৩  
হিজরী খোদিত, তখন নিশ্চিতই ১৭১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় শাসন আরম্ভ হইয়া  
থাকিবে। আর এদেশে তাঁহার যেরূপ ‘নামডাক’ আছে, তাহাতে কোনরূপে  
মনে করা যাইতে পারে না যে, এক বৎসরেরও অল্প সময়মধ্যে ফতে খাঁর  
রাজত্বের অবসান হইয়াছিল; তাহা সম্ভব হইলে এত দীর্ঘকালস্থায়ী কীর্তি  
কখনই তিনি লাভ করিতে পারিতেন না। আমাদের বিশ্বাস, চাকমারাজ  
জল্লাল খাঁ ১১৩৩ হিজরী অর্থাৎ ১০৭৭ মঘিতে মোগলসম্রাটের বশতা স্বীকার  
করিয়া “ফতে খাঁ” আখ্যা পাইয়াছিলেন ; ( এই মৃত্যুও সম্পূর্ণ মোগলানুকরণে  
পারসি বর্ণে ও হিজরী সনে খোদিত। ) এবং উত্তরকালে তিনি সেই  
মোগল-দত্ত আখ্যাতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে বিচারভার পাঠকগণের  
হস্তে। যত দিন যাবৎ এতদ্বিরুদ্ধে কোন প্রবলতর প্রমাণ পাওয়া না যায়,  
সেই পর্য্যন্ত এই ধারণাকেই সত্যের আসনে অধিষ্ঠিত রাখা যাইতে পারে।  
এসম্বন্ধে আমি বর্তমান রাজা বাহাদুর প্রমুখ অভিজ্ঞ মহোদয়বর্গের নিকট  
স্বাভিমত উপস্থিত করিয়াছি ; তাঁহারা সকলেই মদীয় মীমাংসা অনুমোদন  
করিয়াছেন।

---

অধিক ছিল যে, রাজস্ব পর্য্যন্ত উৎপন্ন ধন দ্বারা প্রদত্ত হইত। অদ্যাপি এই পাহাড়ে যিনিময়  
দ্রব্যসা সমাধিক চলে। এমন কি কুকিদের অনেকে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে না ;  
তাহারা সমান ওজনে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বদল করিয়া লয়। বেপারীরা দুই টাকা মূল্যের একমণ  
লবণ দিয়া তৎপরিবর্তে ছয় টাকা মূল্যের একমণ কার্পাস লাভ করিয়া থাকে।

অনন্তর আমরা পুনরায় মাননীয় বোর্ডের পত্রখানি অবলম্বন করিলাম। কারণ, চাক্‌মারাজগণের এই দ্বিতীয় স্তবক আলোচনায় ইহাই সর্বাধিক প্রাচীন—লিখিত উপকরণ। “(জম্মাল খাঁর স্বীকৃত) এই কর কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিত দেওয়া হইয়াছিল না। ১০৯৯ মঘী অর্থাৎ

রাজা সেরমুস্ত খাঁ। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জুমবন্দের (১) শাসনকর্ত্তা সেরমুস্ত

খাঁ (২) গভর্নমেন্টের কার্পাস-কর প্রদান করিয়া

ইহা ( অর্থাৎ পূর্ব বন্দোবস্ত ) সজীব ( Revive ) করিয়াছিলেন এবং পৃথক খাজানা দিবার স্বীকারে অতিরিক্ত কুলানা মোজাস্ত জঙ্গলের বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমুদয় রাজস্ব ১১৩৭ মঘাব্দ

ইংরাজাধিকার আরম্ভ (৩)। ইংরাজী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে

পরিশোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১১৩৮ মঘী

ইংরাজী ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন রাজা সের দৌলত খাঁ উভয় খাজানাই বন্ধ করিয়া দেন, এবং রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি স্থানের গোলা ( দোকান ) লুণ্ঠন করেন; এই কারণে তাঁহাকে আক্রমণের জন্ত ১১৩৯ মঘী ইংরাজী ১৭৭৭ সনে এবং ১১৪২ মঘী ইংরাজী ১৭৮০ অব্দে যথাক্রমে মিঃ লেন এবং মিঃ ওটর মারের নেতৃত্বাধীনে দুইবার অভিযান প্রেরিত হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফল

(১) বঙ্গদেশের যে অংশে ‘জুম’ করা হইত, তাহাকেই ‘জুমবন্দ’ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে এইরূপ “জুমবন্দবাদের” উল্লেখও পাওয়া যাইবে।

(২) পরন্তু এই সেরমুস্ত খাঁকে ইহাদের অনেকে আদি রাজা বলিয়া মনে করেন। এমন কি, মহিয়সী কালিন্দীরণিও মহামুনি মন্দিরের প্রস্তর ফলকে লিখিয়া গিয়াছেন—“অত্র চট্ট গ্রামস্থ পর্বতাধিপতি আদৌরাজা সেরমুস্ত খাঁ”। এ সম্বন্ধে একটী গানেও আছে,—

“আদি রাজা সেরমুস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ী”। ইত্যাদি ‘সেরমুস্ত খাঁ আদি রাজা, তাঁহার বাড়ী রোয়াং [বর্তমান নাম আরাকান] দেশে ছিল। তিনি স্বদেশে—চম্পকনগরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন’ গুনিয়া মঘরাজ কিয়ৎপরিমাণ জায়গীর প্রদান করিলেন।’ ইত্যাদি নানা কথা আছে। আমরা তৎসমুদয় উপকাহিনী দূরে ফেলিয়া বোর্ডের পত্রখানিকেই সত্যের আসন দিলাম।

(৩) ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধি দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীর মহম্মদ কাসেম খাঁর হস্তে বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার নায়েব-নবাবী প্রদান করিয়া প্রতিদান স্বরূপ বর্তমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর প্রদেশ লাভ করেন। হুতরাং সেই সঙ্গে এই ক্ষুদ্র চাক্‌মা রাজ্যও তাঁহাদের অধীন হয়। ইহার অল্পদিন পরে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্শ্ববর্তী স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যও ব্রিটিশের কৃষ্ণিগত হইয়াছিল।

হয় নাই। ১১৪৪ মঘী ইংরাজী ১৭৮২ অব্দে সেরদৌলত খাঁর পুত্র জানবক্স খাঁ রাজা হইলেন; কিন্তু তিনি প্রাপ্য খাজানার অতি অল্প অংশ মাত্র পরিশোধ করিয়াছিলেন।”

এস্থলে পুনরায় ঐতিহাসিক-বিত্রাট উপস্থিত হইল। বোর্ডের উপরোক্ত পত্রাংশের সহিত অপর ঐতিহাসিকের অনৈক্য ঘটিতেছে। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জুমবঙ্গের শাসনকর্তা সেরমুস্ত খাঁ গভর্ণমেণ্টের কর শোধ এবং নূতন এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন\*,—

“Raja Sookdeb Roy A. D.

\*The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein.—p 64.

1737 made settlement with

Govern ment.” অর্থাৎ ‘রাজা শুকদেব রায় ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।’ তিনি এই সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই। আমরা এই বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য হইতে রেভিনিউ বোর্ডের দলিলকেই অধিকতর মূল্যবান মনে করিতেছি। লুইন মহোদয় সম্ভবতঃ এই বন্দোবস্তের কথা সেরমুস্ত খাঁর স্থলে লিখিতে শুকদেব রায়ের নামে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা উক্ত বিবরণী, এক স্তম্ভে রাজাদের নাম ও অপর স্তম্ভে অনুষ্ঠিত কার্যের কথা লিখিয়া, তালিকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং বন্দোবস্তিখানির কথা মৃদাকর, প্রমাদে পূর্ববর্তী রাজা সেরমুস্ত খাঁর নামের পার্শ্বে রাখিতে পরবর্তী রাজা শুকদেব রায়ের নামের পার্শ্বে বসানও বিচিত্র নহে। (১)

উপরে রেভিনিউ বোর্ডের পত্রকে বিশ্বস্ত স্থির করা গেল বটে, কিন্তু তাহাতে শুকদেব রায়ের কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয়, তাহাতে তাঁহার নামোন্মেষের কোন প্রয়োজনও ঘটয়াছিল না। লেখা

রাজা শুকদেব রায়। আছে, ১৭৩৭ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৭৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত

রাজস্বাদি নিয়মিতরূপে দেওয়া হইয়াছিল। বোধ হয়, ইতোমধ্যে শুকদেব রায়ের রাজত্বও চলিয়া গিয়াছে। তদীয় শাসন কালে রাজস্বদটি কোন উরুজলতা বা পরিবর্তন ঘটে নাই বলিয়া বোর্ডের পত্রে কোন উল্লেখ না থাকিবারই কথা। লুইন সাহেবের লেখা ছাড়িয়া দিলেও শুক-

(১) অথবা তাঁহার সংগৃহীত সংবাদেও ভুল থাকিবে, তাঁহার এরূপ ভ্রমের কথা পূর্বেও আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি; এবং বলিতে কি, ইহাই শেষ ভুল নহে।

দেব রায়ের রাজত্ব কখনও অস্বীকার করা যায় না। শিলকতীয়ে "শুকবিলাস" নামক তদীয় মনোরম পুরীর ভাষাবোধে অত্ৰাপি কেন, আরও বহুকাল ধরিয়। লোকলোচন আকৃষ্ট করিবে। এতরিকটবর্তী "তরফ শুকদেব রায়"ও তাঁহার অমর কীর্ত্তি! চাক্‌মারাজার জমিদারী-মধ্যে এই তরফই নাকি সর্বাধিক বড়। আর এক প্রবাণ, রাজভাণ্ডার হইতে হস্তগত মুদ্রাগুলির একতম। পার্শ্বে ইহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল।

পড়া যায়,—



"শুকদেব সহায়

১২১৯"

কিন্তু উক্ত নিয়-রেখাক্রিত স্থল অর্থাৎ "সহায়" এবং "১২১৯" পাঠে ভুল; অনুমানে ধরা হইয়াছে মাত্র। তাহাতে 'রায়' এবং '১১১৯' ও পাঠ করা যায়। পরন্তু 'শুকদেব সহায়' কোন অর্থগর্ভ নহে; আর '১২১৯' ধরিলে কোন হিসাবে সময় ঠিক করা যায় না। অধচ যদি ১১১৯ ধরা যায়, তাহা মবাদ (১) মনে করিয়া সহজে সিদ্ধান্ত-পথে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে রাজা শুকদেব রায় ১৭৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইহাতেও মাহারা শুকদেব রায়ের রাজত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত নিয়ে—মহামুনি মন্দির-বক্ষে স্থাপিত প্রস্তর ফলকে পূণাবতী কালিন্দীরানী যে আশ্র-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে হুবহু তুলিয়া দিলাম।—

"আদৌ রাজা সেরমন্ত খাঁ। তৎপর রাজা শুকদেব রায় অতঃপর রাজা সেরদৌলত খাঁ। পরে রাজা জানবক্স খাঁ। অপরে রাজা টকর খাঁ। অনন্তর রাজা জবর খাঁ। আর্থাপুত্র রাজা ধরম বক্স খাঁ। তৎ সহধর্মিণি আমি শ্রীমতি কালিন্দী রানী।"

বোর্ডের পত্রখানি পাঠে অনুমান হয়, সেরদৌলত খাঁ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পূর্বপুরুষ নির্দিষ্ট রাজা সেরদৌলত খাঁ। গভর্ণমেণ্টের উভয়বিধ রাজস্ব বন্ধ করিয়া দেন।

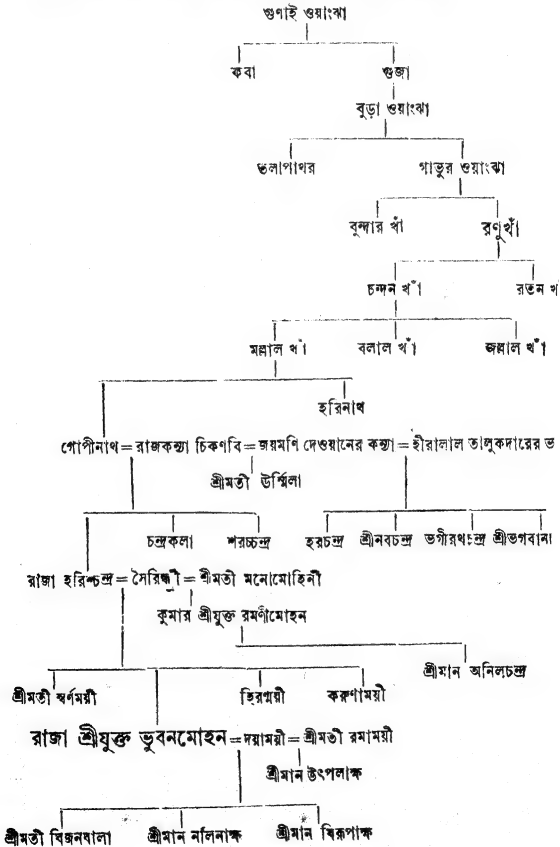
নতুবা হঠাৎ বিদ্রোহী হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। তিনি যে কেবল রাজ-কর বন্ধ করিলেন এমত নহে, পরন্তু রাষ্ট্রনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের দোকানপাট লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কারণে ১৭৭৭ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে মিঃ লেন এবং মিঃ ওটরমারের

(১) এসময়ে চারিদিকে মবাদার প্রাণান্ত ছিল। খৃষ্টাব্দের ভাউনার বর্তমানে ইহা রাজদরবার হইতে নির্বাসিত হইয়া উত্তমর্ণ এবং ব্যবসায়ীদের দপ্তরে মাত্র আশ্রয় লইয়া আছে।

নেতৃত্বাধীনে তাঁহার বিরুদ্ধে দুইবার অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল ; (But to no purpose) কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। কাপ্তেন লুইসও এই রাজদ্রোহিতা স্বীকার করিয়াছেন। তৎসঙ্গে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, উক্ত অভিযানদ্বয়ে সেরদৌলত খাঁ ভিন্ন তদীয় অগ্রতম আত্মীয় রণু খাঁও লক্ষ্যীভূত ছিলেন(১)। এই রণু খাঁ বর্তমান রাজাবাহাদুরের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ (২) ও সাধারণের নিকট সেনাপতি বলিয়া পরিচিত। অনেকে কর্ণফুলীর

(১) Vide—The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, P. 64.

(২) এ স্থলে কুল-লতিকাকারে বর্তমান রাজবংশের পরিচয় প্রদত্ত হইল।—



তীরবর্তী ‘নজরেরটিলা’র “রনু খাঁর খেদা” (১)র ভগ্নাবশেষ নির্দেশ করিয়া থাকে (২)। দৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবন্স খাঁর সময়েও তাঁহার বিস্তার প্রাধিক্য ছিল। সুনীতে পাই, তিনি রাজা মহোদয়ের ভগ্নীপতি ছিলেন।

পূর্বে যে ‘পাগলা রাজা’র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, কেহ কেহ এই সেরদৌলত খাঁকেই ‘পাগলা রাজা’ বলিয়া সন্দেহ করেন। যদিও তাহাদের অবস্থিতি সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তথাপি সাধারণের ভিত্তিহীন সন্দেহ। এই অমূলক ধারণা নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি বিদ্রোহাচরণ এবং রাঙ্গুনিয়ার ব্যবসায়ীদিগের দোকান লুণ্ঠন প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি ঔদ্ধত্যের অভিযোগ আছে বটে, কিন্তু তজ্জন্ত তাঁহাকে পাগলা-গারদে নিক্ষেপ করা কোন মতেই উচিত নহে। তাঁহার পক্ষে ওকালতি লইলে বলা যায়, তখন তিনি অধীনতা অস্বীকার করিবার কিঞ্চিৎ সামর্থ্যবান ছিলেন, সন্দেহ নাই। বোর্ড নিজেই লিখিয়াছেন, দুই দুইবার অভিযানেও কোন ফল হয় নাই। পক্ষান্তরে রাজ্য-লুণ্ঠনাদি রাজাদিগের সাধারণ ধর্ম; ইহা চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। সেরদৌলত খাঁ কখনই অপুত্রক ‘পাগলা রাজা’ হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ বোর্ডের পক্ষে নিশ্চয়ই সেরদৌলত খাঁর লুণ্ঠনাদি অপরাধের সঙ্গে পাগলা রাজকৃত ভীষণ অত্যাচার কাহিনীরও উল্লেখ থাকিত। আরও একটি কারণে আমরা এই সন্দেহ ভ্রান্তিমূলক—প্রমাণ করিতে পারি। পূর্বে আমরা চাকমা-দিগের ক্রমোত্তর গতি দেখাইয়াছি। সেই নিয়মে রাজা শুকদেব রায় আসিয়া রাঙ্গুনিয়ার অনতিদূরে “শুকবিলাস” পুরী স্থাপন করেন। যদি পরবর্তী রাজা সেরদৌলত খাঁই কথিত পাগলা রাজা হন, তবে বহু দূরবর্তী দক্ষিণে ‘পাগলাবিল’, ‘পাগলামুড়া’ এবং তৈনছরী কূলে ‘পাগলা রাজার বাড়ীভিটা’ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ নানা কারণে আমরা এই সন্দেহকে ভিত্তিহীনই স্থির করিয়াছি।

(১) “খেদা”—হাতী ধরিবার খোঁয়ার বিশেষ। জঙ্গল হইতে হাতীগুলিকে ‘খেদাইয়া’ অর্থাৎ তাড়াইয়া ইহাতে আবদ্ধ করা হয় বলিয়া ‘খেদা’ আখ্যা হইয়াছে।

(২) আমরা রনু খাঁর বংশধর ঐযুক্ত ইলুজর দেওয়ানের নিকট হইতে তাঁহার ব্যবহৃত রেসমী কাপড়ের একটা জঁপ পেটু লন পাইয়াছি। তাহার উচ্চতা ৪ ফিট ২১ ইঞ্চি, এবং বেটুণী ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি। ইহা হইতে তাঁহার অবয়ব অনুমান করণ।



১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা সেরদৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবক্স খাঁ সিংহাসনা-

রোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার

মোহরে—

রাজা জানবক্স খাঁ।

“রাজা জানবক্স খাঁ

জমিদার”



খোদিত আছে। তিনি নিজেকে ‘জমিদার’ বলিয়া কেন

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অত্ কোন কারণ বুঝিতে পারি না। সার হেনরী কটন মহোদয়ও লিখিয়াছেন \*,—“প্রাচীন

কাগজপত্র সমুদয় জানবক্স খাঁ ও রণু খাঁর

\* Revenue History of Chittagong,

P. 189.

বিবরণীতে পরিপূর্ণ। যদিও জানবক্স খাঁ

জমিদার বলিয়া কথিত কিন্তু বহুকাল ধরিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।”

“১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ (পূর্বোক্ত) কার্পাস মহাল খাজানার দফাবিশেষে ছিল (১)।” “কার্পাস মহাল বলিতে বুঝায়, যাহাতে পাহাড়জাত কার্পাস কর—ইজারাদার হইতে নগদ টাকায় আদায় হইত। এই ইজারাদার আবার চট্টগ্রামের প্রান্তদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রণু খাঁর সহিত বার্ষিক ৫০১ মণ (২) কার্পাসের চুক্তি করিয়াছিলেন (৩)।” সেই সময়ে “চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল মাননীয় গভর্ণর জেনেরাল (লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস) বাহাদুরের নিকট লিখেন, ‘রণু খাঁ’ নামধেয় জনৈক পর্বতবাসী কোম্পানীকে কার্পাসের ব্যবসায়ের নিমিত্ত সামান্য কর দিয়া থাকেন; আমি এখানে আসিয়াছি যাবৎ তিনি করদাতাদিগের মন্দ ব্যবহার বা বিদ্রোহ-

(১) Revenue History of Chittagong, P. 189.

(২) কিন্তু বোর্ডের পত্রে আছে, “দেখা যায়, ৫০০ মণ কার্পাস করস্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহা ইজারাদারকে দেওয়া হইত; তিনি তৎপরিবর্তে গভর্ণমেন্টকে নগদ টাকা দিতেন।” আবার ক্যাপ্তেন লুইন বলেন, “১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের কার্পাস পরিমাণ কমিয়া ৫০০ মণ ধার্য হইয়াছিল” (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, p. 64.)। কটন মহোদয়ের মন্তব্য এবং বোর্ডের পত্রে একমণের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বিশ্বাস—“শুষ্ক সর্বথা পরিভাষা” সংস্কারে রাজস্ব ৫০০ মণ কার্পাস নির্দ্ধারিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ৫০১ মণ দেওয়ার রীতি ছিল। গভর্ণমেন্ট যাহা পাইয়াছেন, বোর্ড তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। আর ক্যাপ্তেন লুইনও অন্ত্যমানে তাহাতে সায় দিয়া থাকিবেন।

(৩) Revenue History of Chittagong p. 20.

মানসে কয়েক মাস পূর্বে কোম্পানীর ভূম্যধি-  
চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পত্র । কারীদের উপর অকারণ রাজকীয় দাবির বহির্ভূত  
নানাবিধ গুরুত্বার চাপাইয়া অতিশয় অত্যাচার  
করিয়াছেন ।’ অনেকে তাঁহাকে ( কথিত রণু খাঁকে ) ধরিবার জন্ত নানা  
আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পারা যায় নাই । কেননা রণু  
খাঁ স্বীয় বাসস্থান হইতে পলায়ন করেন । অনন্তর তিনি দ্বিতীয় পত্রে জানা-  
ইয়াছিলেন, ‘রণু খাঁ বর্তমানে অধিকতর সৈন্ত একত্রিত করিয়াছেন এবং  
অন্তঃস্থলবাসী আঘেয়াস্ত্রে অনভিজ্ঞ ( ১ ) উলঙ্গ কুকিগণকে অধিক সংখ্যায়  
সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছেন ।’ ইহার পর রণু খাঁর তাদুলী অবাধ্যতায়  
যাবতীয় আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । পাহাড়ীগণকে ইংরাজাধি-  
কৃত চট্টগ্রামের হাটে বাজারে আসিতে দেওয়া হইত না । ফলতঃ ইহাতেই  
কৃতকার্য হওয়া গিয়াছিল ; অতঃপর তাঁহার (রণু খাঁ) সম্বন্ধে কোন কথা  
শুনা যায় নাই (২) ।” “কিন্তু এই বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ সময়ে ইজারাদার স্বীয় নির্দী-  
রিত রাজস্ব চট্টগ্রামের কোষাগারে ( Treasury ) খুব কচিৎ দিয়াছেন (৩) ।”

এখানে রণু খাঁর নামেই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইল । বস্তুতঃ রণু খাঁ,  
জানবন্স খাঁ রাজা জানবন্স খাঁর প্রধান দেওয়ান এবং সেনাপতি ছিলেন ।  
ও রণু খাঁ । তাঁহার হাত দিয়া সমুদয় কার্য্য হইত বলিয়া দোষভার ও তদীয়  
স্বন্ধে স্থাপিত হইয়াছে । এইরূপ ব্যবস্থা বর্তমানেও বিরল নহে । গভর্ণর  
জেনেরেল বা লেপ্টেনান্ট গভর্ণর যে সকল আদেশ করেন, সাধারণতঃ তৎ-  
সমুদয় তাঁহাদের চিফ্ সেক্রেটারীর নামে প্রচারিত হয় । কিন্তু অনেকস্থলে  
সেক্রেটারী মহাশয়েরাই দোষের ভাগী হইয়া থাকেন । বোর্ডের পত্রেও  
উপরিউক্ত কথার কিয়দংশ আলোচিত হইয়াছে । তাহাতে আছে, “রাঙ্গুনিয়া

( ১ ) কুকিগণ তখনও বন্দকের ব্যবহার জানিত না, সুতরাং কোন লোক চালের  
উপর উঠিতে পারিলেও তাহাদের হাত হইতে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিত ।

( ২ ) See—The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein—p.  
21 and A Statistical Account of Bengal, vol. VI,—p. 18. পরন্তু ভারত বাবু এই সকল  
ঘটনার সংবাদ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, “১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল একবার এই ভ্রমচ্ছাদিত  
বহিঃ প্রণীত হইয়া উঠে, লুসাই সর্দার রামু খাঁ নিকটস্থ গ্রামসমূহে নানারূপে উৎপাত করিয়া-  
ছিল । ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর হেষ্টিং সাহেব পাইয়া তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ ঘোষণা  
করিলেন । কিন্তু অগ্রে সে উপদ্রব প্রশমিত হইল ।”

( ৩ ) Revenue History of Chittagong—p. 18-

পরগণাবাসী জানবন্ধ খাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে (১) ইজারাদারের অনেক খাজানা বাকী পড়িয়া যায়। তন্নিমিত্ত ১৭৮৩, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৫ এই তিন বৎসরের রাজস্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং দেশের শাস্তি-রক্ষার জন্ত এসময়ে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়।” “তখন জানবন্ধ খাঁ (মহাপ্রঃ) দুর্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার ঠাহাকে বন্দী করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু অধীনে আনিয়াছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ঘটে (২)।” “১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জানবন্ধ খাঁ প্রেসিডেন্সিতে গভর্ণর জেনেরেলের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন (৩), এবং তদীয় পার্শ্বত্যাগপ্রদেশে শাস্তি রক্ষা করিবেন স্বীকারে পূর্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন (৪)।” কিন্তু তখনও কোন বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছিল না। “এমন কি, ঠাহার প্রতাপে জানবন্ধ খাঁ (ইংরাজের) বশতা স্বীকার করিয়াছিলেন, (চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তা) সেই মিঃ ইরুইনও তাঁহার নিকট হইতে কোন বন্দোবস্ত আদায় করিতে পারেন নাই (২)।”

“১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মেই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রধানকর্তা মিঃ হারিস (Mr. Harris) রেভিনিউ বোর্ডকে অমুরোধ করেন যে ‘চুক্তি (ইজারা)

ইজারাদার

প্রথাচ্ছেদ।

দারের হস্তে পার্শ্বত্যাগপ্রদেশীয় কার্পাসের একচেটিয়া বাণিজ্য-প্রথা রহিত করা হউক, এবং এই বন্দোবস্ত একবারে জুমিয়া বা জমীদারগণের সহিত হওয়া উচিত। কেননা তাহাদের

(১) কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন, “রাজা (জানবন্ধ খাঁ) প্রজার উপর সম্বিশেষ অত্যাচার করিতেছিলেন। সেই হেতু অনেকে আরাকান পলাইয়া যায়।” (The Hill Taracts of Chittagong and the dwellers therein, p. 64.)

(২) Revenue History of Chittagong—p. 189.

কিন্তু “চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত”কার তারক বাবু লিখিয়াছেন (৭৬ পৃষ্ঠা), “খৃষ্টীয় শতাব্দীর ১৭৪৮। জানবন্ধ নামে এক ব্যক্তি চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে উৎপাত আরম্ভ করিতেছিল। কর্তৃপক্ষের আদেশ মতে জেলার কালেক্টর তাহাকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন।” তাহার এই সন নির্দেশ কিছুতেই যে ঠিক নহে, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তদ্বিবক্ষ্যক দুয়ারিটী প্রমাণ উপরেই দেওয়া গেল। বোধ হয় ৮৪ হুজাই ৪৮ হইয়াছে।

(৩) কিম্বদন্তী আছে, যে সময়ে জানবন্ধ খাঁ পলায়ন করেন, তাহার সঙ্গে প্রজারাও পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন একজন গর্ভবতী রমণী শারীরিক ক্লেশভার বহন করিতে না পারিয়া রাজাকে স্বগত গালি দিতেছিল। দৈবযোগে জানবন্ধ খাঁ তাহা স্বকর্ণে শুনিতে পান। ইহাতে তাহার মনে এমন আঘাত লাগে যে, তিনি আর বুদ্ধ না করিয়া ইংরাজের বশতা স্বীকার করেন। এবং কলিকাতায় গিয়া ষড়লাট সাহেবের নিকট উক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(৪) A letter of the Board of Revenue.

স্বভাব ভাল এবং বাসস্থান নির্দিষ্ট (১) ; যেখানে তাহারা পুরুষানুক্রমে থাকে, তাহাতে কিছু দাবীও আছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রত্যেক প্রদেশ স্মরণাতীত কাল হইতে লোকসংখ্যানুসারে কার্পাসের কয়-পরিমাণ লইয়া গঠিত হইত। জুমিয়া অর্থাৎ রায়তগণ কর্ষিত ভূমির বিস্তৃতি-হিসাবে খাজনা দিতনা, সেই কর পরিবার হিসাবে— প্রত্যেক পরিবারে যত অধিক ব্যক্তি বিবাহিত থাকে, তাহাদের খাজানা নির্ধারিত হইবে; বিবাহের পূর্বে রাজস্বের দাওয়া চলিবেনা।’ এই প্রস্তাবমতে ১৫ই জুন গভর্নমেন্ট আদেশ করেন যে, পার্শ্বত্যাগ কার্পাসের ইজারাদারের প্রথা রহিত হইবে এবং কালেক্টর কার্পাসের কর উঠাইয়া দিয়া জুমিয়া বা জমিদারদিগের সহিত পরিমিত (তজ্জায়) জমা ধাৰ্য্য করিবেন। তিনি সেই সঙ্গে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন যে, যদি তাহারা ঐ রাজস্ব নিয়মিতরূপে চালায়, তবে তাহা আর বৃদ্ধি করা যাইবে না (১)।” অতঃপর এদেশে অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত হয়। কিন্তু “১৫ই সেপ্টেম্বর কালেক্টর এই ইজারাদার প্রথা রদ করিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া পাঠান এবং ৯ই ডিসেম্বর পুনরায় এ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টে লেখা-লেখি করেন। অবশেষে মীমাংসিত হইল যে, পাহাড়ীদের নিকট হইতে কর স্বরূপ কার্পাস আদায় করিবার নিমিত্ত গভর্নমেন্টপক্ষ হইতে জনৈক কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন; তিনি পরে সংগৃহীত কার্পাস প্রকান্ত্র নিলামে বিক্রয় করিবেন (২)।”

“১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর কালেক্টর, জানবন্না খাঁর অধিকারভুক্ত পার্শ্বত্যাগ প্রজাগণের উপর ভূমির রাজস্বের স্থায় কর প্রবর্তিত হইবার জ্ঞাপন করিয়া অস্বস্তি প্রকাশ করেন। বোর্ড ১৭৯১ ইংরাজীর ৯ই ফেব্রুয়ারী অনুমতি দেন যে, জানবন্না খাঁ এযাবৎ যে কার্পাস-কর প্রদান করিতেন, তৎপরিবর্তে তাঁহার উপর পরিমিত তজ্জায় রাজস্ব নির্ধারিত হউক এবং অপরাপর সর্দারগণ কার্পাসের বিনিময়ে তজ্জায় খাজনা দিতে স্বীকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট

( ১ ) Revenue History of Chittagong—P. 189.

( ২ ) A Letter of the Board of Revenue, আবার “Chittagong Gazetteer” এ দেখিতে পাই, এসময় কার্পাস ঢাকার সেক্টরিতে চালান যাইত।

হইতে কার্পাসই গৃহীত হইবে; তাহা প্রকাণ্ড নিলামে বিক্রয় করা যাইবে (১)।”

“১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই কালেক্টর জানাইয়া ছিলেন, বাঙ্গলা ১১৯৭ এবং ১১৯৮ সনের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই প্রথম দুই বৎসর দশশালা বন্দোবস্তের অন্তর্নিবিষ্ট করা গিয়াছিল, এ সকল বন্দোবস্তে জানবক্স খাঁর উপর ১৮১৫ টাকা কর নির্দ্ধারিত হয় (২)।”

বন্দোবস্ত।

“১১৯৮ সনের নিমিত্ত জুমিয়ারা যে কর দিতে সম্মত হইয়াছিল, দশশালা বন্দোবস্তের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সেই খাজানাই স্থির থাকিতে বোর্ড ও গভর্নমেন্ট আদেশ করেন। এবং এই সঙ্গে ইহাও বলা ছিল যে, জুমিয়াগণের আবাদ বিস্তারে মোট জমা কোনরূপে বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা ঘটিলে, যেন বোর্ডকে জ্ঞাপন করা হয় (৩)।”

“বাঙ্গলা ১১৯৯ হইতে ১২০৬ সন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ দশশালা বন্দোবস্তের অবশিষ্ট আট বৎসর) কেবল ‘জুমবক্স’ মাত্র জানবক্স খাঁর নামে বার্ষিক ১৭৫৫ সিকাটাকা (৪) জমায় বন্দোবস্ত ছিল এবং, অপরাপর জুমমহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে বিভিন্ন জমায় নির্দ্ধিষ্ট ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ যাবৎ এই জুমবক্সের জমার কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেই সনে উত্তরাধিকারীস্বত্রে রাজা ধরম বক্সের হস্তে উক্ত জুমবক্স রাজ্যভার অর্পিত হয়।” ইহাও বোর্ডের সেই পত্রাংশ। রাজা জানবক্স খাঁ এবং রাজা ধরমবক্স খাঁর মধ্যে আরও দুই জন রাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পত্রে রাজা শুকদেব রায়ের নামের জায় তাঁহাদেরও উল্লেখ নাই। তাঁহাদের সময়ে রাজস্বঘটিত কোন গোলযোগ ঘটে নাই বলিয়া রেভিনিউ বোর্ডের পত্রে বিশেষভাবে নামোল্লেখ না থাকিবার কথা—সম্পূর্ণ পত্র পাঠেও ইহা সহজে প্রতীতি হয়। আমরা পূর্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, রাজা জানবক্স খাঁ রানুনিয়ার রাজবাড়ী স্থানান্তরিত করেন এবং রাজানগর গ্রামও তাহা দ্বারা গঠিত হইয়া

(১) Revenue History of Chittagong—P. 189.

(২) Revenue History of Chittagong—P. 190.

(৩) A letter of the Board of Revenue.

(৪) বাদশাহী আমলের রৌপ্য তক্ষা সিকাটাকা নামে প্রথিত। ইহা ওজনে ১৮০ আঠার জানা, স্তত্রয়া মূল্যও অপেক্ষাকৃত অধিক।

ধাকিবে। ইহা ছাড়া তিনি যদি অপর কোনও সংকার্য করিয়া থাকেন, দূরন্ত কাল সেই গৌরব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে! তাহার করাল কবলে এইরূপে কত যে মহীয়সী কীর্তিলহরী বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে, কে তাহার সন্ধান লয়?

দেখা যায়, ১২০৬ বাঙ্গলা—ইংরাজী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ যাবৎ জুমবঙ্গের বন্দোবস্তি রাজা জানবক্ক খাঁর নামেই চলিয়াছিল; সুতরাং এই সময় পর্য্যন্ত তদীয় শাসন এবং এই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু কল্পনা করা অসম্ভব নহে। অপর কোনরূপেও ইহা অবধারিত করিবার উপায় নাই। জানবক্ক খাঁর তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনান্তে যুবরাজ টক্কর খাঁ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। রাজানগরের রাজা টক্কর খাঁ।

রাজবাড়ীর সম্মুখীন সুবহৎ “রাজার দীঘি” ইহারই খোদিত বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু টক্কর খাঁর ভাগ্যে অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই; অল্প দিন, খুব বিশ্বাস দুই বৎসরও অতীত না হইতেই তিনি নিঃসন্তান ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অনন্তর দ্বিতীয় ভ্রাতা জব্বর খাঁর হস্তে রাজ্যভার পতিত হয়। তাঁহার মোহরে আমরা যে সকল সংবাদ পাই,

তাহাতে তদীয় রাজত্ব-  
রাজা জব্বর খাঁ।

বিবরণ অধিকতর  
পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। ইহার বাঙ্গলা এই,—

“শ্রীশ্রীজয়কালী জয় নারায়ণ  
জব্বর খাঁ ১১৬৩।”



সুতরাং ১১৬৩ মঘাব্দ অর্থাৎ ১৮০১-০২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ অমুরাগ ছিল যে, মোহরমধ্যেও “শ্রীশ্রীজয়কালী জয়নারায়ণ” নাম শীর্ষোপরি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ কোন্ সময় হইতে যে ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না। রাজা শুকদেব রায়ের নামটিতে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী আর কোন রাজার নিকটে বোধ হয় হিন্দু দেবদেবী এত উচ্চতম সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। রাজা জব্বর খাঁ এই যে বীজ রোপণ করিয়া যান, কালে তাহা হইতে বৃক্ষোদয় হইয়া শাখা পল্লববান হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে আবার বৌদ্ধ-

ধর্মবাতায় বিগতন্ত্রী—শুদ্ধ কাণ্ডমাত্র অখুনা অবশিষ্ট আছে! যাহা হউক, তিনি যে সমুদায় সংকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজানগরের তবন পার্শ্বে স্থাপিত “রাজার হাট”ই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিপীঠ।

রাজা জব্বর খাঁ দশবর্ষাধিক কাল রাজ্যাশাসন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠাধিকার বিধান (Law of Primogeniture) মতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডোলপেটা সুরসুরী জীবিত থাকিতেও জব্বর খাঁর পুত্র রাজা ধরমবক্স খাঁ।

ধরমবক্স খাঁ(১) ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্বোক্ত বোর্ডের পত্রে আছে,—“তিনি স্বেচ্ছা ক্রমেই জুমবক্স ও জুমনওয়াবাদের রাজস্ব ৭০০ টাকা অধিক দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল বোর্ড ধরমবক্স খাঁর সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিতে স্বীকার করেন এবং আরও প্রকাশ করেন যে, এই বন্দোবস্তি কখনও কার্পাস মহালের করবৃদ্ধি মানসে হইতেছে না : মাত্র পূর্বতন ভূম্যাধিকারীদিগের সঙ্গে যে জমায় চলিয়াছিল, এখনও তাহাই থাকিবে। এই করারে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৭০৫ টাকা জমায় দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্তি স্থাপিত হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত ৭০০ টাকা ভ্রাস হইয়া পুনরায় ২০০৫ টাকা জমা স্থিরীকৃত হইয়াছিল।”

রাজা ধরমবক্স খাঁর সময় হইতে উঁহাদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ অত্যাধি সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও তৎকালীন লোক জীবিত আছেন; তাঁহাদের প্রমুখ্যৎ আমরা অনেক তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। রাজা প্রায়শঃ রাঙামাটি বাস করিতেন বটে, কিন্তু রাজানগরেই তাঁহার প্রধান বাসস্থান নিরূপিত ছিল। তিনি রাঙামাটির নিকটবর্তী বহুবিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আবাদ করিয়াছিলেন, তাহা “ধর্মখিল” নামে প্রথিত হইতেছে। আবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজুনিয়া হইতে বিশেষ সাহায্যদানে অনেকঘর মুসলমান আনাইয়া তথায় বসবাস করাইয়াছিলেন;

(১) সকলে তাঁহাকে “আঠার মাস্তা ধরমবক্স” বলিয়াই জানে। কেননা তিনি নাকি পিতৃ ষিয়োগের ১৮ মাস পরে ভূমিষ্ঠ হন—এই সুরীর্ঘকাল মাতৃগর্ভেই ছিলেন। এইরূপ সম্ভব-জন্মা ব্যক্তিত্বারা রাজসিংহাসন এবং জাতিতে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে—আশঙ্কায় বা পিতৃব্য ডোলপেটা সুরসুরির স্বার্থসাধনোদ্দেশে তত্ত্বাগোচ্ছার অশ্রুতম নেতা ধরমবক্সকে একদা কোশলে বলি দিতে গভীর অরণ্যে লইয়া যায়। রাজগঞ্জীঘেরা সন্ধান পাইয়া ইংরাজপক্ষের বরকন্দাজের সাহায্যে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন।

তাহাদের বংশধরগণ বর্তমানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ভর করি-

তেছে। বস্তুতঃ রাজা ধরমবন্ধ খাঁর সুশাসনে প্রজাবন্দ  
প্রজারঞ্জন।

মখেই সুখভোগ করিয়াছে। তিনি একাধারে তেজ ও  
কমার আকর ছিলেন। ছুটের দমন ও শিঠের পালনে তদীয় শাসনকাল  
আরও বলকাল ধরিয়া সাধারণের স্থিতি অধিকার করিয়া রাখিবে!  
তাঁহার সময়ে পূর্বাঞ্চলের অসভ্য কুকিদিগেরও কোন উপদ্রব-সংবাদ  
পাওয়া যায় নাই; অথচ তৎপূর্বে ও পরে পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের ইতিহাস  
তাহাদের অত্যাচার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্রজাগণ তাঁহাকে “মহারাজা”  
আখ্যায় গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

কাপ্তেন লুইনের কথায় পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, ‘১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মূল  
চাক্‌মাজাতির অন্ততম শাখার প্রায় ৪০০০ টংচঙ্গ্যা এদেশে আসিয়াছিল।  
রাজা ধরমবন্ধ তাহাদের একতমকে সর্দার বলিয়া অস্বীকার করায় অধি-  
কাংশ পুনরায় আরাকানে প্রত্যাবর্তন করে।’ ইহাতে অবশ্য রাজা ধরমবন্ধের

প্রতি টংচঙ্গ্যা প্রজাদিগের অসন্তোষ জ্ঞাপিত হয়; কিন্তু  
টংচঙ্গ্যা প্রজা।

আমরা বিশ্বস্তহস্তে জানিতে পারিতেছি, টংচঙ্গ্যা প্রজারা  
তাঁহার প্রতি এতাদৃশ অহুরক্ত ছিল যে, চট্টগ্রাম সহরে উপযুক্ত বাসস্থান  
অভাবে রাজার থাকিবার অসুবিধা ঘটে দেখিয়া তাহার। চাঁদাঘারা বর্তমান  
“রাজকুঠি”(১) খানি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং কি ইহাতেও রাজা  
ধরমবন্ধের প্রতি টংচঙ্গ্যাদিগের অসন্তোষ বিখ্যাস করা যায়?

“হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহারও সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এমন কি, তিনি পিতার  
অনুকরণে মোহরেও খোদাইয়াছিলেন, —



“জয় কালী সহায়  
ধরমবন্ধ খাঁ।”

তাঁহার সময়ে হিন্দুধর্ম সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ  
করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় হিন্দুপুর্ন পালন করি-  
ধর্মভাব।

তেন এবং বাড়ীতে প্রতিদিন হিন্দুদেবদেবীর পূজাচর্চনা  
হইত। রাঙামাটির রাজপুরীতেও মহা আড়ম্বরে এক জয়কালী স্থাপন

(১) ইহা সুবৃহৎ এবং গঠন প্রশালী অভিশয় মনোমোহকর। এই সহরে তাদৃশ সুরমা  
প্রাসাদ আর নাই। কিছুকাল হইতে শুধায় বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর বাস করিয়া থাকেন।  
চাক্‌মাজ তৎপূর্বে মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া ভাড়া পান।



করিয়াছিলেন। দৈনিক কালীপূজার নিমিত্ত যথাবিহিত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত ছিল। কথিত আছে, তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া স্বর্গত রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য (১) মহোদয় ও “মহারাজ” উপাধি লাভ করেন; তদবধি তাঁহার বংশধরগণও “মহারাজ ভট্টাচার্য্য” আখ্যায় বিখ্যাত। বস্তুতঃ চট্টগ্রামে এই ব্রাহ্মণবংশ সবিশেষ সম্মানিত। রাজা গুরুদেবকে (২) ৭৪ নম্বর লাট উল্লেখে ৫৮২/০ দ্রোণ (প্রায় ১৯১০০ বিঘা) ২৭৪০৬ নম্বর তালুকে রাধাকৃষ্ণ—নয়াবাদভূমি দান করিয়া ছিলেন; তদীয় বংশধরেরা অত্যাধি সেই ব্রাহ্মণের মাত্র ৪৪ টাকা রাজস্বে ভোগদখলকার ও মালগুজার আছেন। ইহা ছাড়া, রাজা ধরমবল্ল খাঁর সময়ে রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের খুব যাতায়াত ছিল; এখানে তাহাদের বিলম্বিত দু’পয়সা ‘প্রণামী’ ও জুটিত। এবং রাজদরবারে হিন্দুজ্যোতির্বিদগণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; রাজা প্রায় কার্যোই তাহাদের সহিত গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল আলোচনা করিতেন।

সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার কিছুকাল পরে রাজা ধরমবল্ল একদা সৈন্তসামন্তাদি সমভিব্যাহারে মুগয়ায় বহির্গত হন। বহুদূর কণ্টকাকীর্ণ

(১) এই মহারাজ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্যই (চট্টগ্রাম) ধলঘাটের কানুনগোরদের বাড়ীতে জটৈক শিষ্যের কালীপূজা অতি অল্প সময়ে সমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎকর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সর্গাহত হইয়া ঝালীর বৃক্ক দায়ের আশ্রয় করেন; তাহাতে সেই বিদীর্ণ বৃক্ষ হইতে অবিরল ধারায় শোণিত বহির্গত হইতে থাকে। তখন উক্ত শিষ্য সপরিবারে তদীয় চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) বিজয়বাদীরা বলেন;—চট্টগ্রামে বাসকালীন একদা চাক্‌মারাজ একাকী (চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী) ভ্রমণ-হলে আপন জমিদারী পরিদর্শন করিতে ছিলেন। কিন্তু অমনোযোগিতায় কিছু অধিকদূর আসিয়া পড়েন। এহেন সময়ে ঠাণ্ডা তাহাকে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে আক্রমণ করে। তথায় এই দৈবদুর্ভাগ্য হইতে মস্তকটী রক্ষা করিবারও উপায় আশ্রয় নিকটে ছিল না। মহাবিপদে পড়িয়া তিনি ইত্যন্তঃ দৌড়িতে লাগিলেন। এই রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য দূর হইতে ইহা অবলোকন করিয়া স্বীয় পর্ণহস্ত মহারাজকে প্রদান করিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ত্যাগবীকারে অত্যধিক পরিতুষ্ট হইয়া চাক্‌মারাজ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিকটবর্তী উচ্চস্তম্ভে আরোহণ করতঃ চতুর্দিকে যত দূর দেখা যায়, তৎসমস্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজদরবারেও তাঁহার প্রতিপত্তি হইয়াছিল; তাহাতে মহারাজ আরও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে “মহারাজ ভট্টাচার্য্য” উপাধিতে বিভূষিত করেন। তদবধি হইতে তাহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে।

অপূর্বমিলন । (১)

শিলাময় পথ-পর্যটনে রাজা অতিশয় পিপাসা কাতর হইয়া পড়িলেন ; জলাশয়ে চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল । একজন আসিয়া জানাইল যে, কিয়দূরান্তরে শৈলশৃঙ্গোপরি (কুরাকুটা গোছার) গুজাং চাক্‌মার আবাস আছে । রাজা সেখানে বিশ্রাম লাভাশায় চলিলেন । উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধ গুজাং সধর্ম্মিণীর সহিত জুম্‌ক্ষেত্র বীজ বপন করিতেছেন । আচম্বিতে তাহার আলয়ে মহারাজার পদাঙ্গণ দেখিয়া দম্পতি নিজকে কৃতার্থ জানে হর্ষ-পুলকিত এবং ভক্তিবিনয়াবনত হৃদয়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিলেন । অধিকন্তু তাহাদের পর্ণকুটিরশোভিনী অপরূপ সুষমাময়ী মৃগাক্ষিণী দ্বাদশবর্ষীয় কণ্ঠারত্নের সৌন্দর্য্য-সুধা মহারাজার শ্রমকাতর প্রাণে অধিকতর প্রীতিদানু করিয়াছিল । তদীয় সুকোমল করকিসলয়-বাহিত মৃণ্ময় ঝারি পূর্ণ সুশীতল বারিপানে তাঁহার পিপাসার শাস্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তিনি অনিমেষ লোচনে সুন্দরীর চঞ্চল নয়নোপরি দৃষ্টি যোজনা করিয়া রহিলেন ! তাহাতে কিশোরী মহারাজের চিন্ত-চাঞ্চল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈষদ্ধাস্ত-আশ্রু মস্তক অবনত করিলেন । এদিকে সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছেন দেখিয়া, বিহঙ্গমকুল নানাতানে সঙ্গীত ধরিয়া কুলায়াভিমুখে ছুটিল, সহচরগণ দিব্যবসন সংবাদ জ্ঞাপন করিলে হঠাৎ মহারাজার চৈতন্যোদয় হইল । অনন্তর তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

বাড়ীতে আসিয়াও মহারাজ সেই সুন্দরী-মূর্ত্তি-চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেন না । তাঁহার দর্শনাভিলাভেই মনোদূত অগুরুণ ঘুরিতে লাগিল,—রাজকার্য্যে আর যথারূপ দৃষ্টি রহিল না । পরে আর মনোবেদনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, একদিন প্রিয়তম বয়সের নিকটে হৃদয়কপাট উদ্‌ঘাটিত করিলেন । তিনি অপরাপর পাত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কাঁটাছরী হইতে প্রাপ্ত গুজাং চাক্‌মাকে সপরিবারে রাজবাড়ীতে আনাইলেন । গুজাং দেও-

বিবাহ ।

য়ান পদবী লাভ করিলেন, তাহাদের যাবতীয় দুঃখ নিরাকৃত হইল । বলা বাহুল্য, ছুহিতারত্ন কালাবিবিকে কালিন্দীরানী নাম দিয়া মহারাজ পাটেশ্বরী করিলেন । এক্ষণে কিছুকাল গত হইলে

(১) এই সমুদয় বিষয়গী রাজ সরকারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী যেতাঙ্গী (চট্টগ্রাম) নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকমল দাস মহোদয় সংকলিত হস্ত লিখিত কাহিনী হইতে গ্রহণ করিলাম ।

কালিন্দীর গর্ভে কোন সন্তানাদি জন্মিতেছে না দেখিয়া, রাজা তদীয় জ্ঞাতি-ভগিনী আটকবিবিকে (১) বিবাহ করেন। তিনি সাধারণের নিকট “মধ্যমাঠাকুরাণী” আখ্যায় পরিচিতা ছিলেন। এই “কুরাকুট্যা গোছার” দৌলত খাঁর বাড়ীতেও মহারাজার প্রায়শঃ যাতায়াত ছিল। ক্রমে তিনি দৌলতের কন্যা হারিবিবির সহিত প্রণয়বদ্ধ হইয়া পড়েন। অবশেষে তাঁহাকেও বিবাহ করিয়া “ছোটরাণী” করিলেন। কিন্তু এ সকল ‘সপত্নী-সহবাসেও কালিন্দী রাণীর প্রতি মহারাজার ভালবাসার তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। তিনি নিরন্তর কালিন্দীর প্রেমপ্রবাহে মগ্ন থাকিতেন। অতঃ-

সন্তানলাভ।

পূর বড়রাণীর গর্ভ চিহ্ন দেখা গেল। তিনি যথাকালে

এক সুলক্ষণ তনয় প্রসব করিলেন। অদৃষ্ট বিড়ম্বনা—

দ্রুত কৃতান্ত অকালে রাজপরিবারের এই স্নেহনিধিকে অপহরণ করিল, কালিন্দীরাণীর সন্তান ভাগ্য এইখানেই পর্যাবসিত হইল! পরে কনিষ্ঠা রাণী হারিবিবির এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে; তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল—মেনকা ওরফে চিকণবিবি। অনন্তর কয়েক বৎসর পরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে (২)

লোকান্তর।

বাঙ্গালা ১২৩৯ সালের আষাঢ় মাসে মহারাজ ধরমবজ্র

সকলকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া রাণীমাটি রাজ-

প্রাসাদ হইতে লোকান্তর গমন করেন।

ধরমবজ্র খাঁর মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতা পড়িয়া গেল। অগত্যা “কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্” হারিবিবির অবিবাহিতা তনয়া চিকণ বিবির অভিভাবক

স্বরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কন্যাই সম্পত্তির কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্।

একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হওয়াতে হারিবিবির অতিশয় অহঙ্কার করিয়াছিল; তিনি বড় রাণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহার মতমাত্রও জিজ্ঞাসা না করিয়া ওয়াংঝাগোছা—কাঁকড়া গোষ্ঠীসমুদ পূর্বকথিত রণুখাঁর প্রপৌত্র গোপীনাথ দেওয়ানের সহিত হারিবিবি স্বীয় কন্যা চিকণবিবির বিবাহ দিলেন এবং রাজনগরের

(১) কেহ কেহ ইহাকে আতপবিবি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

(২) কিন্তু কাগুন লুইন এখানে বিশেষ ভুল করিয়াছেন। ‘The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein’ নামক পুস্তকে রাজা ধরমবজ্র খাঁর মৃত্যুকাল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ লিখিয়া গিয়াছেন (See p. 64)। তাহা পাঠে বর্তমান গ্রন্থকারও ভ্রমে পড়িয়াছিলেন; পরিশেষে অনেকালেক কাগজপত্র দৃষ্টে সংশোধিত হইয়াছে।

নিকটবর্তী সোনাইছরী গ্রামে ভিন্ন বাড়ী নির্মাণ করাইয়া কচ্ছা ও জামাতার সহিত কালিন্দী রাণী হইতে পৃথকভাবে বাস করিতে লাগিলেন। আর এদিকে পতিবিরহবিধুরা বড়রাণী সপত্নী বিদেহবাহিত্তে দিন দিন জলিয়া পুড়িয়া অহর্নিশ দয়ারসাগর ভগবানকে স্মরণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন !

অবশেষে যখন বিপক্ষের আক্রমণ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কালিন্দী গভর্ণমেন্ট সমীপে পরলোকগত স্বামীর রাজত্ব-শাসনভার পাইবার প্রার্থনা করেন। তাহাতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট ইহার মীমাংসা হওয়া পর্য্যন্ত, ধরমবন্ধ খাঁরই সগোছা এবং সগোত্রজ বর্তমান রাজচন্দ্র দেওয়ান প্রভৃতির জ্যেষ্ঠতাত শুকলালখাঁকে বার্ষিক

২৪২১৮/১১ পাই জমা দিবার স্বীকারে পার্কত্যা প্রদেশের “সরবরাহকারিত্ব” প্রদান করেন। ইহাও আদেশ ছিল যে, সরবরাহকার প্রাণপণ চেষ্টায় যাহয় কিছু অতিরিক্ত সংগ্রহ করিতে পারিলেও, তাহা কালেক্টারিতে দাখিল করিতে হইবে। এই বন্দোবস্ত মাত্র ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ যাবৎ চলিয়াছিল। চট্টগ্রামের জমিদারীভার সীতাকুণ্ডনানার অন্তঃপাতী কাটগরনিবাসী আমানত আলী নামক জনৈক মুসলমানের হস্তে সমর্পিত ছিল। আর পার্কত্যা প্রদেশের শাসনকার্য্য যে দুই বৎসর কোট অব ওয়ার্ডসের হস্তে ছিল, তাহাতে কোন প্রকার নূতন পরিবর্তন হয় নাই ; সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য নির্বাহিত হইয়াছিল। পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কালিন্দী রাণী বার্ষিক ২৫৮৩/২ পাই জমায় ইজারা গ্রহণ করেন।

“১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রাণী এই ইজারা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ইহা সরকার বাহাদুরের খাসেই শাসিত হইয়াছিল। পরে পুনরায় রাণীর সহিত দুই বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত হয়। পরিশেষে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট কালিন্দী রাণীকে মৃত-স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির সরবরাহকারিণী সাব্যস্ত করেন।” পরন্তু বলা থাকে যে, তাঁহাকে ইতোমধ্যে

Commissioner's letter no.

৫৪৪, d. 10-12-1873.

রাণী কালিন্দী ।

জাত হরিশ্চন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র নামক চিকণবিবির  
নাবালক পুত্রদ্বয়ের (১) উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ

(১) এতদ্ভিন্ন চিকণবিবির এক কচ্ছাও জন্মিয়াছিল। তাহার নাম রাখা হয় চন্দ্রকলা । কিন্তু এই কচ্ছা এক বৎসর অতিবাহিত না করিতেই ভবধাম পরিত্যাগ করে।

এবং হারিবিবি, আটকবিবি, চিকণবিবি ও জামাতা গোপীনাথের যথোচিত ভরণপোষণ চালাইতে হইবে।

তখন হারিবিবি আর উপায়াস্তুর না দেখিয়া কন্ডা, জামাতা ও দৌহিত্র-দ্বয় সমভিব্যাহারে রাজানগরের বাড়ীতে আসিলেন এবং জ্যেষ্ঠা রাণীর

কমা।

পদধারণে স্বীয় দুর্কীব্যহারের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা

করেন। দয়াবতী কালিন্দী রাণী সপত্নীর করুণ

প্রার্থনায় ক্রোধহেষ্ বিম্বিত হইয়া কনিষ্ঠা ভগিনী প্রায় হারিবিবিকে বাহ-  
যুগলমধ্যে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে সবিশেষ আশ্বস্ত করিয়া  
স্বীয় কন্ডা, জামাতা ও দৌহিত্র নির্বিশেষে চিকণবিবি গোপীনাথ ও হরিশ্চন্দ্র-  
শরচ্চন্দ্রকে নিম্ন তদ্বাধানে রাখিলেন। কালক্রমে হারিবিবি সোনাঁইছরী  
বাড়ীতে ভবলীলা সাঙ্গ করেন, তিন মাসের মধ্যে চিকণবিবিও রাজানগর  
প্রাসাদ হইতে মাতার পদাঙ্গুসরণ করিলেন; আবার কিছুদিন পরে হয়—  
দশ বৎসরের বালক শরচ্চন্দ্রও মাতা এবং মাতামহীর সেবায় ইহলোক  
হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল! উপযু্যপরি এই সকল বিপদপাতে বড়রাণী  
নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। জামাতা গোপীনাথকে নিজালয়ে রাখিয়া,  
ক্রমাধ্বয়ে আরও দুই বিবাহ করাইলেন (১)। একমাত্র দৌহিত্র—রাজ্যের  
ভাবী উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্রকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত রাণীর প্রগাঢ় যত্ন  
ছিল; তজ্জন্তু যাহা কিছু সম্ভব, তিনি তৎসমুদয় করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার মিঃ এইচ, এ, ককারেল ১৮৭৩  
খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী সমীপে যে  
পত্র \* দেন তাহাতে দেখা যায়,—“প্রায় ১৮৫৫ খৃঃ

\* Letter no. ৫৪৪.

অঙ্কে রাণীর দরখাস্তের উপর রেভিনিউবোর্ড তাঁহার

রাজস্বের হিসাব পুনর্নিদ্ধারণের অনুমতি প্রদান করেন। ‘প্রাচীন কার্পাসমহলের

(১) চিকণবিবির মৃত্যুর পর গোপীনাথ দেওয়ান প্রথমে কালিন্দীরাণীর ভ্রাতা জয়মণি  
দেওয়ানের কন্ডা কাল্দীকে বিবাহ করেন। তদীয় গর্ভে উম্মিলা নামী এক কন্ডার জন্ম  
হয়। কাচালং—কট্টলীবাগী ত্রীযুক্ত নীলচন্দ্র দেওয়ানের সহিত উম্মিলার বিবাহ হইয়াছিল;  
তিনি এখনও জীবিত আছেন। পরন্তু কাল্দীর মৃত্যু হইলে গোপীনাথ দেওয়ান পুনরায়  
আমুগোহার চিকণখাঁর কন্ডা হীরলাল তালুকদারের ভগ্নী শ্রীমতী জানকীর পানিগ্রহণ করেন।  
তাঁহার হরচন্দ্র, নবচন্দ্র, ভগীরথচন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র চারিপুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র  
অধুনা লোকান্তরিত : নবচন্দ্র এবং ভগবানচন্দ্র রাজমহলের বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন।

বিষয়' বিবেচনা করিয়া (২০১৫১৩ সিকা খাজানায়) তাহা ধরমবল্লভার মৃত্যু কন্তা চিকণবিবির শিশু পুত্রের নিমিত্ত রক্ষা করা হইয়া-  
বন্দোবস্ত ।

ছিল। এই বন্দোবস্ত তখনও সম্পাদিত হয় নাই। কিন্তু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কালেক্টর কর্তৃক (প্রতিবেশী সর্দার) বোমাংকে যে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল, কালিন্দী রাণী সেই মর্মে মালিকী-বন্দোবস্ত প্রার্থনা করিলে—তাহা প্রদত্ত হয়। এই আদেশে বুঝা যায় যে, রাণী নিজেই এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহা কায়েমী অর্থাৎ চিরস্থায়ী; রাণী অধিকারিণী বলিয়া পরিকীর্তিতা। তিনি উত্তরাধিকারিণীর দাবি যাহাতে অসঙ্গত বলিয়া পরিবর্তিত হইতে না পারে, সেই ক্ষমতা লাভের নিমিত্ত বন্দোবস্ত চাহিয়াছিলেন।”

যাহা হউক, অনন্তর হরিশ্চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাণী তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। বহু অশুসন্ধানের পর আত্মীয়-স্বজনদিগের পরামর্শক্রমে লাক্ষ্মীগোছার—পিড়াভাঙাগোষ্ঠিজ রত্নবাঁ দেওয়ানের (১) কন্তা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা সৈরিকৃতীর সহিত রাজানগর প্রাসাদে মহা সমারোহে শুভপরিণয় কার্য সম্পাদন করেন। এই বিবাহে চট্টগ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত

ভ্রলোক এবং পার্শ্বতা প্রদেশের প্রায় সমগ্র অধিবাসী আমন্ত্রিত হইয়া-  
ছিলেন। ঢাকা হইতে গায়ক বাজকর প্রভৃতি আনা হয়; এক পক্ষকাল ধরিয়া গীতবাহাদি চলিয়াছিল! এতাদৃশ আড়ম্বর পূর্ব বিবাহ চাক্‌মাসমাজে এযাবৎ হয় নাই। রাণীর সুবন্দোবস্ত গুণে এই বিরাটব্যাপারেও কোন ক্রটি ঘটয়াছিলনা। ইহার অনেকদিন পরে হরিশ্চন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে রত্নবাঁ দেওয়ানের সর্ধকনির্ধা কন্তা শ্রীমতী মনোমোহিনীকেও তাঁহার বিবাহ করাইয়াছিলেন।

মাত্র এই সমুদয় কার্য লইয়াই মহীয়সী কালিন্দীরানীর শাসনকাল অতিবাহিত হয় নাই। কি উৎকট রাজনৈতিক সংঘর্ষে, কি গুরুতর সমস্তা পূর্ণ ধর্ম ও সামাজিক বিপ্লবে, সর্বত্রই তদীয় মহতী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল! প্রোচ্য ও প্রতীচ্য জগতে এপর্যন্ত যতজন মহিলা রাজ্যভার পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রোচঃস্বরগীয়া সাম্রাজ্ঞী

(১) রত্নবাঁ দেওয়ানের নাসিকা অতিশয় উন্নত ও হ'টালো (“চুচ্যাং”) ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে “চুচ্যাং দেওয়ান” নামে অভিহিত করিত।

ভিক্টোরিয়ার অব্যবহিত নিয়ে একমাত্র কালিন্দীরাণীর নামই সংস্থাপিত করা যাঁহতে পারে। দুঃখের বিষয় তথাপি কোন কোন স্বার্থপীড়িত মহাপুরুষের রূপায় তাঁহার নির্মল চরিত্রের উপর বিকৃত বর্ণ ফলিত হইয়াছে। আমরা উভয় পক্ষ হইতে যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছি, নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করিবেন।

কাপ্তেন লুইন স্বয়ং একস্থলে লিখিয়াছেন \* ;—“১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা পার্শ্বতা প্রদেশের আভ্যন্তরীণ মিতব্যয়িতার মুখ্যভাবে হস্তক্ষেপ করিনাই। সেইবৎসর ত্রিপুরা জেলার নিকটবর্তী কুকিগণ ( খঙলের ) ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রজাদিগের উপর কয়েকবার হত্যাপূর্ণ অত্যাচার করিয়াছিল (১)। এই বিপ্লবসমূহ এক্রপ ভীষণ ভাবে প্রকাশ

\*The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein — P. 23.

পাইয়াছিল যে, গভর্ণমেন্টের ভয় ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়াছিল। অবশেষে সীমান্তপ্রদেশরক্ষার নিমিত্ত এই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন।”

এবং এই বৎসরের “১লা আগষ্ট ২২ আইনা-  
নুসারে ( সুপারিন্টেণ্ডেন্টের শাসনাধীন ) পার্শ্বতা  
প্রদেশকে চট্টগ্রাম হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র

A Statistical Account of Bengal—Vol. III P 18.

জেলা স্বরূপে পরিগণিত করা হয়।” কিন্তু “চট্টগ্রামের কালেক্টর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে যাবৎ (অত্রত্য) খাজানা-  
সংগ্রহ সংক্রান্ত কাগজাদি সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে  
প্রদান করেন নাই।” পরে “১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই

Revenue History of Chittagong—P. 190

(নব গঠিত) জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পদবী সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পরিবর্তে ডেপুটিকমিশনার আখ্যা হয়। তিনি এই পার্শ্বতাপ্রদেশের

(১) তাহারায় ১৬০ জন ইংরাজ প্রজা হত্যা করে, এবং শতাব্দিক লোক ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ “রাজমালা” ৩৬১-৩৬৭-৩৭০ পৃষ্ঠায়ও আছে। পরবর্তী জাহ্নুয়ারীতে আবার তাহারায় উৎপাত আরম্ভ করে, সেই সময়ে ত্রিপুরাধরের উদয়পুরাদি ধ্বংস করিয়া কালিন্দীরাণীর অধিকৃত কয়েকখানা গ্রাম পুড়িয়া দেয়। তখন রাণীর প্রার্থনানুসারে, তাহাদের দমন করিতে ইংরাজ সৈন্যগণ ‘ষড়কল’ ( ইহার পরিচয় ১২০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেওয়া হইল ) পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহাতেই তথ্য হইতে ১৮ মাইল দূরস্থিত বিজোহী কুকিরাজ রতন পু’ইয়ার অধিকারস্থ প্রজাগণ ঘরবাড়ী জালাইয়া পলাইয়া যায়। অনন্তর সেই মনে রতন পু’ইয়ার আত্মসমর্পণ করে।

ব্যবহৃত শাসন ও বিচারকার্য চালাইবার ক্ষমতা

লাভ করেন; এবং সেই সময়ে এই জেলা

The Hill Tracts of  
Chittagong and the  
dwellers therein, P. 23.

সবভিতিসনেও বিভক্ত হয়। নিম্নতন কর্মচারী-

দিগের উপর তথাকার ভার থাকিত।" এতদ্ভিন্ন তখন বিচারাধি চালাইবার নিমিত্ত গভর্ণমেন্ট হইতে কয়েকটি বিশেষ বিধি নির্ধারিত হয়। যথা—

১। পাহাড়ীদের মধ্যে অভিযোগ ঘটিলে পক্ষসমর্থনার্থ উকিল-মোক্তারাদি কোন আইন-ব্যবসায়ী দিতে পারা যাইবেন। ২। ষ্টাম্পের প্রয়োজন হইবেনা; যথাসম্ভব স্বল্প খরচায় আইনানুসারে সরল ও জায্যবিচার প্রদান

করিতে হইবে। ৩। জাতীয় আচার ও সংস্কার

মানিতে হইবে, এবং তৎপ্রতি সম্মান দেখাইবে।

৪। ডেপুটিকমিশনার মাজেস্ট্রেট-কালেক্টরের পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

একমাত্র বিভাগীয় কমিশনারের নিকট তদীয় বিচারের 'আপিল' চলিবে,

এবং গুরুতর অভিযোগের শেষমীমাংসাও তিনি করিবেন। পরিশেষে

১৮৯২ অব্দে লুর্সাই পর্বত ইংরাজের অধিকৃত হইয়া গেলে, পার্শ্বতা

চট্টগ্রামের শাসনকার্যাদি চট্টগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা হয়। ১৯০০

সনে এতাকার নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেন্ট এক বিধান 'পাস' করেন, পরিশিষ্ট

ভাগে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

বস্তুতঃ এই পার্শ্বতা প্রদেশ স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত হওয়া অবধি আভ্যন্তরীণ

ব্যবহৃত কর্মে গভর্ণমেন্টের স্বল্প দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্বে চট্টগ্রামের

অধীনে অবস্থান কালে নিরীহ পাহাড়ীগণের প্রকৃত অভাব-অভিযোগাদি

জ্ঞাপন করা দুঃসাধ্যই ছিল। জেলা-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বতা চট্টগ্রামের

ইংরাজ গভর্ণমেন্ট। সীমান্তবর্তী চন্দ্রধোনায় বিচারালয়াদি প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, তাহাতেও, পাহাড়ীদিগের অসুবিধা

বহু পরিমাণে নিরাকৃত হয়। এখানে বসিয়াই আগারুয়া (যাহারা উপরে

গিয়া বাঁশবেতাди কাটিয়া আনে,)-দের নিকট হইতে 'ট্যাক্স' আদায় করা

হইত। অনন্তর ইহাদের আরও অধিকতর সুবিধা-মানসে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের

১লা জানুয়ারী সমুদয় অফিস পার্শ্বতা চট্টগ্রামের প্রায় কেন্দ্রস্থল—রাঙামাটিতে

স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আবার সমুদয় গভর্ণমেন্ট

শেষোক্ত বিশেষ ব্যবস্থা কয়টিদ্বারা পাহাড়ীদিগের সহজে সুবিচার

পাওয়ার পথও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অন্তরের সহিত স্বীকার



করি যে, মাননীয় ইংরাজ গভর্নমেন্টের ঈদৃশী নীতিতে প্রজাসাধারণের সুখসমৃদ্ধি অশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তদ্বারা দেশীয় রাজার ব্যক্তিগত প্রাধান্ত উচ্ছেদ প্রায় হইয়াছে। “রাজামালা” কারও

\* ৩৩৪ পৃষ্ঠা।

ইহা লিখিয়াছেন \*, “১৭৮২ শকাব্দে ( গভর্নমেন্ট )

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করেন। তদবধি ক্রমে ক্রমে চাক্‌মাসরদার-দিগের রাজশক্তি হরণ পূর্বক তাহাদিগকে সাধারণ জমিদারশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।”

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট চাক্‌মারাজার ১৪ ও ৮৬ নম্বর ‘লাট’ নিলাম করিতে চাহিলে কালিন্দীরানী তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত করেন। ইহাতে চট্টগ্রামের কালেক্টর ১৮৬৬ ইংরাজীর ২রা জানুয়ারী যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

“জাবেদনকারিণী সমুদয় লাটের বিক্রি সম্বন্ধে বলেন, এই সমস্ত ভূমি তদীয় সত্ত্বাধিকৃত জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত; গভর্নমেন্টের খাস নহে। তিনি বাঙ্গালা ১১৭০ সনের ৬ই শ্রাবণ, ইংরাজী ১৭৬০ সালে ঘোষণার উপর নির্ভর করিয়া এই আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে তদা-

নীন্তন চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রশ্নান কর্তা মিঃ হারি ভেরিলট্

প্রাচীন সীমা।

সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেহী হইতে শস্য, এবং

নেজামপুর রাস্তা ( যেখ হয়, ইহা বর্তমানে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকাভিমুখে প্রবাহিত রাস্তা—Dacca Trunk Road ) হইতে কুকিরাজ্য পর্য্যন্ত সমগ্র পার্বত্যপ্রদেশ রাজা সেরমুন্স খাঁর জমিদারীর কার্ণামহাল ভুক্ত; এবং আদেশ ছিল,—গভর্নমেন্টের রাজস্ব চালাইলে ইহা, তাহার দখলেই থাকিবে। আর অধস্তন কর্মচারিগণকে বারণ করিয়াছিলেন, যেন তাহার পরস্বর্তী উত্তরাধিকারীদিগের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা না হয়। ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, যদি এই দাবি স্বজায় রাখা বাইতে পারে, তবে কোন আইন-সঙ্গত উপায়ে ইহা রাণীর পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উক্ত ঘোষণার সীমাবদ্ধ পার্বত্য প্রদেশের সর্বত্রই রাণীর স্বত্ত্ব সমভাবে বর্তিবে।

( স্বাক্ষর ) এ, স্মিথ,

কালেক্টর।”

এই কৈফিয়ত দেখাইয়া কালেক্টর মিঃ স্মিথ ১৭ই জুলাই ( ১৮৬৬ খৃঃ অঃ ) রাণীর দাবী অগ্রাহ করেন। রাণী মাননীয় বোর্ড-সমক্ষে ইহার আপিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ নম্বর পত্রযোগে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন,—

“কালেক্টর অতি সাবধানতার সহিত ইহার বিচার করিয়াছেন। পতিত

জমির উপর রাণীর কোনও স্বত্ত্ব নাই। তিনি পাখাড়ী জুমিয়াদিগের

সরদার। রাণী ভূমির কর গ্রহণ করিতে পারেন

না, কেবল মাত্র ‘পারিবারিক-কর’ (১) লইয়া থাকেন। কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করেন যে, গভর্ণমেন্টই পতিত ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী, তাহা অপর কোন প্রকার স্বত্ত্ব দ্বারা ভারগ্রস্ত হয় না। অতএব এই আপিল অগ্রাহ করা হইল।”

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট লেপ্টেন্যান্ট টি, এইচ, লুইনকে ‘কাপ্তেন’ (২) রাজসন্মান দিয়া পার্কতা চট্টগ্রামের সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্বরূপে পাঠান। পরে অবশ্য যথাসময়ে তিনি ‘ডেপুটি কমিশনার এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি’ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫ই মে তিনি অত্রত্য কার্যভার গ্রহণ করেন। ফলতঃ তাঁহার হস্তেই এদেশে ব্রিটিশের অধিকার ও প্রাধান্ত সুদৃঢ় হয়। এখানকার সাধারণ লোকেরাও আরও বহু কাল ধরিয়া ‘লুইন সাহেব’কে স্মৃতিষাণ্ডে সযত্নে রক্ষা করিবে। কিন্তু কেন জানিনা, প্রথম হইতে কালিন্দীরানীর উপরে তিনি সন্দ্বিগ্ননয়নে দৃষ্টি স্থাপন করেন! উভয়েই লোকাভীত প্রতিভাশালী, এবং কার্যদক্ষতায় অসীম ধন্যবাদার্থ! সংস্কারবাদী মাইকেলের কথায় বলা যায়,—“কুক্ষণে ভেটিলে দৌহা, দৌহে রিপুভাবে!” লুইন মহোদয় তদীয় “এ ফ্লাই অন দি হুইল” (A Fly on the wheel) নামক গ্রন্থে রাণী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষেপতঃ তাহা উল্লেখ করিতেছি।—

“রাণী বুদ্ধবিধবা ছিলেন। তিনি কতিপয় স্বার্থসংপৃক্ত মন্ত্রী পরামর্শে চলিতেন এবং আমি যতকাল (চট্টগ্রাম) পার্কতা

Page—326.

প্রদেশে ছিলাম, সর্বদাই মদীয় বিরুদ্ধাচরণ করিয়া—

ছিলেন। প্রথমবারে রাণী আমার বিচারের বিরুদ্ধে প্রথমে কমিশনারের নিকটে, পরে হাইকোর্টে ‘আপিল’ করেন। যাহাহউক, আমি বড়ই সতর্ক হইলাম। যখন কোথাও সন্দেহ হইত, তাহা বন্ধুগণের কমিশনার

অনুযোগ।

মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত স্মৃগিত রাখিতাম; এইরূপে আমার কোন ক্রটি ধরিতে পারা যায় নাই। পরে আমার উপর নানা দোষারোপ করিয়া কলিকাতায়

(১) ১০৫ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় এই ‘পারিবারিক-কর’ পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

(২) Captain in Her Majesty's 10th Regiment.

কতকগুলি (বেনামী) ‘উড়োচিঠি’ প্রেরিত হয়। বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট কৈফিয়ত দিবার নিমিত্ত আমার নিকটে সেই সমস্ত প্রেরণ করেন। বস্তুতঃ এই যুক্তিগত অপবাদ গুলি খণ্ডন করিতে আমাকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই। এইরূপে নানা উদ্ভেজনাপূর্ণ বেনামী চিঠি ও আবেদন

অগ্রাহ্য হইয়াছিল। অনন্তর লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর

Page—327.

আমার বিরুদ্ধে বহুবিধ অবিচার ও অত্যাচার

বিবরণী সম্বলিত সাতজন পাহাড়ী নেতার স্বাক্ষরযুক্ত এক খানি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে আমার কার্যস্থলে অনুসন্ধান করিতে তিনি চট্টগ্রামের কমিশনারকে লিখেন। কমিশনার আসিয়া উক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারী নেতা সাতজনকে ডাকাইলেন। কিন্তু সকলেই এই অভিযোগ এবং স্বাক্ষর অস্বীকার করেন। অধিকন্তু অনেকে মদীয় শাসনে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া কমিশনার সমীপে আবেদন করিলেন। শুনিয়া সুখী হইলাম, ইহাদের মধ্যে বর্তমান বোম্বা রাজা মংফ্রুও একজন। এবং মওরাজা ক্যাজটাই স্বয়ং গিয়া কমিশনারকে অনুরোধ করেন যে, আমাকে এই পার্শ্বতা প্রদেশ হইতে যেন স্থানান্তরিত করা না হয়।”

“পরন্তু এই অনুসন্ধান-ফলে আমি উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম এবং আমার কার্যদক্ষতার ধন্যবাদসূচক পত্রও পাইয়া-

Page—328.

ছিলাম। রাণীর (?) নিগ্রহ-চেষ্ঠা সত্ত্বেও যে উন্নতি

হইল, তজ্জন্ত আমি নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমার সম্মানের উপর আক্রমণে বিফল মনোরথ হইয়া, অবশেষে তিনি (?) মদীয় জীবননাশে ক্লতসংকল্পা হইলেন। একদা আমি “মহাগুনি-মেলা” (১) হইতে অতিশয় ক্লান্ত শরীরে বাসায় আসিয়া কিছু আগেই ঘুমাইতে

Page—329.

যাই; কিন্তু ঘুম হয়না। কিয়ৎক্ষণ পরে চুরুট জ্বালা-

ইতে উঠিয়া দেখিলাম, দীপশলাকার বাতাসী নাই; চাকরেরা আমার আবাস-শৈলের নিয়ন্ত্রিত তাহাদের বাসগৃহে চলিয়াগিয়াছে। × × হঠাৎ দেখিতে

পাইলাম, একখুনি জানালা খোলা রহিয়াছে।

হনন চেষ্ঠা।

আমার সন্দেহ হইল। বালিসের নীচে প্রত্যহ রাত্রি-কালে গুলিভরা একটি পিস্তল থাকিত; তাহা লইয়া নিঃশব্দে বিছানা হইতে

(১) মল্লিখিত “মহামুনি” শীর্ষক প্রবন্ধে এই সেলার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য:—  
“কোহিমুর,” কাস্তন-চেত্র, ১০১১।

নামিয়া পড়িলাম ! এবং উক্ত জানালার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া সতর্কতার সহিত দেখিয়া রহিলাম । কুম্ কুম্ মন্থণা হইতেছিল ; দরজার পথে চারিজন মন্থণের ছায়া পড়িল । ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তাহাদের

Page—330.

বর্শাও ক্ষীণ জ্বলিতেছিল । তখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা হইতেছিল যে, কে প্রথমে প্রবেশ করিবে ! অনন্তর একজন ঢুকিয়া, আমার শৃঙ্গ শয্যার উপর ছুরিকাঘাত করিতে লাগিল । আর অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই । তাহাদের তাড়াইতে পিস্তলের সহিত ভীষণ চীৎকারে বাঁপ দিয়া পড়িলাম । তথায় এক কর্কশ শব্দ উঠিল ! আমি দ্রুত কাপুরুষের উপর পিস্তল ছুড়িলাম । পরে প্রহরী এবং চাকরেরা আসিল ; এক মহা গড়গোল পড়িয়া গেল ! তাহাদের মধ্যে একজন আহত হইয়াছিল, এবং এক পার্শ্বে দুইটী বর্শা পড়িয়াছিল । তাহা ছাড়া “বান্দালা” হইতে পশ্চাৎ অভিমুখে রক্ত-ধারা দৃষ্ট হইল । ঘলা বাহ্য, তাহারা সকলেই পলাইয়াছিল ; কে কে যে ইহাতে লিপ্ত ছিল, তাহা আমি কোনরূপে বাহির করিতে পারি নাই । শুনিয়াছিলাম, রাণীর উস্তে-জনাতেই ইহা ঘটিয়াছে । কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার উপযোগী প্রমাণ পাইতে পারি নাই । অতঃপর কিছু দিন আমার নিদ্রা যাওয়ার সময় বারান্দায় একজন প্রহরী থাকিত । পরে যখন আমার বন্ধু মওরাজার উপদেশ শরনকক্ষ পবিত্রস্থানে পরিবর্তিত করিয়া, সেখানে তাঁহার প্রদত্ত একটী সুন্দর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলাম, তদবধি আমি সেই পবিত্রমূর্তির রক্ষণাধীনে নির্নিয়মে নিদ্রা যাইতাম ।”

কোন নিশ্চিত প্রমাণ না পাইয়াই এরূপে তিনি রাণীর উপর অযথা নানা প্রকারে দোষারোপ করিয়াছেন । তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, চাক্রাদিগের মধ্যে বর্শার ব্যবহার নাই । আর এতাদৃশ গুরুতর কার্য-সম্পাদনের নিমিত্ত কোন বিজাতীয় লোককে বিশ্বাস করা রাণীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে ! তখনও কুকির উপদ্রব সম্পূর্ণ দমিত হয় নাই ; তাহাদের কর্কক যে ইহা ঘটে নাই, কে বলিবে ? বিশেষতঃ কোন বিচার-কর্তার বিরুদ্ধে ‘আপিল’ করিলেই যে শত্রুতাচরণ করা হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত । স্বার্থে আঘাত পড়িলেও প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে লোক প্রত্যক্ষে আসিতে ভয় পায় । সূতরাং নাম গোপন করিয়া প্রকৃত অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা সর্বত্রই দুর্বল মানবের পক্ষে একমাত্র উপায় ; তাহাতে

আবার প্রাচ্যদেশের (১) প্রতি এত কটাক্ষ কেন? এ সকল যে কালিন্দীরাগীর যোগে হইয়াছিল, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দুঃখের বিষয় জানিতে পারিলাম না, যে সাতজন পাহাড়ীনায়েকের নাম আবেদন পত্রে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার কোন জাতীয়! বিচারকার্যে ডেপুটি কমিশনারের সহিত দেশীয় রাজা হইতে প্রজার সম্পর্ক কম ছিল না! অতএব বোমাং ও মণ্ড্রাজা তদীয় শাসন-বিচারে সন্তোষ প্রকাশ করিলেও রাণী নীরব থাকায়, তাহার উপরেই যাবতীয় সন্দেহের আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। বোমাং ও মণ্ড্রাজার একরূপ ‘গায়ে পড়িয়া’ ক্রতজ্ঞতা স্বীকার করিবার কারণও ছিল। এই নূতন রাজা মক্ষুকে তিনিই বোমারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অতঃঃ তাহার রূপা না ঘটিলে বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত আমরা মণ্ড্রাজার নাম শুনি-তাম না। কেননা আমরা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, পূর্বে মণ্ড্রাজার স্বতন্ত্র কোনও রাজা ছিল না। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুঞ্জশামাই নামধেয় জনৈক মনসদার ৭৮ শত পরিবার প্রজা লইয়া চাক্ষু-রাজ্যকে বার্ষিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা “মাটিপোড়া খাজানা” (২) দেওয়ার স্বীকারে

মণ্ড্রাজার বিবরণ। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন (৩)। তিনি পরে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে

সরিয়াছেন। কুঞ্জশামাইর পুত্র কাজচাঁই, কাপ্তেন লুইনের শাসনকালের প্রথম ভাগেও কালিন্দীরাগীকে এই রাজ্য দিয়াছেন। শুনিয়াছি, রাণীর তদানীন্তন নায়েব—বর্তমান গ্রন্থকারের প্রাতিশ্রুতীর মাতামহ চট্টগ্রাম ফটিকছরী থানার অন্তঃপাতী ধুক্ষগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গত হরগোবিন্দ রাহা মহোদয় এই “মাটিপোড়া খাজানা” উক্ত মনসদার হইতে আদায় করিয়াছিলেন; এবং অতঃঃ নায়েব শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দেওয়ানও সেই কর উত্তল (৪) করিয়াছেন।—অতঃঃ তিনি জীবিত

(১) কাপ্তেন লুইন “এ কুই জন দি ছটলে” পুর্নোক্ত উড়োচিঠির কথা উত্থাপন করিবার সূচনার বলিয়াছেন,—“Next a very harassing mode of attack was adopted, and one much in favour in the East.”—Page 326.

(২) “মাটিপোড়া খাজানা” অর্থাৎ জুমকর। জুম জালাইতে মাটিও পোড়া যায় বলিয়া, ইহাকে ‘মাটিপোড়া’ বলা হইয়ছে।

(৩) ইনি নাকি বোমাং এর অধিকার হইতে পলাইয়া আইসেন; উক্ত মনসদার হয়।

(৪) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের বাৎসর্য্য সার্কুল বিভক্ত হইয়া গেলে, গিরিশচন্দ্র মণ্ড্রাজার

(১)। লুইস কাজটাইর ব্যবহারে বিশেষ সম্বল হইয়া তাঁহাকে নাকি চাক্‌মারায় কর বন্ধ করিতে পরামর্শ দেন। পরে তিনি গভর্ণমেন্টে বিস্তর লিখিয়া চাক্‌মারাজ্য হইতে মওরাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া যান। কালিম্বী ইহার জন্ত বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টে 'আপিল' করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দাবি অগ্রাহ হয় (২)। সুতরাং কেবল কাজটাই কেন, মওরাজ্যের উপভোগকারী পুরুষানুক্রমে সকলেরই কাণ্ডে লুইনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি কষ্টব্য।

কাজটাইর সহিত লুইনের সৌহার্দ-নিদর্শন দুই এক স্থলে দেখাইয়া আসিয়াছি। পাঠকবর্গের বিদগ্ধ দৃঢ়বদ্ধ করিতে, এস্থলে আর একটি চিত্র তদীয় “এ ক্লাই অনু দি হইল” হইতে তুলিয়া দিলাম :—“মও চিকের বাগস্থান মাগিকছরীতে পৌঁছছিলে, রাজার নিজগৃহের এক বৃহৎ কামরায় আমি রহিয়াছিলাম। ইহা অবশ্য বিশেষ অলুপ্তের লক্ষণ। এযাবৎ কোনও ইংরাজ পুরুষ

Page—359.

এতদূর পারিবারিক আত্মীয়তার মধ্যে স্থান পায় নাই। আমার মাধ্যমিক

অধিকার-মধ্যে পড়েন। মওরাজার মানেজার বাহু পূর্ণজ দাসকে এখন কর দিবস সমস্ত ব্রিটিশবাহু সবিধানে বলিয়াছিলেন,—‘হার অমৃষ্ট—এই হাতেই মওরাজ্য হইতে স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছি, আমার এই হাতেই মওরাজ্যকে স্বাধীন রাখে হইতেছে।’

(১) এস্থলে পরম দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পুস্তকের এই অংশ লিখিত হওয়ার কিছুকাল পরেই তিনি পক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(২) এ সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের ককুরিয়ত এই (Letter no. 543 P. D. dated—7. 10. 1898) যে, “the first Mong Raja having been an Arracanese Mug whom it was convenient to the Government to place over the tribes in the north, as being the most important person in those parts.” তাঁহারা বলেন, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই পার্বত্য প্রদেশ স্বতন্ত্র জিলারূপে গঠিত হইলে উত্তরাংশের শাসনকার্য ভাল চলিতেছেনা দেখা গেল। যদিও ইহা চাক্‌মারাজ্যের নামাজ্য অধিকারে ছিল, কিন্তু কলে দূরে থাকিতে লোকজনের উপর প্রকৃত শাসন চলিত না। কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ জালাইতে পারে এমন কোন উপরিত্ত তথ্য না থাকিতে, বড়ই অসুবিধা ঘটতে লাগিল। কাজটাই সেইখানকার সম্মানিত ও অবদানপন্ন ছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাই তাঁহাকে তত্ত্ব সন্ধান মনোনীত করেন।

অধিকন্তু শুনা যায়, কাজটাইকে “খামাই” বা ডাকিয়া “মওরাজ্য” বলিবার নিমিত্ত কাণ্ডে লুইন দেশবিশেষে চেষ্টা পিটাইয়াছিলেন। সুতরাং এই ‘মওরাজ্য’ পদবী লুইনেরই প্রদত্ত হইবে। সে বাহা হউক এস্থলে আমরা মওরাজ্যবংশের একখানি ডালিকা প্রদান করিলাম :—

সৌন্দর্য

ভোজনের সামগ্রী ( মণ্ড ) রাণীর নিজ তত্ত্বাবধানেই  
প্রস্তুত হইয়াছিল । পরিবেশন-কালে তিনি স্বয়ং

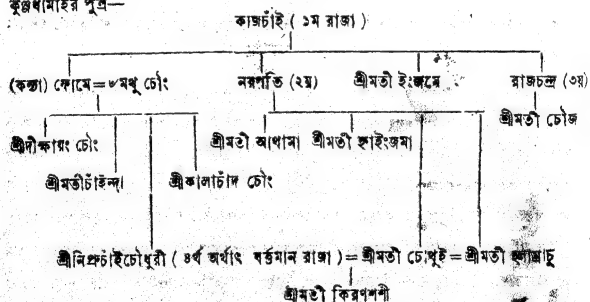
উপস্থিত থাকিয়া, সুকোমল অঙ্গুলিনিচয়দ্বারা কয়েকটি বিশেষ মনোনীত  
সামগ্রী নির্দেশ পূর্বক, আমাকে খাইতে অহরোধ এবং জেদু করিয়াছিলেন ।  
বেতসাগ্র, বংশমূল প্রভৃতি অনাস্বাদিতপূর্বক দ্রব্যও আমি সাহসের সহিত  
খাইয়াছিলাম । অনন্তর গৃহকর্ত্রী অতিথি-সংস্কারের উদ্দেশ্যে ঈষৎ হাসিতে  
হাসিতে আসিয়া মৎসঙ্গুখে একটি পিতল পাত্র স্থাপন  
করিলেন । ইহাতে তৈলেভাজা নরম চারিটি

Page—360.

খেতকীট ( ১ ) ছিল । তিনি তজ্জনী ও বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠযোগে তাহার একটি লইয়া  
আমার কম্পিত ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দিতে চাহিয়াছিলেন । আমি ধন্যবাদ দিয়া  
অনিচ্ছাসূচক হাসির সহিত তাহা দূরে ফেলিলাম । কিন্তু যখন তাঁহাকে  
সন্তোষজ্ঞাপনের চেষ্টা করিয়াও মুক্তিলাভ অসম্ভব বুঝা গেল, তখন আমার  
সম্ব্যাহারের সম্মান রাখিবার নিমিত্ত সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল । পরে  
বিদায়কালে রাজার অহরোধে তাঁহার ক্ষুদ্র বালক—নরপতিকে স্বীয় পুত্রবৎ  
সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম ।”

ইহা হইতেই সম্ভবতঃ কাপ্তেন লুইন মনে করিয়াছিলেন যে, পার্শ্বত্যাগে  
অবরোধপ্রথা নাই । তাই তিনি অতঃপর একবার কালিন্দীরানীর সহিত

কুঞ্জধামাইর পুত্র—



(১) চাকমারাজ এই পোকা খায় । তাহার ইহাকে “মিছু পোগ” বলিয়া থাকে ।  
বীণের মধ্যে পাওয়া যায় । নিত্যন্ত ক্ষুদ্র পাওয়া গেলে নবোদগত বীণে ছিদ্র করিয়া উন্মাদে  
রাখে এবং মুখে ছিপি দেওয়া হয় । সেই বীণের অভ্যন্তরভাগস্বাভাৱে কিছু বড় হইলে ঐরূপে  
অল্প বীণে রাখে, এই প্রকারে বীণ পরিবর্তন দ্বারা পোকাটি ক্রমে বৃহত্তর হইয়া থাকে । অনন্তর  
জানিয়া খাইতে নাকি বেশ আশ্বাস লাগে । ইহা বড়ই তৈলাক্ত ।

দেখা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন ; কিন্তু রাণী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন । তজ্জন্ত তিনি সবিশেষ কুপিত হইয়া, কতিপয় পাহাড়ীকে দাসস্বরূপে

আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ছলনায়—কালিন্দীরানীকে

বন্দী করিতে উপযুক্ত সংখ্যক সিপাহী সমভিব্যাহারে সহকারী মিঃ রেইণীকে পাঠাইয়াছিলেন । রেইণী প্রথমে রাজবাড়ীতে উপনীত হইয়া দাসরূপে আবদ্ধ লোকগণকে তলব করেন ; রাণী তাহাতে কোনও বাধা দেন নাই । পরন্তু তাহারা সকলে একবাক্যে স্বেচ্ছাকৃত চাকরী স্বীকার করিয়া যায় । তখন রেইণী আর কোন পথ না পাইয়া বিফল মনোরথে প্রত্যাবর্তন করেন । ইহাতে কাপ্তেন লুইনের নির্যাতন-স্পৃহা দূর না হইয়া বরং ঘূতপ্রকৃষ্ট-অনলবৎ আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে । অবশেষে তিনি ‘হাতে না পারিয়া দাঁতে’—কাগজেকলমে রাণীর ধ্বংসস্তব অনিষ্ট করিয়া যান ।

লুইন মহোদয়ের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ(১) ঘটবার কারণ আমরা সবিশেষ অবগত নহি । উপসংহার ভাগে তচ্ছিত্রিত বাঙ্গালীর ছবিও দেখাইব । পরন্তু তিনি কালিন্দীরানীর সমালোচনায় বাঙ্গালী কৰ্ম্মচারিগণকেও অশুযোগ-ভাগী করিতে যাইয়া একস্থলে লিখিয়াছেন\*,—“সতত-  
যত-বিরোধী রাণী এবং তদীয় বাঙ্গালী মন্ত্রিগণ ভিন্ন  
জেলায় সমস্ত নায়কদিগের সহিত আমার সঙ্গাব

\* A Fly on the  
wheel—P. 37.

অশুযোগে—কালিন্দীরানী  
ও বাঙ্গালী কৰ্ম্মচারী ।

ছিল ।” বোধ হয়, তিনি এবস্থিৎ মন্তব্য সম্বলিত একখানি শুণ্ড লিপি বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দিয়াছিলেন । কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেই সময়েই অস্থায়ী কমিশনার লর্ড এইচ, ইউলিক ব্রাউন বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টে লিখিয়াছিলেন, † “কালিন্দী রাণী ব্যতীত অত্যাঙ্গ রাজা ও প্রজাগণ লুইনের সবিশেষ প্রাধান্য স্বীকার করে ।” আরও আছে, “এখানে পার্শ্বভ্য প্রদেশের অনিষ্টের একমাত্র কারণ, পার্শ্বীয়শাসনকার্যের বিষয় অন্তরায়-স্বরূপিনী, বাঙ্গালী মন্ত্রী পরামর্শ-পরিচালিতা কালিন্দীরানী, তহনীলদার

† Letter no. 421,  
dated 12-11-1888.

(১) এ সম্বন্ধে তদীয় ‘A Fly on the Wheel’ এ বিবৃত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । “The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein” এর উপসংহারও লিখিয়াছেন,  
‘With the Bengalees I have never been accord.’



বিনিয়োগের পরিবর্তে অব্যবহৃত সহিত পাট্টা দিয়া, বহুকাল প্রচলিত পদ্ধতির উচ্ছেদে চাক্ষুসীদিগের অসন্তোষোৎপাদন এবং প্রজা সাধারণের অশেষ অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন। পার্শ্বভাগে তালুকের জমির জায় বন্দোবস্তভুক্ত হইয়া থাকে। প্রায়শঃ বাঙ্গালীরাই (জুমিয়ারদের কর বাড়াইয়া ও নিজেদের কমিশন না দিয়া) উচ্চ হারে বন্দোবস্ত গ্রহণ করে। ইহাতে দেওয়ান প্রথা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। গ্রাম্য বিচারাদির নিমিত্ত বন্দোবস্ত নাই। পাট্টাদারেরা কিয়দংশ রাখিয়া অবশিষ্ট তালুক বিক্রয় করে। তন্নিমিত্ত পাহাড়ীদিগকে (অধিকারীর সঙ্গে সঙ্গে) একগ্রাম ছাড়িয়া অপর এক নতুনগ্রাম গঠন করিতে হয়। এই সমুদয়ে শাসন কার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। x x x x কালিন্দীরাজীর প্রার্থনার মধ্যে দুইটী প্রধান।—১। তাঁহাকে দৌহিত্রের য্যানেজার স্বরূপ গণ্য না করিয়া চাক্ষুসীদিগের শাসনকর্ত্ত্বরূপে স্বীকার করা হউক, এবং ২। তাঁহাকে নির্দিষ্ট করে বন্দোবস্ত দেওয়া যাউক। x x x x অনেক চাক্ষুসী প্রজা চাষের জমি প্রার্থনা করিয়াছে, ইহাতে কালিন্দী রাজীর স্বীয় প্রজার প্রতি অবজ্ঞা এবং বাঙ্গালীদিগের যোগে শাসন-অত্যাচার সূচিত হয়। পাহাড়ীগণ বলে, 'তিনি (কালিন্দীরাজী) আমাদেরকে বাঙ্গালীর মুস্কেফিতে (১) ছাগলের মত বিক্রয় করেন।' চাক্ষুসীরা তদীয় অধীনতা পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে চায়; কেন না তিনি অধীশ্বরের কোনও কর্তব্য পালন করেন না। প্রজাপণ বখন সর্দার কর্তৃক উপাধিভুক্ত হয়, তাহার আর তাঁহাদের অধীনে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, বাস মৌজায় আশ্রয় দেওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র যদি গীত্র রাজ্যত্যাগ গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার প্রজাপণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে—আমি আশ্রয় হইব না! কারণ, এখনই তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। অনেকে বাস মৌজায় বন্দোবস্ত প্রার্থনা করিয়াছে। x x এই তালুকদারী-প্রথা রহিত হইয়া চাক্ষুসীদিগের মধ্যেও রোয়াবা (২) মিয়োজিত হউক। x x x হৃৎথের সহিত বলিতেছি যে, আমি যাহা প্রস্তাব করি, তিনি (কালিন্দীরাজী) সমস্তেরই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।” স্পষ্টই বুঝা

(১) পাট্টাগ্রহিতা বাঙ্গালীগণ চট্টগ্রামের মুস্কেফিতে প্রজাদের নামে লালিস উপস্থিত করিতেন।

(২) 'রোয়াবা'—এই পার্শ্বভাগদেশীয় মধ্য ও ত্রিপুরাদিগের গ্রাম্যমণ্ডলের উপাধি। তিনি কন আদালত এবং গ্রাম্য সাধারণ বিচারাদি নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

বাইতেছে—লর্ড ব্রাউন যাহা লিখিয়াছেন, এতৎসমুদয়ই কাপ্টেন লুইনের বারপার প্রতিধ্বনি স্বাক্ষর ! পরন্তু রাণীর মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পরবর্তী, লুইন মহোদয়ের স্থলাভিষিক্ত মিঃ এ, ডব্লিউ, বি, পাউয়ার (১) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ৪৭২ নম্বর পত্রে সেই ‘সংস্কারে’ বিভাগীয় কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন,—“ধর্মবিশ্বাসের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী কতিপয় অসংমন্ত্রী হাতে পড়িয়া অপরাপর কুনীতির মধ্যে—হিন্দু আইনানুসারে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ এবং মনুষ্য-তালকের অংশ বিক্রয় অনুমোদন করিয়াছিলেন।”

এইরূপে ‘বিড়াল শাবকে বাঘের উপদ্রব প্রচারিত হইয়া (২)’ রাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রমেই গুরুতর হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য বাঙ্গালী কর্তৃত্বাধিগণও নিমিত্তভাগী হইয়া পড়িয়াছেন। যে সমুদয় বাঙ্গালীমহন্যাদাতার স্বক্কে রাজপুরুষেরা দোষারোপ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শর্গীয় নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (বাড়ী—কেলিসহর, চট্টগ্রাম) এবং জগন্মোহন গুহ (বাড়ী—ভূবি, চট্টগ্রাম) এই দুইজনই প্রধান ছিলেন। রাণী প্রায়শঃ তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন। কিন্তু সাধারণ্যে তাঁহাদের কোন অপবাদ নাই, অধিকন্তু সজরিত্ততারই প্রসিদ্ধি আছে। তবে হইতে পারে, তাঁহারা স্বজাতিবাৎসল্যে কোন কোন বাঙ্গালীর প্রতি অনুরাগিত অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে নিরীহ চাক্ষুশগণ উৎপীড়িত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের ‘পক্ষ-সমর্থনার্থ’ এই মাত্র অনুমান করা যায়; নতুবা তাদৃশ ভীতিবজ্রক বর্ণনার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে রাণীর প্রকৃতি যাদৃশ বিকৃত ভাবে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টও বিরক্ত না হইয়া পারেন নাই।

(১) ইনি ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ৩রা জুলাই পার্কাডা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংহাই দ্বারা পার্কাডা ত্রিপুরার পূর্ব প্রান্ত এবং লুসাই এদেশের সীমা নির্ধারিত হয়।

(২) কথিত আছে, একবার্ত্তি কোনও বাজারের স্তম্ভের পার্শ্ববর্তী ‘খানায়’ একটা ছুর বিড়ালশাবক দেখিয়া বাথ। কিন্তু সে শিয়া অপর একজনকে নিকট বর্ণনাকরে যে, “বাজারের স্তম্ভের পার্শ্বে এক একাঙ বিড়াল দেখিয়া আসিলাম”; পরে ২য় ব্যক্তি অপরকে “অপূর্ব ত্রিমাচাকৃত মাছের”, ৩য় ব্যক্তি অন্তর্যমকে “বাজারকার মাছের”, ৪র্থ ব্যক্তি একবারে “বাজারে মাছ মাছ বাসিয়াছে” সংবাদ দিল। পরে জলদ্রব উঠিল যে “বাজারে যে মাছ আসিয়াছে, তাহা উৎপাতে বাজারবাণী ইত্যদ্যতঃ পলাইতেছে” ইত্যাদি।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী সেক্রেটারী মিঃ আস্‌লি ইন্ডেন মহোদয় ২৭০ নম্বর পত্রে চট্টগ্রামের কমিশনারকে জানাইয়াছিলেন,—“মাননীয় লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর হুঃধের সহিত বলিতেছেন যে, যদি রানী এরূপে স্থানীয় শাসন কর্তার কার্যে বারম্বার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেন, এবং তদীয় প্রকৃতি সংশোধন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর-কর্তৃপক্ষের বিরাগ।

বরাহকারিণী হইতে পদচ্যুত করা যাইবে। অপর দুই (বোমাং ও মণ্ড) রাজা বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইলে, কালিন্দীরানীর কোন ওজর আপত্তি শুনা যাইবে না। লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর তাঁহার প্রতিবাদ খণ্ডনে প্রস্তুত আছেন।” ফলতঃ স্থানীয় শাসনকর্তার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া রানী কর্তৃপক্ষের অতিশয় বিরাগভাগিনী হইয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত হুঃধের বিষয় সন্দেহ নাই। পরন্তু তিনি যে গভর্নমেন্টের প্রতি সাতিশয় আত্মবতী ছিলেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত সিপাহিবিরোধকালে যখন ব্রিটিশ-রাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও তিনি কর্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। এদেশে কালিন্দী রানীর সময়ের লোক এখনও বাঁহারা বর্তমান আছেন, তাঁহার কথা তুলিলে সকলেই ‘হায়—হায়’ করিয়া থাকেন! এমন কি দূরবর্তী চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র বালক-মুখে পর্য্যন্ত তদীয় প্রাতঃস্মরণীয় নাম শুনিতে পাওয়া যায় (১)। পাঠক বিচার করুন, ইহা অত্যাচারের অভিলাপসমস্ত শু স্করণ আর্জনাৎ, কি স্মৃতি-মন্দিরের অনন্ত আরাতি!

পরন্তু রানীর শাসনকালের এইমাত্র অভিযোগ শুনিতে পাই, তাঁহার সহোদর জয়মণি দেওয়ান ফকির তমুরাম চাক্‌মার শিষ্যগ্রহণ করিয়া উপদেশ পায় যে, যদি কেহ “চেন্নী” উপনদীর করদ সরিৎ “নুনছরী”র উৎপত্তি স্থানে হ্রদমধ্যস্থিত গোলাকৃতি শিলাখণ্ডোপরি সাতজন হিন্দুকে বলি দিতে পারেন,

নরবলি।

তাহা হইলে সেই শিলাখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া “সাত রাজার ধন মাণিক” তাহার করতল-গত হইবে। জয়মণি এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ৭ সাতজন হিন্দু বেপারীকে সন্মিলিত করিয়া লইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে একজন ধূর্ত-চুড়ামণি নাপিত ছিল।

(১) বর্তমান গ্রন্থকার অতি বাল্যকালেই পূজনীয় মাহুদেবী সকাশে মহীয়সী কালিন্দীরানীর কীৰ্ত্তিকাহিনী শুনিয়া ছিলেন। সেই অখণ্ড তরীয়া বিস্তারিত জীবনী জানিতে তাঁহার অভিপ্রায় আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

অপর ছয়জনকে বলিদানের পর, নাপিতকে মানের নিমিত্ত নদীতে লইয়া গেলে, সে ডুব দিয়া অদৃশ্য হয়। এবং অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিয়া সে চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট সমীপে যাবতীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে। তাহাতে জয়মণি বন্দী হন, এবং অবশেষে নানা চেষ্টায় অব্যাহতি লাভ করেন। জয়মণিকৃত আরও কয়েকটি অত্যাচারে বাস্তবিক প্রজাসাধারণের মধ্যে অভ্যস্ত ভয়ের উদ্বেক হইয়াছিল। উৎপীড়িত জনগণ কাতরকণ্ঠে—

“রাজার শালা জয়মণি ;

রক্ষা কর কালিন্দীরণী ।”

বলিতে বলিতে দয়াময়ী রাণীর চরণতলে স্মরণ লইত। সেই শোকময় কোলাহল অত্ৰাপি লোকের কর্ণে প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। ইহা হইতেও রাণীর ভ্রায়পরতার প্রতি সাধারণের ভক্তিমত্তার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় !

কালিন্দীরণীর শাসনবিবরণী যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। চন্দ্রের কলঙ্ক প্রায় তাঁহার কেবল মাত্র একটা অবিবেচকতার কাজ হইয়াছিল—‘মল্লুয়া-তালুক’ সৃষ্টি এবং তদংশ বিক্রয়ে ক্ষমতা প্রদান। নিন্দাকারিগণ এই ছিদ্র পাইয়াই নানা

বিশেষণে সাজাইয়া তাঁহার চুর্নায় গাথা বাহির করিয়াছিলেন। ইহার কুফল পূর্বে বর্ণিতে

মাল্লুয়া-তালুক।

পারিলে রাণী কখনই এই নুতন পদ্ধতি চালাইতেন না। ‘দেশে’ যে মালাকার, লম্বাচার্য্য, ভাট ও আদ্যপুরোহিতদিগের যজ্ঞমানের-তালুক আছে, সেই অনুকরণেই বোধ হয় তিনি স্বীয় প্রজাদিগের তালুক গঠন করিয়াছিলেন। এবং উহাদের মধ্যে যেমন যজ্ঞমান-তালুকের স্বৈচ্ছামূরূপ অংশ ক্রয় বিক্রয় আছে, এইপ্রজা-তালুকেও সেই অধিকার দান করেন। কিন্তু তখন তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, তাহার প্রজা-তালুকের অংশ বিক্রয়ে তালুকদারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের বাসস্থানও স্থানান্তরিত করিতে হয়। যজ্ঞমান-তালুকে সে অসুবিধা নাই। কেননা তৎসীমা ‘চৌহদ্দি’ দ্বারা নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজাপরিবার লইয়া প্রজা-তালুক গঠিত হইত। তবে ইহাকে তাঁহারা বৈরূপ ভীষণ বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, ফলে তাহা নহে, এখানে আমরা তৎপাট্টার এক প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম।—

(বাক্য)  
 জীবিত কালীদাস

“পাটী কবুলকরার দায়েকবুলিয়ত জীশানচন্দ্র দেওয়ান শিহরে লবণ খাঁ দেওয়ান বৃত্ত  
 সাকিন কাচালং জোমবঙ্গ খানে কাচালং প্রতি কামি দামি ইতিমেরারি তালুকি পাটী পত্রমিদং  
 আগ্রে আমার জমিদারির অধীন কার্ণার মহাল সংক্রান্ত তোমার সাবেক মুরচি তালুকদার  
 মোট পাটী (১) ১১ বরের কাতে কাচা ১৭৩ বর রাওতের সালিখানা হস্তবুদ মবলক ১১২৪/১০

গণ্ডা কোশানী বেশী ৭০৬ গণ্ডা পুণ্যাহ নজর ১ টাকা চিনার বরচা  
 পাটী। ১ টাকা আগচনি ৫ টাকা হমিশ আমলা আন ৫ টাকা সাকুলো মং  
 ১৩০৮/১৬ গণ্ডা বারবরপ ২৮০ থাকি হিত ১২৮/১৬ গণ্ডা বাজানার পরে তুমি তালুকী পাটী  
 পাওরার দরখাস্ত করিবার তাহা স্বল্পক্রমে তোমা হইতে কামি দামি ইতিমিরারী তালুকী  
 কবুলিয়ত লইয়া কামি দামি ইতিমিরারী তালুকী পাটী দিতেছি যে নিরূপিত বাজানার বাজে  
 রকম সহ সব বসন তুমি ও তোমার পুত্র পুত্রাদি ক্রমে নীচেরলিখিত কিস্তিতে তালুক মালিক  
 আমার জমিদারী সেরেস্তাতে দাখিল করি নিয়া দাখিল লইয়া ও লইবেক শটমিস্তে কিস্তিতে  
 বাজানার আদার না কর ও না করে প্রচলিত কামুন জারিতে ও আগমন যাহা কামুন প্রচলিত  
 হয় তদ্বারাহ বাজানার ও তোমার মাল মনকুলা হাবর সমস্তাদি জোরক ও নিলাম বিক্রি  
 পূর্বক আদার লইতে কোন ওজর না করিবা ও না করিবেক। ভেটবেগার নজর খীকার খাইন  
 মাখট রসর পটন বরচা ও সাদি ফিরাত্তে নজরাণা ও বরচা পূর্ব ভতে ও বসন বাহা  
 উপস্থিত হয় এবং হজুরের সন্ত বেশী হয় সব তালুকদারানমতে দিয়া ও দিবেক তালুক হেবা  
 খারিজ আগমি হকুম খিনা না করিবা বেআইনী কোন কর্ম না করিবা কর তোমার নিজ  
 নিশা করিবা তালুকাতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তৎসম্বন্ধে হজুরে লখনবা  
 আমার নিকট এতলা করিবা তালুকদার রায়ত উৎসৃষ্ট হয় নিরূপিত কামামতে তুমি ও তোমার  
 উত্তরাধিকার্য ভোগবার থাকিবা ও থাকিবেক রায়ত কতকেকরাল হয় বাজানার আদারের পক্ষে  
 কোন ওজর না করিবা ও না করিবেক তল করীপে আমার মালিকীতে তোমার তালুক বরাইবা  
 তালুকদার রায়ান রাণা রণি খিনা সাবেকমত দখলে রাখিবা একমর্মে কামি দামি ইতিমিরারী  
 তালুক পাটী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩১ মং তারিখ ২ আষাঢ়—”

ইহাধারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, তালুকদারগণের জমী নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু  
 বন্দীভেত তাহা চালাইয়া এবং সময় বিশেষে রাজব্যাপারাদির টাল দিয়া

(১) মশ কাঁচাঘর অর্থাৎ পরিবার লইয়া এক পাকাঘর গণনা হইত। পূর্বে প্রতি  
 কাঁচাঘরের খামসের করিয়া কার্ণার করবরণ নির্দিষ্ট ছিল, আলবর বার সময় তাহা হজুর  
 পরিবর্তিত হয়।

তাহারা পুরুষানুক্রমে বন্দোবস্ত মহালের উপসদ্ব ভোগদখল করিতে পারিতেন। এই আর দায়ভাগমতেই বিতক্ত হইত, অর্থাৎ কোন তালুকদারের মৃত্যু হইলে মহাল তৎপুত্রগণের মধ্যে ভূলাংশে বিভাজিত হইয়া পড়িত। যাহা হউক, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি ২২৫ নম্বর পত্রে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের জনৈক সেক্রেটারী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারকে লিখিলেন যে, “বিগত ১২ই নবেম্বরের ৪২১ নম্বর ( লর্ড ব্রাউনের প্রাপ্ত ) পত্রের প্রস্তাবানুসারে মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্ণর ( রোয়াবা অর্থাৎ ) হেডম্যান ( Head man ) নিয়োগ প্রথা অনুমোদন করেন। ইহারা গ্রামবাসী কর্তৃক নির্ধারিত হইয়া রাজা-

দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। ডেপুটী কমিশনারের

নিকট ইহাদিগের একখানি তালিকা থাকিবে।

রাজারা যাবতীয় পরিবর্তন-সংবাদ তাঁহাকে যথাসময়ে জানাইবেন। হেডম্যানেরা রাজাদের নিমিত্ত “কেপিটেশন টেক্স” (১) ( পারিবারিক কর ) আদায় করিবেন এবং যে কোন অভিযোগ ডেপুটী কমিশনারের নিকট জানাইবেন। ( মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ) তাহা চালাইবার ও সাক্ষ্য যোগাইবার ভার তাঁহাদের উপরই থাকিবে। তাঁহারা সাধারণতঃ ডেপুটী-কমিশনারের আদেশ পালনে বাধ্য রহিবেন। x x অনুরোধ করিতেছি যে, রাণীকে জানাইবেন—তিনি এযাবৎ এই সম্বন্ধে যতসব আবেদন করিয়াছেন, তৎসমস্তেরই মীমাংসায় লেপ্টেনান্ট গভর্ণর রাণীকৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সরবরাহকার অপেক্ষা উচ্চতর পদবী অস্বীকার করেন। যতদিন পর্যন্ত সপত্নী-দৌহিত্র বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় তাঁহার হস্তে এই সম্পত্তি ও জাতীয়ভার রাখিতে সম্মত থাকেন, ততদিন রাণী কর্তৃপক্ষের আদেশ ও অভিমত পালন পূর্বক কার্য্য চালাইবেন। তাঁহাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি সরদারের প্রতিনিধি মাত্র। এই পার্শ্বতা প্রদেশে তাঁহার কোনও স্বত্ব নাই। x x লেপ্টেনান্ট গভর্ণর আপনাকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন যে, ( আপনি সম্পূর্ণ বিবেচনার সহিত ইহার উপায় বিধান করিয়া ) রাণীর শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীতে পার্শ্বতা প্রথার জ্ঞাত জেদ করিতে পারেন, এবং তাঁহাকে যাবতীয় তালুকদারী ও ইজারা রহিত করিতে

(১) “কেপিটেশন টেক্স” ( Capitation tax )—ইহার প্রকৃত অর্থ ‘লোক প্রতি কর’। মিঃ পাউয়ার বলেন ( see—letter no. 872, date 17-6-1875 ), “এই ভুল নামটি আলাকান হইতেই আসিয়াছে। ইহা প্রাপ্তবয়স্ক পাহাড়ীদিগের মাথাগণনা ( অর্থাৎ লোক-প্রতি ) কর মাত্র। কিন্তু এখানে যে কর গ্রহণ করা হয়, তাহা পরিবারপ্রতি ; অর্থাৎ পরিবার-মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক একাধিক থাকিলেও, অতিরিক্ত কর দিতে হয় না।” এইজন্য “কেপিটেশন টেক্সের” অনুবাদ এইপুস্তক ‘পারিবারিক কর’—করা হইল।

আদেশ দিতে পারেন। ঐ সকল তালুকদারেরা যদি জাতিতে চাকমা হন, তবে তাঁহারা ই রোয়াবা অর্থাৎ হেড্‌ম্যান হইবেন। রাণী যদি স্বয়ং পাহাড়ে বাস করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্রবাবু তথায় বাস করিবেন এবং ডেপুটি কমিশনারের সহিত স্বয়ং সম্পর্ক রাখিবেন। যদি দেখা যায় যে, রাণী ইহাতে বাধা দিতেছেন বা গভর্নমেন্টের প্রতি তদীয় কর্তব্যে শৈথিল্য প্রদর্শিত হইতেছে, তখন তাঁহাকে সরবরাহকার হইতে পদচ্যুত করিতে গভর্নমেন্ট ইতস্ততঃ করিবেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।”

ফলতঃ অতঃপর সীমাবিশেষবর্তী অধিবাসীদের উপর হেড্‌ম্যান নিয়োজিত হইলেও তাদৃশ পারিবারিক-কর গ্রহণের কোন এক সাধারণ পরিমাপ ছিল না। হেড্‌ম্যানেরা অধীন প্রজাগণের সহিত একটা চুক্তি করিয়া লইতেন। অনন্তর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট এক ‘রিজলিউশনে’

জুমকর নির্ধারণ।

প্রকাশ করেন যে, “১৮৬৯ সনে প্রত্যেক জুমিয়া-

পরিবারের উপর ৪ টাকা খাজানা নির্ধারণের

প্রস্তাব উপস্থিত হয়। কাপ্তেন লুইন বলেন, এ সময়ে কোন সাধারণ পরিবর্তন বা নূতন নির্ধারণ উচিত নহে। তবে গভর্নমেন্ট-সম্মতিক্রমে এতৎসম্পর্কীয় বিচার নিষ্পত্তির সময় ৪ টাকা হিসাবে মীমাংসিত হইবে।” বস্তুতঃ কাপ্তেন লুইনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ( ১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে ) এখানে ‘পারিবারিক-কর’ প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৮৭৪ অব্দে বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট বলেন, এই জুমকর রাজস্বের ভিত্তিস্বরূপেই গৃহীত হইবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হইবার পূর্বে কর্ণফুলী নদীর শুষ্ক একমাত্র চাকমা রাজারাই অধিকারে ছিল। তজ্জগৎ মোগল বা ব্রিটিশ

গভর্নমেন্টকে কোন রাজস্ব দিতে হইত না।

কর্ণফুলী নদীর শুষ্ক।

কিন্তু ক্রমে ইহাতে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়,

এবং হাত পড়ে। তখন কালিন্দী রাণীর সহিত—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ৭৫৬৬ টাকা জমায়া ইহার বন্দোবস্ত হয়। পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লুইন এই বন্দোবস্তে রাণীর বার্ষিক লাভ কত হইতেছে, জানিতে চাহেন; রাণী তদন্তের পূর্ব্বোক্ত পাঁচ বৎসরের যে আয় তালিকা পাঠাইয়াছিলেন (১)। তাহা হইতে লুইন মহোদয় প্রথম তিন বৎসরের

(১) শুনিতে পাই, পাছে গভর্নমেন্ট রাজস্ব বর্দ্ধিত করেন বা একবারে বাস করেন, সেই ভয়ে আয়-তালিকায় লাভ-সংখ্যা খুব কম করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু “ঠকা”তে

হার কমিয়া বার্ষিক ২২৮৬ টাকার অর্ধেক ১১৪৩ টাকা, বন্দোবস্ত ব্যতিরেকেই কালিন্দী রাণীকে বার্ষিক দিয়া কর্ণফুলীর শুক আদায় তার গভর্ণমেন্টের বনবিভাগের (Forest Dpt.) হস্তে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। গভর্ণমেন্ট এই নূতন অধিকার সাগ্রহে অনুমোদন করেন; পরন্তু রাণীকে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব, উপস্থিত (১৮৭২ সালের) লুসাই-অভিযানে (১) তদীয় ব্যবহার বুঝিয়া স্থির করা হইবে আশাষে বিবেচনায়ীন রাখিলেন। অনন্তর সেই অভিযানের সাহায্যে সম্বৃষ্ট হইয়া সতর গভর্ণমেন্ট ১ই অক্টোবরের (১৮৭২ সাল) ৫৭৬৩ নম্বর পত্র প্রেরিত ১১৪৩ টাকা চাক্‌মারাজার বার্ষিক জমা হইতে বাদ দিবার স্বীকার করেন। তদবধি কর্তৃপক্ষ এই বার্ষিক ১১৪৩ টাকা লুসাই অভিযানে চাক্‌মাসরদারের কৃত সাহায্যের পুরস্কার বলিয়া নির্দেশ করিয়া আসিতে-ছেন (২)। রাণী যে সকল ক্ষমতাস্বামী হেডম্যানকে দিয়া গভর্ণমেন্টের এতাদৃশী সহায়তা করিয়াছিলেন, কথিত পুরস্কারের অংশ তাহাদিগকেও ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। যাহা হউক, অত্ৰাপি চাক্‌মারাজ গভর্ণমেন্টের রাজস্ব হইতে এই টাকা মুক্তি পাইয়া থাকেন।

রাণীর রাজস্ব-বর্ণনা শেষ করিবার পূর্বে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আর দু'চারিটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রকৃতি কার্যে প্রতিভাত হয়, ইহা বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ সত্য। লোকে যাহাদিগকে একান্ত গোঁড়া বলিয়া মনে করে, সেই দার্শনিক মহাশয়দেরও এইমত! এত্বেলও রাণীর প্রকৃতি উপলব্ধি

গেলেই ঠিকিতে হয়," রাণী আপন ফাঁদেই আপনি জব্দ হইলেন। অধুনা ইহার আর বাস্তবী ব্যয় বাদেও লক্ষাধিক টাকা হইবে। রাণীর সময়ে কি ২০২৫ হাজারও ছিল না?

(১) ১৮৭০-৭১ খঃ অব্দে কুঝিয়া পুনরায় কাছাড় উপগ্রব আরম্ভ করে। সেইবার তাহার কতিপয় ইংরাজ চাকরকে হত্যা করিয়াছিল, এবং নবম বর্ষ বয়স্ক। মেরী উইনচেষ্টার নামী এক ইংরাজ-তনয়াকে লইয়া যায়। তখন এই ১৮৭২ অব্দে কাছাড় দিয়া একদল সৈন্ত জেনারেল বুসিয়ারের এবং আর একদল চট্টগ্রাম দিয়া জেনারেল ব্রাউনলোর নেতৃত্বাধীনে তাহাদের আক্রমণ করে। ভারতের ভূতপূর্ব সেনাপতি ও ট্রাঙ্গভালের ভীষণ সমর-বিজয়ী লর্ড রবার্টস্ তখন লেফটেন্যান্ট কর্ণেলরূপে কাছাড় দলে ছিলেন। (কুকিসর্দার ভলোনেলের নাম)মুসারে লর্ড রবার্টস্ তদীয় প্রিয় অশ্বের নাম "ভলোনেল" রাখেন, সেই গোড়া ১৮৭৭-১৮৯৬ পর্যন্ত তাঁহার বাহক ছিল। স্বর্গীয়া সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আদেশে কাবুল-বিজয়ের চেষ্টারূপে ভলোনেলের দেহ চারিটা সুবর্ণ পদকে শোভিত হয়।) চট্টগ্রামের সৈন্ত-দলই মেরী উইনচেষ্টার প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়াছিল। এত্বেল বলিয়া রাখি, সেই দুঃসময়ে স্বর্গত রায় অজয়চরণ মিত্র বাহাদুর উক্ত কাছাড় সৈন্ত দলের সহিত ছিলেন; তাঁহার তদানীন্তন সাহস ও বিক্রমের কথাও গৌরবের সহিত উল্লেখ যোগ্য। অনন্তর এই বর্ষরাজ্য হইতে এদেশ রক্ষা করিতে কর্তৃপক্ষ রাজ্যটিতে ৬৫৬ জন সিপাহী রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে মার্টিনী হেনরীর বন্ধুসমূহ ১৩৮ জন মাত্র আছে।

(২) Vide—Commissioner's letter No. 998, dated 10th December, 1873.



করিবার জ্ঞান কোন উপকথা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্মৃহং কার্যাবলীই অনুরক্তার সহৃদয়তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। রাষ্ট্র-  
রাণীর কার্য।

নিয়ার “রাণীর হাট” বোধ হয় যুগযুগান্তর ধরিয়।  
তদীয় কীর্তি ঘোষণা করিবে। ইহার পূর্বে তিনি স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে পদোন্নয় “রাজার হাট” স্থাপন করিয়াছিলেন। সর্বোপরি তাঁহার “মহামুনি” প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি মহাবিবুৎ সংক্রান্তিতে ষাত্রীসঙ্গম ও সপ্তাহাধিককাল স্থায়ী বিরাট মেলায় ব্যবস্থা—তাঁহার অক্ষয়কীর্তি! মহামুনিমন্দির-বক্ষে স্থাপিত প্রস্তর ফলকে তিনি যে বিনীত নিবেদন (১) লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে তাঁহার অলৌকিক উদারতা—অতুঃজ্বল ধর্মোন্মাদনা সহজেই প্রতীত হইয়া থাকে। যেক্রপ স্তনিতে পাই, সেই সময়কার তুলনায় বাঙ্গালা ভাষাতে তাঁহার বেশ দখল ছিল। রাণীর লিখিত অপর কোন লিপি পাওয়া যায় না; আমরা বহু বহু তদীয় একটি স্বাক্ষর মাত্র এস্থলে রক্ষা করিতে পারিলাম।—

## শ্রীমতিকাশিনী বাণী

বলা বাহুল্য তাঁহার আমলেই বাঙ্গালার সর্ব প্রথম প্রাধাত্য দেখিতে পাইয়াছি, বহুদিন পরে পারসীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা গেল। পক্ষান্তরে তাঁহারই সময়ে (১৮৩৭ খৃঃ অব্দে) গভর্ণমেন্ট বিচারালয় প্রভৃতিতেও পারসি স্থলে ইংরাজী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা মুসলমানদিগের পক্ষে আক্ষেপের কারণ, সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাদের এই কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া উচিত যে, রাজভাষা ছায়ার ছায় রাজার অনুগামী হইতে বাধ্য; তাঁহাদের প্রাধাত্য কালেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। এদিকে রাণীর সহানুভূতিতে সমগ্র চাক্ষা সমাজেই বাঙ্গালা ভাষা শ্রীযুক্তি লাভ করিয়াছিল।

এক্ষণে রাণীর ধর্মভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে। সাহস সহকারে বলা যায় যে, ইহাতে তিনি সমৃদয় স্ত্রী-সমাজেরই মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

রাণীর ধর্মভাব।

ধনসম্পত্তিতে মগ্ন রহিয়া, এমন রাজ্যধীশ্বরী হইয়াও তাঁহার মত ধর্মচর্যা করিয়াছেন, এহেন রমণীর উদাহরণ বর্তমান যুগে নিতান্ত বিরল! তিনি পরিশেষে বৌদ্ধধর্মে

দীক্ষিতা হইলেও সকল ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আলিঙ্গন করিতেন। বিশেষতঃ হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সমাজে তাঁহার একরূপ নিরপেক্ষ ও মাঝামাঝি ভাব ছিল যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে আপনাদের দলভুক্ত মনে করিতেন।

### হিন্দু ধর্মে—

তাঁহার মত ভক্ত কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ৭৮ জন ব্রাহ্মণ প্রতিনিয়ত রাজ্যলয়ে থাকিতেন। তাঁহারা প্রত্যহ বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা ইত্যাদি করিয়া, তৎচরণামৃতসহ নির্মালা দান, এবং প্রাতঃ ও সাংকালে রাণী-সকাশে বিভূষিত করিতেন। এতদ্বিধ শনিবারে শনিপূজা, বৎসরান্তে নবগ্রহার্চনা, শ্রাবণে বিষহরী, আশ্বিনে ভগবতীর্হণ ও লক্ষ্মী—কার্ত্তিক দীপাবলিত ব্রতসংযুক্ত কালী—মাঘে সরস্বতী পূজা এবং ফাল্গুনে দোলমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের সেবা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্রত পূজাদি যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইত। ফাল্গুনের অমাবস্যায় বিরাট সমারোহে রাজানগর হইতে ৪ চারি মাইল উত্তরবর্তী কালীপুরে কালীপূজা হইত। তথায় এক ইষ্টকময় কালীমন্দির ছিল (১)। রাণী উক্ত তিথিতে পার্শ্বপ্রবাহিতা ইচ্ছামতী (২) উপনদীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দান-দক্ষিণা দিয়া শিবিকা-রোহণে স্বকীয় “গোলবদনী” প্রভৃতি ১৮টী সুসজ্জিত হস্তী ও বহু অশ্বচর পূর্ণ নানা আড়ম্বরের সহিত কালীপুর যাইতেন। তথায় যথাবিধি পূজা, বলি প্রভৃতি হইয়া না গেলে তিনি আহাৰ্য্য গ্রহণ করিতেন না। পরদিন তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালেও পূর্বরূপ আনন্দোৎসব চলিত।

তদীয় প্রাত্যাহিক উপাসনা পদ্ধতি আরও মহত্তর ছিল। বাস-ভবনের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে তিনি পূজার নিমিত্ত নির্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তাহাতে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিলই না ; এমন কি তাহা পরিষ্কার করিবার

(১) এই কালীমন্দিরের উদ্ভাবনের এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কালীর নামেই ঘোষা হয়, গ্রামের নাম কালীপুর রাখা হইয়াছিল। ইহা কালিন্দীর গাণী বা তৎপূর্ববর্তী চাকমারাজ্যেরই কীর্ত্তিচিহ্ন হইবে।

(২) ‘ইচ্ছামতী’ ও প্রাক্তন ‘শিলক’ নদী উপনদীস্বরূপ পরস্পর বিপরীতভিত্তিযুক্ত হইতে আসিয়া কর্ণফুলী নদীর একই স্থানে আশ্রয়সম্পন্ন করিয়াছে। এই মহাসঙ্গম সন্নিধানে ইচ্ছামতী দেবীর মন্দির আছে। চট্টগ্রামের হিন্দুসমাজ দেবী ইচ্ছামতী এবং তদীয় স্ত্রোতোধারার প্রতি সম্মিলিত ভক্তিপরায়ণ। এতিদিনই তথায় কাহাকেও না কাহাকে মানস দান করিতে দেখা যায়। বিস্তারিত বিবরণ ১০১০ সনের “সাহিত্যে” ইচ্ছামতী শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা।

নিভা পূজা।

ভারও রাণী স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। মালাকার প্রতিদিন পুষ্পচয়ন করিয়া বহিঃপাশ্বে নগদস্তকে সাজি তুলিয়া রাখিত। তিনি অবগাহনান্তে পটাস্বর পরিধান পূর্বক পুষ্প-পাত্র সাজাইয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিতেন, পূজাকালে অষ্টোত্তরশত স্মৃতদীপ যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। প্রজ্জলিত শ্বেতচন্দনে মৃগনাভি মিশ্রিত গুগ্গুল ধূপ পুড়িয়া চতুর্দিক আমোদিত করিয়া তুলিত এবং থাকিয়া থাকিয়া ষণ্টারবসংযুক্ত শঙ্খের তৈরব হৃদ্বারে সমস্তাৎ বিকম্পিত হইত! তৃতীয়বার বাদ্যধ্বনি হইয়া গেলে, পূজক ব্রাহ্মণ বিষুপাদোদক ও ব্রহ্মপাদোদক এবং রক্তত থালায় শুভ নিম্নালা লইয়া বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেন। পূজা সম্পন্ন হইয়া গেলে প্রিয় সহচরী দুই জন বাহ্যুগল ধারণ করিয়া তাঁহাকে দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করাইত। অনন্তর দ্বিজবর শিরোপরি আণীষপুষ্প প্রদান করিলে তিনি উল্লিখিত পাদোদক গ্রহণ পূর্বক আহারার্থে গমন করিতেন।

রাজসভায় প্রায়শঃ শাস্ত্রালোচনা চলিত। তিনি পর্দাস্তরাল হইতে শ্রবণ করিতেন এবং আবশ্যক বা সন্দেহ স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন। একদা একরূপ আলোচনাকালে তিনি সমবেত স্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ‘পূর্ব জন্মকৃত কোন্ পাপে ইহলোকে পুত্রহার এবং

পাপ-তত্ত্ব।

অকালে পতি-বিয়োগ যন্ত্রণা পাইতে হয়।’ বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নে রাণী স্বীয় হতভাগ্যের কারণই জানিতে চাহিয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী নানা আলোচনার পর স্থির করিলেন, ‘কন্মবিপাক’ নামক শাস্ত্র পাঠে ইহা নির্ণীত হইবে। অনন্তর সকলের নির্দেশক্রমে চট্টগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত পরলোকগত রামমণি ত্রায়বাগীশ এবং গোপীনাথ শিরোমণিকে আনাইয়া শুভদিনে উক্ত শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করা হয়। রাণী স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্বক অজিনাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তিভাবে তাহা শ্রবণ করিতেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পাঠের পর নির্ধারিত হইল, পূর্বজন্মে অপরের পতিকে বশীভূত করিয়া স্বামী বিরহ যন্ত্রণা প্রদান করিলে বালবৈধব্য ভোগ অবশ্যম্ভাবী (১); এবং হিংসা-পরবশে পর পুত্রের জীবন বিনষ্ট করিয়া থাকিলে ইহজন্মে নিশ্চিত পুত্রহার হইতে হইবে (২)। উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া চতুর্দশী তিথিতে শিবপূজা পূর্বক

(১) “যান্যং পতিং বশীকৃত্য স্বানিবিচ্ছেদযচ্চিনা। পীড়য়েৎ স্ত্রিয়মজ্ঞানং বালবৈধব্যম্বেতি সা ॥”

ইতি চৈত্র্য সাহাস্রায়।

(২) “কদমং হিমহাওয়ারঃ পরপুত্রাভিঘাতনং। নিরয়ঃ বিবিধং ভূক্তা যোবিজ্ঞম্ অবাগ্যচ ॥

রৌপ্য রুশারুত সুবর্ণ হরগৌরী প্রতিমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, এবং সুবর্ণোপবীত বিষ্ণুর নামে উৎসর্গ করিয়া হোমান্তে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলে, যথাক্রমে বৈধব্য ও মৃতবৎসা (গর্ভশ্রাব) দোষ হইতে মুক্তি পায় (১)। বলাবাল্য, তিনি অনতিবিলম্বেই বহু অর্থব্যয় ও কঠোর শ্রমস্বীকারে উক্ত পুণ্যব্রতদ্বয়ের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর তিনি এক মহান্নদানও করিয়াছিলেন ; তাহাতেও প্রায় ২৮০০০ টাকা ব্যয় হয়।

### মুসলমান ধর্মো—

ও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি রাজভবনের (রাজানগর) সম্মুখীন রহং সরোবরের উত্তরবর্তী জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে একখানি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ‘আজান’ এবং সাংসাময়ে প্রদীপ দিতে একজন বিত্তদ্বাচারী খোন্দকার মসজিদ নির্মাণ। নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। প্রতি ‘জম্মা’ অর্থাৎ শুক্রবারে খোন্দকার, মৌলবী, কাজী প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া, বাহিরের ঘরে আধ মণ চুন্ধের পায়সান্ন রন্ধন করত—হজরতের সরামতে খোদার নামে নিবেদনান্তর অনেকানেক মুসলমানকে খাওয়াইতেন। এতদ্বিন্ন নানা স্থানে মসজিদের সাহায্যার্থ রাজসরকার হইতে অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

### বৌদ্ধধর্মো—

প্রথমতঃ সাধারণ প্রসক্তিমাত্র ছিল। অনন্তর এক সময়ে আরাকান হইতে সংঘরাজ এবং হার্বাঙের গুণামেজু নামক প্রসিদ্ধ ভিক্ষুহয় আসিয়া তাঁহাকে

অজপ্রং গর্ভাশ্রাবজং দুঃখং পরম দারুণং। মরণাট্টপরা তচ্চ দুর্কহং যন্ন শক্যতে ॥” ইতি ভৃগুবাক্যম্ (ইহা গর্ভশ্রাবের কারণ হইলেও, মৃতবৎসা সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা এই হেতু নির্দেশ করেন।)

(১) “উমামাহেশ্বরী কার্ণা প্রতিমা স্বর্ণ সম্ভবা। ত্রিকর্ণসা তদঙ্গসা কবীদ্যাপিমিতসা চ ॥ জবা শাঠাং ন কুবীত সর্কর্বা হিতমিচ্ছুকঃ। স্বাপথেৎ খেত বস্ত্রাটো রাজতে বৃষভে শুভে ॥ ব্যাত্রাজিন সমাকীর্ণে সংস্থাপাভার্টা যত্নতঃ। উপবাসেন তত্রাদৌ চতুর্দশাং সমাহিতঃ ॥ শৈবঃ সাহস্রিকং হোমং কুর্বাদ্য গৌর্যাশ্চ যত্নতঃ। প্রাপ্তে প্রভাত সময়ে স্নাতা সংপূজ্য পূর্ববৎ ॥ আত্মৈর বোধবিদ্বো ব্রাহ্মণান্ পরিপূজ্য চ। অর্পয়েৎ প্রতিমাং শান্তোষ্টৈর্বিষবাদোষ শাস্তয়ে ॥ শূণ্ণ রাজন্। প্রবক্ষ্যামি দানং বৈধব্যা নাশনং। উমা মাহেশ্বরঃ নাম হা নারী কুরুতে ব্রতং ॥ সমধা শ্রদ্ধয়া মুক্তা শূণ্ণ প্রাপ্নোতি যৎ কলং। জন্ম জন্মান্তরে কপি বৈধব্যঃ লভতে নহি। ইতি অত্রিবাক্যঃ। “যজ্ঞোপবীতঃ কুবীত কাক্ষ্মন্ত অশক্তিতঃ। রৌপ্যপাত্রে চ সংস্থাপ্য পলার্দে নাক্ষিতোপি বা ॥ গ্রহি এদেশে দেয়ন্ত মৌক্তিকং ঋণিরাভ্রতঃ। প্রকালঃ পক্ষগবোন গায়ত্র্যা তাম্রভাজনে ॥ অজ্ঞে পাত্রোপরিহস্ত ধারয়েহপবীতকঃ। গজ পুষ্পাকৌতৈধু পৈনৈ বৈদ্যৈরপি ভক্তিতঃ ॥ চতুর্কাছং বিভূঃ বিষ্ণু শঙ্খ চক্র গদাধরং। অশূজ্য কারণেছোহমং মস্ত্রৈর্কৈল্লব সংজকং ॥ তিলাজামধ্বনা মিশ্রং যবৈরৈষ্ট্রস্তর” পতং। হোমান্তে কণ্ঠে দেয়ং শ্রদ্ধয়া চোপবীতকং ॥” ইতি ভৃগুবাক্যং।

বৌদ্ধধর্মে প্ররোচিত করেন (১)। তাঁহাদের প্রমুখ্যৎ ভগবান্ সম্বুদ্ধের চরিতামৃতকাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইলেন এবং অনতিকালবিলম্বে শুভদিনে যথাবিধি তদধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। পরে ইহাদেরই

উপদেশে রাজানগর রাজভবনের পূর্ব পার্শ্বে সুরমা মহামুনি প্রতিষ্ঠা।

নবরত্ন মন্দির প্রস্তুত করিয়া—চট্টগ্রাম, আরাকান ও লক্ষাদেশের নানাভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ পূর্বক মহাসমারোহে বাঙ্গালা ১২৭৩ সনের ৮ই চৈত্র দিবসে আরাকানের অধ্বকরণে “মহামুনি” স্থাপন করেন। তৎমন্দিরের অংশিক চিত্র এই।—



(১) কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সিংহলে অশীতবিদ্যা হরি ঠাকুর নামক জৈনক চট্টগ্রামবাসী ভিক্ষুর দাবিই অগ্রগণ্য বলিয়া থাকেন।

মন্দিরের বক্ষেই প্রস্তরফলকে খোদিত আছে ;—(১)

“ত্ৰীত্ৰীভোক্ত

ফড়া

বিজ্ঞাপন ।

সর্বসাধারণের অবগতার্থে এ বিজ্ঞাপন, প্রচার করিতেছি যে অত্র চট্টগ্রামস্থ পর্বতাবিধিপতি আদৌ রাজা সেরমহু খাঁ তৎপর রাজা যুসুফদেব রায় অতঃপর রাজা সেরদৌলত খাঁ পরে রাজা জানবকুশ খাঁ অপর রাজা টর্কর খাঁ অনন্তর রাজা জর্কর খাঁ আর্থ্য পুত্র রাজা ধরমবকুশ খাঁ তৎসহধর্মিণি আমি ত্রীমতি কালিন্দী রাণি আপোন অদ্বুষ্ট সাফল্যান্তিমানে তাহানদিগের প্রতি

প্রস্তর-লিপি ।

কৃতজ্ঞতাঞ্চক নমস্কার প্রদান করিলাম মদীয় পূর্ববত্তির ধর্ম্মার্থে বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রীবুদ্ধিসাধন জন্ত দ্বিগ্ধেষিয় অনেকানেক যুধিগন কতক সাক্ষাৎসারে ১২৭৬ বাঙ্গালার ৮ চৈত্র দিবসে অত্র রাজানগর মোকামে স্থলকুল রত্নাকর “চিঙ্গ” সংস্থাপন হইয়াছে তাহাতে আজন্মাবধি বিনা করে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বি ঠাকুর হইতে পারিবেক উলোখিত পুন্যক্ষেত্রের দক্ষিণাংশে ত্রীত্ৰী ছাইকা মুনী স্থাপিত হইয়া তদুপলক্ষে প্রত্যেক সনাধেরিতে মহাবিদুর যে সমারোহ হইয়া থাকে ঐ সমারোহেতে ক্রয় বিক্রয় করনার্থে যে সমস্থ দোকানি ব্যাপারি আগমন করে ও মঙ্গলময় মুনী দরশনে যে নমস্কার জাতিক উপনিত হয়, তাহারার দ্বিগ হইতে কোন প্রকারের মহাবুল অর্থাৎ করগ্রহন করা জাইবেক না ইদানিক কি ভবিষ্যতে উলোখিত ব্যক্তিগন হইতে ইহা লজ্জন করিয়া করগ্রহন করি বা করাই কি করে বা, করায় তবে এই জর্মে ঐ জর্মে এবং জর্মে জর্মে মহাপাতকিপাত্ত পরিগণিত হইবেন ।

কিমাধিক মিতি— x x x”

এই অনুশাসন লিপির অক্ষরে অক্ষরে রাণীর প্রগাঢ় বুদ্ধিবিদ্যাস এবং অমাত্যবিক উদারতা প্রতিভাত হইতেছে । স্বধের বিষয়, তদীয় উপযুক্ত উত্তরাদিকারিগণ কায়-মনোবাক্যে উক্ত “রাণীর আদেশ” প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন ।

অতঃপর রাণী অন্তিম পুত্রকার্য্য হইবেন না বলিয়া, একটি মহাদানে ব্রতী হইলেন । তাহাতে সাধারণ পরিবারে যাহা বাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চট্টলের ভিক্ষুগণকে সম্প্রদান করেন এবং এই সঙ্গে ব্রাহ্মণকেও একপ্রস্ত (Set) রজত বাসন দান করিয়াছিলেন । তাহা ছাড়া, প্রায় দুই সহস্র রবাহত নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ১০ পাঁচসিকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হয় । অগণিত ভিক্ষুক ও সমবেত হইয়াছিল ; ভোজনে ও পারিতোষিকলাভে সকলেই পরিতুষ্ট

(১) লিপিখানি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম ; হুতরাং ভাষা বা বর্ণাঙ্কিত মার্জিতব্য ।

হইয়া যায়। কিছুকাল পরে পুনঃ পূর্বোক্ত ভিক্ষুদ্বয় এবং উনাইনপুর (চট্টগ্রাম)-নিবাসী চন্দ্রকুমার ভিক্ষু রাজভবনে উপস্থিত হন; সেই সুযোগে রাণী প্রায় সপ্তাহকাল ধরিয়া তাঁহাদের মুখে বুদ্ধ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। অনন্তর অবোধ চাক্‌মা প্রজাসকলের মধ্যে ধর্মজ্ঞান বিস্তার-কামনায় অমিয় বুদ্ধচরিত পালি হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত করাইতে সঙ্কল্প করেন। এই পণ্ডিতবর্গের ধর্মপ্রচার চেষ্টা।

মতানুসারেই নয়াপাড়া (চট্টগ্রাম)-নিবাসী কুল লোথক দ্বারা ব্রহ্মভাষার “ধাতুভোয়াং” নামক পুস্তকের অনুবাদ করাইয়া, বাবু নীলকমল দাস কর্তৃক লিখাইয়া লন। এই পুস্তকের নাম দেওয়া হইল—“বৌদ্ধরঞ্জিকা।” ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্মবিবরণ হইতে ধর্মপ্রচার, নির্বাণ-ঘোষণা এবং পরিশেষে প্রিয়ভ্রম শিষ্য আনন্দের উপর যাবতীয় ভার হস্ত করিয়া তিরোভাব ইত্যাদি সমুদয় কথা সরল পথে বর্ণিত হইয়াছে। পরে তিনি ইষ্টকময় ‘ক্যং’ (১) নির্মাণে মনোযোগ দেন। সর্বাঙ্গীন চেষ্টায় যথাসম্ভব সত্বর মন্দির প্রাপ্ত হইল। কিন্তু কি দৈব-দুর্কিপাকে—উপরের কার্য শেষ করিয়া মিস্ত্রীগণ অবতরণ মাত্র সর্বোচ্চ চূড়াটি ভূপতিত হইয়া গেল! রাণী এই দুঃখাবহ সংবাদে অতিশয় মর্মান্বিতা, এবং ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তিতা হইলেন; মন্দির পুনর্গঠনের নিমিত্ত লোক নিয়োজিত করিলেন। তখন শারদীয় পূজা সমুপস্থিত, দুইজন পূজক ব্রাহ্মণ বাতীত হিন্দুকর্মচারিগণের আর সকলেই বিদায় পাইয়া-ছিলেন। কেবলমাত্র বাবু নীলকমল দাসের উপর আদেশ রহিল, বিজয়া দশমীতেই বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া আসিতে হইবে। পরবর্তী মাসে ‘ক্যং’ প্রতিষ্ঠার কামনা আছে; সেই সময়ে চাক্‌মাদিগের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত তিনি ইতিমধ্যে শীঘ্রই কলিকাতা গিয়া ১০০০ এক হাজার “বৌদ্ধরঞ্জিকা” মুদ্রিত করিয়া আনিবেন।

কিন্তু হায়,—সেই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৬৩ সনের ৫ই আশ্বিন বিপুল শারদীয় উৎসবের সময় রাণী স্বীয় পূজাগৃহে বসিয়া প্রাত্যহিক ইষ্টসাধনা করিতে-

ছিলেন, এহেন সময়ে গৃহমধ্য হইতে ঘোর দৈবনির্ঘাত-ধ্বনি রাণীর স্বর্ণযাত্রা।

উথিত হইল। তাহাতে ভয় পাইয়া প্রিয় সহচরীদ্বয় অতি সতর্পণে কপাট খুলিয়া দেখিতে পাইল, রাণী নিবাতনিকম্প প্রাণীপপ্রায় নিশ্চল ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে রহিয়াছেন! ইহাতে তাহারা আরও ভয়ানক হইয়া

(১) ‘ক্যং’—বৌদ্ধমঠ।

‘মা-মা’ আহ্বানে রাণীর হস্তাকর্ষণ করতে লাগিল। তখন তিনি সংজ্ঞালভ করিয়া বলিলেন, ‘কেন তোমরা পূজাগৃহে প্রবেশ ও আমাকে অসময়ে স্পর্শ করিয়াছ ?’ তাহার কাতরতার সহিত অববেচকতার নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিল। প্রিয়তমা সখিগণের কাতরনিবেদনে রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, ‘যা’হউক, এক্ষণে আমাকে বিছানায় লইয়া চল।’ অতঃপর তাহার অতি সাবধানে রাণীকে পর্য্যক্ষোপরি লইয়া গেল; কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক সাংঘাতিক বেদনা উপস্থিত হইল। তাহা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তিনি যুবরাজ হরিশ্চন্দ্রকে ডাকাইলেন। সংবাদপ্রাপ্তমাত্র যুবরাজ সহস্রশিখীর সহিত রাণীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি মুমূর্ষা-জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ‘হরিশ, এই লও তোমার—ধনসম্পত্তি রাজ্য সকলই তোমার, আশীর্ব্বাদ করি,—ভগবানের রূপায় তুমি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া সংসারের সুখে কালাতিপাত করিতে থাক; স্বধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া পুত্রবৎ প্রজাপালনে তৎপর হও। আমি যাইতেছি, আমাকে লইবার জন্ত আই স্বর্গায় দূত রথ লইয়া শূন্যমার্গে অপেক্ষা করিতেছে; আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না! আমা-র—জ-ন্ত—কাঁ—দি—ও—না।’ এই শেষ হইল—বাক্শক্তি রহিত হইয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের প্রাণপাখীও মন্তোর এ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তখন করুণ আর্তনাদে রাজপুত্রীতে যে কি ভীষণ কোলাহল উঠিয়াছিল, সে বর্ণনা করিয়া কল নাই (১)। কিন্তু হায়! রাণীর চিরাতীর্ণিত ক্যাং-উৎসর্গ এবং বৌদ্ধরঞ্জিকা বিতরণ (২) হইল না! অবশেষে যথাসময়ে মহামুনিমন্দির ও ক্যাং-ভবনের মধ্যভাগে চন্দনকাঠ এবং বিস্তৃত ঘৃত সহযোগে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সমাহিত হইল। এক্ষণে তরুণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাণীর অমরকীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

(১) এইমাত্র বলিলেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইবে যে, রাণীর মৃত্যু বৃষ্টিতে পারিয়া তদীয় প্রিয় হস্তিণী “গোলবদনী” কর্ত্তার আশানে গড়াইতে গড়াইতে—কাদিয়া কাদিয়া পঞ্চদ্রপ্রাপ্ত হয়, অবশেষে নাকি তাহাকেও প্রায় চল্লিশ টাকার নববস্ত্রমণ্ডিত করিয়া সৎকার করা হইয়াছিল।

(২) শুনা যায়, পরিশেষে রাজ্যমাটি সুলের আদি শিক্ষক আবদুল হাকিম মহোদয়ের সম্পাদকতায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা বহুকষ্টেও তাহা কিরূপ হইয়াছিল—দেখিতে পাইলাম না।



ডেপুটিকমিশনার কাপ্তেন লুইনের পত্রে রাণী কালিন্দীর মৃত্যু (১)-সংবাদ জানিয়া অস্থায়ী কমিশনার মিঃ এইচ্, এ, কোকোরেল বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট সমীপে “বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের ব্যক্তিগত যোগ্যতা

\* Letter No. 988, dated  
10-12-1873.

সম্বন্ধে এবং চাকমাজাতির পারিবারিক-করের বন্দো-  
বস্তির ও শাসনকার্যের সুবিধান নিমিত্ত প্রাচীন

পদ্ধতি মতে তাহাদের জাতীয় শৃঙ্খলাবিধান বিষয়ক এক ‘গোপনীয় পত্র’ \* প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাননীয় লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর কমিশনারমহোদয়ের প্রায় দাবতীয় প্রস্তাবই অনুমোদন করেন। রাজস্ব বিভা- + Letter No. 154, dated  
21-1-1874.  
গের সেক্রেটারী মিঃ এইচ্, এল, ডেম্পিয়ার কমি-  
শনারকে জানাইলেন † :—

× × × × ×

“২। রাণী চাকমাদিগের প্রদত্ত খাজানার সরবরাহকার মাত্র ছিলেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সত্ত্ব পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গভর্নমেন্টের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর ২৯৫ নম্বর পত্রে লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর রাণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবি এবং সরবরাহকারিণী অপেক্ষা উচ্চতর পদবী অস্বীকার করেন—বিশেষরূপে মীমাংসিত এসকল কথা রাণীকে অবগত করাইতেও লিখিয়াছিলেন।

“৩। × × ইহা প্রস্তাব হয় যে, হরিশ্চন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত এই সরবরাহকার প্রথা চলিবে। জমা সম্বন্ধে (যাহা নাকি আপনার পত্রের ৭ম হইতে ৯ম ‘প্যারায়’ বিবৃত হইয়াছে) গভর্নমেন্ট অপরাপর জাতির নিমিত্ত পূর্বে যাহা অনুমোদন করিয়াছেন, সেই পরিবার প্রতি ৪৭ চারি টাকা হারে পারিবারিক-কর ধার্য্য হইবে। ইহা হইতে এক টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ হেড্‌ম্যান, দুইটাকা সর-বরাহকার হরিশ্চন্দ্র পাইবেন এবং অবশিষ্ট এক টাকা রাজস্ব গভর্নমেন্ট গ্রহণ করিবেন। যদিও ৪৭ টাকা করিয়া প্রত্যেক পরিবার হইতে কর গ্রহণ করা সাধারণ নিয়ম রহিল, কিন্তু সরবরাহকার চাকমাগণ হইতে এই খাজানা কম বা বেশী বাহাই হউক না কেন, সেই পূর্ব প্রচলিত প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে কাপ্তেন লুইন প্রস্তাব করেন নাই। ইহাও প্রস্তাবিত হয় যে, যতদিন

(১) পরন্তু মধ্যমা ঠাকুরাণী আটকবিবি আরও কিছুকাল ইহলোকে ছিলেন। চটগ্রামের জীবন ঋটিকার বৎসর ( ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

পর্যন্ত কোন বিবাদ বিসম্বাদ ব্যতিবেকে তাহারা এইভাবে চলিতে পারে, ততদিন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এ সমুদয় প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

“৪। × × এই কর নির্দ্ধারণের পূর্বে যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল, যাহা বর্তমানে চলিতেছে, তাহার গণনা ও রেজেষ্টারী শেষ করা আবশ্যক। ইহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কালিন্দীরানীর সহিত যে সকল সর্ত্তে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, সেই করারে কর আদায় করিবার নিমিত্ত হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা হইল। আপনি × × দেখাইয়াছেন, এই অস্থায়ী বন্দোবস্ত ১০৮১।৪ পাইতে হইবে; ইহা রানী কালিন্দীর সময়ের ২০৮৫।৪ সিকা (অর্থাৎ টাকা ২২২৪।৪ পাই) জমা হইতে লুসাইবিদ্রোহে সাহায্য করায় ১১৪০ টাকা বাদ গিয়া অবশিষ্ট থাকে। এই অভিযান কালে গভর্ণমেন্ট হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র বিশেষ সম্বোধনের সহিত দেখিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত তাঁহাকে তত্ত্বাবধান-ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল (১)। তাহা উল্লেখ করিয়া লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর এই প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত অনুমোদন করেন। হরিশ্চন্দ্রকে ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, কর স্থায়িক্রমে হ্রাস করা হইল না। × ×

“৫। লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর আরও ইচ্ছা করেন যে, নূনজমাতে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে ইহা স্বীকার করাইয়া লওয়া হউক, তিনি চাক্‌মাদিগের গণনা এবং রেজেষ্টারী সম্পাদন বিষয়ে রাজভক্তিপূর্ণ সাহায্য করিবেন, অন্তথা শাস্তিস্বরূপ পূর্বজমা ২০৮৫।৪ পাই দিতে হইবে।

এতদ্বিন্ন “৬। × × ইহাও প্রস্তাব করা যায় যে, হরিশ্চন্দ্রের বাসস্থান পার্শ্বতাদিগের মধ্যে রাখিবার নিমিত্ত এই বন্দোবস্তের একসর্ত্ত থাকিবে এবং তজ্জন্ম তাঁহাকে জেদ করাও হইবে।” অনন্তর গভর্ণমেন্টের সরবরাহকার স্বরূপে “রাজা” (২) পদবী দিয়া হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা

(১) অধিকন্তু এই লুসাই অভিযানের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া সহায় বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ হেন্‌কী (Hanke) মহোদয়ের যোগে হরিশ্চন্দ্রকে ১৫০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ঘড়ী ও চেইন এবং “রায় বাহাদুর”—রাজসম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ঘড়ী ও চেইন অদ্যাপি বর্তমান রাজাবাহাদুর ব্যবহার করিতেছেন।

(২) ‘গভর্ণমেন্টের সরবরাহকার স্বরূপে রাজা’ অর্থাৎ ভূমি সম্বন্ধে যাক্ষতীয় সব গভর্ণমেন্টের খাস অধিকার ভুক্ত। রাজা কেবল অধিবাসীদিগকে শাসন করিবেন এবং তাহাদের নিকট

হয়। বলা বাহুল্য এতদিন পরে “মুনিমা গোছার” “ধাবানা” বংশ হইতে “ওয়াংঝা গোছার” “কাঁকড়া” বংশ রাজগোরব লাভ করিল। তাঁহার সময়ের দুইটা মোহর প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটিতে অঙ্কিত আছে,—

“শ্রীহরিশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর”

অন্যটিতে—

“শ্রীযুক্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর”

বাদামৌ আকারে উভয় মুদ্রাতেই ইংরাজী ও বাঙ্গালায় এই নাম দুইটা খোদিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এসময় হইতে মুদ্রাগুলির আকার এবং অক্ষর মার্জিত হইতে আরম্ভ হইল।

রাজত্বভার গ্রহণ করিয়াই হরিশ্চন্দ্র নব্ব্বপ্রথমে এই পার্শ্বত্যাগপ্রদেগে লাঙ্গলের চাষ প্রবর্তিত করেন (১)। তাঁহার দ্বিতীয় কার্য রাজমাটি—রাজবাড়ীর পার্শ্ববর্তী “সিঙিনালা” নামধেয় সুবিশাল ভূমি আবাদ।

সিঙিনালা আবাদ।

এস্থান পূর্বে ঘোরতর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; ব্যাঘ্র-বরাহাদি হিংস্র বন্য জন্তুগণ সতত বিচরণ করিত। এক সময়ে যে স্থানের নাম মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হইত,—রাজা হরিশ্চন্দ্রের চেষ্টায় আজ তাহা শ্রামল শস্ত্রে পরিবৃত্ত হইয়া দর্শকের নয়ন পরিতৃপ্ত এবং কৃষক কুটির ধন-ধাত্রে পরিপূর্ণ করিতেছে। কেবল এই দুই কার্যেও তিনি অমর হইয়া থাকিবেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের শাসন-প্রারম্ভেই বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টে এই পার্শ্বত্যাগ চট্টগ্রামকে

সার্কেল-বিভাগ প্রস্তাব। চারিপ্রধান ভাগে (২) বিভক্ত করিবার প্রস্তাব

হয়। ডেপুটি কমিশনার মিঃ পাউয়ার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ৪৭২ নম্বর পত্রে বিভাগীয় কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন, “আমার মত এই, যে সকল জুমিয়া কোন রাজার অধিকার ছাড়িয়া খাসমহালে জুম করিবে, তজ্জন্ত তাহাদিগ-হইতে খাজনা ৪ টাকা স্থলে ৫ টাকা লওয়া হইবে এবং

হইতে সংগৃহীত রাজস্বের এক নির্দিষ্ট অংশ পারিতোষিকস্বরূপে রাখিয়া অবশিষ্ট যথাসময়ে গভর্ণমেন্টে দাখিল করিবেন।

(১) বরাদমের ৮ নীলচন্দ্র দেওয়ানও এই লাঙ্গলের চাষ প্রবর্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেন্টের পত্রেও ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। See—the Deputy Commissioner's letter No. 472, dated 17-6-1875.

(২) ১। চাক্ষু সার্কেল, ২। বোমাং সার্কেল, ৩। মণ্ড সার্কেল, এবং ৪। খাসমহাল।

তাহার দুইটাকা যে রাজার অধিকার হইতে সে প্রজা আসিয়াছে, তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। চাক্‌মাদিগের কতকাংশ ফেণীকুলে বাস করিয়া থাকে। সেখানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ তিন হাজার। ইহাছাড়া চাক্‌মাদার্কলের উত্তর সীমায়—চেঙ্গী উপত্যকাত্তে কতিপয় চাক্‌মা বসতি আছে। তাহাদিগের উপর হস্তক্ষেপ করা অবিবেচকতার কার্য্য হইবে। রাজা হরিশ্চন্দ্র উত্তর-পূর্ব সীমা নির্ধারণ কালে আপত্তি উত্থাপিত করেন। বোধ হয় তিনি প্রজাগণের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ স্থান পাইতে উত্তরে চেঙ্গী ও কাচালঙের উপত্যকা এবং পূর্বে ছার্ণে ও উনিপাম পর্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত চাহেন। এই আপত্তিতে আমার উত্তর এই, তিনি একটি উৎকৃষ্ট অংশ পাইয়াছেন। যেখান হইতে চাক্‌মাগণ (কুকি) আক্রমণ ভয়ে পলাইয়াছে, সেই চেঙ্গী উপত্যকা আমরা ত্রিপুরা ও পাইলংছা (মণ্ড্রাজার) জাতিকে দিব। চাক্‌মাদিগের রেজেষ্টারী প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহার ফল এবাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। যাহা হউক জানা যায় যে, ইহাতে ৮৩টা তালুক (অর্থাৎ এক এক হেড্‌ম্যানের অধীন করদ মোজা) আছে। স্থলতঃ ১৭২৬ পরিবার খাজনা দেয় এবং ৫৮৯ পরিবার নিষ্কর। বোধ হয়, মোটের উপর কিছু বেশী হইবে।”

সার্কেলবিভাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র যে আপত্তি করেন, এ স্থলে সেই আবেদন প্রত্যাখ্যানের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—  
আবেদন।

“বর্তমান মাসের ৫ই তারিখের ডেপুটি কমিশনার বাহাদুরের পরওয়ানায় জানিতে পারিলাম, গভর্নমেন্ট পার্কতারাজাদিগের শাসিতব্য প্রদেশের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহার মাত্র স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশবাসী জুমিয়গণ হইতে পারিবারিক-কর আদায় করিতে পারিবেন; স্বজাতীয় সকলের নিকট হইতেই খাজনা আদায় চলিবে না। আবেদনকারী নিম্নোক্ত প্রার্থনাগুলি বিচার ও আদেশের নিমিত্ত উপস্থিত করিতেছে।

“২। গভর্নমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, এই জেলা চারিটি করদ সার্কলে বিভক্ত হইবে। তাহারই মীমাংসাকল্পে বিভাগীয় কমিশনার লর্ড ইউলিক ব্রাউণ, ডেপুটি কমিশনার কাপ্তেন লুইন এবং পার্কতা রাজগণকে লইয়া স্বীয় আবাসভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এতদূশ বিভাগে সকলেই সম্মত্রে আপত্তি করেন। কমিশনার এ সমস্ত ঘটনা গভর্নমেন্টকে জানাইলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই মর্মে আদেশ হইল যে, দরখাস্তকারী এবং অপরাপর রাজাগণ স্ব স্ব বংশীয় প্রজাগণ যেখানেই বাস করুক বা জম করুক না কেন, কর আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু আবেদনকারীর অসৌভাগ্য নিবন্ধন প্রাপ্ত প্রস্তাব পুনরাধাপিত হইয়াছে।

“৩। আবেদনকারীর নিমিত্ত নির্ধারিত ক্ষুদ্র সার্কলে অনেক ছনখোলা রহিয়াছে; কাজেই

জুমের উপযোগী ভূমি অত্যন্ত মাত্র। প্রার্থিকের দুই তৃতীয়াংশ রায়ত এই সার্কেলে এবং এক তৃতীয়াংশ সীমার বাহিরে বাস করে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণী এই আবেদনের ৪র্থ ও ৫ম দফায় লিখিত হইল। এই আবেদনকারী প্রার্থনা করে, যেন প্রাচীন রীতিতে গভর্নমেন্টের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আদেশানুসারে স্ববংশজ সকলের নিকট হইতেই পারিবারিক-কর পাইতে পারি।

“৪। দরখাস্তকারীর প্রজাগণ দক্ষিণে কাপ্তাই ( কর্ণফুলীর উপনদী বিশেষ ), উত্তরে ফেণী, পূর্বে কুকিপ্রদেশ এবং পশ্চিমে পার্বত্যপ্রদেশের সীমা পর্যন্ত স্মরণাতীতকাল হইতে জুম করিয়া আসিতেছে। কয়েকজন মাত্র বন্দোবস্তি প্রাপ্ত মধ্য ও ত্রিপুরা এতদ্ব্যতীত জুম করিত এবং তাহারা একিবারে গভর্নমেন্টে খাজনা দাখিল করিত। কিন্তু আবেদনকারী ও তাহার পূর্ববর্ত্তিগণ সমুদয় চাকমাপ্রজা হইতে পারিবারিক-কর আদায় করিয়াছে, এবং গভর্নমেন্টকে নিয়মিত কর দিয়া তাহাদের লভ্যাংশ উপভোগ করিয়াছে। প্রার্থী সবিনয়ে জানাইতেছে যে, ১ নম্বর সার্কেলে সমস্ত রায়তের উপযুক্ত স্থান নাই। কেননা, জুম-করিবার যথেষ্ট জমি পাওয়া যাইবে না। অবশ্য আপনি অবগত আছেন, জুমের নিমিত্ত প্রতি বৎসর নূতন ভূমি প্রয়োজন হয়। একবার জুম করা হইলে সেই ভূমিতে ৮১০ বৎসরের মধ্যে আর জুম চলে না।

“৫। ১ নম্বর সার্কেলের বহির্ভূত যে সকল স্থান চাকমাগণ কর্তৃক অধুষিত, এস্থানে তাহা উল্লিখিত হইল। কাচালগের উপনদী শিশুকের তীরবর্ত্তী স্থান,—ইহার মোহনা হইতে একদিনের পথ পর্যন্ত; চেন্দীর উপনদী গাইক্কাছরীর মোহনা হইতে তিন দিনের পথ পর্যন্ত তীরবর্ত্তী স্থান; ধরুং উপনদীর তীরবর্ত্তী স্থান মণ্ড-সার্কেলান্তর্গত কেলাছরী, নাভাঙা এবং ফেণীকুল; আবেদনকারীর কতকগুলি প্রজা ত্রিপুরামহারাজের রাজ্যে বাস করে। বর্ত্তমান নির্ধারিত সীমা যদি পরিবর্ত্তিত না হয়, তবে প্রার্থিকের পারিবারিক-কর আদায়ের ক্ষমতা অনেকাংশে তাবৎ রাজাদিগের হাতে পড়িবে। আপনি বিবেচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে কত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। চাকমারা কখনও অল্প কাহাকেও পারিবারিক-কর দেয় নাই। কেবল তাহাদের নিজ রাজাকেই দিত। তাহারাও এক্ষণে অল্পকে কর দিতে আপত্তি করিতেছে। দরখাস্তকারী প্রার্থনা করিতেছে যে, গভর্নমেন্টের নূতন আদেশে তাহাকে যে সমগ্র চাকমাজাতির অধীশ্বর করা হইয়াছে, সেই প্রদত্ত আদেশ যেন কার্যকর হয়।

“৬। চাকমাদিগের অধুষিত স্থান সমূহ চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে;—বড় কল্লের (১)

(১) “বড়কল”—মোহনা হইতে প্রায় একশত মাইল উপরে কর্ণফুলীর সর্বনিম্ন জলপ্রপাত-মালা। ইহা ছোটবড় ৮১০ টি জলপ্রপাত লইয়া প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। নদগর্ভ শিলাময়; যাবতীয় জিনিষাদি নামাইয়া বড়-সাবধানে নৌকা নিতে হয়। জিনিষ টানিবার জন্ত নদীপারে এই দুই মাইল ট্রামের বন্দোবস্ত আছে। প্রপাতগুলির মধ্যে তিনটি সর্কাপেক্ষা বড়। ভ্রমধ্যে মধ্যেরটিই ভয়ানক; প্রায় ১৪১৫ হাত উচ্চ হইতে ভীষণবেগে জল পতিত হয়, তাহাতে প্রায় ৬৭ হাত গভীর এক আবর্ত্ত ঘটে। বিস্তারিত বিবরণী ২৫শে ফাল্গুনের (১৩১১ সন) “জ্যোতিঃ”তে দ্রষ্টব্য।

উপরে খাসমহাল, মাইয়নী রিজার্ভ, মণ্ড সার্কেল, ও চাকমা বা আবেদনকারীর সার্কেল । ইহা দৃষ্ট হইবে যে, যদিও বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাতে চাকমাগণ ইচ্ছামত স্থানে জন্ম করিতে পারে, তথাপি আবেদনকারীর কতকগুলি প্রজা পার্শ্বত্যা ত্রিপুরায় চলিয়া গিয়াছে। আপনি বিবেচনা করিতে পারেন, তাহাদিগকে আনিয়া সমুদয় চাকমাগণকে দরখাস্তকারীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট সার্কেলের সীমার মধ্যে পুনরায় স্থাপন করা কতদূর সম্ভবযোগ্য হইতে পারে।

“৭। আবেদনকারীর প্রার্থনা এই, আপনি সাতিশয় দম্মা পূর্বক এই দরখাস্তখানি গভর্ণমেন্টের সুবিচারের নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন, যেন প্রার্থী বর্তমান প্রচলিত রীত্যনুসারে বাসস্থান-নির্কির্শেষে সমগ্র চাকমাজাতি হইতে কর আদায় করিতে পারে।”

ডেপুটি কমিশনার মি: পাউয়ার এই আবেদনপত্র বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাইতে তত্পরি এই স্বাভিমত \* জানাইয়া- \* Letter no. 319—  
ছিলেন:— “আপনি দেখিবেন, কত অধিক dated 20-4-1876.

সংখ্যক চাকমা ২ নম্বর (মণ্ড) সার্কেলের ফৌজী তাঁরে বাস করে।

× × × রাজভক্তিমাত্র তাহাদিগকে একত্র রাখিবার পক্ষে সহায়তা করে। তাহার। সম্ভবতঃ পুরুষ পরম্পরাবদ্ধ রাজাকে ছাড়িয়া অপর বিজাতীয় রাজার শাসনাধীনে যাইতে হইবে ভয়ে পার্শ্বত্যা ত্রিপুরায় পলাইয়া যায়। কাপ্তেন লুইনকৃত শাসনাধিকারের সীমা-নির্দেশের প্রস্তাবে চাকমারাজা এবং তদীয় প্রধান প্রধান দেওয়ানগণ আপত্তি করিয়াছিলেন। আমি বিশেষরূপে বলি যে, যদি গভর্ণমেন্ট পূর্বপ্রস্তাবিত সীমা পুনর্নির্দিষ্ট না করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রবর্তিত করিতেন, তাহা হইলে রাজা হারিশ্চন্দ্রের আপত্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। × × আমি মনে করি—সীমা পুনঃ পরিবর্তিত হইয়া চাকমা-গণকে তাহাদের পুরুষ পরম্পরাবদ্ধ রাজার অধীনে জন্ম আবাদ করিতে আরও অধিক স্থান দেওয়া ষাউক। কিন্তু বিষয়টা নিতান্ত সহজ নহে। ১ নম্বর সার্কেলের বহির্ভূত চাকমাগণকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ স্ব স্ব রাজাকে ছাড়িয়া কম সুবিধাজনক স্থানে বসবাস করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নিশ্চয়ই অরণ্য রাখিতে হইবে—চাকমাগণের যদিও চাষ-আবাদ নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং তাহার। ইচ্ছামত একস্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যায়, কিন্তু মূল আবাসস্থান স্থায়ী।” অতঃপর গভর্ণমেন্ট বিশেষ ধীরতার সহিত ইহার মীমাংসা করিয়াছিলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া আন্দোলন-আলোচনার

পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর আদেশ +

+ Letter No. 1985—  
797 L.R.

বাহির হয়,—এই (পার্শ্বত্যা চট্টগ্রাম) জেলা তিন সার্কেল ও দুই খাসমহলে বিভক্ত হইবে।—

“১ নম্বর, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সার্কেল :

উত্তর—কাচালঙ ফরেষ্ট রিজার্ভ, গাইঝাছরী কেংলাছরী, নাভাঙা ছরার উৎপত্তি স্থল পর্যন্ত;;

তথা হইতে ধুকুঙের নিম্ন বাবং।

পশ্চিম—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের “কলিকাতা গেজেটের” প্রথম ভাগের ৮১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পার্কত্যপ্রদেশের নূতন সীমা পর্যন্ত। (১)

দক্ষিণ—কর্ণফুলী নদী, সীতাপাহাড় রিজার্ভ, কাণ্ডাই ও রাইন্থঙের মধ্যবর্তী জলাঙ্গ হৈছুরা পর্যন্ত এবং রাইন্থং রিজার্ভ।

পূর্ব।—ছৈচাল ও ‘বড়কল’ পর্বতশ্রেণী।”

ইতোমধ্যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী কমিশনার মিঃ জন্, বিম্‌স পার্কত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টে এক সুদীর্ঘ

\* Letter No. 21.

রিপোর্ট \* উপস্থিত করেন। তাহাতে তিনি হরিশ্চন্দ্রের

বঙ্গালীভাব দেখাইবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—“( স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার )

কাপ্তেন গর্ডনের বর্ণনায় দেখা যায়, × × × রাজা হরিশ্চন্দ্র

বঙ্গালীপদ্ধতির লোক এবং তাঁহার হিন্দুধর্মগ্রাহ্যারী

হরিশ্চন্দ্রের বঙ্গালীভাব।

নিত্যনৈমিত্তিক অস্থানধারণা চাক্‌মাগণ অনেক

পরিমাণে সেই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

× × × ×

“রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র। চট্টগ্রামে তদীয় ভ্রমচারী আছে। তিনি বেশ সজ্জতিপন্ন লোক। বঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার এত ঝোঁক যে, তিনি হিন্দুপূর্ব ও ভোজাদি পালন করিয়া থাকেন। তিনি অপরাপর সরদারের মত তাঁহার লোকজনের সঙ্গে তত অধিক পরিমাণে পুরাতন জায়গীর সম্বন্ধীয় সম্পর্ক রাখেন না। × × × রাজা আপনাকে হিন্দু ও বঙ্গালী প্রতিপন্ন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিছেতেন। চট্টগ্রামের বঙ্গালী রায়তগণের মধ্যে থাকিতেই তাঁহার ইচ্ছা। স্বজাতীয় প্রজাগণের প্রতি তদীয় চেষ্টা অতি অল্প।”

আমরা যতদূর দেখিতেছি, কমিশনার মহোদয় কাপ্তেন গর্ডন কর্তৃক ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। বস্তুতঃ হরিশ্চন্দ্র বঙ্গালীসমাজকে ভাল বাসিতে গিয়া নিরর্থক কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। পূর্বেও এক্ষণে ভালবাসায় রাণীর

(১) চন্দ্রখোনার সন্নিকটবর্তী ত্রিপুরাহন্দরী নামী উপনদী এই সীমা কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিতেছে

প্রতি কাপ্তেন লুইনের বিষদৃষ্টি দেখাইয়া আসিয়াছি । পরন্তু উক্ত পত্রেরই প্রত্যুত্তরে \* মহামান্ন “লেপ্টেনান্ট গভর্নর দেওয়ান-গণের ক্ষমতা শক্তিস্কৃত ও রাজা হরিশ্চন্দ্র বাহাতে \* Letter No. 1078—450 L. R.—dated 2-5-1879. তাঁহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, তহুপযোগী প্রস্তাব অনুমোদন করেন ।” ইহার কারণস্বরূপ লিখিয়াছিলেন ( ১ ), “রাজা তদীয় জাতির সুখ-সুবিধার নিমিত্ত প্রকৃত কোন তত্ত্বাবধান লয়েন না ; উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আর্থিক আয় হইতে তাঁহার যাবতীয় অভাব পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে বরাবরই কর্তব্য পরিহার করিতেছেন ।”

পরে যখন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ডেপুটি কমিশনার মিঃ এল, আর, ফরব্রুস বিভাগীয় কমিশনার বাহাহুর সমীপে অত্রত্য রাজা-দিগের রাজস্ব বৃদ্ধি প্রস্তাবে এক পত্র † দিয়াছিলেন, † Letter No. 565.

জমাবুকি প্রস্তাব ।

তাহাতে চাক্‌মারাজ-সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য এবং নিম্নোক্ত যুক্তিতে জমা বৃদ্ধির কথা প্রকাশ ছিল :—

“রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাহুর—

তাঁহার সার্কেলে অবস্থিত পরিবার সংখ্যা—	৫০১১	
মণ্ড সার্কেল হইতে তিনি যত পরিবারের কর পান—	১০৫৮	
	৬০৬৯	
শতকরা ১৫ হিসাবে বিধবা, বিপত্নীকে, খিসা প্রভৃতিতে বাদ—	২১০	
	৫৮৫৯	
যতঘর স্বাধীন বন্দোবস্ত করিয়াছে—১২৬৫	}	৫০৭৬
তাঁহা হইতে শতকরা ১৫ হিসাবে		
বিধবা, বিপত্নীক, খিসা প্রভৃতি বাদ—১৮৯		
		৬২৩৫ ঘর।
অর্থাৎ ( প্রতি পরিবারে এক টাকা করিয়া ধরিলে রাজস্ব )		৬২৩৫ টাকা ।
১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২ই অক্টোবরের ৫৭৬৩ নম্বর গভর্নমেন্ট পত্র মতে		
১৮৭২ সালের লুসাই অভিযানের সহায়তার জন্য মুক্ত ঋজনা—	১১৪৩	”
সুতরাং দাতব্য রাজস্ব—		৫০৯২ টাকা ।”

( ১ ) ইহার ইংরাজীটুকু এই ;—“The Raja takes no real interest in the management of his tribe, and all that need be secured to him is a reasonable amount of pecuniary profit from the position which he has inherited, but the duties of which he persistently evades.”



বলা বাহুল্য, কমিশনার মহোদয়ও তাহা বখাসঘর বন্ধীয় গভর্ণমেন্টে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তখন সহদয় গভর্ণমেন্ট

হইতে প্রত্যুত্তর \* আসে,—“ডেপুটি কমিশনার

\*Letter No. 1985—797

L. R.—dated 1-9-1881.

১০৮১৪ পাই জমাকে ১০০২ টাকা করিবার প্রস্তাব

করিয়াছেন, কিন্তু লেপ্টেনান্ট গভর্ণর একসঙ্গে এত বুদ্ধি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। (১) পরন্তু ইহা বুঝা যায় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র এক্ষণে রাঙামাটিতেই থাকেন; যদি তিনি তদীয় প্রজাগণের সম্বন্ধে অধিকতর পরিমাণে জাতীয় কার্যে যোগদান করেন, এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিপত্তিশালী হন, তাহা হইলে লেপ্টেনান্ট গভর্ণর বড়ই আশ্লাদিত হইবেন।”

স্থানীয় রেসিডেন্ট অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট-প্রতিনিধির হস্তেই দেশীয় রাজস্ববর্গের নিয়তিক্র পরিচালিত হইতেছে! তাঁহার। যখন যেভাবে যাহা বলেন, কর্তৃপক্ষকে তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিচার-ব্যবস্থা করিতে হয়। সুবিধান বা নিপীড়নে সাধারণ যাহাতে মহামাত্র গভর্ণমেন্টের হাত দেখিতে পায়, বস্তুতঃ তাহা রাজকীয় প্রতিনিধির মন্ত্রণা-ফল মাত্র! কর্তৃপক্ষ আর বেশী তলাইয়া দেখিতে পারেন না, তেমন দেখিবার অবসরও নাই। সুতরাং স্থানীয় রাজপুরুষকে সম্বলিত রাখিতে পারিলে সুখ-সুবিধা ছই আছে, নতুবা ধনে মানে অধঃপাতে যাইতে হয়। পূর্বে দেখাইয়াছি, রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি স্থানীয় ডেপুটিকমিশনার মিঃ ফরবসের অমুকুল মন্তব্যে সহদয় লেপ্টেনান্ট গভর্ণর রাজাবাহাহুরের কার্যে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালে মিঃ ফরবসের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের মনোমালিঙ্গ ঘটে! তখন তিনি হরিশ্চন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত রাজকার্য-পরিচালনে অক্ষম বলিয়া গভর্ণমেন্টে রিপোর্ট করেন। তদন্তরে গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে রাজকার্য হইতে অপস্থত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সহদয়

কমিশনার সার ওইচ, জে, এস, কটন মহোদয়ের

কৌন্সিল গঠন।

অনুরোধে গভর্ণমেন্ট রাজার পদচ্যুতি আদেশ প্রত্যা-  
হার করিয়া রাজকর্ম-নির্বাহে হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যার্থে এক কৌন্সিল মনোনীত করিলেন। ইহাতে—

(১) পরে ইহা ৩১৫৫ টাকা হইয়াছিল। ১৯০৬-০৭ হইতে দশ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ৪৫৫০ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। বোম্বা ও মণ্ডসার্কলেও বখাসঘর পূর্বে ২০১৮ ও ২০১৯ টাকা ছিল, এক্ষণে ৫৭৭২ এবং ৩৪৭৮ টাকা হইয়াছে।

- ৩ নীলচন্দ্র দেওয়ান, বাড়ী বড়াদম ( চেঙ্গী ) ;  
 ৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস, " ধলঘাট, চট্টগ্রাম ;  
 শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান, " কামিলাছরী ;  
 " ত্রিলোচন দেওয়ান, " বড়াদম ( কর্ণকুলী ) ;  
 " রাজচন্দ্র দেওয়ান, " বাঁকছরী ;

সভ্য নিয়োজিত হন। ইহাদের মধ্যে কেবল স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফিসের হৃতপূর্ব ইংলিস ক্লাক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস মাত্র গভর্ণমেন্টের মনোনীত সভ্য ; আর সকলেই দেওয়ান, তালুকদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক সভ্যেরই মাসিক ৫০ টাকা করিয়া বেতন চলিত।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর হইতে ১৮৮৫ সনের ২২শে জানুয়ারী যাবৎ এই কোন্সিল রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সহায়তা করিয়াছিলেন। ২৩শে জানুয়ারী মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালার ১১ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়—

গুরুপক্ষের সপ্তমী তিথিতে রাজাঘাট রাজপ্রাসাদে  
 লীলা সাঙ্গ !

রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর স্থলীলা রাণীদেব, মেহের পুতুল পুত্রকন্ডা এবং অপরাপর পরিবার-পরিজনকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া একমাত্র হৃদয়স্তর করিয়া কবলে ভবলীলা সাঙ্গ করেন। প্রথমা মহিষীর গর্ভে পুত্র ভুবনমোহন এবং স্বর্ণময়ী, হিরণ্যময়ী ও করুণাময়ী—কন্ডাত্মের জন্ম হইয়াছিল; কনিষ্ঠা রাণী শ্রীশ্রীমতী মনোমোহিনী একমাত্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন—রমণীমোহনকে। স্বর্ণময়ী সর্বজ্যোষ্ঠা; 'তৈন্যা গোছা'র—'কুখ্যা' বংশজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দেওয়ানের সহিত তাঁহার গুণপরিণয় হইয়াছে। বিবাহে যৌতুক স্বরূপ রাজানগরে প্রায় তিনশত টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি এবং পার্শ্বত্যাগদেবে গুভলং—মিতিঙাছরীর একটি সুবৃহৎ মৌজা প্রদত্ত হয়; রাজসরকার হইতেও স্বর্ণময়ী মাসিক ৫০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়া থাকেন। বর্তমানে তাঁহাদের এক পুত্র ( নাম—পুলিনবিহারী ) এবং তিন কন্যা ( নাম—হেমললিনী, নীলললিনী ও প্রফুল্লললিনী ) ; অপর দুই রাজকন্যা বিবাহ না হইতেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রধানা রাজ্ঞী সৈরিকী বহুকাল পতিবিচ্ছেদ-বন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে শূলযোগে ১৯০১ ইংরাজী ১৭ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৯ বাঙ্গালার ১লা আশ্বিন পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৫টার সময় পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত বাবালকের

পক্ষে উল্লিখিত কোন্সিল শাসনকার্য্য নিৰ্কাহ করেন। তখন পার্কত্যাৰাজ্য পরি-  
চালনে শ্রীযুক্ত মীলচন্দ্র দেওয়ান সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত  
বিস্তিত শাসন। কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ও শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান সভ্য  
ছিলেন। চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান ও শ্রীযুক্ত  
ঈশ্বরচন্দ্র বিখাসের হস্তে ছিল। অনন্তর জুন মাস হইতে গভৰ্ণমেন্ট  
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে পাশ্চাত্যপ্রদেশের এবং শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন  
দেওয়ানকে চট্টগ্রামের জমিদারীর ম্যানেজার করিয়া আর সকলকে বিদায় দেন।  
এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইলে গভৰ্ণমেন্ট চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার ত্রিলোচন  
বাবুর হাত হইতে লইয়া চট্টগ্রাম “কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের” তত্ত্বাবধানে অর্পণ  
করেন। কিন্তু পার্কত্যাপ্রদেশের শাসনকর্ত্ত্ব বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের রাজ্যা-  
ভিষেক পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বাবুর হস্তেই ছিল। শেষ কয়বৎসর তিনি রাজসরকার হইতে  
মাসিক একশত টাকা করিয়া বেতন পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পূৰ্ব্বাঞ্চলে  
পুনরায় কুৰ্দিগের উপদ্রব আরম্ভ হয়। তজ্জন্ত গভৰ্ণমেন্ট বাধ্য হইয়া ১৮৯২  
খৃষ্টাব্দে লুসাইতে আবার অভিযান প্রেরণ করেন। কুৰ্দি দমিত হয়; এবং  
আনুযজিক ফলে লুসাই আসামভুক্ত ও পার্কত্যা চট্টগ্রাম সবডিভিসন হইয়া যায়।  
পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা হইতে এই শেযোক্ত প্রদেশ পুনরায় স্বতন্ত্র জেলাৰূপে  
পরিগণিত হইয়াছে।

যুবরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাননীয় গভৰ্ণমেন্টের  
আদেশে ১৮৯৭ ইংরাজির ৭ই মে মোতাবেক ১৩০৮ বাঙ্গালার ( ১২৫৯ বর্ষের )  
বর্ত্তমান রাজা ২৫শে বৈশাখ স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ( ১ ) মিঃ  
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ডবলিউ, এন, ডেলিভিন ( Delivine ), সি, এস,  
রায়। মহোদয় রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহ সহকারে  
তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনিই বর্ত্তমান চাক্ষা অধিনায়ক ( Chakma  
chief ) তাঁহাকে খেলাত প্রদান উপলক্ষে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বেল-  
ভেডিয়া প্রাসাদে এক বিরাট দরবার ( ২ ) অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন প্রজারাজক

(১) ১৮৯১ ইংরাজীর ১৬ই নবেম্বর হইতে এই পার্কত্যা চট্টগ্রামের প্রধান শাসনকর্ত্তার  
পদবী এসিঃ কমিশনার হইয়াছিল, অনন্তর ১৯০০ ইংরাজীর ২রা মে হইতে তৎপদবী সুপারিন্টেন্ডেন্ট  
হইয়াছে।

(২) Vide the full description in the “Statesman” dated 16th  
December, 1898.

লেপ্টেনান্ট গভর্নর সার জন উড্‌বরণ মহোদয় বহু গণ্যমান্ত দেশীয় এবং বিদেশীয় ভ্রমলোককে এ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। দরবারের কার্য আরম্ভ হইলে, দুইজন খেলাত প্রদান।

আশ্রয় সেক্রেটারী চাকমাপতিকে সসম্মানে মাননীয়

লেপ্টেনান্ট গভর্নর-সমীপে লইয়া উপস্থিত করেন।

তখন চিফ সেক্রেটারী মহোদয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর বাহাদুরের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলে, মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর এবং সমবেত ভ্রমহোদয়বর্গ সকলেই স্ব স্ব আসন হইতে গাত্ৰোত্থান করেন। অনন্তর চিফ সেক্রেটারী মহোদয় “রাজা” পদবী সংযুক্ত সনন্দখানি পাঠ করিয়া লেপ্টেনান্ট গভর্নর বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি তাহা চাকমাপতির হস্তে প্রদান করেন। তখন রাজা বাহাদুর প্রতিমানে মাননীয় লেপ্টেনান্ট গভর্নর মহোদয়কে একটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করেন।

তিনি যথারীতি তাহা স্পর্শ মাত্র করিয়া রাজা লেপ্টেনান্ট গভর্নরের বক্তৃতা।

বাহাদুরকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ( ১ ) :—

“আপনি উত্তরাধিকারীহুত্রে পার্শ্বতা চট্টগ্রামের চাকমাজাতির অধিনায়কত্ব লাভ করিবার সময় যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বারা আজ আপনাকে বিভূষিত করা আমার সুখজনক কর্তব্য।

(১) His Honor addressing the Raja, said :—

“You have, on succession to the chiefship of the Chakma clan of the Chittagong Hill Tracts, received the title with which it is my pleasant duty to invest you to-day. Your clan is the most numerous, and occupies the largest section of the Hill Tracts, and the management of your circle involves much responsibility, and demands the exercise of much tact and prudence. You are young, but enjoy the advantage of having been brought up during a long minority by the Court of Wards and of having received a good education. I trust that, with the advice of the local officers, which will always be given to you, you will be able to manage the affairs of your circle with credit to yourself and advantage to your people. The government looks to you and the other chiefs of the Hill Tracts to assist in all measures which will contribute to improvement of the condition of hill tribes. It attaches great importance, as you are aware, to the abandonment of their nomadic habits by the hillmen, and their adoption of plough cultivation wherever land is available.”

আপনার জাতি সংখ্যায় অনেক এবং পার্কিত্যপ্রদেশের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিরা বাস করিতেছে; আপনার সার্কলের শাসনপরিচালন গুরুতর দায়িত্বজনক এবং সবিশেষ চাতুর্য ও বুদ্ধিনৈপুণ্য সাপেক্ষ। আপনি যুবক; পরন্তু সুদীর্ঘ বাল্যকাল ধরিয়া “কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্” কর্তৃক আচার ব্যবহাবাদি শিক্ষা পাইবার এবং হুশিক্ষিত হওয়ার সুবিধা উপভোগ করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি, স্থানীয় রাজপুরুষগণ হইতে সতত যে উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে প্রজাসাধারণের সুবিধা এবং স্বীয় গৌরবের সহিত আপনার সার্কলের শাসন নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন। পার্কিত্যজাতিসমূহের অবস্থার উন্নতিকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইবে, তৎসমুদয়ে আপনি এবং পার্কিত্যপ্রদেশের অপরাপর অধিনায়কবর্গ সহায়তা করিবেন বলিয়া গভর্নমেন্ট আশা করেন। গভর্নমেন্ট পার্কিত্যদিগের স্থিতিহীন অভ্যাস পরিহার করিয়া, যেখানে স্থান পাওয়া যায়—তথায় লাল্লের চাব অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, ইহা আপনার জানা আছে।”

অতঃপর রাজাবাহাদুর তদীয় আসনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সকলে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

রাজা ভুবনমোহন ১৮৭৬ ইংরাজীর ৬ইমে মোতাবেক ১২৮২ বঙ্গাব্দ (১২৬৭ মঘির) বৈশাখ মাসে রাঙামাটি রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তদীয় ধীর-গম্ভীর ব্যবহারে পরিবার প্রীতিবেশী সকলেই

সংক্ষিপ্ত জীবনী। তৎপ্রতি প্রকৃষ্ট। তিনি ১৮৮৮ সালে প্রথম বিভাগে

উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন, তৎপরে দুই বৎসর স্থায়ী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। অনন্তর চতুর্দশ বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তাহাতেও মাসিক ৮ টাকা করিয়া তিন বৎসর স্থায়ী বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখন সদাশয় গভর্নমেন্ট বিশেষতঃ তাঁহারই পাঠ-সৌকর্য্যার্থে রাঙামাটি মধ্য ইংরাজী স্কুলকে উচ্চ ইংরাজী শ্রেণীতে উন্নীত করেন। এসময়ে রাজসরকার হইতে এই স্কুলে মাসিক বিশ টাকা সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত হয়। এক্ষণে তাঁহাদের কেহই পড়িতেছে না, রাজাবাহাদুর তথাপি সাহায্য বন্ধ করেন নাই। বর্তমান গ্রন্থকারও সেই বৃত্তাংশ ভোগ করিতেছেন। মধ্যইংরাজী পাঠের পর চারিবৎসরেই ভুবনমোহন প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বলাভ করেন। অতঃপর কলিকাতায় থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত তাঁহার ফাষ্টআর্ট পাশ করা ঘটনা উঠে নাই! অবশেষে স্বাস্থ্যজনকবন্ধন সুযোগ্য চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিদ্যালয়-ছাড়িলেও তিনি অধ্যয়ন বিসর্জন দেন নাই;

অত্ৰাপি নিয়মিতরূপে নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্র এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালী উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী অবসর সময়ে পাঠ করিয়া থাকেন ।

রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি যাবতীয় কাণ্ডের সুশৃঙ্খলাবিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । রাজধানীর পারিপাট্য সাধন সর্বপ্রথমে উল্লেখ যোগ্য । পূর্বে

কাণ্ড । এই রাজত্ববনের অবস্থা অতি সামান্য মাত্র ছিল,

যথোপযুক্ত গৃহাদিও ছিল না । যদিও অত্ৰাপি রাজ-পুরীর সমরক্ষ হয় নাই, কিন্তু উন্নত জমিদার বাড়ী অপেক্ষা এক্ষণে মন্দ নহে । এবং যাদৃশ আরোজনের সহিত কাজ চলিতেছে, কালে নগ্ন মনোহারী হইবে— আশা করা যায় । রাজকীয় অফিস হাতে ‘জমিদার দপ্তরের’ আবর্জনাও বিদূরিত হইয়াছে । পরন্তু রাজা ভুবনমোহন আপন যুদ্ধাতেও নূতনপ্রথা অবলম্বন করিয়াছেন । তাহাতে নাম রাখা হয় নাই ; ইংরাজিতে পরিধিপ্রাপ্তে—“চট্টগ্রাম এবং পার্কচ্যপ্রদেশ”, মধ্যে দুইটি হস্তী, দুইখানি তরবারী ও একটি কামান— রাজচিহ্নের উপরিভাগে ইংরাজিতে “চাকমারাজ” এবং তন্নিম্নে দেবনাগরী অক্ষরে হিতোপদেশের প্রধান নীতিসূত্র “উজোগিনং পুরুষসিংহুপৈতি লক্ষ্মীঃ” খোদিত হইয়াছে । বে নীতিবাক্যকে ‘মটো’ করিয়া তিনি রাজকাণ্ড পরিচালন করিতেছেন, তাহাতেই জমিদার শাসনপ্রণালী সহজে উপলব্ধি হইবে । তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । তাহা দিয়াই প্রজাবর্গের যথাসাধ্য উপকার করিতে তিনি সতত যত্নপরায়ণ । বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রজাগণকে বিশেষ সাহায্য করেন, এবং তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টাকলে—বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ এখন আর নিরীহ পাহাড়ী-দিগকে সর্বস্বান্ত করিবার তত সুবিধা পায় না । বস্তুতঃ রাজনৈতিক স্বার্থ অব্যাহত রাখিয়া ঈদৃশ প্রজারঞ্জন-তৎপর অতি অল্প রাজারই সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া গিয়া থাকে । আবাল-বৃদ্ধবনিতা এমন কি ইংরেজকর্তৃপক্ষগণও তাঁহার ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট—একারণে মাননীয় গভর্নমেন্টের নিকটও তিনি বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকেন । ধর্ম্মে তিনি কোনও নূতন পরিবর্তন করেন নাই । মাতামহীর সজীবিত বৌদ্ধধর্ম্মে রাজা হরিশ্চন্দ্রও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন ; বর্তমান রাজাবাহাদুরের সময়ে তাঁহার এই ধর্ম্মেই যেন দৃঢ়তম হইয়া আসিতেছেন ।

[ ২ ]

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ মোতাবেক ১৩০১ সনের ১৮ই ফাল্গুন রাজধানীর রাজপ্রাসাদে অত্রত্য কাঁটাছরী নিবাসী ‘কুরাকুট্যাগোছার’ নন্দাব গোষ্ঠিক শ্রীবৃন্দ চন্দ্রকান্ত দেওয়ানের প্রথমা কন্যা দ্বয়ামরীর সহিত রাজা ভুবনমোহনের শুভ-

পরিণয় কাণ্ড মহাসমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ১৪ই ফাল্গুন দয়াময়ীর জন্ম হয়। সুতরাং পূর্ণ ত্রয়োদশ স্বর্গগতা রাণী দয়াময়ী।

বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, মাত্র দশবর্ষকাল রাজসংসার আলোকিত করিয়া ১৩১২ বাঙ্গলার ৭ই বৈশাখ, ইংরাজী ১৯০৫ অব্দের ২০শে এপ্রিল রাণীমাটি রাজপ্রাসাদে কালান্তক স্মৃতিকার প্রবল আঘাতে চিরকালের তরে এই পবিত্র দীপ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে! এই দশ বৎসর তাঁহার সাধচর্য্যে রাজাবাহাদুর কত যে সুখ-শান্তি উপভোগ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে তদীয় স্মৃতি উঠাইলে তাঁহার অপাঙ্গ-জাত অশ্রুকণা সাক্ষ্য দিয়া থাকে। রাণী বহুদিন ধরিয়া রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; রাজাবাহাদুর প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার চিকিৎসাবিধান করেন। কিন্তু হয়! এত ঔষধ—এত শুশ্রূষা সকলই ব্যর্থ করিয়া করাল কাল দিকট বদন ব্যাদনে তাঁহার প্রাণভরা সুখ—বুকভরা আশা সমস্তই বিনষ্ট করিল! আমরণ পতিসেবা ও রাজসেবা করিয়া সেই স্বর্গীয় প্রতিমা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, মহিলা-জীবনে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য-সুখ আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ আরও আশ্বাসের কথা,—তিনি মৃত্যুকালে স্বামীর কোলে অগাধ প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ — অসান্ত-স্নেহ পুস্তলিকা—একটি বালিকা এবং দুইটি বালক দিয়া গিয়াছেন। কন্যার

নাম শ্রীমতী বিজ্ঞনবালা, বয়স—অষ্টমবর্ষে উপস্থিত (১)।  
পুত্র কন্যা।

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নলিনাক্ষ ও কনিষ্ঠ শ্রীমান বিরূপাক্ষের বয়স যথাক্রমে ছয় ও চারি বৎসর। রাণী মহোদয় কেবল যে বিনয়-নম্র ব্যবহারে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—তাহা নহে, তাঁহার অলৌকিক গুণ-সৌরভে সহস্র ব্যক্তি মাঝেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। বিগত ১৩১১ সনের বোম্বাই প্রদর্শনীতে তাঁহার স্বহস্ত নির্মিত দু'খানি তসরের কাপড় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তসরের কারুকার্য্যে এই দুইখানিই বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করত দুইটি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে বলিয়া তদানীন্তন নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে বিবোধিত হয়। ততোধিক প্রশংসার বিষয়, এই তসরের বস্ত্র খণ্ডস্বয় যে তথাকথিত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা

(১) রাজাবাহাদুর পুত্রকন্যাগণের শিক্ষাদানের জন্ত কতেয়াবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকচরণ বিশ্বাস নামক জনৈক শিক্ষককে স্বীয়ভবনে রাখিয়াছেন। শ্রীমতী বিজ্ঞনবালা বর্তমানে উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য পড়িতেছে।

নহে, পার্বত্যায়রমণীগণ এইরূপ কারুকার্যে প্রবৃত্ত হইলে

শিল্প ।

লাভজনক হইবে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত

পূর্বনির্দিষ্ট এই বস্ত্রখণ্ডের কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ “লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে” (১) প্রেরণ করেন। তাঁহারাই বোম্বাই প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। “ভারতী”র ভূতপূর্ব সম্পাদিকা বঙ্গের মহিলাকুলনিধি শ্রীমতী সরলা দেবী ১৩১১ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, “চট্টগ্রামের পার্বত্যরাজ্যের রাণীর স্বহস্ত প্রস্তুত দুইটি অতিসুন্দর বস্ত্রখণ্ড বঙ্গদেশের গৌরবের কারণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন।” (২) ইহাতেই তদীয় শিল্পনৈপুণ্যের গৌরব উপলব্ধি হয়। এবং তদুপলক্ষেই ২০শে ফাল্গুন স্থানীয় “জ্যোতিঃ” সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “এই হৃদ্বিনে রাণীর প্রশংসিত শিল্পনৈপুণ্য এবং তাঁহার ঐ মহোচ্চ আকাজ্জ্বল্যের কথা শুনিয়া আমরা যে কি পরিমাণ আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা সর্বাত্মক-করণে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া রাজসংসার আলোকিত রাখুন; তাঁহার চেষ্টায় আমাদের দীনা চট্টলভূমির গৌরব বৃদ্ধি হউক।” আহা, তাহা আর হইল কই!

(১) অধুনা সুেই “লক্ষ্মীভাণ্ডার” নাই, তাহার হস্তান্তর ও অবস্থান্তর উভয়ই ঝটিয়াছে।

(২) এই পুস্তকে স্বর্গীয় রাণী মহোদয়ার প্রাপ্ত পদকদুইটির প্রতিকৃতি রক্ষা করিবার মানসে রাজাবাহাদুরের নিকট পদকদ্বয় চাহিয়াছিলাম। তিনি “লক্ষ্মীরভাণ্ডারের” কাব্যাদ্যক্ষের কাছে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াও পদকসম্বন্ধীয় কোন কথা জানিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। অনন্তর আমি এই প্রতিকৃতি পাইতে “লক্ষ্মীভাণ্ডারের” তৎকালীন সর্বাধিকারিণী শ্রীমতী সরলা দেবী সকাশে লিখিয়াছিলাম। তদন্তরে তাঁহার সহকারী কাব্যাদ্যক্ষ আমাকে লিখিয়া-ছিলেনঃ—“x x ‘বোম্বাই প্রদর্শনীতে’ চাক্‌মারাগীর এবং ত্রিপুরার রাণীর শিল্পকাব্য একই আলমারীতে ছিল। প্রথমতঃ আমরা শুনিতে পাই যে, চাক্‌মারাগীই স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরে যখন পদক এবং তৎসঙ্গে সার্টিকিফিকেট আসিল, তখন দেখা গেল, পদকগুলি ত্রিপুরার রাণীর নামে আসিয়াছে। পূজনীয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর মতে চাক্‌মারাগীর কাব্যই সুন্দর এবং পদক পাওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং তাঁহার একপই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু চাক্‌মারাগী আদৌ কোন পদক পান নাই।” ইহাতে বুঝা যায়, গোলমালে পড়িয়া চাক্‌মারাগীর প্রাপ্তব্য পদক ত্রিপুরারাগীর নামে হইয়া গিয়াছে।



বর্তমান রাণী।

আমহোদয় গত ৮ই অগ্রহায়ণ ( ১৩১২ ) মৃতরাণীর জাতি-  
ভগিনী, শ্রীযুক্ত গঙ্গামণিক দেওয়ানের প্রথম কন্যা—  
শ্রীশ্রীমতী রমায়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আশাকরি  
বর্তমান রাণীমহোদয়া স্বর্ণগতা দয়াময়ীর পুণ্যগোরব লাভ করিয়া রাণীর কীর্তিধ্বজা  
অক্ষুণ্ণ রাখিবেন; ভগবান সমীপেও আমাদের এই প্রার্থনা। তাঁহার গর্ভে প্রথমে  
এক কন্যা জন্মিয়াছিল; কিন্তু অতিশিশু কালেই গতাস্থ হয়। অনন্তর ৩৪ মাস  
গতহইল এ পুত্র লাভ হইয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল রাণীমাটি রাজপ্রাসাদে কুমার রমণীমোহনের  
জন্ম হয়। তদীয় আবালপ্রসিক্ত তেজীয়াসী  
কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়। প্রতিভা এবং কার্যতৎপরতার কথা সকলেরই মুখে  
শুনিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কলিকাতায় অধ্যয়নকালে তিনিও তত্রতা  
হেয়ার স্কুলে পড়িতেন। পরে তিনি রাজাবাহাদুরের কলেজ পরিত্যাগের সঙ্গে  
সঙ্গে বাড়ী চলিয়া আসেন। এখানে থাকিয়া রাণীমাটি হাই স্কুল হইতে এন্ট্রান্স  
পাশ করেন। অনন্তর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন; কিন্তু  
হৃদ্বমনীয় ম্যালেরিয়ায় পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তিনি ‘ফাষ্ট আর্ট’ পাশ করিতে পারেন  
নাই। অনন্তর তিনি বিলাত গমনে অভিলাষী হন। কিন্তু রাজাবাহাদুর নানা  
কারণে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। বলিতে কি, এইখানেই  
তাঁহার ছাত্রজীবনের যবনিকা পতিত হইল। কিন্তু তাঁহা হইলেও তিনি এখানেই  
অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। ১৩১২ সালে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ানের কন্যা  
শ্রীমতী সরলাবালায় সহিত তদীয় গুণগরিময় হইয়াছে। বৎসরাধিক গত  
হইল তাঁহাদের এক পুত্র লাভ হইয়াছে, শ্রীমানের নাম অনিলচন্দ্র।

রাজকীয় প্রথাশুসারে ( ১ ) জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী;  
সুতরাং এই পার্শ্ব্যরাজ্যে কুমারবাহাদুরেরও কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি মাত্র  
রাজসরকার হইতে নির্দিষ্ট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এতদ্বিত্ত এই পার্শ্ব্য-  
রাজ্যে অল্পতম হেডম্যানস্বরূপে তিনি ‘বন্দুকভাড়া’ নামক সুবৃহৎ মোজার  
পরিচালন-ভার পাইয়াছেন। কাগজে পড়ে এই সমস্ত পৃথক বন্দোবস্ত  
থাকিলেও, তাহা কেবল ভাবীকালের নিমিত্ত।  
বাস্তবিক তাঁহাদের দ্রাঘত্বের বাদৃশ পবিত্র অমুরাগ

সৌভ্রাতৃ।

দেখা যায়, বর্তমান স্বার্থ-সর্বস্বয়ুগে একদল কদাচিত্ পরিণাম-সাধারণের চক্ষে তাঁহারা ভ্রাতৃ-প্রেমে “রান-লক্ষণ” প্রায় প্রত্যয়মান । হইলেও কুমার রমণীমোহন, রাজাবাহাদুরের মাতৃদেবী পরলোকগতা মহারানী সৈরিক্কীর প্রতি অসাধারণ ভক্তিমান ছিলেন । তাহার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার স্বর্গগতা আত্মার প্রীত্যর্থ এবং ভদ্রীয় স্মৃতি জাগরক রাখিতে কুমারবাহাদুর প্রতি বৎসর রাজ্যমাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্বোচ্চস্থানীয় পাহাড়ী ছাত্রকে “সৈরিক্কীমেডেল” নামধেয় একটি রৌপ্য পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । এতদ্ভিন্ন তিনি সবিশেষ চেষ্টাসহকারে রাজানগরে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টঅফিস খুলিয়াছেন ; তাহার নাম রাখিয়াছেন— পোষ্ট অফিস “রাজা ভুবন ।” ইহাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি নিঃস্বার্থ ভক্তিপরায়ণতার অত্যাশ্চর্য দৃষ্টান্ত নহে কি ?

দায়ভাগমতে কুমার রমণীমোহন চট্টগ্রামের জমিদারীর অধিক অধিকারী । সম্প্রতি তৎসম্বন্ধেও তাঁহাদের মধ্যে এক বন্দোবস্ত হইয়া রহিয়াছে । তাহাতে রাজাবাহাদুর আপন অংশ হইতে তাঁহাকে বার্ষিক দুইশত টাকা আয়ের সম্পত্তি অধিক দিয়াছেন ।—দৃঢ় ভ্রাতৃপ্রেম ! বলা বাহুল্য, এই বন্দোবস্তও ভবিষ্যতের জন্ত । এক্ষণে সম্পূর্ণ জমিদারীর ভারই কুমারবাহাদুরের হস্তে স্তম্ভ রহিয়াছে । তিনি বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় রাজানগর বাড়ীতে থাকিয়া জমিদারী শাসন করিয়া থাকেন । “কোর্ট অব্ অয়ার্ডসের” নীতিবস্ত্রে জমিদারীর কার্য প্রায় সুশৃঙ্খল হইয়া আসিয়াছিল ।

তিনি আরও সংস্কার বিধান করিয়া সুচারুরূপে শাসন পরিচালন করিতেছেন । জমিদারীর ‘পুণ্যাহ’ সচরাচর ভাদ্রমাসেই হইয়া থাকে ; সে দৃশ্য যথার্থই ছন্দাকর্ষক । কুমারবাহাদুর রাজানগর রাজপ্রাসাদকে “ফ্যান্সি ভিলা” ( Fancy Villa ) অর্থাৎ ‘সুন্দর্য পুরী’ নামাকরণ করিয়াছেন । তত্রত্য রাজবাড়ী সংলগ্ন মধ্যইংরাজী স্কুলের উন্নতিবিধানের নিমিত্তও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন ।

কুমারবাহাদুর স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিই অতিশয় অনুরাগী । একসময়ে তিনি এই পার্শ্বত্যাগ প্রদেশের সমুদয় কার্পাসের একচেটিয়া ব্যবসায় খুলিবার চেষ্টা করেন ; কোনও কারণে তাহা আর ঘটয়া উঠে নাই ! তবে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ ভাবেই কার্পাস ও তিলের ব্যবসায় চালাইতেছেন । সমস্ত পরের উপর নির্ভর

স্বাধীন ব্যবসায় ।

জনও আশায়ুগল ফললাভ হয় নাই । পক্ষান্তরে কৃষিকার্যের  
 মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন । তিনি চট্টগ্রামবিভাগীয় “কৃষিসমিতির”  
 ( Agricultural committee ) অগ্রতম সভ্য । কৃষিবিষয়ক যখন যে নূতন  
 গবেষণা বাহির হয়, তাহা অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া কার্যে প্রয়োগ  
 করিবার চেষ্টা করেন । কোথাও সন্দেহ ঘটিলে তাহা লইয়া কৃষিসমিতিতে  
 আলোচনা, অথবা সুপ্রসিদ্ধ “কৃষক”পত্রে জিজ্ঞাসা (১) করিয়া থাকেন । সম্প্রতি  
 তিনি রাঙামাটির পার্শ্বপ্রবাহিতা কর্ণফুলীর অপর পারে এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র  
 ( Model garden ) খুলিয়াছেন ; বৎসরের যে কয়মাস রাঙামাটিতে থাকেন,  
 তাহার অধিকাংশ সময় রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া এই কৃষিক্ষেত্রসংলগ্ন সাধারণ গৃহে  
 বাস করিয়া থাকেন । ইহার নাম রাখিয়াছেন “শান্তিকুঞ্জ ।” নামটি যথার্থই  
 হইয়াছে, হৃদয়বান লোক এখানে আসিলে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবেন (২) ।  
 পরিশেষে তদীয় শিকারনৈপুণ্যও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ রাজ-  
 মহারাজগণ যেরূপ সিপাই-পন্টন লইয়া (!) পশুশিকারে বহির্গত হন, তিনি  
 তাহা করেন না ; প্রায়শই অন্তর্নির্ভর । শিকারের মধ্যে এযাবৎ দুইটি ‘রয়েল  
 বেদল টাইগার’ই বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত ।

ফলতঃ ভুবনমোহন, রমণীমোহন কি বর্তমান রাণী শ্রীশ্রীমতী রমানন্দের জীবন-  
 চরিত লিখিবার সময় এখনও বহুদূরে । তাঁহাদের জীবনের উৎকৃষ্টভাগ সবে আরম্ভ  
 হইয়াছে মাত্র । প্রিয় পাঠকবর্গের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার  
 জন্তই উল্লিখিত কয়েকটি স্থল কথা এখানে বলিতে হইয়াছে । ইহাতে ভবিষ্যৎ  
 ইতিহাস বা জীবনোলেখকদিগেরও কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে । কখনও এ  
 আশা, কার্যতঃ সফল দেখিতে পাইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব !

( ১ ) বাঙ্গালা ১৩১২ সনের আষাঢ় সংখ্যার “কৃষক” দ্রষ্টব্য ।

( ২ ) কিছুদিন হইল, ইহা এখান হইতে চেন্নাইতে তদীয় বন্ধুবান্ধব মৌজার উঠাইয়া  
 নিয়াছেন । তথায়ও তাঁহার উৎসাহ প্রশংসাযোগ্য ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

- [ ১ ] রাজনীতি—শাসনপ্রথা—রাজকীয় উৎসব ;
- [ ২ ] তালুক ও তালুক দেওয়ান ;
- [ ৩ ] মৌজাগঠন ও হেড্‌ম্যান নিয়োগ ; এবং
- [ ৪ ] কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

[ ১ ]

রাজনীতি বলিলে সচরাচর যে অর্থ প্রতীত হয়, সেই “সাম দান ভেদ-দণ্ড” একমাত্র স্বাধীন রাজারাই পরিচালনার অধিকারী। অধীনের বিধি ব্যবস্থাতেও স্বাধীনতা নাই ; তাহাদিগকে সভয়ে ও সাবধানে কর্তৃপক্ষের প্রদর্শিত পথ ধরিত্তা কার্যনির্বাহ করিতে হয়। ১৮৬০, ১৮৮৪, ১৮৯২ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বিধান সমূহের ( ১ ) দ্বারা মাননীয় গভর্ণমেন্ট ক্রমে এই পার্শ্বত্যা প্রদেশের সর্বময় প্রভুত্ব হস্তগত করিয়াছেন। ফলতঃ বর্তমানে এদেশ একরূপ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের শাস্তাং তত্ত্বাবধানে শাসিত হইতেছে। রাজা এবং তদধীন হেড্‌ম্যানগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত প্রজাবর্গের শাস্তিরক্ষা ও করসংগ্রহ করিত্তা পারিশ্রমিকস্বরূপ রাজস্বাংশ ভোগ করেন। স্তত্রাং এক্ষণে চাকমা-  
অধঃপতন।

রাজমহোদয়কে করদরাজসংজ্ঞাভুক্তও করা যাইতে পারে না। পূর্ববর্তী রাজাদিগের উন্নত প্রভাব-গৌরব যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অতীতের প্রভাশ্মিত চিত্রখানি বর্তমানের পার্শ্বে ধরিলে নিতান্ত শত্রুকেও ত্রিয়মাণ হইতে হয় ! কিছুকাল পূর্বে যে চাকমা নরপতি দীক্ষাদাতা গুরুকে পর্য্যন্ত “মহারাজ ভট্টাচার্য্য” উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, আজ সেই চাকমাধীশ্বর অর্থহীন “রাজা”, কার্য্যতঃ সরদার বা অধিনায়ক ( Cheif ) উপাধি মাত্র সম্বল লইয়া আছেন। কালের কি বিচিত্র মহিমা ! রাজা বাহাজুর

ন, “কাপুরুষ” আমরা ইহাতে বিধাতার হাত দেখিয়াই  
ব। কে বলিবে, তাঁহার শুভ-ইচ্ছা আরও কত না অভিনবত্ব

কেনববে ?

সমগ্র পার্শ্বত্যা চট্টগ্রাম প্রধানতঃ এক ইংরাজ সুপারিন্টেন্ডেন্টেরই কর্তৃত্বাধীন ।  
অপর একজন এসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও দুইজন সব ডেপুটিকমিস্তার তাঁহার  
সাহায্য করিয়া থাকেন । চট্টগ্রামের কমিশনারের হস্তে এখাকার সেসন  
জজ এবং ইন্সপেক্টর জেনেরেল অব্ পোলিসের ক্ষমতা স্তম্ভ, প্রাদেশিক  
গভর্নমেন্ট হাইকোর্টের প্রভুত্বও পরিচালনা করেন । গভর্নমেন্টপোলিস ( ১ )  
কর্তৃক গুরুতর এবং পাহাড়ী ও ‘দেশের’ লোকসংস্পৃষ্ট ঘটনার অনুসন্ধান হয় ;  
অপরপর অভিযোগের বিচার-ভার সার্কেল চিফের উপর অর্পিত হইয়া থাকে ।  
ইংরাজ-রাজপুরুষদের রিপোর্ট পাঠেও দেখা যায়, গুরুতর অপরাধ কদাচিত্  
ঘটে । খুন ও গুরুতর জখম প্রায়ই হিংসা ও পানবশতঃ হয় । অপরাধী  
কদাচিত্ দোষগোপন ও বিচার অমাত্তের চেষ্টা পাইয়া থাকে ( ২ ) । বর্তমান  
রাজা বাহাদুর উচ্চতম \*শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট-প্রায় ক্ষমতা  
মাত্র লাভ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করেন । তবে তাঁহাদের হইতে  
অধিকতর সুবিধা অবশ্যই আছে । ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে নির্ধারিত মাননীয়

বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের বিধান মতে তিনি নিম্নোক্ত  
বিচার ক্ষমতা ।

কতিপয় গুরুতর অভিযোগ ব্যতীত স্বীয় সার্কেলের  
সাধারণ অধিবাসী কর্তৃক বিহিত বাবতীয় বিষয়েরই বিচার করিতে পারেন ; তজ্জন্ম  
তাঁহার জরিমানা, ক্ষতিপূরণ আদায় বা কয়েদ করিবার অধিকার আছে । যাহারা  
অর্থদণ্ড পরিশোধে অসমর্থ, তাহাদিগকে জেল খাটিতে হয়, রাজবাড়ীতেই  
জেলখানা আছে । কয়েদীদ্বারা রাজবাড়ী সংস্পৃষ্ট নানা কার্য্য করান গিয়া

( ১ ) কমা, লামা, কাচালং, চন্দ্রঘোনা, রামগড়, রাঙামাটি, বান্দরবন ও মাহালছরীতে  
সরকারী থানা আছে । বাবতীয় আবশ্যকীয় ঘটনাই পোলিসকে জানান হয় । একজন পোলিস  
কর্মচারী গড়ে ৩৭ বর্গমাইল—প্রায় ৯০০ লোকের শান্তি রক্ষা করিতেছে ।

( ২ ) অদ্যাপি সময়ে সময়ে ছেড় কোম্বাটার হইতে বহুদূরবর্তী স্থানের বিকৃতমস্তিষ্ক কেহ  
কেহবা ব্রিটিশ রাজের প্রতি হেয়জ্ঞান দেখাইয়া স্বকীয় অধীশ্বর্য্য ঘোষণা পূর্বক অশিক্ষিত  
রামতপণ হইতে কর আদায়ের চেষ্টা করে । বলা বাহুল্য, কর্তৃপক্ষের স্বজায়াসেই তাহা দমিত  
হইয়া যায় ।

থাকে । স্থানীয় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রাজা বাহাদুরের নিষ্পত্তি পাবেন । কমতাত্তিরিক বিচার্য যথা :—

১। গভর্ণমেন্ট, গভর্ণমেন্ট কর্মচারী এবং গভর্ণমেন্টের নিষ্পাদিত বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ।

২। সাংঘাতিক আঘাত সংঘটিত এবং প্রাণনাশক অস্ত্র-ব্যবহৃত—তাদৃশ দাকার অভিযোগ ।

৩। কাহারও বিরুদ্ধে খুনী, অজ্ঞানকৃত নরহত্যা, ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর আঘাত, বে-আইনী আটক, বলাৎকার \*, মানুষ ভুলাইয়া নেওয়া \*, মানুষ চুরি\* এবং অনৈসর্গিক দোষের অভিযোগ ।

৪। জোরে গ্রহণ, দহাতা, ডাকাইতি, অনধিকার প্রবেশ এবং ঘরে সিঁদু দিয়া—৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি লইয়া গেলে, তজ্জন্ত অভিযোগ ।

৫। জালিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ।

৬। অস্ত্র আইন সংঘর্ষ অভিযোগ ; এবং \*

৭। বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর ইহার সম্পক্ষে যাহা নির্ণয় করিতে পারেন, তেমন অভিযোগ বা অভিযোগ সমূহ ।

\* পাহাড়ীদের মধ্যে যে সকল বলাৎকার, মানুষ ভুলাইয়া নেওয়া এবং মানুষ চুরি প্রভৃতি ঘটে, তৎসমুদয়ের বিচারভারও রাজাবাহাদুরের হস্তে আছে। তিনি এইরূপ জাতীয়তা-সংপৃক্ত আরো কোন কোন অভিযোগের সীমাংসা করিতে পারেন ।

গভর্ণমেন্ট কর্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ, বাজারের দোকানদার ও ব্যবসায়ীগণ, মাছ ধরির ও গর্জনখোলার পাটোয়াহিগণ ব্যতীত রাজাবাহাদুরের সার্কল মধ্যে বাহারী বসতি কি চাষ-আবাদ করে, তাহার। সকলেই তদীয় অধীন

প্রজা বলিয়া পরিগণিত। হেড্‌ম্যানগণ রাজার কমতা শাসন ব্যবস্থা।

ও শাসনাধীনে থাকিয়া তাহাদের হইতে শাসনা আদায় করিয়া থাকেন, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে থিসা ( কয় সংগ্রাহক ), কারকারী ( গ্রামের শাস্তি-ক্ষক ), বিধবা, বিপত্নীক, অবিবাহিত, নূতন পৃথক ( পরিবার ), রোগী ( অন্ধ, খজ, কুষ্ঠপীড়িত প্রভৃতি ), এবং বাহারী সম্রাস্ত দেওয়ান বা তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও হেড্‌ম্যান পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে,

হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। পরন্তু জুমও করে, অথচ সন্দেহ করিতেছে বলিয়া কেহ জুমকর হইতে রক্ষা পায় না, ইহা ছাড়া ১৯০০ সালের নিয়মানুসারে স্থিরীকৃত হয়,—কোন জুমিয়া যদি এক সার্কলে বসবাস করিয়া অত্র সার্কলে জুম করে, তবে তাহার আপন রাজাকে বাহা দিতে হয়, তদ্ব্যতীত যে রাজার সার্কলে জুম করে—তাঁহাকেও সম্পূর্ণ জুমকর দিতে হইবে। আর একই রাজার সার্কলাধীনে এক মোজায় বাস করিয়া অপর মোজায় জুম করিলে, আপন হেডম্যানকে নিয়মিত প্রাপ্য দিয়া তদতিরিক্ত যে হেডম্যানের মোজায় জুম করে,—তাঁহাকেও জুমকরের অর্ধেক দিতে হয়। এস্থলে চাকমা রাজার “জুম রেজেষ্টারী”র একটা “করনের” নমুনা দেওয়া হইল। এতদ্বারা অতি সহজেই তদীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং কর আদায়-ব্যবস্থা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।—

REGISTER OF JOOMIAHS  
IN THE  
OFFICE OF THE CHAKMA RAJAH'S ESTATE,  
Chittagong Hill Tracts, for the year.....

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তালকের নাম ও নম্বর।	মোজার নাম ও নম্বর, হেডম্যানের নাম এজার ক্রমিক নম্বর	রায়তের নাম ও ধাম	যোগ ( Addition owing to immigration )।														
			সন ১২৬ মধির মোট ঘরের সংখ্যা	হিল ত্রিপুরা হইতে আগত	মান রাজার সার্কল	বোমাং সার্কল	কালেক্টরী	আরাকান	কুকি প্রদেশ	নতুন বেকল(New separation)	গোপনীয় ঘর প্রকাশ	অন্ত মোজা হইতে আগত	ধাস মোজা হইতে আগত	আনুতিয়াইও মোজা হইতে আগত	সমষ্টি	৫ ও ১৭ ঘরের সর্বমোট	

১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## বিয়োগ ( Reduction owing to emigration ) ।

হিল ত্রিশুরা পলায়ন	মান রাজার সার্কেল	বোমাং সার্কেল	কালেটুরী	আরাকান	কুকি প্রদেশ	অস্ত্রের সঙ্গে যোগ হওয়া	তকরার (Double entry)	অস্ত্র মৌজায় যাওয়া	খাস মৌজায় যাওয়া	আনুষ্ঠিকাইণ্ড মৌজায় যাওয়া	নিকশ	সমষ্টি	অবশিষ্ট

( Continued )

৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪
সকর				নিকর							
জুমিরা	জুমিরা ও চাষা	সমষ্টি	বিমা	কারবারি	রাজা ( Widowers )	অবিবাহিত	নতুন বেলক	রোগী ইত্যাদি	প্রকৃত চাষা	মোট	মন্তব্য ।

এই পার্কৃত্য প্রদেশে সাধারণতঃ চতুর্বিধ কর প্রচলিত । ১। জুমকর,— ১৮৭৩ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখের বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের আদেশে পরিবার-প্রতি চারি টাকা নির্দ্ধারিত হয় । তন্মধ্য হইতে গভর্ণমেন্ট একটাকা, রাজা দুই টাকা এবং হেডম্যান এক টাকা পাইয়া থাকেন । এতদতিরিক্ত হেডম্যানের প্রত্যেক পরিবার হইতে একজনের চারিদিন “বেগার” প্রাপ্য আছে ; জুমিরাগণ



এই চারিদিন বেগারের পরিবর্তে টাকা একটি দিয়াও রক্ষা পাইতে পারে (১)।

পরবর্তী নিয়মে চিফ্‌গণের উপর দশবৎসরের জন্য এক করের বিবরণ।

নির্দ্ধারিত জুমকর ধার্য হইয়াছে, প্রজাসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির সহিত ইহার কোন পরিবর্তন ঘটে না। ২। চাষের খাজানা (২)। যদি কোন উপযুক্ত লোক এই পাহাড়ে লাল্লের চাষের জন্য জমি চাহে, তাহা হইলে গভর্ণমেন্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, রাজা অথবা হেড্‌ম্যান তাহাকে অনুমতি দিতে পারেন। প্রথম তিনবৎসর জমি সম্পূর্ণ নিরুর দেওয়া হয়। অনন্তর স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহোদয় কর নির্দ্ধারণ করেন। কর একবার ধার্য হইলে দশ বৎসর বাবৎ তাহা অপরিবর্তিত থাকে। এই চাষের খাজনা রাজাবাহাদুরের শাসন ও পরিদর্শনাধীনে হেড্‌ম্যানগণ কর্তৃক আদায় হয়। অবস্থানুসারে ইহা রাজার হাত দিয়া বা একেবারে গভর্ণমেন্টের উত্তলকারির কাছেও দেওয়া বাইতে পারে। ৩। অকুঠ ভূমিকর। সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুর কর্তৃক অকুঠ ভূমি সকলের উপর কর নির্দ্ধারিত হইলে, তাহা চাষের জমির তৌজিভুক্ত হয় এবং এই সমুদয়ে প্রাপ্ত রাজস্বও চাষের খাজনার নিয়মে গভর্ণমেন্ট, রাজা ও হেড্‌ম্যানের মধ্যে ভাগবন্টন হইয়া থাকে। কিন্তু বাজার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা থাকে না। তাহা সুপারিন্টেন্ডেন্ট মোজা হইতে পৃথক করিয়া স্বয়ং লাগিগ্রত করিতে পারেন, এবং তৎপরিচালন কার্য—তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, হয়ত হেড্‌ম্যানের যোগে অথবা নিজেও চালাইতে পারেন। ৪। ছন এবং গর্জন খোলা কর।—সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুরই ছনখোলা লাগিগ্রত করিয়া থাকেন। তজ্জন বৎসর বৎসর অথবা দশবৎসরের অনধিককালের নিমিত্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। পরন্তু ইহার খাজনা পূর্কোক্ত তৌজিভুক্ত হয় না, কিংবা চাষের বা অকুঠ ভূমির করের দ্বার বিভক্ত হয় না। জুমকরের গভর্ণমেন্টের প্রাপ্য অংশ এবং চাষের লব্ধ রাজস্ব প্রতিবৎসর মার্চমাসের মধ্যেই সরকারে দাখিল করিতে হয়। অনন্তর রাজা ও হেড্‌ম্যানগণ উপস্থি-উক্ত বিধানে কুঠ ও অকুঠ ভূমিকরের কমিশন ফেরত পাইয়া থাকেন। এতদ্বিন্ন এখানে জসকর, বন্দুকের খাজানা, খোঁরাড়-টেক্স, পার-বার্টার টেক্স, আবকারী-টেক্স, ফরেষ্ট বিভাগের শুদ্ধ প্রভৃতি বখা

(১) সাধারণ পাহাড়িগণ এতদতিরিক্ত সরকার বাহাদুরকেও আবশ্যক হইলে বৎসরে ১৫ দিন করিয়া বেগার দিতে বাধ্য; তজ্জন তাহারা দৈনিক পাঁচ আনা করিয়া মুজুরী পায়।

(২) ১৮৭৫ অব্দে চার সংক্রান্ত কর মাত্রই ছিল না, ১৯০৩-০৪ অব্দে ২২০০০ হইয়াছে।

নিয়মে আছে। ইত্যাদি বাবতীর বাবদে ১৯০৩-০৪ সালে এই দেশ হইতে মোট ১৩৪০২৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। এসকল কর Financial year অর্থাৎ ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বৎসর ধরিয়া লওয়া হয়।

রাজা বাহাদুর জাতীয় বিধান মতে হেডম্যান অর্থাৎ দেওয়ান ও তালুকদার, এবং খিসা বা কারবারীর বাড়ী ভিন্ন অপর কাচারও আলয়ে গমন করিতে পারেন না। দৈবযোগেও বা সাধারণ চাকমাগৃহে পদার্পণ জাতীয় বিধান।

করিলে, তাহাকে অন্ততঃ খিসা কি কারবারী করিয়া দিতে হয়। রাজা দেশ ব্যতিরেকে সাধারণ পরিবারে কেহ কোন স্বর্ণভরণ, এমন কি “বাহু”, “চন্দ্রহার” এবং পায়ের “মল” প্রভৃতি যৌপ্যালঙ্কারও ধারণ করিতে কিংবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ত্রায় অবরোধ-প্রথা প্রবর্তনেও সক্ষম নহে। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট দেওয়ানের মাত্র এতাদৃশ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আছে। পরন্তু সাধারণ চাকমা-পরিবারে কখনই স্বর্ণালঙ্কার ধারণের অনুমোদন লাভ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন রাঙামাটিস্থ চাকমা ও ত্রিপুরাগ্রামের উপর চাকমারাজার কতিপয় বিশেষ প্রভুত্ব আছে। এই সকল গ্রামানিবাসী চাকমা ও ত্রিপুরাগণ জুতা, মোজা এবং খরম ব্যবহার করিতে পারে না; এবং একমাত্র তদীয় অনুমতি ব্যতীত প্রাপ্তকৃত অলঙ্কার ব্যবহার কিম্বা অবরোধ প্রবর্তন, এমন কি কাঁচা বা পাকা ঘর প্রস্তুত করিতেও অসমর্থ। এই কারণে রাজাবাহাদুরের অধীন প্রজাগণ ১। খাস মোজাবাসীদিগের মধ্যে বাহারী উপরোক্ত বাধ্যতার অধীন, ২। জাতীয় স্থবিধা ভোগে অধিকারী চাকমা হেডম্যানের অধীন মোজাবাসিগণ, ৩। তাহাতে বঞ্চিত চাকমা হেডম্যানের অধীন মোজাবাসিগণ, এবং ৪। চাকমা ভিন্ন অপর জাতীয় হেডম্যানের অধীন মোজাবাসিগণ ইত্যাদি—ভেদে শ্রেণীচতুষ্টয়ে চিহ্নিত রহিয়াছে।

রাজকীয় দপ্তরখানা, বিচারালয়, হাজত-ঘর ইত্যাদি সমস্তই আধুনিক সভ্যতানু-মোদনে গঠিত। কাগজপত্র, হিসাবনিকাশ ও কতকপরিমাণে পৌরাণিক সংস্কার ছাড়িয়া আসিয়াছে। পাঠক “জুর্নরেজেষ্টারী” হইতেই তাহার কিছু পরিচয়

রাজ-অফিস।

পাইয়াছেন। যে সমুদয় কাগজে গভর্নমেন্টের সহিত অতি অতিশয় নিকট সন্ধন্ধ, তাহার বিচার-নীমাংসা

(Proceeding) একমাত্র ইংরাজীতেই সম্পাদিত হয়। কেবল প্রজ্ঞাকে লইয়া ব্যবহৃত কাগজপত্র বাঙ্গালার চলিয়া থাকে। রাজাবাহাদুর নিয়মিত সময়ে অফিসঘরে আসিয়া বিচারাদি সুনির্ভাহ করিয়া থাকেন। তা’ ছাড়া দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি রাজকীয় কর্মে ব্যস্ত করেন। বাবু পীতাম্বর দাস

রাজাকিসের সর্বপ্রধান কর্মচারী ; এতদ্বিন্ন ইংরাজী কেরানী (English Clerk) বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান, আমিন বাবু অধীনচন্দ্র বড়ুয়া, দ্বিতীয় মোহরের বাবু গুডাকর বড়ুয়া, এবং অন্ততম মোহরের বাবু কৃষ্ণকুমার দাসের নামও এখানে উল্লেখ যোগ্য। রাজকর্মের সুবিধার জন্য গভর্ণমেন্ট অফিসের অনুযায়ী এই কার্যালয় বন্ধ দেওয়া হয় ; স্মরণ্য প্রজাগণ একসঙ্গে আসিলে উভয় ধর্ম্মাধিকরণেরই সাহায্য পাইতে পারে।

“পুণ্যাহ” (১) ভারতীয় রাজত্ববর্গের এক অতি পবিত্র দিন। সাধারণ জমিদার মহলে পর্য্যন্ত এই শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাজনদিগের “নূতন থাটা”ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সময়ে তাঁহারা রাজকীয় উৎসব।

স্ব স্ব সম্প্রদায় জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া নানা আড়ম্বরসহকারে বৎসরের প্রথম প্রাপ্য গ্রহণ করেন। জুমের ধান ও তিলসূতা উঠিয়া গেলে, কার্তিক মাসে পাহাড়ীদিগের হাতে টাকা-পয়সা আসে। তখন তাহারা বৎসরের কর প্রদানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়। এই সুযোগ অপেক্ষা করিয়া চাক্‌মারাজ অগ্রহায়ণের প্রথমভাগে শুভদিন নির্দিষ্ট করিয়া পবিত্র “পুণ্যাহ” কর্ম সম্পাদন করেন। এসময়ে তাঁহার অধীন যাবতীয় হেড্‌ম্যানগণ আহূত হইয়া প্রত্যেকে এক বা ততোধিক রোপ্যমুদ্রা নজর এবং সংগৃহীত জুমকর হইতে আপনাদের প্রাপ্য অংশ বাদ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ও সংগৃহীত চাষকর প্রদান করিয়া থাকেন। জাঁকজমক, গীতবাণে ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য্য স্মরণ করাইয়া দেয় ; আর দর্শকগণ সেই রামায়ণ-মহাভারতবিশ্রুত গৌরবমহিমার অপূর্ণ স্মরণ দেখিয়া আনন্দে মজিয়া রহে ! এই “পুণ্যাহ” উপলক্ষে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলও একদিনের নিমিত্ত বন্ধ থাকে। পুণ্যাহের দিন প্রাতে স্কুলবোর্ডিংএর ছাত্রবর্গ এবং সমাগত হেড্‌ম্যানগণ রাজালয়ে ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। আনুষ্ঠানিক ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক, পুরাকালে “মাংচী দেওয়ান” নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রজা রাজসমীপে প্রার্থনা করিয়া এই উৎসব উপলক্ষে মদ খাওয়ার নিমিত্ত দেওয়ান-তালুকদারগণের বংশ-মর্যাদানুসারে এক টাকা, আট আনা ও চারি আনা ইত্যাদিক্রমে “ভাঙুতি খরচ” পাইবার অনুমতিলাভ করেন। হেড্‌ম্যান প্রথা প্রবর্তিত হইলেও এই ব্যবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে, রাজসরকারের প্রধান কার্যাধ্যক্ষ পুণ্যাহান্তে দাখিলা

(১) ইহার বিস্তারিত বিবরণী ১৩১২ সনের মাঘ সংখ্যার “প্রবাহে” মল্লিখিত “চাক্‌মারাজার পুণ্যাহ” প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

দেওয়ার সময় হেড্‌ম্যানগকে যথাযোগ্য “ভাণ্ডি খরচ” প্রদান করিয়া থাকেন ।

একটি পৃষ্ঠার টিকায় “রাজপাড়ালিয়া”দিগের বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে রাজপরিবারের দাসত্বকার্য্য সমুদয় করিতে রাঙামাটিতে কয়েকবর ত্রিপুরা আছে । ইহাদের পূর্বপুরুষদিগকে কোন ভীষণ ভূভিক্ষে তদানীন্তন চাক্‌মারাজা ক্রয় করিয়াছিলেন, তদবধি ইহারা চাক্‌মারাজার “গোলাম” আখ্যায় অভিহিত । চামর চুলান, ছত্রধারণ প্রভৃতি কার্য্য ইহাদিগেরই দ্বারা করান হয় ।

ইহাদের পূর্বপুরুষ প্রধানতঃ ত্রিপুরা ছিল । কালে রাজগোলাম ।

মঘ, চাক্‌মা, টংচায়া প্রভৃতির শ্রেণীর লোকও এই জাতীয় জীলোকদিগকে গ্রহণ করিয়া (১) তাহাদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে ; এবং অনেক অনাথ চাক্‌মা বালকও ইহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া তথাকথিত শ্রেণীভুক্ত হইয়া আছে ।

## [ ২ ]

চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধানকর্তা মিঃ হারি ভেরিল্ট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে চাক্‌মাধিপতির বিশাল সীমা স্বীকার করিয়াছিলেন, আমরা

সীমা ও পরিমাণ ।

তাহা যথাস্থানে দেখাইয়া আসিয়াছি । তন্মধ্য হইতে কতকাংশ—সীতাকুণ্ডের পাহাড় প্রভৃতি চট্টগ্রাম জিলাভুক্ত হইয়াছে । পঞ্চমাংশেরও অধিক ৬৫৩.১ বর্গ মাইল মণ্ড্রাড়া বেদখল করিয়াছেন এবং আরও প্রায় তৃতীয়াংশ সীতাপাহাড় (১১), রাইন্থাং (২২৮.৩), কাচালং ও মাইরনৌ (৭৯৫) —একুনে ১০৩৪.৩ বর্গমাইল বনপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের “ফরেস্ট-রিজার্ভে” রক্ষিত হইতেছে । ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর নির্দ্ধারিত “রাজা হরিচন্দ্রের সার্কল”ও অধুনা পরিবর্তিত । এইরূপে প্রায়ই চঞ্চলা চাক্‌মা রাজ্যলক্ষ্মীর অঞ্চল সঙ্কুচিত হইতেছে । গত ৮৯৮ সনেও একবার এই সীমা নির্দেশ হইয়া গেল । তাহাতে

(১) পরন্তু ইহাদিগের বিবাহবন্ধনকে “মানুষের চাষ” মাত্র মনে হয় । ভগ্নীকন্যা, ভ্রাতৃকন্যা, শালীকন্যা, মাসী, পিসী, বড়শালী, ভ্রাতৃবধূ, ভাগিনেয়বধূ, ভ্রাতৃপুত্রবধূ, বৈপিতৃবধূ, বিমাতা, সহোদরা-ঋজ্ঞ এবং নানা শ্রেণীর ঋজ্ঞ এমন কি সহোদরাকে পর্য্যন্ত বিবাহের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । লিখিতেও লজ্জা আসে, পুষ্পবতী নামী এক রমণী হুয়াধন নামে কোন ব্যক্তিকে প্রথমে ধর্মপুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, অনন্তর পতিত্বে বরণ করিয়াছে !!! এরূপ পাশবদৃশ্য মনুষ্যসামগ্রীর অপর কোন সমাজে আছে কি না, অবগত নহি ।

উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। যাহা হউক, বর্তমানে চাক্ষুসভার অধিকৃত এই পার্শ্বাত্য প্রদেশের পরিমাণ ফল—১০৯৭.৯ বর্গমাইল।

১৮৯১ ইংরাজীর লোকগণনা কার্যের সুবিধার মিত্ত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে চাক্ষুস সার্কেল ৯ নম্বর খণ্ডে (Block) বিভক্ত করা তালুক ও তালুক দেওয়ান। হয়। পরে ১৮৯২ সালের আইনে সেই বিভাগই স্থায়িকরূপে অনুমোদিত হইয়া খণ্ডগুলি ‘তালুক’ নামে অভিহিত হইয়াছে। তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ওল্ডেমের প্রস্তাবে এই সকল তালুকের উপর এক একজন ‘তালুক দেওয়ান’ নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং এই ১৮৯২ সালের আইনে স্থিরীকৃত হয় যে, বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর কথিত তালুক-দেওয়ান নিযুক্ত করিবেন। প্রত্যেক তালুকের অধিবাসিবর্গ—কেবল গভর্ণমেন্টের কর্মচারী এবং তাঁহাদের পরিবারেরা ব্যতীত আর যাহারা তালুকে চাষ করে বা বাস করে, সকলেই তত্ত্ব দেওয়ানের ক্ষমতাবীন হইবে; তালুক দেওয়ানের স্ব স্ব তালুকান্তর্গত হেডম্যানদিগের বিচারের পুনর্বিচার, হেডম্যানের ক্ষমতাবীত কোন কোন অভিযোগের বিচার, তন্নিমিত্ত ১০০ একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা, জরিমানা আদায়, ও এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তি যাবৎ আসামী আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন; এতদ্বিত্ত লাক্সলের চাষে লক্ষ রাজস্ব হইতে রাজা ও হেডম্যানদিগের প্রাপ্যংশ ভিন্ন তিনিও ৫ অংশ পারিশ্রমিকস্বরূপে প্রাপ্ত হইবেন; এই সকল বিধানানুসারে নিম্নোক্ত মহাশয়েরা তালুক-দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—

তালুকের নাম।

তালুকদেওয়ান।

১	নম্বর	তালুক	কাচালং	...	শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ান।
২	"	"	চেঙ্গী	...	৬ নীলচন্দ্র দেওয়ান।
৩	"	"	মহাপ্রাং	...	শ্রীযুক্ত রাতচন্দ্র দেওয়ান।
৪	"	"	সত্তা	...	" কমলাজ চৌধুরী *।
৫	"	"	ইচ্ছামতী	...	" শরচ্চন্দ্র রোয়াজা *।
৬	"	"	রাঙামাটি	...	" কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান।
৭	"	"	রাজভবন	...	রাজার খাল।
৮	"	"	গুভলং	...	শ্রীযুক্ত জিলোচন দেওয়ান।
৯	"	"	বড়কল	...	" কুমার রমণীমোহন রায়।

ইহাদের মধ্যে \* তারিখিত হইলেন মহাজাতীর; এবং রাজা ও কুমারবাহাদুর ভিন্ন অবশিষ্ট পাঁচজনও চাক্ষুসভাজের মুখপাত্র ছিলেন। রাজাবাহাদুর উদ্দেশী

ব্যবস্থার নানা অসুবিধা দেখাইয়া আপত্তি উত্থাপিত করেন ; তাহাতে অবশেষে তালুকদেওয়ান-প্রথা রহিত হইয়া যায়।

[ ৩ ]

এই সকল তালুক আবার ১২৪টি মোজায় বিভক্ত। ফলতঃ ১৮৯২ এবং ১৯০০ সালের আইনে যথাক্রমে সার্কেল ও মোজাবিভাগ দৃঢ়তর হইয়াছে।

মোজা গঠন।

শেষোক্ত আইনমতে প্রত্যেক মোজার পরিমাণফল ১৬ বর্গমাইলের কম বা ২০ বর্গমাইলের অধিক হইবে না। যে যে স্থানে চাষের কাজ চলিতেছে, অথচ স্থায়ী বসতি আছে, প্রথমে সেই সকল স্থানে মোজা গঠিত হয়। কোনস্থান মোজাভুক্ত না হইলে অনির্দিষ্ট ( undefined ) ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এতদ্বিন্ন প্রত্যেক মোজায় ৫০ একর উত্তম কৃষিযোগ্য ভূমি গভর্নমেন্টের খাস তত্ত্বাবধানে থাকে ; তাহা 'সার্ভিস ল্যান্ড' (Service land) অর্থাৎ জায়গীর বা চাকর্য্যের জন্ত রাখা হয়। গ্রাম্য কার্য্যের জায়গীরস্বরূপ—হেড্‌ম্যান, পাটোয়ারী ( খিসা ) বা কারবারী কিসা যদি প্রহরী নিযুক্ত করা হয়, সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুর তাহাদের মধ্যে কাৰ্য্যকালের নিমিত্ত উক্ত ভূমি নিজের ভোগদখল করিতে প্রদান করেন। প্রায় প্রতি হেড্‌ম্যানই ইহা হইতে ২৫ একর করিয়া পাইয়াছেন।

ইতিপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, ধূর্য্যা—কুখ্যা—ধাবানা—পিড়াভাঙা বংশচতুষ্টয় চাকমাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহাদের পূর্বপুরুষ রাজার মন্ত্রীত্ব করিতেন ; তাহাদের “দেওয়ান” পদবী ছিল। পাগলা রাজার বিধবা পত্নীর মৃত্যুর পর চাকমা রাজসিংহাসনের অধিকারী নির্বাচনের সময় ধূর্য্যা ভ্রমক্রমে অপদস্থ হইয়া

উচ্চসম্মান হারাইয়াছিলেন। পদচ্যুত হইয়া তিনি দেওয়ান ও তালুকদার।

তালুক গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে পদবীও তালুকদার হইয়া যায়। উত্তরকালে বংশ বিস্তৃত হওয়ার কুখ্যা, পিড়াভাঙা, এমন কি—রাজপরিবার ব্যতীত ধাবানা বংশের আর সকলকেও সংসারযাত্রা পরিচালনের নিমিত্ত সেইরূপ তালুক গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু তখনও ইহাদিগের দেওয়ান আখ্যা পরিবর্তিত হয় নাই ( ১ )।

( ১ ) সরকার, কাম্বুনগো, মজুমদার প্রভৃতি পদবীগুলির জ্ঞান “দেওয়ান” উপাধিও ক্রমে বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। তবে দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এই সামান্য অধিকারটুকুও হারাইয়া

এই মৌজাবিভাগের পূর্বে দেওয়ান ও তালুকদারগণ স্ব স্ব তালুকের দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রভৃতি সর্ববিধ কর্তৃত্ব করিতেন, কেবল প্রাণদণ্ডাজ্ঞার নিষিদ্ধ রাজাসুমতি লইতে হইত । শেষে শেষে রাজা বাহাদুরকে প্রচুর পরিমাণে নজর দিয়া অনেকেই দেওয়ান নিযুক্ত হইতে লাগিলেন । তাঁহারায়তদের হইতে পরিবার প্রতি ৩৪ টাকা করিয়া কর ও ১৫ দিন ‘বেগার’ বা তৎপরিবর্তে দুই টাকা অতিরিক্ত আদায় করিতেন । তাহা হইতে ঘর প্রতি আট আনা ও একজনের ১৫ দিন বেগার রাজাকে দিতেন । দেওয়ানগণ ইহা ছাড়া বৎসরের প্রথমজাত ফল ও চরিণ, শূকর, গয়াল প্রভৃতি শিকারলব্ধ প্রাণীর একখানি করিয়া “রাণ” (১) প্রাপ্ত হইতেন । এবং দেওয়ান পরিবারের বিবাহে প্রত্যেক ঘরকে এক টাকা করিয়া চাঁদা, নির্দিষ্ট পরিমাণে ভোজ্য সামগ্রী ও মদ (২) দিতে হইত । সেইরূপ দেওয়ান-তালুকদারগণও রাজপরিবারের বিবাহে পাঁচ হইতে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা, নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী ও মদ দিতে বাধ্য ছিলেন । অতি-পূর্বে অলঙ্কার ধারণ ও অবরোধ প্রবর্তনের অনুমোদন এবং শিকারলব্ধ প্রাণীর অংশপ্রাপ্তির ক্ষমতাও একমাত্র রাজার হাতে ছিল, অনন্তর কতিপয় দেওয়ান প্রভূত নজর দিয়া তাদৃশ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রত্যেক দেওয়ানের রায়ত নির্দিষ্ট ছিল ; তাহারায়েখানে যাইয়া জুম্ম-আবাদ করুক না কেন, আপন অধিনায়ককে খাজানা এবং ‘বেগার’ দিতে বাধ্য হইত । এ সকল দেওয়ান বা তালুকদারেরা রাজার নিকট হইতে প্রজাদিগের পরিবার হিসাবে পাট্টা গ্রহণ করিতেন । কোন বিশেষ কারণে এই নির্দিষ্ট প্রজাসংখ্যার হ্রাস হইলেও খাজানা কমিত না । সেইরূপ নির্দিষ্ট পরিবারের লোকবৃদ্ধিতেও রাজস্ব বর্দ্ধিত হইত না । কোন দেওয়ান কি তালুকদারের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রজা-পরিবার অস্থাবর সম্পত্তির হার পুত্রদের মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হইত ; অপুত্রক হইলে তাঁহার কন্যা বা অপর উত্তরাধিকারী, তদভাবে রাজার খাস

অধিকার ও ব্যবস্থা ।

হীনতম অবস্থায় পড়িয়া রহিলে, কেহই আর তাহার “দেওয়ান” আখ্যা মানে না । তখন সে সাধারণ “চাকম” উপাধিতেই পরিচিত হইয়া থাকে ।

(১) “রাণ”—উরু সহিত সমস্ত পদ ।

(২) বলিয়া রাখা ভাল, অত্র ভাষা পাহাড়ী সকলেরই স্ব স্ব প্রয়োজনোপযোগী মদ্য প্রস্তুতের অধিকার আছে, কিন্তু বিক্রয় করিতে পারে না ।

অধিকারে বাইত। প্রজার সংখ্যাধিক্যহেতু দেওয়ানদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া বাইতেছে দেখিয়া, রাজা ধরমবল্ল তাহা থর্ক করিতে কতিপয় অতিরিক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে রাজা ইচ্ছা করিলে স্বীয় অধিকার হইতে প্রজা লইয়া নূতন পাট্টা দিতে পারিতেন। কালিন্দীরাণী এই তালুকাধিকারের অংশ বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়াছিলেন; তাহাতে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার পুনরায় তাহা রহিত করেন।

১৯০০ সালের আইনের ফলে যে সকল মৌজা নিদ্ধারিত হয়, গভর্ণমেন্ট প্রজানির্দেশে অধিনায়ক—দেওয়ান-তালুকদার প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেক মৌজার উপর এক এক একজন হেড্‌ম্যান। দলপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদিগের রাজকীয় উপাধি “হেড্‌ম্যান” (Headman) হয়। গভর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষী ও তাঁহাদের পরিবার, বাজারের দোকানদার ও ব্যবসায়ীগণ এবং মাছ ধরিলার ও গর্জন খোলার পাট্টাগ্রহিত্বর্গ ব্যতিরেকে মৌজায় যাহারা বাস করে কিম্বা চাষ-আবাদ করে, সকলেই হেড্‌ম্যানের কর্তৃত্বাধীন। তিনি ‘মোড়লের’ স্থায়; পরন্তু কার্য অধিকতর দায়িত্বজনক! হেড্‌ম্যানের কাজ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যেমন—রাজস্ব আদায়, এবং মৌজার শান্তিরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ বিচার।

হেড্‌ম্যানগণ রাজস্ব আদায়ে থিসা ও কারবারদিগের সহায়তা পাইয়া থাকেন; তজ্জন্ত তাহারা স্বয়ং রাজস্ব হইতে মুক্তলাভ করে। গভর্ণমেন্টের নূতন ব্যবস্থায় হেড্‌ম্যানেরা নিজেও ২৫ একর করিয়া “সার্কিস ল্যান্ড” ভোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। এই থিসা ও কারিকর ভিন্ন রাজস্ব আদায় ও ক্ষমতা।

অবিবাহিত, বিধবা, বিপত্নীক, চিররোগী প্রভৃতি অসমর্থগণও কর হইতে অব্যাহতি পায়। অপরাপর জুমিয়া পরিবার হইতে ইহারা চারিটাকা জুমকর এবং চারিদিন ‘বেগার’ আদায় করেন। কেহ কেহ বেগারের পরিবর্তে খাজানারূপে একটাকা অতিরিক্ত দিয়া রক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এই ‘বেগার’ বা অতিরিক্ত টাকা একমাত্র হেড্‌ম্যানেরই প্রাপ্য। তাহারা জুমকর হইতেও একটাকা রাখিয়া অবশিষ্ট রাজসরকারে দাখিল করেন। যদি কোন জুমিয়া এক হেড্‌ম্যানের মৌজায় বাস করিয়া অপর হেড্‌ম্যানের মৌজায় জুমকর, তবে তাহাকে যে হেড্‌ম্যানের মৌজায় বাস করে, তাহার সম্পূর্ণ রাজস্বাদি দিয়া যে হেড্‌ম্যানের মৌজায় জুমকর, তাহাকেও দুইটাকা জুমকর দিতে হয়। হেড্‌ম্যানগণ এই সমস্ত উল্লেখ আপন আপন জুমবেঞ্চেট্টারী



সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে রাজাবাহারসমীপে পাঠাইয়া দেন। অনন্তর রাজকর্মচারিগণ মোজায় মোজায় গিয়া সেই তৌজী পরীক্ষা করিয়া আসেন। হেডম্যানেরা রাজপুণ্যাহে অঙ্কতঃ একটাকা করিয়া নজর এবং স্বীয় মোজার ক্ষমকের অধিকাংশ প্রদান করিয়া থাকেন। উপযুক্ত রায়তকে তাহার ক্ষমতাসাধ্য জমিতে চাষ করিবার নিমিত্ত ইহার। অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু রাস্তার বাধা ঘটে, কি সাধারণের অশুবিধা হয় অথবা গভর্নমেন্টের আবশ্যকে আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে কোন কৃষিযোগ্য ভূমি হেডম্যানদিগের দ্বারা লাগিয়ত হইতে পারে না। কোন বন্দোবস্তি ইহার অগ্রথা হইলে তাহা একিকালে রহিত হইয়া যায়। কিম্বা যদি কোন ভূমি বন্দোবস্তিভুক্ত হইয়া যাওয়ার পর গভর্নমেন্টের আবশ্যকে আসে, তবে তাহা ক্ষতিপূরণ দিয়া খাস করিতে পারেন। এই সমুদয় চাষের ভূমির নিমিত্ত হেডম্যানদিগকে স্বত্ত্ব “জমাবন্দী” রাখিতে হয়। মাননীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুরের নির্দেশ মতে এই কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির রাজস্বও ইহার। আদায় করিয়া সরকারে দাখিল করেন, পরে টাকাপ্রতি ১০ আনা হিসাবে কমিশন লভ করেন। এই সকল রাজস্বাংশ ব্যতীত দেওয়ান বা তালুকদারগণের দ্বায় রাজক্ষমতালব্ধ কোন কোন হেডম্যানও অধীন প্রজাগণের মধ্যে কেহ কোন পণ্ড শিকার করিলে তাহার একখানি “রাণ” পাইয়া থাকেন। আর যাহাদিগের তাদৃশ অধিকার নাই, তাহাদের রায়তের। রাজাকেই উক্ত ‘রাণ’ প্রদান করে (১)। পক্ষান্তরে রায়তের বিবাহাদি গুভাহুঠানে এক বোতল মদ, এক ‘বিড়া’ পান ও ৮টি সুপারি দিয়া হেডম্যানকে ‘সালাম’ জানায়, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

মোজার শাস্তিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাসংপৃক্ত বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার হেডম্যানগণকে সম্পাদন করিতে হয়; অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইলে নজরান এক টাকা প্রয়োজন। তাহার। পঁচিশ টাকা পর্যন্ত

বিচার।

অর্থদণ্ড এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুরের আদেশ প্রাপ্তি যাবৎ আসামী আবদ্ধ রাখিতে পারেন। ইহাদের অনেকেই জরিমানালব্ধ অর্থ ভোগ করিতে ক্ষমতাবান। অপরাপরকে কিয়দংশ (সাধারণ মোকদ্দমায়

(১) পরন্তু ঈদৃশ স্থলে কোন চাকমা গরাল মারিয়া রাজপ্রাপ্য “রাণ” না দিলে ৫০ টাকা, শূকর বা বড় হরিণ স্থলে ২৫ টাকা এবং ছোট হরিণ স্থলে ৫ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়

গাত টাকা ) মাত্র রাজাকে দিতে হয় । মানুষ ভুলাইয়া বা চুরি করিয়া নেওয়া প্রভৃতি ক্ষমতাতিরিক্ত গুরুতর অভিযোগগুলি হেড্‌ম্যানের রাজাবাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন । পরন্তু উভয়ের সম্মতি থাকিলে মাত্র ইহার দম্পত্তির বিবাহবন্ধনচ্ছেদ অনুমোদন করিতে পারেন ; অত্যা তাহা উচ্চতর আদালতে পাঠাইয়া দিতে হয় ।

উপর্যুক্তানুসারেই হেড্‌ম্যান নির্বাচিত হয়, তবে বংশ গৌরবের প্রতিও কিঞ্চৎ দৃষ্টি থাকে ! স্ততরাং দেওয়ান-তালুকদার বংশধরেরাই চাকমাজাতিতে বিত্তাবৃত্তিতে সমধিক উন্নত বলিয়া অধিকাংশ স্থলে পূর্বগৌরব

নিয়োগ ।

অক্ষুন্ন রহিয়াছে । সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট বাহাদুর রাজা এবং মোজাবাসীদিগের সহিত বিবেচনা করিয়া হেড্‌ম্যান নিযুক্ত করেন । তিনি অযোগ্যতা কিম্বা অসংব্যবহারের নিমিত্ত পদচ্যুত করিতেও পারেন । এই পদে উত্তরাধিকারসম্ব নাই ; কিন্তু পুত্র যোগ্য হইলে পিতার কাধ্যে নিযুক্ত হইতে পারেন । কোনও হেড্‌ম্যান একাধিক মোজার ভার পাইবার অধিকারী নহেন । পূর্বের রাজার খাস অধিকারে ১০০০ এক সহস্র পরিবার “রাজপাড়ালিয়া” ছিল । তাহাদের বসবাসের জন্ত বিশেষ বিবেচনায় রাজাবাহাদুর ১২ বারটি মোজা পাইয়াছেন । অবশ্য এই সকল মোজা শাসনে তাঁহাকে গভর্ণমেন্টের সহিত হেড্‌ম্যান-প্রায় ব্যবহার চালাইতে হয় । নিম্নে রাজা ও কুমার বাহাদুর ব্যতীত চাকমা হেড্‌ম্যান ও পার্শ্ববর্তী বন্ধনী মধ্যে তাঁহাদের অধিকৃত মোজার তালিকা প্রদত্ত হইল ।—

মোজা ও হেড্‌ম্যান ।

চাকমা সার্কোলে—

১ নং তালুক কাচালং ।—শ্রীনীলচন্দ্র দেওয়ান ( বড়কাটলি ), শ্রীজৈলাধন দেওয়ান ( চালদাতলী ), শ্রীচন্দ্রমাণিক দেওয়ান ( ডলুছরী ), শ্রীনবচন্দ্র দেওয়ান ( ঘুইছরী ), শ্রীধৈর্য্য তালুকদার ( মারিচ্যাচর ), শ্রীনির্ম্মলধন দেওয়ান ( রাঙাপানিছরা ), শ্রীকর্ণচন্দ্র তালুকদার ( পেটাখারমারছরা ), শ্রীমহুয়া তালুকদার ( ভাসায়া আদম ), শ্রীকিনারাম তালুকদার ( নলুয়া ), শ্রীমদনমোহন দেওয়ান ( খাগারাহরী ), শ্রীশশিমোহন দেওয়ান ( বনমোহর ), শ্রীযুবলক্ষ তালুকদার ( কাকপর্য়া ), শ্রীভূবনমোহন দেওয়ান ( বেগেনাছরী ), শ্রীহুজুয় দেওয়ান ( ককুঁচীছরা ), শ্রীগোলক তালুকদার ( বগাচতর ) ।

২ নং তালুক চেঙ্গী ।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দেওয়ান ( ছয়কুড়িবিলা ), শ্রীশশিকুমার

দেওয়ান (মাইচহরী), শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেওয়ান (সাবেক-কাং), শ্রীবাসুদেবচাঁদ তালুকদার (কাটলতলা), শ্রীমেতা তালুকদার (জাহাছরী); শ্রীবিজয়গিরি তালুকদার (গবছরী), শ্রীমানিকচন্দ্র তালুকদার (এগরাল্যা ছরী), শ্রীস্বর্ধাধন তালুকদার (শেলচহরী)।

৩। তালুক মহাপ্রম্। শ্রীনীলমণি দেওয়ান (চৌধুরীছরী), শ্রীকবিরাজ দেওয়ান (ঘিলাছরী), শ্রীঅক্ষয়মণি তালুকদার (হাজাছরী), শ্রীরাজমণি দেওয়ান (ছোট মহাপ্রম্), শ্রীসুবরাজ দেওয়ান (বুড়ীঘাট), শ্রীবাসুদেব দেওয়ান (বড়াদম), শ্রীস্বর্ধাচন্দ্র তালুকদার (বেতছরী), শ্রীরাজচন্দ্র দেওয়ান (বাকছরী), শ্রীনবীনচন্দ্র তালুকদার (তৈ-চাকমা), শ্রীরাজচন্দ্র দেওয়ান (বগাছরী) শ্রীরাজ-কুমার তালুকদার (কেঙাইলছরী)।

৪ নং তালুক সর্ভা।—শ্রীঅভয়চরণ তালুকদার (দুরছরী), শ্রীকুলচন্দ্র দেওয়ান (বানরকাটা), শ্রীঅনঙ্গমোহন দেওয়ান (মুক্তাছরী), শ্রীহরিকান্ত তালুকদার (ডানের বানর কাটা), শ্রীগোপীনাথ তালুকদার (লক্ষীছরী), শ্রীশ্রীচন্দ্র দেওয়ান (শুকনাছরী), শ্রীরমণীমোহন দেওয়ান (কেরেককাবা), শ্রীমন্দিচরণ তালুকদার (না-ভাঙা)।

৫ নং তালুক ইচ্ছামতী।—শ্রীভক্তারাম তালুকদার (মুবাছরী), শ্রীভাগ্যধন তালুকদার (ঘাগরা), শ্রীরাজচন্দ্র তালুকদার (ঘিলাছরী)।

৬ নং তালুক রাঙামাটি।—শ্রীজয়কুমার দেওয়ান (রাঙাপাণি), শ্রীচন্দ্রধর দেওয়ান (বাকছরী), শ্রীত্রিভুজ দেওয়ান (বগড়াবিল), শ্রীচণ্ডীচরণ দেওয়ান (জীবতলা), শ্রীনগেন্দ্রনাথ দেওয়ান (কামিলাছরী), শ্রীত্রিলোচন দেওয়ান (বড়াদম), শ্রীরতনমাণিক দেওয়ান (সাপছরী), শ্রীগঙ্গামাণিক দেওয়ান (শুকরছরী), শ্রীমুক্তাকিশোর দেওয়ান (কুহগছরী), শ্রীকান্তমাথ চাকমা (ডলুছরী), শ্রীকৃষ্ণচরণ দেওয়ান (তৈমিহং)।

৭ নং তালুক রাজভবন।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান (বালুখালি), শ্রীকামিনী মোহন দেওয়ান (মঘবান), শ্রীবনেন্দ্রচরণ তালুকদার (কোশলমোহনা), শ্রীজয়চন্দ্র তালুকদার (ধনপাতা), শ্রীকর্ম্মধন দেওয়ান (কতুবদিয়া), শ্রীতিলক চন্দ্র দেওয়ান (নারেইছরী), শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেওয়ান (ফুলগাজি বাপের ছরী), শ্রীমানিকচাঁদ তালুকদার (বিলাইছরী), শ্রীসিদ্ধাধন তালুকদার (কেরগছরী), শ্রীনবীনচন্দ্র দেওয়ান (কাইন্দা)।

৮ নং তালুক শুভলং।—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দেওয়ান (মিতিছরী), শ্রীশরণচন্দ্র

দেওয়ান ( জারুলছরী ), শ্রীমদনমোহন দেওয়ান ( এরইছরী ), শ্রীলালমোহন দেওয়ান ( পানছরী ), শ্রীবিরাজমোহন দেওয়ান ( মৈদ ), শ্রীনীলচন্দ্র কারবারী ( তিন্দোছরী ), শ্রীপঞ্চানন তালুকদার ( বাঘাছোলা ), শ্রীকিশোর দেওয়ান ( চোখপতি ঘাট ), শ্রীজ্ঞানেশ্বর তালুকদার ( ডুবাজারুল ), শ্রীবীণাধন দেওয়ান ( কুম্ভমছরী ), শ্রীচন্দ্রধন তালুকদার ( বনজুগীছরা ), শ্রীমেঘনাথ দেওয়ান ( ফকির-ছরা ), শ্রীকৈলাসধন দেওয়ান ( লুলাংছরী ) ।

৯ নং তালুক বড়কল ।—শ্রীকূলচন্দ্র তালুকদার ( গর্জনতলী ), শ্রীচন্দননাথ দেওয়ান ( গোরহান ), শ্রীরতননাথ দেওয়ান ( আইবাছরা ), শ্রীইন্দ্রধন দেওয়ান ( হেইংভরাইয়া ), শ্রীভৈরবচন্দ্র দেওয়ান ( মাওদং ), শ্রীপবনরাজ দেওয়ান ( ধুমবাংলাং ), শ্রীমানিক্য তালুকদার ( তৈবুং ), শ্রীবিজ্ঞাধর তালুকদার ( বামের হাণ্ডা ), শ্রীজয়ন্ত তালুকদার ( চিবা বড়হরিণা ) প্রভৃতি ৮৮ জন ।

মঙসাকৈলে—

শ্রীসিকচন্দ্র দেওয়ান ( আমতলী ), শ্রীভৈরবচন্দ্র দেওয়ান ( বড়নল ), শ্রীকৈলাসচন্দ্র তালুকদার ( ভুবলছরী ), শ্রীশশিকুমার দেওয়ান ( ভৈলাভাঙ ), শ্রীমানিকধন তালুকদার ( আশাং ), শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেওয়ান ( বড়বিলা ), শ্রীগগনচন্দ্র দেওয়ান ( আলুটলা ), শ্রীনিত্যানন্দ খিসা ( মুবাছরী ), শ্রীরাজকুমার তালুকদার ( কাইয়ং ঘাট ), শ্রীনবীনচন্দ্র তালুকদার ( লেমুছরী ), শ্রীরামমোহন খিসা ( ছপুর্গা নল ), শ্রীকিস্তা খিসা ( কেয়েঙানালা ), শ্রীউমাচরণ দেওয়ান ( গামারী ঢালা ), শ্রীহরিধন তালুকদার ( উন্টাছরী ), ৬ কিনাধন তালুকদার \* ( দাদুপ্যা ), শ্রীহরিধন দেওয়ান ( ইদুছরী ), শ্রীপূর্ণজয় ( ছরছরী ), শ্রীঈশানচন্দ্র দেওয়ান ( কমলছরী ) শ্রীমোগুলধন কারবারী ( ভুগাছরী ) প্রভৃতি ১৯ জন ।

[ ৪ ]

আমরা এস্থলে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবনী রক্ষা করিতেছি ।

জীবনী ।

ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনচরিত নহে, জীবনের স্থল পরিচয় মাত্র । বলা বাহুল্য, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়েই আমরাগিকে একত্রে সংকীর্ণিত হইতে হইল । ভবিষ্যৎ লেখকেরা ইহাদের

\* কিনাধনের মৃত্যু \* হওয়ায় তৎপুত্রের সাবেকক প্রাপ্তি পর্যন্ত মংখই নামক জনৈক মথের সরবরাহকারিতার উক্ত মৌজার ভার আছে ।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবন-ইতিবৃত্ত লিখিয়া ধত্ত হউন, আমরা তাঁহাদের সৌকার্য্যার্থে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কার্য্যকালের সংবাদও রাখিয়া গেলাম ।

চাক্‌মাসমাজের প্রধান ব্যক্তির কথা চিন্তা করিতেই সৰ্ব্বপ্রথমে—

## ৮ ঈশানচন্দ্র দেওয়ান

এর নাম মনে আসে। যদিও তিনি অধুনা আর এ পৃথিবীতে নাই, তথাপি তাঁহাকে বর্তমান সমাজের পথ-প্রদর্শয়িতা বলা যায়। তাঁহার পিতার নাম লবণ খাঁ দেওয়ান, মাতার নাম ভেলুয়া বিবি। এই লবণ খাঁ ওয়াংঝাগোছার অক্ষয়-গোয়ব মহাবীর রণুখাঁর দ্বিতীয় পুত্র রতনখাঁ ও রাজকন্ঠা পত্যমণির শুভসম্মিলনের ফল। কিন্তু ঈশানচন্দ্র অধিককাল পিতৃহুম্ব ভোগ করিতে পারেন নাই, তবে তদীয় মহীয়সী জননীর পালনশুণে পিতার অভাবজনিত কোন কষ্টই তাঁহাকে অভিজ্ঞত করিতে পারিয়াছিল না। ভেলুয়া বিবির ছায় ধর্ম্মপরায়ণা দয়াবতী— সাহস ও বুদ্ধিশালিনী রমণীর সংবাদ অতি অল্পই শুনা যায়। তিনি নাবালক পুত্রগণকে লইয়া অতি সুবন্দোবস্তে পরিবার চালাইয়াছিলেন। অসভ্য কুকিগণও তাঁহাকে বিশেষ ভয় ও সন্ত্রস্ত করিত, অতাপি কুকিমহলে তাঁহার ষশঃকীর্ত্তন শুনা গিয়া থাকে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সুপ্রাসক্ত খণ্ডল-হত্যাকাণ্ডে কুকিগণ তথা হইতে যে সকল লোককে ধরিয়া লইয়া যায়, ভেলুয়াবিবি তাহাদের মধ্য হইতে নানা কোণে তিনটি ত্রিপুরারমণীকে উদ্ধার করিয়া গভর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন। বঙ্গের তদানীন্তন লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর এই নিমিত্ত তাঁহাকে আন্তরিক গভীর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লেখা পড়া বিশেষ শিখিতে না পারিলেও ঈশানচন্দ্র মাতার অসামান্য বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই অবস্থা উন্নত করিয়া লইয়াছিলেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রবল অহুরাগ ছিল, দেশ-ও জাতির উন্নতিবিধায়ক ব্যবস্থা এবং রাজ-নৈতিক আলোচনার প্রতিও তেমন হৃদয়ঙ্গম দৃষ্টি থাকিত। গভর্ণমেন্টের নিকটও তাঁহার খুব সম্মান ছিল, একসময়ে তিনি ছোটলাট বাহাদুরের “গার্ডেন পার্টিতে”ও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালীন স্থানীয় প্রায় সমুদয় ইংরাজকর্তৃপক্ষই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত প্রশংসাপত্রগুলি এখনও দেখিতে পাই। ধর্ম্মকার্য্যেও তিনি সাতিশয় মুক্তহস্ত ছিলেন, একবার জাতীয় প্রথামুরূপ পিণ্ডোৎসর্গ কার্য্যের জন্য বহুসংখ্য টাকা ব্যয় করেন। এজন্যে কেহই চিরস্থায়ী

নহে, ১২৯০ বাঙ্গালার ২৫শে আশ্বিন মহালয়া পূর্বদিনে ৫৫ বৎসর বয়সক্রম-  
কালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

তঁাহার ছই পুত্র । জ্যেষ্ঠ জন্মেজয় বালাকাল হইতেই বলিষ্ঠ, সাহসী, প্রত্যাংপরমতি কিন্তু অতিশয় ক্রোধী, ও ছষ্টবুদ্ধি ছিলেন । জৈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ইন্দ্রজয় ঢাকা হইতে আসিলে ক্রমে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ ঘটে, অবিলম্বে তঁাহারা পৃথক হইয়া পড়েন । অনন্তর জন্মেজয় কার্যে অবহেলা প্রদর্শনহেতু হেড্‌ম্যান হইতে পদচ্যুত হওয়ার গভর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া ৭০ জন রায়ত সংগ্রহ করত—পার্কত্যাগ্রপুরার চলিয়া বাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে কাচালাং রিজার্ভের তিনটিলা ফরেস্ট টেসনের পার্শ্বদ্বিয়া গমনকালে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তঁাহার সঙ্গীগণকে উক্ত টেসন আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে প্ররোচিত করেন । ফরেস্ট গার্ডেরা সমূলে নিহত হয়, এবং তঁাহারা গভর্ণমেণ্টের প্রায় ২০০০ টাকা লইয়া যায় । পরে তাহাদের ৩৮ জন ধরা পড়ে, তন্মধ্যে হইতে ৩ জন রাজার সাক্ষ্যে মুক্তি পায় । আর সকলেরই ২—১০ পর্য্যন্ত মেয়াদ হইয়াছে । দলপতি জন্মেজয় ১৯০০ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছিলেন না, পরে ধৃত হইয়া জাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরে বাস করিতেছেন । ইন্দ্রজয় বাবুই বর্তমানে পিতৃভদ্রাসনে আছেন । পরন্তু ভ্রাতৃবিরোধে এক্ষণে তঁাহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে । জৈশানবাবুর পরেই

## ৬ নীলচন্দ্র দেওয়ান

এর কথা বলিতে হয় । তিনি মুনিমাগোছার ধাবানা বংশজ কান্দর খাঁর ঔরসে এবং জাহ্নবীর গর্ভে ১২৪২ বাঙ্গালার ৪ঠা কার্তিক শুক্রবার ( ঢেঙ্গী ) বড়ানন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তখনও এদেশে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা না হওয়ার বালা-  
কালে তঁাহার ভাগ্যে উপযুক্ত বিভালাত ঘটে নাই । ১২৬০ সনের কার্তিক মাসে তিনি কালিন্দী রাণীর সেরেস্তার তহশিলদারিতে নিযুক্ত হন । রাণী তঁাহার কাজকর্মে অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি রাণীর পক্ষ হইতে পাঁচশত লোক লইয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করেন ; তজ্জন্ত তিনি একখানি যশস্বার পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ইহার পর তিনি ঘটনা-  
বশে রাণীর কার্য পরিত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্ট পুলিশ ইন্স্পেক্টরের কার্যে প্রবেশ করেন । সেই পরে থাকিয়া ১৮৭২ সালের লুসাই অভিযানে তিনি কু-  
কি-

দমন এবং রসদ-সংগ্রহ কার্যে গভর্ণমেন্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন । তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কাপ্তেন লুইন তাঁহাকে চেঙ্গী উপনদীর পূর্বকুলবর্তী পাহাড়ের শৃঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত দিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহা লয়েন নাই । অবশেষে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৬ বৎসর সরকারী কার্যের পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মাসিক ২৬৮/৮ পাই হিসাবে পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন । অনন্তর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যকারী কোমিসলের সভ্য, ও পরে কার্যনির্বাহক কোমিসলের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন । তখন তিনি মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন পাইতেন । এতদ্ভিন্ন তাঁহার সৰ্ব্বপ্রধান কার্য—তিনি এই পার্শ্বত্যাগপ্রদেশে সৰ্ব্বপ্রথমে লাক্‌লেয় চাষ প্রবর্তন করিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ।

বাব্বালা ১২৬২ সনে নীলচন্দ্রবাবু লার্ম্যাগোছাসম্বৃত গঙ্গাধরের পিতৃস্বসা চিত্র-বতীকে বিবাহ করেন । কিন্তু তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়াতে ১২৬৯ সনে রাঙিগোছার তুব্দির ভগ্নাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । তদীয় গর্ভে পুত্র শশিকুমার, চিত্রকুমারের জন্ম হয় । সহৃদয় গভর্ণমেন্ট তাঁহার কার্যকল অরণে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত শশিকুমার দেওয়ানকে পুলিশের সবইন্স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন ; নীলচন্দ্র বাবু জীবদ্দশাতেই ইহা দেখিতে বাইতে পারিয়াছিলেন । গত ১৩১৩ বঙ্গাব্দ ৫ই পৌষ ইংরাজী ২০শে ডিসেম্বর (১৯০৬), তদীয় ভবলীলা সাক্ষ হইয়াছে । ইহার পরে

## ৮ গিরিশচন্দ্র দেওয়ান

এর নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি নীলচন্দ্র দেওয়ানের পিতৃব্য মৃত গুন্দার খাঁ দেওয়ানের পুত্র । খুল্লতাত গুন্দার খাঁ কতিপয় ছষ্টলোকের পরামর্শে তাঁহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করেন । তাহাতে বাধ্য হইয়া তাঁহারা বাব্বালা ১২৬১ সনে হাদাছরা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন । সঙ্গে প্রায় চারিসহস্র ত্রিপুরা এবং ৫১৬ শত চাক্‌মা আসিয়া তাঁহাদের প্রজা হয় । সেখানে তাঁহাদের অব্যাহত ক্ষমতাছিল, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচারাদি করিতেন । ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরা মহারাজের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর ( ১ ), উদয়চন্দ্র ঠাকুর, মধুচন্দ্র ঠাকুর এবং সেনাপতি

পরীক্ষিত প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া বিখ্যাত কুকি সরদার রতন পুঁইয়ার (১) সঙ্গে মিলিত হইয়া বেমাগিরিতে বাস করিতেছিলেন। একদা তাঁহারা কতকগুলি কুকি সমভিব্যাহারে ত্রিপুরার কৃষ্ণবলী পোমাং নামক জনৈক প্রতাপাশ্রিত ব্যক্তির পাড়া লুট করিতে যাওয়ার সময় গিরিশচন্দ্রের পাড়ায় আসিয়া তাঁহাদের ঘর জ্বালাইয়া দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। এ সময়ে বাড়ীতে জ্যেষ্ঠদের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র ৭৮ শত লোককে তিন স্থানে বাহ্যকারে স্থাপন করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের এক ভৃত্য ধৃত হয়; অপর বিদ্রোহীদের চলিয়া যায়। পরে ইহারা প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাদিগকে পুনরায় আক্রমণ করে। এবারও ইহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু পলায়নকালে ইহাদের লুণ্ঠিত ছয়জন যুবতীকে তাঁহারা উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আবার ৫০৮০ জন কুকি আসিয়া তাঁহাদের একটি পরিত্যক্ত বাড়ীর ঘর ঘর জ্বালাইয়া দেয় এবং নানা উপদ্রব করিতে থাকে। তখন গিরিশচন্দ্র দোনালী বন্দুকে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিলে সকলেই পলায়ন করে। পরে আবার পৌষমাসে প্রায় চারি হাজার কুকি আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে, গিরিশচন্দ্র নয়জন মাত্র লোক লইয়া সম্মুখীন হন। বন্দুকের গুলিতে ১৬ জন কুকি হত হয়, অপরেরা পলায়ন করে। এইরূপে কুকিদের অত্যাচার অসহ্যবোধে তাঁহারা চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছুরী থানার অন্তঃপাতী বারনাসিয়া গ্রামে আবাসস্থান অন্তরিত করেন (২)। সেখানে দুই বৎসর কাল মাত্র বাসের পর রামগড় আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন। পরে ক্রমে ক্রমে বর্তমান বাসস্থান আমতলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও পূর্বে তাঁহার অপারিসীম ক্ষমতা ছিল। ডেপুটী কমিশনার মিঃ এ, ডব্লিউ, পাউয়ার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুনের পত্রে \*  
 লিখিয়াছিলেন :—“ফেণীকুলে গিরিশচন্দ্র দেওয়ান  
 বিশেষ প্রতিপত্তি-সম্পন্ন।” তিনিই আবার পরবর্তী  
 বৎসরের ২১শে এপ্রিলের পত্রে + লিখিয়াছেন :—  
 “গিরিশচন্দ্র দেওয়ান যদিও হরিশচন্দ্রের প্রাধান্ত স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীয়  
 প্রজাগণের উপর রাজার মত শাসন চালাইয়া থাকেন।”

\* Letter No. 472.

+ Letter No. 319.

(১) কাপ্তেন লুইনের “ফাই আন্ দি হইল” নামধের গ্রন্থে রতনপুঁইয়া সম্বন্ধীয় নানা কথা আছে।

(২) যেসকল গুলিতে পাই, নীলচন্দ্র দেওয়ান এবং গিরিশচন্দ্র দেওয়ানের পারিবারিক বিবাহেই কুকির উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।



তজ্ঞাগোছার শ্রীমতী লক্ষ্মীপতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তৎপরে দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ রসিকবাবুর হাতেই জমিদারী চলিতেছে। গত ১৩১৩ সনে গিরিশচন্দ্র তীর্থযাত্রার বহির্গত হন। বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া আসিতে বন্ধমানে ১৮ই কার্তিক ১৩১৩, ইংরাজী ৪ঠা নবেম্বর (১৯০৬), পঞ্চম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপরে যে তিন ব্যক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইল, তাঁহারা সকলেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত। অনন্তর অধুনা বর্তমান আর তিনজন প্রধান ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছদ শেষ করিব। ইহাদের জীবনী অসম্পূর্ণ। ভগবান করুন, ইহারা আরও সুদীর্ঘকাল ইহসংসারে থাকিয়া দেশের ও দশের কার্যে গৌরবান্বিত হউন।

## শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান

ধামাইগোছার শিড়াভাঙা গোষ্ঠিতে বাঙ্গালা ১২৫৮ সনের ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ৮ দণ্ড রাত্রিকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—দয়াদন দেওয়ান। বহুদিন হইতে তাঁহারা কর্ণফুলীর “কুঁউর্গ্যারবাঁক” তীরবর্তী কামিলাছরী গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এই গ্রাম রাঙামাটি হইতে চট্টগ্রামের ৭ মাইল নিকটতর। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণচন্দ্রের অটল অধ্যবসায় এবং বিপুল কার্যদক্ষতা—সৌভাগ্যসঞ্চারের প্রধান কারণ ছিল। তিনি সর্বপ্রথমে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাচীন প্রণালীমতে শিক্ষালাভ করেন। পরে অনুমান ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজানগর রাজবাটিতে থাকিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তদনন্তর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রঘোনায় ইংরাজী-বাঙ্গালা মিশ্রিত বিদ্যালয় খোলা হইলে তাহাতে গিয়া ভর্তি হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১২৭৪ সনের ১০ই চৈত্র পিতৃবিয়োগ হওয়ার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ৪র্থ শ্রেণী হইতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন প্রায় চারিমাংস চন্দ্রঘোনায় ডেপুটি কমিশনার আফিসে শিক্ষানবিশের কার্য করেন। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই কমিশনার লর্ড ইউলিক ব্রাউন তাঁহাকে ৪০ টাকা বেতনে উক্ত আফিসের দ্বিতীয় কেরানী-পদে নিযুক্ত করেন। এসময়ে তাঁহার উপর পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের বর্তমান প্রধান নগরী রাঙামাটির তদানীন্তন জল্ল পরিকার করাইবার ভার অর্পিত হয়। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী ডেপুটি কমিশনার আফিস রাঙামাটিতে উঠিয়া আসে। তদবধি তিনি এখানেই স্থায়ীরূপে আছেন। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত নীলচন্দ্র দায়োগার ভ্রাতৃপুত্রী ত্রিলোকচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী কেমখরীর সহিত তাঁহার

শুভপরিণয় হয়। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ২৭শে আগষ্ট ৫০ টাকা বেতনে ‘ইংরাজী কেরাণী’ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যার্থে কাউন্সিলের সভা এবং হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে তদীয় পার্শ্বভার্য্যজ্ঞের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। রাজসরকার হইতে তিনি তজ্জন্ত প্রথমে ৫০ পঞ্চাশ টাকা পরে একশত টাকা করিয়া বেতন পাইতেছিলেন। ১৮৯০ ইংরাজীর চীন-লুসাই অভিযান (১) কালে তদীয় সাহায্যনাভে বিশেষ সন্তুষ্টি হইয়া সন্থদর গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে একটি সুবর্ণপদম প্রদান করিয়াছেন। তাহার পৃষ্ঠে খোদিত আছে ;—

“ Presented

by

Government

to

Babu Kristo Chandra Dewan

Manager of the Chakma Raja's Estate

For good services rendered

During the Chin-Lushai Expedition

1890 A. D.”

অর্থাৎ “১৮৯০ খৃষ্টাব্দের চীন-লুসাই অভিযানকালে বিশেষ সাহায্য করার চাকমারাজ-সম্পত্তির ম্যানেজার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত।” অনন্তর তিনি ১৮৯৫ ইংরাজীর ২৭শে সেপ্টেম্বর ১০০ টাকা বেতনে ৪র্থ শ্রেণীর সবডিপুটি কলেক্টরের পদ লাভ করেন, ক্রমে বেতন বর্তমানে ২৫০ টাকা হইয়াছে। তাঁহার এই অপূর্ণ উন্নতির মূলে দুইটি মহৎ গুণ সর্বিশেষ অমুখাবন যোগ্য। একটি—অসাধারণ সরল ব্যবহার, দ্বিতীয় সু-উচ্চ সঙ্গায়তা।

তাঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান বি, এ পদাঙ্ক পড়িয়া সবডিপুটি কলেক্টরের পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে চট্টগ্রামে আছেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, কৃষ্ণবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর—

### শ্রীযুক্ত ত্রিজগত দেওয়ান

মহোদয় স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কোবাগারের (Treasury) খাজাফির কাজে আছেন ; তিনিও অতিশয় সরল। পঞ্চমতঃ—

(১) এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণী “রাজমালা”রও পাওয়া যাইবে। ৩৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

## শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দেওয়ান ।

ইনিও “ধামাইগোছা”র “পিড়াভাঙা” গোষ্ঠিসম্ভূত । পিতার নাম জয়চন্দ্র দেওয়ান, মাতা—রম্ভাবতী । ১৮১৪ ইংরাজী মোতাবেক ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২২শে আষাঢ় প্রাপ্ত “কুউর্গ্যার বাঁকেই” বড়াদম নামধেয় গ্রামে জন্মিষ্ট হন । বহুকাল ধরিয়া তাঁহার এই গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছেন । পিতার অবস্থাও মন্দ ছিল না, পরন্তু তিনি দেশে এবং সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন । তিনি অনেকদিন স্বর্ণগতা কালিন্দী রাণীর মন্ত্রিত্ব কার্যও করেন । দুঃখের কথা এহেন পিতৃমুখভোগ ত্রিলোচন বাবুর ভাগ্যে অধিক দিন ঘটে নাই ! তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়সে ১২৬৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতৃবিয়োগ ঘটে । কিন্তু তদীয় বুদ্ধিমতী জননী পুত্রের স্বাভাবিকী প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অচিরে তাঁহাকে চন্দ্রঘোনার সেই মিশ্রবিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া দেন । তবে পাঠে তাঁহার অশেষ অনুরাগ ও জননীর প্রবল চেষ্টা থাকিলেও, তিনি বিদ্যালয়ে অধিককাল কাটাইবার অবসর পান নাই । সংসার চালাইবার অপর কেহ না থাকায় ৫৯ বৎসর পরেই তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; পরন্তু এক্ষেত্রে তিনি এত পারদর্শিতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন যে, ক্রমে তদীয় ভাণ্ডার ধনধাতো পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে । এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বিবরণ দিব—ধনসম্পত্তিতে এতদেখে চাকমা বাহাদুরের অব্যবহিত নিম্নেই তাঁহার স্থান নির্দেশ করা যায় । পূর্বে যে “ধামাইর হাটের” নাম উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহাও ইহার অধিকারে ; তা’ ছাড়াও চট্টগ্রামে অপর জমিদারী মহাল আছে ।

কালিন্দীরাণীর সরকারেও তিনি কাজ করিয়াছিলেন । পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাঙামাটিতে গভর্নমেন্টের অধস্তন কোবাগার ( Sub Treasury ) সংস্থাপিত হইলে, তিনি প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া তাহাতে খাদ্যাকীর পদে ছিলেন । অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্রের কৌশিলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সভ্যপদে কাজ করেন । পরিশেষে ভূবনবাবু যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তৎপর কিছুকাল তদীয় পরামর্শদাতা স্বরূপ ছিলেন । কিন্তু যে কারণে তিনি বিদ্যালয় ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পুনঃ তেমনি কারণে এই পরাকীর দায়িত্বভার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সম্পত্তি সুরক্ষাবেষকণের নিমিত্ত চলিয়া যান । ইত্যবসরে গভর্নমেন্ট সমীপেও তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লুসাই অভিযানে সাহায্য করার

কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদসূচক লিপি প্রদান করেন। ত্রিলোচন বাবুর গুণগ্রাম কেবল এ সকলে নহে, দান—ধর্ম—তীর্থপর্যটন প্রভৃতিতে তাঁহার অশেষ গৌরব। যাচক মাত্রকেই তাঁহার নিকট রিক্ত হস্তে ফিরিতে হয় না, জাতিধর্ম নির্বিশেষে এমনকি মত্তের বৈষম্য থাকিলেও তিনি প্রার্থীকে বিমুখ করেন না।

১৮৭১ ইংরাজিতে সুপ্রসিদ্ধ ঈশানচন্দ্র দেওয়ানের কণ্ঠার সহিত পরিণয় হয়। তাঁহাদের পবিত্র সম্মিলনে চারিপুত্র ও দুই কন্যা জন্মিয়াছে। বিশেষ পরিতাপের বিষয়, জ্যেষ্ঠপুত্র মনোমোহনের মস্তক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিকার ও মনোরঞ্জনার্থে ত্রিলোচনবাবু যথাসাধ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। অপর শ্রীমান্ কামিনীমোহন প্রভৃতি অধ্যয়নে নিরত। পিতৃস্বখ ভাগ্যে অধিকাল না থাকিলেও প্রায় ৪৮ বৎসর ধরিয়া ত্রিলোচনবাবু মাতার অনাবিল স্নেহ লাভ করেন; গত ১৩০৯ সালের কার্তিক মাসে সেই মহীয়সী মাতাকেও হারাইয়াছেন।

## শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ান ।

পরলোকগত নীলচন্দ্র দেওয়ানের অত্যন্ত পিতৃব্য শুমান খাঁ দেওয়ানের ঔরসে পূণ্যগর্ভা সন্ধ্যার গর্ভে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ( শুক্রবার ) তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু পরবর্তী বৎসরেই পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। অনন্তর ১২৬৫ বঙ্গাব্দে অগ্রজ মোহনচন্দ্র দেওয়ান তাঁহাকে লইয়া বাঁকুছরী গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; বর্তমানেও তাঁহার তথায় বাস করিতেছেন।

রাজচন্দ্র বাবুও রাজানগর রাজবাড়ী থাকিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে চন্দ্রধোনা গভর্নমেন্ট স্কুলে ছয়বৎসর পাঠের পর বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্বক পুলিশের হেড্ কন্স্টেবল পদে নিযুক্ত হন। ছয়মাস তাহাতে কাজ করিয়া ছাড়িয়া দেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে চাকমারাজ-সরকারে দেওয়ানি কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লুসাই অভিযানে কালিন্দীরাগী তাঁহাকে গভর্নমেন্টের সাহায্যার্থ পাঠান। গভর্নমেন্ট তাঁহার কার্যে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন। পরে তিনি মাসিক ৫০ টাকা বেতনে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কার্য পরিচালন সভার সদস্যপদেও নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় বলে স্বীয় অবস্থাকে বহুপরিমাণে উন্নত করিয়াছেন, অধুনা বিষয়-কর্ম লইয়াই ব্যতি-বাস্ত। শ্রীমান যোগেন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র নামে তাঁহার দুইটা পুত্র, কিন্তু পক্ষান্তরে সপ্ত ছহিতারত্ন লাভ করিয়াছেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

## ( শ্রমবিভাগ ও কুলমর্যাদা । )

খিসা—কারবারী—ওকা—এবং রায়তগণ ।

রিজলী মহোদয় বলিয়াছেন \*,—"Among the chakmas, as perhaps among the Greeks and Romans in the beginning of their history, the sect is the unit of the tribal organization for certain public purposes."

\* Tribes and Castes of Bengal, Page—170.

অর্থাৎ—“সম্ভবতঃ গ্রীক ও রোমানদিগেরই মত চাক্‌মাদের বংশ কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্যে জাতীয় শৃঙ্খলাবিধানের ( পক্ষে ) একক হয় ।” কিন্তু বলিতে কি, সম্প্রদায় বিশেষে শ্রমবিভাগের কঠোর ব্যবস্থা হিন্দু-সমাজ ভিন্ন আর কোথায়ও নাই । ইহাতে সমাজের ইষ্টানিষ্ট উভয়ই আছে । একদিকে শ্রমবিভাগে যেমন এক

একটি কার্যের ভার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর উপর

শ্রমবিভাগ ।

ভুক্ত থাকায়, তাহাদের বংশধরগণ অতি অল্প আয়াসেই তত্তৎ ব্যবসারে লব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, পক্ষান্তরে আবার উপযুক্ত প্রতিযোগিতার অভাবে উন্নতির পথে যেমন অগ্রসর হইবার শক্তি পায়না ; এবং বিভিন্নশ্রেণীতে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে সমাজে কোনও নূতন তেজ প্রবেশেরও সুবিধা নাই । বোধহয়, ভারতের প্রাচীন রত্নগুলি হারাইবার ইহাও একটি বিশেষ কারণ । শক্তি না পাইলে কি দিয়া তাহা রক্ষা করিবে ? পাশ্চাত্য নীতিবিদ পণ্ডিতগণ এতাদৃশী ব্যবস্থার প্রতি তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন । যে দেশে একই জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ হেন বিভ্রাট ঘটিয়া গিয়াছে, সেখানে আর জাতীয় একতার সম্ভাবনা কোথায় ? বস্তুতঃ হিন্দুদের ভিতর কতকগুলি নিয়ম এমনি কঠোর যে, তাহার বিঘ্নয় ফলে সাধারণকে সমস্তই অনুবিধা ভোগ করিতে হইত। কোন রকমে তৎপ্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন

করিলে সমাজে “পতিত” থাকিতে হয়। ব্যবসায় লইয়া একপে আতীয় উচ্চতা পরিমিত হয় বলিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থও বন্ধায় থাকে। সেই সুযোগে তাহারা একমত হইয়া অবাধ-অত্যাচার করিবারও প্রয়াস পায়। আর তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা পাইলে অমনি বাত-ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ভীষণাকার ধারণ করিয়া “ধর্ম্মঘট” করিয়া বসে। সুতরাং সমস্ত নির্যাতন সাধারণকে নীরবে সহ করিয়া লইতে হয়। “স্বদেশী-আন্দোলনে”র ফলে অনেকেই সাম্প্রদায়িক তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বপ্রতিভামূরূপ কর্মে নিয়োজিত হইতেছে; তাহাতে যে সমাজের একটি মহৎলাভ ঘটবে, সন্দেহ নাই।

চাক্‌মাদিগের মধ্যেও শ্রমবিভাগে কতকটা শ্রেণীবিভাগ আছে, কিন্তু তাহা বংশগত নহে—কার্যগত মাত্র। ‘খিসা’, ‘কারবারী’, ‘ওঝা’, ‘রায়ত’ প্রভৃতি আখ্যাগুলি তাহাদের কার্য লইয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ‘খিসা’, ‘কারবারী’ গ্রামের সকলেরই নির্বাচন-মতে নিযুক্ত হয়। আবার সকলের সমবেত মত হইলে তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতেও পারা যায়। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অভিজ্ঞ হইলেই ‘ওঝা’র ব্যবসায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যোগ্যতা না থাকিলে উত্তরাধিকার স্বত্বে এই সকল কাজ চালাইবার অধিকার পাওয়া যায় না। পরন্তু ইহারা কখনও

সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনাদৃত বা অস্পৃশ্য নহে! এমন কুলমধ্যমা।

কি, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ পর্য্যন্ত চলিতে কোন বাধা নাই। ‘দেওয়ান’ ইচ্ছা করিলেই ‘খিসা’, ‘কারবারী’ বা ‘রায়ত’ কস্তার পানিগ্রহণ করিতে পারেন; এরূপ আদান-প্রদান সমাজে যথেষ্ট চলিতেছে। এতদ্বির নিমন্ত্রণাদিতে সকলে একত্রেই বসিয়া খায়। কিন্তু বসিবার বিশেষ শৃঙ্খলা থাকে। রাজপরিবারের আসন সর্ব্বাগ্রে নির্দিষ্ট হয়, অনন্তর ‘দেওয়ান’, ‘তালুকদার’, ‘খিসা’, ‘কারবারী’, ‘ওঝা’ ও ‘রায়ত’ ক্রমে বসিয়া যায়। আবার ইহাতেও কিকিৎ ইত্যর বিশেষ আছে। তালুকদার “কুটুবে বড় হইলে” অর্থাৎ যদি কোনও তালুকদার সম্পর্কে দেওয়ানের পূজনীয় হয়, তবে সেই তালুকদারের স্থান পূর্বে হইবে।

খিসা।—খিসাগণ দেওয়ান-তালুকদার অর্থাৎ হেড্‌ম্যানদিগের প্রধান সহকারী; সমাজ শাসনে বা থাঞ্জানা উত্তল-তহনীলে ইহারা বিশেষ সাহায্য করে। এই নিমিত্ত তাহারা হেড্‌ম্যানগণের আহ্বান মতে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাদের কি রাজাবাহাদুরের বাড়ীতে কর্ম্মাধ্যক্ষতা করিতেও ইহারা সুযোগ পায়। বড় বড় ব্যাপারে ইহাদিগের হাতে প্রধানতঃ ভাণ্ডার ঘরের ভার পড়ে; তদ্বির

লোক খাওয়ান, অভ্যর্থনা করা প্রভৃতি নানা দিকেই তাহাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বলা বাহুল্য, সমাজে অপর সাধারণের ক্রিয়াকর্মে ইহাদের উপর প্রধান প্রধান কার্যের অধ্যক্ষতা থাকে, ইহারাও তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। খিসা-গণকে জুমকর দিতে হয় না, চাষের জন্তু গভর্ণমেন্ট হইতে বিনা করে জায়গীর পায়। তবে কিনা ইহাদিগকে রাজপুণ্যাহ এবং রাজার বা হেডম্যানগণের শুভাহুষ্ঠানে এক 'চুঙা' (১) মদ, একটি হুইপুই মোরগ ও একটি "আক্‌চলী" (২) দিতে হয়। এই 'খিসা' আখ্যাটী মদদিগের হইতেই অধুকৃত হইয়াছে।

কারবারী।—কারবারী 'আদমের' শাস্তিরক্ষক। বেশের চৌকীদারদিগের জায় ইহারা গ্রামে কোন গোলযোগ ঘটিলে হেডম্যানের গোচরীভূত করে, সামাজ্য অভিন্নোঙ্গে হেডম্যানেরা কারবারীর উপরই শীমাংসার ভার দিয়া থাকেন। দালা-হাদ্দামার সম্ভাবনাস্থলে ইহাদিগকে নিশ্চয় উপস্থিত থাকিতে হয়। প্রয়োজন হইলে খিসাগণও ইহাদের সাহায্য পায়। অধিকন্তু হেডম্যানের বাড়ীতে কারবারীর প্রভুত্বও কম নহে; অনেকে কারবারীর উপরই সংসারের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহারা কায়মনে মনিবের হিত সাধনে তৎপর রহে। কারবারীগণও জুমকর হইতে মুক্ত এবং জায়গীর ভোগ করিতে পায়। এতদ্বির আর কোন পারিশ্রমিক নাই! তাই গ্রামবাসিগণকেও চৌকিবারী কর দিতে হয় না।

ওঝা।—এই আখ্যাটি প্রাচীন বাঙ্গালাতেও পাওয়া যায়। অমর কবি কৃত্তিবাসও আপনাকে "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে মন্তাদি অবধৌতিক চিকিৎসা দ্বারা ভূত প্রেতের দৃষ্টি নিবারককেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু চাক্‌মাদের "ওঝা" ঠিক তাহা নহে। ইহাদিগের "ওঝা" দুই জাতীয়—স্ত্রী-ওঝা ও পুরুষ-ওঝা। যে সকল স্ত্রীলোক ধাত্রীর কাজ করে, তাহাদিগকেও "ওঝা" বলে। সামাজিক অনেক কার্য পুরুষ-ওঝাগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়; বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলে ওঝার কাজ করিতে পারে না। ভূত-প্রেতাদির উৎপাত নিবারণ, রোগপ্রতিকার, গ্রামদেবতা পূজা প্রভৃতি

(১) চুঙা—বীশের এক পূর্ণ পরিমিত অংশ মাত্র। ইহার এক প্রান্তে গাঁট এবং অপর প্রান্তে খোলা থাকে।

(২) আক্‌চলী—কাঁচা এক আড়ি অর্থাৎ বোল সের বা পাঁচ সের চাউল পরিপূর্ণ বীশের চ্যাচাড়ী বিধিত চুপুড়ী বিশেষ।

বহুবিধ ক্রিয়াকর্মে ইহাদের প্রয়োজন। এক কথা—ওঝাগণ সমাজের বাজক (১)। অমুঠানের পুরুষদিগ একচুড়া ময়, পাঁচগড়া পান ও পাঁচটি সুপারি লইয়া গৃহস্থ ওঝাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। অনন্তর ওঝা রাত্রিতে খাওয়ার পর অতি পবিত্রভাবে ভগবানকে স্মরণ করিয়া গৃহস্থের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করে; এবং স্বপ্নে ভাবী অমুঠানের ফলাফল জানিতে পারে। পরদিন গিয়া যথাবিধানে কাষা সম্পাদন করিয়া থাকে। ওঝারা এই যজন-পূজনের নিমিত্ত যথোচিত দক্ষিণা পায়। মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট ত্রুতে তাহারা কিছু গ্রহণ করে না। স্ত্রী-ওঝাগণেরও পারিতোষিকের বিধান আছে; আর্থিক পুরস্কারের সহিত মদ এবং কাপড়ও দেওয়া হয়। বিদেশিনী হইলে একটি মোংগাও প্রদান করে, আর যদি স্বদেশীয়া হয়, সেই মোংগা কাটিয়া পরিপাটিক্রমে ভোজন করায়। কিন্তু ওঝাদিগের খাজানা বাদ নাই। কোন কোন স্থলে হেড্‌ম্যান ইহাদিগকে কর হইতে মুক্তি দিয়া নিজে তাহা বহন করিয়া থাকেন। এস্থলে একটু উল্লেখ থাকা উচিত, চাক্‌মাসমাঝে “বৈত” আখ্যাও আছে। ইহারা মুষ্টিযোগ মাত্র সঞ্চল লইয়া এবং স্থলবিশেষে কবচ-মস্তাদি দৈবামুঠান বিধানে চিকিৎসা চালাইয়া থাকে।

রায়ত।—সাধারণ প্রজামাত্রকেই রায়ত বলা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাদের পরিবারপ্রতি জুমকর বার্ষিক চারিটাকা, ও একজনের চারিদিন “বেগার”—নতুবা আরও একটাকা খাজানা অধিক দিতে হয়। পূর্বকালে রায়তেরা দেওয়ানের বাড়ীতে পনরদিন “বেগার” দিতে বাধ্য ছিল। এখন তাহা চারিদিনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারও কোন নিয়ম নাই। কোনও কার্যে একবার যাওয়া-আসা করিলেই চলে। সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কেবল চাষী রায়তগণকে বেগার দিতে হইবে না।

এতদ্ভিন্ন চাক্‌মাসমাঝে কুস্তকার, সর্গকার, কর্ণকার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি কোল ব্যবসায়ীবিশেষ নাই; এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বহু অন্ত্রবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণের আগমনের পূর্বে ইহারা বাঁশে করিয়া পাক এবং লাউয়ের খোলে জল বহন করিত। অতাপি কুকি প্রভৃতি আদিম অধিবাসিবর্গ অনেকেই এইরূপে সংসার চালাইয়া থাকে। চাক্‌মাদিগের মধ্যে মুক্তিকা পাত্রের বহুল প্রচলন হইয়াছে বটে, কিন্তু

শিল্পিত্রম।

ইহারা তজ্জন্ত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের মুখের দিকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। মূল্যও চটুগ্রাম হইতে রাঙামাটি আসিয়াই চারিগুণ



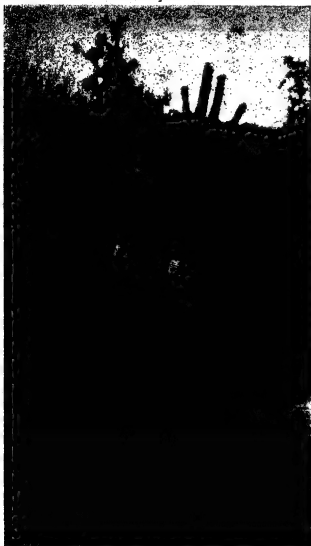
হয়—দূরবর্তী স্থানেত আরও বেশী। সেইরূপ গহনা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয়  
লৌহাদ্রাদির জন্তও তাহাদিগকে সর্বদা বিজাতীয় শিল্পীদিগের সাহায্যপ্রার্থী  
হইতে হয়! নিজেদের মধ্যে ইহা যোগাইবার ব্যবস্থা না থাকাতাই এত দুর্গতি!  
কিন্তু এখনও তাহারা ইহা শিখিতে মনোযোগ দিতেছে না। প্রায় বিশ বৎসর  
পূর্বে অত্রত্য রাজ্যমাটি গভর্নমেন্ট বিদ্যালয়ের তদানীন্তন হেডমাস্টার বর্তমানে  
পেন্সন প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহোদয় এই স্কুলের শাখাস্বরূপে গভর্নমেন্ট-  
ব্যয়ে কুস্তকার, কর্মকার ও সুত্রধর নিযুক্ত করিয়া একটি শিল্পবিদ্যালয় (Artisan  
School) খুলিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় কপিয় সম্ভ্রান্ত লোকের ঔদাসিন্যে  
অচিরে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। হায়! তাহা এতদিন জীবিত থাকিলে  
কত শুভফল প্রদান করিত। জাতীয় নেতৃবর্গের এই ক্রটির নিমিত্ত আরও  
বহুকাল যাবৎ সমাজকে কষ্ট পাইতে হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি, ইহাদের শ্রুতি নাই বলিলেই হয়; যে ছ'একখানি উঠে  
তাহাও চিমটার সাহায্যে উৎপাদিত করিয়া ফেলে। সুতরাং আর প্রায়ই ফেলিতে  
হয়—কেবল চুল। ইতিপূর্বে ইহারা একে অপরের চুল কাটিত। এখনও যে  
সকল স্থানে বাঙ্গালী নাপিতের যাতায়াত নাই, তথায়  
নাপিতের কার্য।  
পরম্পরের সহায়তার কার্য নির্বাহ করে। ইহাতে  
কিছুই নিন্দার বিষয় নাই। তাহারা পরম্পর পরম্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর  
করিয়া চলিয়া আসিতেছে, কেনই বা দুষণীয় হইবে?

সাধারণ চাক্ষুশগণ কাপড়গুলিও নিজে নিজে ধুইয়া লয়; গৃহিণীদের উপর  
এই কার্যের ভার থাকে। নদীপথে গমনকালে  
ধোপার কার্য।  
প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ঘাটে ঘাটে চাক্ষুশমণীগণ  
কাপড় পরিষ্কার করিতেছে। ইহারা প্রথমে বৃক্ষলতাদির দ্বারা কাপড়ে উত্তমরূপে  
মাখিয়া সিঁদ্ধ করিয়া লয়। অনন্তর ঠাণ্ডা হইলে তাহা ঘাটের কাঠের উপর  
রাখিয়া তত্পরি লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে থাকে; এবং মধ্যে মধ্যে জলের  
ছিটা দেয়। কাপড়গুলি বিশেষ ভারী বলিয়া দাঁড়াইয়া আছড়াইতে পারা যায়  
না। ছোট ও পাতলা বস্ত্র পরিষ্কার করিতে অবশ্য দাঁড়াইয়াই আছড়ায়।

ইহা ছাড়া সাধারণ পরিবারে অপরাপর গৃহকর্মেও জীলোকগণ অনন্তসহায়।  
পুরুষেরা দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে প্রশান্ত সুখ উপভোগ করিতেছে, আর  
কাঠাহরণ।  
তাহাদের সহধর্মিণীগণ দা-হস্তে মার্ভেডের প্রবল প্রত্যাপ  
তুচ্ছ করিয়া অশেষ কষ্টসাধ্য আহরণে নিরত! বহনোপ-

যোগী কাঠ সংগৃহীত হইলে, লতাধারা বোঝা করিয়া আর একখানি লতার তাহা



কপালের সাহায্যে পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া সেই কাঠের বোঝা বহন করিয়া থাকে। কেহ কেহবা কাঠ সংগ্রহের নিমিত্ত বাড়ী হইতে “থুকং” (১) লইয়া আসে, তাহা আহৃত কাঠে পূর্ণ করতঃ উপরি-উক্ত প্রকারে বহন করে। তরি-তরকারী সংগ্রহেও এই একই বিধি কপালে “থুকং” ঝুলাইয়া দা-হস্তে “রাগ্যায়” অর্থাৎ পুরাতন জুমে শাক, শুন্স প্রভৃতি আহরণ করে। এইরূপ কপালের সাহায্যে পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া

বোঝাবহন-প্রথা কেবল চাক্‌মাগিরের মধ্যে নহে, পার্শ্ব জাতি মাত্রেই ইহা

দেখা যায় (২)। চাক্‌মাগণ কথায় বলে,—“কপালের হুখ, কপালেই ভুগুক” অর্থাৎ কপালের হুখ

কপালেই ভোগ করুক। কথাটা বেশ সমর্থযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী বটে! বস্তুতঃ পাহাড়ে’ রাস্তায় বোঝা বহন করিবার পক্ষে ঈদৃশী ব্যবস্থা সুবিধা জনক, সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন স্থানের মুটেগণ যে কোন মোটা—এমন কি, লম্বা ও মোটা বাঁশের বোঝা, জলের ভার ইত্যাদি পর্য্যন্ত কাঁধে না লইয়া মাথায় বহিয়া থাকে। ইহাতে যে তাহারা কি সুবিধা পায়, বুঝিতে পারি না!

ইহাদের ধান ভানিবার ব্যবস্থাতেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ঢেঁকি আছে

(১) “থুকং”—বাঁশের চাঁচাড়া নির্মিত ঝুড়ি বিশেষ।

(২) ত্রিপুরা রমণীগণকে উক্তরূপে জল আনয়ন করিতেও সর্বদা দৃষ্ট হয়।

সত্য এবং গঠন প্রাণালীও একই রূপ; কিন্তু তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রায় পরিবারেই “ঢেঁকিশাল” নাই। ঢেঁকি মহাশয় বাড়ীর একপাশে অথবা সংরক্ষিত হইয়া পূর্বজন্মের কৰ্মফল ভোগ করিয়া থাকে! যে সকল পরিবারে গৃহিণীর ‘বা’-আদি কোন ঘোঁসর নাই, সেখানে ধান ভানা।

তাঁহাকে একাই “পাদ-দেওরা” ও “এলে-বেওরা” উভয় কার্যই করিতে হয়। কতক্ষণ একটানা “পাদ”দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, বাম হাতে ঢেঁকিটা তুলে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে ধানগুলি উল্টাইয়া দেয়। এই নিমিত্ত ঢেঁকিটাও প্রায়শঃ হালকা করা হয়। ঢেঁকি এক হাতে তুলিয়া রাখিতে অসমর্থ হইলে, দুই হাতে উঠাইয়া কোন কাঠ তৈস্ দিয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে “কুলা”র গচলন নাই। একমাত্র “চালুনি”তেই উভয়বিধ কার্য নির্বাহিত হয়।

এইত গেল কয়েকটি আনুযায়িক গৃহকর্মের কথা। সর্বাপেক্ষা প্রাশংসার বিষয়, চাক্ষুযমহিলায় শজ্জা-নিবারণের ক্ষমতা পরমুখাপেক্ষিণী হয় না। তাহাদের অপূর্ণ বয়নশিল্পের কথা বথান্যস্থানেই বিস্তারিতরূপে মহিলাগণের শ্রমশীলতা।

আলোচিত হইবে। এতদতিরিক্ত জুমের কার্যেও তাহারা পুরুষের অধিকাংশ সাহায্য করে। বিবাহকালে এইরূপ সাংসারিক কার্যাদক্ষতা লইয়াই স্ত্রীলোকদিগের যোগ্যতা বিচার হয়। সাধারণতঃ বলে,

“নেই মোগন্তুন কাণা মোগ ভালা,

সবাই ন-পে’তে রাজার ষি ভালা।”

অর্থাৎ ‘স্ত্রী না থাকা অপেক্ষা কাণা স্ত্রী ভাল, একেবারে না পাইতে রাজকন্যা ভাল’ (১)। কীরসর পালিতা অকর্মণ্যা রাজ-ছহিতা বিবাহের লোভ এতই সংযত! সাধারণ পরিবারে পুরুষদের খাটুনি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের খাটুনি অনেক পরিমাণে অধিক। জুমের কার্যে পুরুষেরা কেবল জঙ্গল কাটিতে বাহা কিছু কাঠ পার, অপরাপর কার্য প্রায় প্রধানত স্ত্রীলোকদিগের উপর নির্ভর করে। তদুপরি আবার সন্তান পালন, স্বামীর হকুম সরবরাহ ইত্যাদি কত আত্মোন্নতিতেও নিয়মিত ঘুমাইতে পায়েনা; অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া কাপড়ের ক্ষয় হুতা কাটিতে হয়। বস্তুত তাহারা এত খাটে যে, চিন্তা করিয়া দেখিলে

(১) কথাটি “নাই মামার থেকে কাণা মামা ভাল”—এর অনুরূপ হইলেও তদপেক্ষা গুরুতর চিন্তা-যোগ্য।

আশ্চর্য্য না হইয়া থাকি যাই না ! ভগবান যেন তাহাদিগকে শুদ্ধ 'গতর  
খাটিতেই' পাঠাইয়াছেন, কারণ লুইনের বর্ণনায়ও \* The Hill Tracts of  
আছে \*, "পাহাড়ীদিগের মধ্যে জীলোকেরাই Chittagong and the  
সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যক্ষম ও পরিশ্রমী । স্বভাবত dwellers therein—P. 36.

সকল ঋতুতে অবিরত ও অবিপ্রান্ত পরিশ্রম হেতু তাহাদের সমাজে জীলোকসংখ্যা  
হ্রাস পায় এবং অবশিষ্ট জটিল রোগাক্রান্ত হয় ।" পুনরায় তিনি পরিশিষ্ট ভাগে  
যেন অধিকতর বেদনার সুরে লিখিয়াছেন, "ইহাই নিয়ম যে বলবানের প্রতি  
সকলে সম্মান করে । জীলোকেরা শক্তিপ্রকাশে বিমুগ্ধ, তাই যাবতীয় বর্কর  
জাতির মধ্যেই তাহাদের প্রতি ঘৃণা পরিলক্ষিত হয় । হাতের কাছে দ্বী, মা কি  
ভদ্রী থাকিলে অনেক সামান্য বোঝাটাও লইতে চাহে না ।" অহো, তাহাদিগের  
এই আশ্চর্য্য শ্রমসহিষ্ণুতা চিন্তা করিলে, অন্তরে স্বতই দয়া ও ভক্তির উদয় হয় ।  
একমাত্র দাম্পত্য শ্রেমই তাহাদের এতাদৃশ কর্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার । ধন্ত শ্রম !  
তোমার আকর্ষণে লোক প্রাণের মমতা তুচ্ছ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে পারে ।  
আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ এই ঘোর বিলাসিতার যুগে চাকমা রমণীদের শ্রম-তৎপরতার  
কথা অনুধাবন করিবেন কি ?

# ষষ্ঠি পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] জাতীয় চরিত্র, [ ২ ] স্ত্রীস্বাধীনতা,

এবং

[ ৩ ] দাম্পত্য প্রেম ।

[ ১ ]

যে জ্ঞানের আলোকে মানব-হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম বিকাশ পায়, তাহাই প্রকৃত মহান ও ভক্তির যোগ্য ! নতুবা বিজ্ঞতাভিমানী যে আমরা—নিরন্তর স্বার্থের আন্দোলনে মজিয়া থাকি, অজ্ঞতা তদপেক্ষা শত সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর । একতা

স্বর্গীয় সামগ্রী ; তাগ-স্বীকারে অভ্যস্ত না হইলে, একতা ।

এমন দুর্লভ অধিকারে আশা করা যায় না । উচ্চতম রাজশক্তি হইতে নিরন্তর ভিক্ষাপাত্র পর্য্যন্ত একতার শাসনে নিয়ন্ত্রিত । ক্ষুদ্র হইতেই যদি মহত্তের পরিচয় লইতে হয়, তৃণগুচ্ছ হইতেই যদি একতার শক্তি উপলব্ধি করিতে হয়, তবে চাকমা সমাজ হইতেও আমাদের শিখিবার অনেক আছে ! ইহাদের একতাবন্ধন আশাতীত সুদৃঢ় । যে কোন “মেলা” অর্থাৎ অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ মনে হইলে ‘আদমের’ দশ জন মিলিয়া পূর্বে “তেইংমাং” ( পরামর্শ ) করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া লয় । তাহা ছাড়া কাহারও কোন বিপর উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া তাহার সাহায্য করে । দুর্ভিক্ষের সময় কাহাও অতিরিক্ত ধান বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই, তাহা দীনহীন স্বজনগণের মধ্যে বিতরণ করিতে হয় । বিগত দুর্ভিক্ষের সময় ইহাদিগের যে অসাধারণ তাগস্বীকার দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাদিগকে জগতের সর্বোন্নত জীব বালিতে ইচ্ছা করে ! প্রতিবেশী ক্ষুধার মরিতেছে দেখিয়া নিজের বাহা কিছু সঞ্চিত আছে বাহির করিয়া দিযাছে, অথচ জানিত যে—তাহাকেও অনতিবিলম্বে সেই অভাব ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে । ইহাদিগের সেই অলৌকিক উদারতাতেই উক্ত ভীষণ অন্নকষ্ট হইতে নিঃসংশয় অনেকে রক্ষা পাইয়াছিল । হায়, আর্থনীতিবেত্তাদিগের ব্যংশধর

হইয়াও এই ব্যবহার আজ আমাদের চক্ষে নূতন বোধ হইতেছে ! আর একটি কথা পূর্বেই বলা উচিত ছিল, ইহাদের ভিতর পারস্পরিক প্রীতি এত অধিক যে, শিকারলব্ধ পশুর মাংস অকুণ্ঠিত চিত্তে “লুটে” অর্থাৎ আদমবাসী প্রত্যেক পরিবারে বিভাগ করিয়া দেয় । কিন্তু স্বর্ণহেই তাহাদের একতা কম, একানবর্তী পরিবার সংখ্যা সমগ্র সমাজে বড় অধিক নহে । বিবাহ হইয়া গেলে, ভাই ভাই দুয়ের কথা, পিতা-পুত্রও ঠাই ঠাই হইয়া যায় ; তবে কোন বিরোধ থাকে না ।

সরলতা একতা বন্ধনের শ্রেষ্ঠতম উপকরণ । সরল না হইলে মন উদার হয় না, সুতরাং অপর প্রাণের সহিত মিলিবার শক্তিই বা কোথা হইতে আসিবে ।

ফলতঃ বলিতে কি, ইহাদের হৃদয়-কপাট সরলতার  
সরলতা ।

বাতাসে উন্মুক্ত নহে, সংসারে তাহাদের ভাগ্যে সুখভোগ প্রায়ই ঘটনা উঠেনা ! সরলের “দুঃখিত যে মন, দুঃখের কথা কথা কহে সে অপরে ;” কিন্তু কপটাচারী ব্যক্তি তাহা হৃদয়ভাষ্যের সুগুণ রাখিতে গিয়া জীবন ভাষ্যক্রান্ত করিয়া ফেলে ! তাহারা কি নিজ কি অপর—কাহারও কাছে শান্তিসুখ অবেষণ করিয়া পার না ! শিকার অভাব বলিয়া কিনা জানি না, কেবল চাকমাগণ নহে, পার্বত্যজাতিমাত্রেরই সরলতা অসাধারণ ! কাপ্তেন লুইনও বলিয়াছেন \*, “তাহারা সরল, সৎ এবং প্রফুল্লচিত্ত ।”

\* The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein—P. 115

পরন্তু স্থানীয় প্রাচীন অফিসারদিগেরও মুখে শুনিতে পাই,—পূর্বে ইহারা গুরুতর অপরাধ করিয়া আসিয়াও তাঁহাদের নিকট সমুদয় খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ চাহিত ; হরত তাঁহারাি সেই ঘটনা প্রমাণের নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন । কোন মহাত্মা তৎগোপনের মন্ত্র শিক্ষা দিলেও বেচারী জেরার কুটিল চক্রে পড়িয়া খাটি কথা আর চাপা দিতে পারিত না । অধুনা শিক্ষা ও বিজাতীয় সংসর্গের ফলে প্রকৃতির এই সরল শিশুদিগের হৃদয়েও কিঞ্চিৎ কলুষভাব প্রবেশ করিয়াছে । তাই বলিষ্ঠ ইচ্ছা করে, হে শিক্ষা ও সভ্যতা—তোমাদের অহুগ্রহ যদি ইহাই হয়, তবে দূর হইতে প্রলিপাত করি ।

অনিল যেমন অনলের অহুগামী, বিশ্বাস ভেমন সরলতার অহুসরণ করিয়া থাকে । লোকে এসংসারে যাহাতে বিশ্বাস, সেই মাত্রা বিশ্বাসেরই প্রকার ভেদ

মাঝ । অতএব সহজেই অহুভব করিতে পারা যায়,  
বিশ্বাস ।

জগতের বন্ধ হইতে বিশ্বাস বিলুপ্ত হইলে কি ভয়ানক  
বিপ্লব ঘটিল ! সংসারে বিশ্বাসঘাতকতার পাণ-কোলাহল অবিরত শুনিতে পাওয়া

যায় সত্য, কিন্তু সুখ-দুঃখের তুলনার তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিংকর । অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অতীত বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ চাক্ষুশ্যদিগকে প্রায়ই বিনা দলিলে জানা জিনিসের অল্প টাকা দান দিয়া থাকেন ; তাহা ছাড়া ইহাদের অভাব পূরণেও তাঁহারা সাহায্য করেন, কিন্তু বিশ্বস্ততার হানি অতি অল্পই ঘটে !

যাহা সৎ তাহাই সত্য । এই মূল সূত্রে আস্থা না থাকিলে কর্তব্যজ্ঞান আসি-  
বার ভরসা নাই ;—সুভার্য্য সংসারকার্য্য পরিচালনের আর উপায় কোথায় ?  
আমরা মূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, অজ্ঞতা সত্যের মর্যাদা ধ্বংস করিতে  
আনে, সভ্যতা-দৃষ্ট বিজ্ঞতা সেইমতে তত মনোযোগী  
সত্য পরায়ণতা ।

নহে । এ কারণে মনে হয়, “বুঝিবা অজ্ঞতা ছিল  
ভাল ।” সরলতারূপ ভিত্তির উপর সত্যের আসন অবস্থিত । ভিত্তি শূন্যগর্ভ  
হইলে আসন কখনই স্থির থাকিতে পারে না । পূর্বেই বলিয়াছি, চাক্ষুশ্যদিগের  
জাতীয় জীবনে সরলতার বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইতেছে । যতদিন তাহারা যোর  
অজ্ঞানান্ধকারে ছিল, পাপ মিথ্যা তখন স্পর্শ করিতেও পারে নাই ; কিন্তু ক্রমে  
আধুনিক সভ্যতা বুদ্ধির সহিত যখন দেখিল যে, বিদেশীয়গণ নানা ছলচাতুরীতে  
তাহাদিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেছে, তখন—সত্য বলিতে কি,—তাহারা  
আত্মরক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সুশাগিত অস্ত্র শস্ত গ্রহণ করিল ।  
এক্ষণে অনেকেই তাহাতে লীলাবস্ত—সুযোগ পাইলেই প্ররোগে ইতস্ততঃ করে না ।  
হায়, “অভাবেই স্বভাব নষ্ট করে !”

দয়া ও দানে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । প্রথমে দয়া পরে দান—প্রথমে কর্তব্যজ্ঞান,  
পরে কার্য্য । দয়ালু হইয়াও দাতা না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের একটা  
দান ।

মধ্যেই কর্তব্যজ্ঞান নিহিত মনে করেন, তাঁহাদিগকে  
উৎকৃষ্ট বিচারক বলিতে পারি না । এই পার্শ্বতাদিগের ভিতরে কর্তব্যজ্ঞানের  
যে উজ্জল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উন্নত জাতিবিশেষেও তাহার অভ্যন্তর মাত্র  
প্রতিপালিত হয় । ইহারা আবশ্যিক বুলিলে আধ্যাত্মিকতার “মন্ত্র” উপদেশকেও  
অতিক্রম করে ! এমনও দেখা গিয়াছে, প্রার্থীর অভাব হইতে দাতার অন্তর  
অনেক অধিক, তথাচ তিনি প্রার্থনা পূরণে যত্ববান । এতদ্বির ভিক্ষু ও ভ্রমণদিগের  
সেবা, আত্মীয় বা সম্মানান্বিত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দান, উৎসর্গাদি প্রায়ই  
আছে, এবং রোগ প্রতিকার এবং তাদৃশ বিপদ-নিবারণ প্রভৃতির নিমিত্ত দানধর্ম্ম  
অবশ্য করণীয় । চট্টগ্রামের অনেক আচার্য্য, বৈরাগী এবং নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

আসিয়া ইহাধিগ-হইতে ( নানা বুদ্ধিকি খেলাইয়া ) কত দান-দক্ষিণা আদায় করে ; কিন্তু ইহারা তথাপি তাহাদের প্রতি সাতিশর শ্রদ্ধাবান !

অতিথিসংস্কার ভারতের একটি চিরন্তন ব্যবস্থা ! কপর্দক মাত্র না লইয়াও দেশ-পর্যটনের আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব ছিল । বর্তমানে আমরা সেই “সর্বদেবময়োহতিথি”র সেবা ভেমন গুরুতর আতিথেয়তা ।

কর্তব্য বলিয়া মনে করি না, অথবা সভ্যতার ভাষায় বলিতে গেলে—আতিথেয়তা মুষ্টিভিক্ষার ত্রায় বর্জনীয় । সমাজকে উন্নত করিতে হইলে সর্বত্রই এ ছইকে নির্বাসিত করা প্রয়োজন, ইহাই আমাদের বর্তমান ধারণা ! বস্তুতঃ অধুনা অতিথির প্রতি সমাজের ঘৃণা-দৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে । এই নিমিত্ত নিত্য কষ্ট ও অসুবিধায় না পড়িলে; কেহই আতিথ্য-গ্রাহী হয় না । পৌরগিক যুগের শিথিলত্ব, দাতাকর্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের অতিথিসংস্কারের বিশ্বমোদীপক চিত্র সভ্যতার আলোকে মূল্যশূন্য জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু এই পার্কতাজাতির আতিথেয়তার সহিত তুলনা করিলে, সেই সন্দেহ দূরীভূত হয় । এখনও একদৃষ্টান্ত বিবল নহে যে, হয়ত কোন গৃহস্থ ২৪ দিন ধরিয়া অনাভাবে প্রায় সপরিবারে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে, এহেন সময়ে অতিথি উপস্থিত । কিন্তু অতিথিকে উখন তাহাদের এই জীবন দ্রবস্থার সংবাদ কিছুমাত্র বুঝিতে না দিয়া গৃহপতি গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যে কোনরূপে অতিথি-সংস্কারের উপকরণসমূহ বধাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছে ! আর যাহাদের অবস্থা সচ্ছল, তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, অতিথিকে আতিথ্যজনিত কোন মনোবেদনা অনুভব করিতে হয় না । কেবল পুরুষেরা নহে, তাহাদের সহধর্মিণীরাও একত্র সর্বশেষ তৎপর থাকে । তাই কবি বলিয়াছেন,—

“অতিথি সেবার রত, সতীলক্ষ্মী শ্রমণী,

বনপ্রম আলো করে—যেন শত শকুন্তলা ।”

হুঃখ এবং লজ্জার বিষয়, কোন কোন বাঙ্গালী আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়া অল্প বিবাসঘাতকতার অভিনয় করিয়াছে । তৎকৃত অনেক সাধারণ বাঙ্গালী অতিথিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি সেবার পরায়ুখ হয় না । পক্ষান্তরে ষাওয়ার সময় যে কেহ, এমন কি সম্মিহিত প্রতিবেশীও গৃহে উপস্থিত হইলে না খাইয়া ফিরিতে দেয় না ।

বাহীনতা ও আত্মনির্ভরতা দ্বারা আতিথ্যবোধের ভেদ ও শক্তি গঠিত হয় ।



যে জাতি বত অধিক পরিমাণে স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে, তাহাদের  
কমতাও তত অধিক। আবহাওয়া—তেজ ও শক্তি  
তেজ ও শক্তি।

গঠনে অতি অল্পমাত্র সহায়তা করে। চাক্‌মাগণ  
স্বাধীনতা হারাইয়াছে অধিক দিনের কথা নহে; আর তাহাদের আত্মনির্ভরতার  
পরিচয়, পূর্বপরিচ্ছেদেও কিয়ৎপরিমাণে দেখাইয়া আসিয়াছি। ইতিপূর্বে নানা  
অনুবিধা ভোগ করিয়াও তাহারা পরযুগের দিকে তাকাইত না। কিন্তু অধুনা  
ক্রমে বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রলোভনে আত্মশক্তি হারাইতেছে। এখন বাহা  
কিছু তেজ অবশিষ্ট, তাহার প্রকৃত নাম আত্মাভিমান, তেজের একটি ক্ষীণ প্রকৃতি-  
বিশেষ। তেজ মূহ হইলে তাহা উজ্জ্বল দেখাইবার যে চেষ্টা,—তাহাই আত্ম-  
ভিমান, ইহাই তাহাদের বর্তমানে অবশেষ! কিন্তু তেজ কমিলেও তাহাদিগের  
শারীরিক যে শক্তি, তাহা কমে নাই। সভ্যতার ‘অগ্নিমান্দ্য’ না জন্মিলে  
মানবের দৈহিক বলের কদাচিৎ ব্যত্যয় ঘটে। বিশেষতঃ সংসার-সংগ্রামের  
চালনায় তাহাদের শক্তি পরিপুষ্ট হইতে পারে। চাক্‌মাদের অনেককে দেখিলে  
মনে হয়, বল যেন শরীরে আর ধরিতেছে না। মাংসপেশীগুলি স্থূল ও স্তম্ভ,  
তন্মধ্যে শোণিত সঞ্চালন যেন বাহির হইতেই স্তম্ভ পরিদৃষ্ট হইতেছে।  
পরন্তু চেহারা দেখিয়া ইহাদের বয়স নির্ণয় করা সহজ নহে, তাহাতে বিশেষ  
বহুদর্শিতা আবশ্যক হয়। কোন কোন ৪০।৪৫ বৎসর বয়সের প্রৌঢ়কেও  
পূর্ণ যুবকের মত দেখায়। এমন কি, কাহারও ৬০।৬৫ বৎসরেও যুবার লক্ষণ  
প্রকাশ পায় না। আশ্চর্যের বিষয়, এদেশে বাঙ্গালীদের চুল শিত্রই পাকিয়া  
যায়, কিন্তু পাহাড়ীদের মধ্যে পলিতকেশ বিরল।

তেজ ও সংযম প্রায় বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও তেজ সংযমকে স্তম্ভ করে।  
কিন্তু কেন জানি না, চাক্‌মাদিগের চরিত্রে সংযমের একান্ত অভাব। অতি সহজে  
সংযম।

বৈখ্যচ্যুতি ঘটে। তাহা জীবৎ ক্র-কৃক্কন এবং যুখে  
(ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া জোরে বায়ুনির্গমনে) এক  
অব্যক্ত শব্দদ্বারা সহজে প্রকটিত হয়। স্থূলছাত্রদের মধ্যেও দেখিয়াছি,  
চাক্‌মাবালকের অনেকে হরত অঙ্ক করিতেছে, কিন্তু প্রথমচেষ্টা বিকল হইতেই  
“ন পারিম্” বলিয়া ফেলিয়া রাখিল। শুনিয়াছি, শিক্ষার প্রথম বিস্তার কালে  
শিক্ষক একটু চোক রাঙাইলেই তাহারা স্থূল ছাড়িয়া পলায়ন করিত। পল্লিগ্রামে  
এরূপ ঘটনা অতাপি প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে। তত্ত্বের সাধারণ লোকে আসিয়া  
ফাজের সময় ইতস্ততঃ উকিছুঁকি দেয়। যদি জিজ্ঞাসা করি,—“কি চাও?”

অমনি বিরক্তি সহকারে উত্তর করে, “কি চাইত ?” অথচ প্রকারান্তরে অহুৎসাহন করিলে জানিতে পারা যায়, তাহার কিছু জানিবার বা বলিবার আছে । এইরূপে আরও নানাভাবে তাহাদিগের দৈর্ঘ্যবিচ্যুতির উদাহরণ পাওয়া যায় । নূতন আগন্তকের পক্ষে এই দৃষ্ট প্রথম প্রথম অশেষ বিরক্তির কারণ হয়, কিন্তু ক্রমে তাহাদের জাতীয়তাব হৃদয়ঙ্গম করিলে তখন বিরক্তি যাইয়া অহুৎসাহ আসে । আর যে বৌদ্ধধর্ম তাহাদিগের বর্তমান অবলম্বন, তাহার শাসন মানিয়া চলে—একরূপ লোক সমাজে অতি বিবল । পক্ষশীলাচারী লোকও একান্ত দুর্লভ । বলিতে কি, তাহারা ইঙ্গির দমনে সাতিশয় দুর্বল ।

বোধহয় সংযমেই অতাবে চাকুমাদিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা একেবারেই নাই । নতুবা ইহারা ঘেরুপ পরিশ্রমী এবং উপার্জনক্ষম, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারবাদ্রা নির্বাহ করিয়া বাইতে পারে । কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা ইহাদিগকে অতি সামান্যই

মিতব্যয়িতা ।

আবাক্ত করে,—তাহারা উপস্থিত সুখ-সন্তোষে নিত্য ব্যগ্র হয় । ভাদ্র আশ্বিন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠের কল পাকিতে আরম্ভ করে ; তখনকার সামান্য আয়ে কোন রকমে দিন কাটায়ে । পরে কার্তিক-অগ্রহায়ণে ধান কাপাস পাওয়া গেলে, তাহাদের “ফুর্ডি বা দেথে কে ? নবান্ন-উৎসবে টাকা যেন কড়ির সমানও মূল্যবান নয় ! ইহাছাড়া দিবারাত্রি মদের ভাটি, এবং প্রায়শ শিষ্টকাদি চলিয়া থাকে । এইরূপে আমোদ প্রমোদে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত যায় । তখন “মহামুনি” মেলার খরচ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় । সেখানে যে সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, বেহালা, কন্সার্ট প্রভৃতি সখের সামগ্রী ক্রয় করে, সে সমুদয় আর বাড়ী পর্য্যন্ত আসিতে পার না । নাচের হজুগে সমস্ত সেখানেই বিনষ্ট হইয়া যায় । অনন্তর ক্রমে রিক্তহস্ত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় । প্রথম প্রথম প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজন হইতে ধার, সাহায্য এবং ব্যবসায়িগণের দান প্রভৃতি দ্বারা অতিকষ্টে চালাইয়া থাকে । পরে যখন চারিদিকে সাহায্যের দ্বার বন্ধ হয়, তখন ফলমূল শাকাদি ভক্ষণে বা অর্দ্ধাংশে—অন্যমনে দিনপাত করিতে বাধ্য হয় । এতাদৃশ কষ্টে পড়িতে হইবে জানিয়াও সৌভাগ্যের সময় তাহাদের ইহা স্বরণ থাকে না (১) । হায় ! না জানি ভগবান কবে তাহাদিগের এই মোহ দূর করিবেন ।

(১) ‘আবাক্ত গমনের দ্বারা এমন ও হু’একজনের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায় যে, সৌভাগ্য-ক্রমে কোম্বারে আশাভীত কল লাভ করা গেলে—তাহাদের দাখা ঘুরিয়া যায় । কারণ প্রতি

বিলাসিতা বর্তমান সভ্যতার এক প্রধান নিদর্শন । তাই আমরা সুসভ্য নামে পরিচিত হইবার আশায় তুচ্ছ সুকাদানার সহিত মুখের অন্নগ্রাস বিনিময় করি । সঙ্গে সঙ্গে এই সরলপ্রাণ চাক্ষুশগণও বিলাসিতা ।

অনল-লুক্ক পতঙ্গপ্রায় এই বাহ্য চাক্চিক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । কাপ্তেন লুইন “এ ফ্রাইন্স দি হইল” নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন \* —“ইউরোপীয় সভ্যতার কলুষিত

\* Page—379.

ভাব প্রবিষ্ট হইতে না দিয়া ইহাদিগকে উন্নত করা আমার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল । কিন্তু ইহা বড়ই কঠিন সমস্যা ।” অতঃত তিনি তিনি “পার্কল্যা চট্টগ্রাম এবং তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ” নামক পুস্তকের পরিণিষ্ট ভাগে এসম্বন্ধে অধিকতর প্রাণ খুলিয়া লিখিয়াছেন †,

† Page—115-16

“শারীরিক আবশ্যকীয় অভাবের উপরে কিছুই প্রতি

তাহাদের সহায়ভূতি নাই । × × × × আমরা দেখি পৃথিবীর অপর সর্বোৎকৃষ্ট ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবর্তন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অপকার সমূহ আসিয়াছে ; তথাপি জগতের সর্বত্র বাবতীয় অনুরক্ত জাতির উপরে আমরা প্রথমে ( বাতায়ত বা বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা ) সম্বন্ধ স্থাপিত করি, এবং পরিশেষে সভ্যতারূপ বিরাট উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ব্যবহারাদি চালাই ।

× × কিন্তু এই সভ্যতা কি বা দিয়া থাকে ? মিঃ লেইং বলেন, × × সভ্য বটে, বর্তমানে পূর্বের ছায় অধিকাংশলোক উপবাসের পার্শ্বে রহিয়াছে, তবুও ইহা উন্নত স্বাচ্ছন্দ্যের অযোগ্য নহে । আমি কল্পনা করিতে পারি, পাহাড়ীরা বলিবে—‘হে শত্রু, তাদৃশী উন্নতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ।’ সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য ধনবৃদ্ধির ইচ্ছা, বাহা কেবল আবশ্যকানুরূপ নহে—জীবনের

বৎসরই তাহার অনটনে পড়িয়া মহাজন হইতে ধার করিয়া আসিয়াছে, এবারে তাহার প্রয়োজন হইতেছে না—এ কেমন কথা ? তখন তাহার সেই শ্রান্ত ধনরাশি বৎসরের প্রথমভাগেই ব্যেছে আন্দোলন-প্রমোদে নিঃশেষিত করে । অনন্তর অতীত প্রকার অনুসরণ করিয়া মহাজনদিগের শরণাপন্ন হয় । পরন্তু আমরা যতদূর দেখিয়াছি ঘরে চাউল থাকিলে, চৈত্র-পূর্ণাঙ্কও চলিবে না জানিয়াও—তিন চারিজনবিশিষ্ট পরিবারে ৩৪ সের চাউল স্তোক করিতেছে । তাহা হইতে কিছু তাহার ধার, অবশিষ্ট মোরগ, শূকরকে চালিয়া দিতেছে ; ইহা ছাড়া মদের ভাড়িত লাগাই আছে । এবং ইহাও শুনিয়াছি যে, বিসং ভীষণ দুর্ভিক্ষকালে যখন সমস্ত গভর্ণমেন্ট চাউল ধার দিতে ছিলেন, অধিব্যাকারী অনেক তাহা ছদ্মশব্দ উপবাসের পর পাইয়াও হানীর দোকানে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করতঃ মদ কিনিয়া পাইয়াছে ।

সুখান্ন এবং বিলাসিতাও যেন চলে । X X আমাদের পাহাড়ীদের স্তার সরলতাচারীদিগের মধ্যে তেমন কোন অতিপ্রায় নাই ; তাহাদের স্থিতিহীন জীবন অত্যধিক সম্পত্তি সঞ্চয় হইতে বারণ করে এবং তাহারা সম্পূর্ণ জাতীয় সমতা ভোগ করে । X X এই সকল সরল জাতির মধ্যে উক্ত সভ্যতা প্রবেশ করিলে তাহাদিগের কোন উন্নতি হইবে না, বরং ধ্বংস করিবে ।” বস্তুতঃ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং বাঙ্গালী-সংসর্গই ইহাদিগের “মোটো ভাত ও মোটা কাপড়ের” ভিত্তির বিলাসিতা আনিয়াছে । অবিবাহিতা বালিকাগণ একমাত্র “পুতি”র লহরী ভিন্ন বিশেষ কোন বিলাসোপকরণ সামগ্রী পায় না । কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর সোহাগের সঙ্গে সঙ্গে রঙ-বেরঙের সাড়ী, বড়ি, নানাবিধ গহনা, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি নানা সখের সামগ্রীও লাভ করে । শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষাত বিলাতফেরত বাবু—চলা ফিরাও অনেকটা ইঙ্গবঙ্গদলসম্মত । ইহা ছাড়া, সাধারণ চাক্‌মাদিগের মধ্যেও এতদূর বিলাস-ইচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে যে, কেহ কেহ দোকানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ‘রাজা বে কাপড় পরেন,’ তাহা অনুসন্ধান করে । দোকানদারেরাও এই সুযোগে কলনাতীত মূল্য আদায় করিয়া লয় ( ১ ) ।

অনেকে বিলাসিতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে না । তাহারা ভুলিয়া যায় যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে অপকার ঘটতে পারে, কিন্তু বিলাসিতা না হইলে কোন ক্ষতি নাই ।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ।

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা রাখিতে বিশেষ ব্যয়েরও আবশ্যক হয় না, অথচ স্বথে স্বচ্ছন্দে থাকা যায় । ইহারা এই দিকে কিঞ্চিৎ উদাসীন বটে, কিন্তু আহাৰ্য্য এবং পানীয়ের প্রতি দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, বোধ হয় এইরূপ পৃথিবীর অতি অল্প জাতিরই আছে । প্রতি সপ্তাহে এক বা ততোধিক বার নেকড়া-জলে মকের উপস্থিতল পরিষ্কার করিয়া থাকে । কিন্তু তিনটা বিষয়ে ইহাদের অনেকে এখনও সভ্যজাতি হইতে দূরে

( ১ ) এহলে আর একটি কথা বলিলে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হয় । বস্ত্রাদি কোন জিনিষ দোকানে অবিক্রীত হইয়া পড়িয়া যাইলে, ব্যবসায়ীরা তাহা নিজে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে । অনন্তর যখন সৌখীন চাক্‌মা যুবকগণ জিনিষ ক্রয় করিতে আসে, তাহারা “মহাজনের” ব্যবহৃত ব্রহ্মই উৎকৃষ্টতর মনে করিয়া তাহা লইতে অতিলাবী হয় । “মহাজনের” প্রথমে তাদৃশ অনুসন্ধানে জব্বীকৃত হইয়া তাহাদের ব্যগ্রতা বর্ধিত করে, অবশেষে অসম্ভব মূল্য আদায় করিয়া তাহা হাড়িয়া থাকে ।

রহিয়াছে। প্রথমতঃ স্নানের প্রয়োজনীয়তা যে কি, বুঝিতে পারে না; শরীর ঠাণ্ডা থাকিলে আর স্নানের আবশ্যকতা অনুভব করে না। এই নিমিত্ত শীতকালে স্নান কদাচিৎ ঘটে। গ্রীষ্মকালে শরীরের স্নানি দূর করিতে কখন কখন স্নান দুইবারও হয়, কিন্তু ডুব দিয়া নহে। বিশেষতঃ জী কি পুরুষ বাহাদেব মাথায় চুল আছে, ডুব দিয়া স্নান তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সপ্তাহ বা ততোধিক অন্তর স্নান বা লতা-বিশেষের নির্বাণ দ্বারা চুল ধোওয়াই প্রশস্ত বিধি। স্নানান্তে বস্ত্রপরিবর্তন প্রারম্ভ ঘটে না। স্বেদসিক্ত পরিধেয় যখন দুর্গন্ধে ব্যবহারের অযোগ্য হয়, তখন একবার কাচিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের মঞ্চোপরিভাগ স্থপরিষ্কৃত ও মনোহর। বাহির হইতে কেহ আসিলে প্রথমে “ইজরে” উঠিয়াই পা দুইবার ব্যবস্থা আছে, এই নিমিত্ত “সাঁকো”র ধারে এক কলসী জল এবং একটি জলপাত্র রাখা হয়। পরন্তু মঞ্চের নিম্নতল নরক বিশেষ। উপরিভাগ হইতে নানা ময়লা পরিত্যক্ত হইয়া আস্তাকুঁড় হইতেও জঘন্ত করিয়া তুলে। রাত্রিতে বালক এবং অসমর্থেরা মঞ্চোপরি হইতেই মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করে। অবশ্য বাড়ীতে শূকর থাকিতে তাহা অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। কিন্তু শূকর ও মোরগেরা নিজে বাহা করে, তাহা নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। তৃতীয়তঃ ইহাদের বাহ্যের পর শৌচব্যবস্থা অত্রবিধ। মল ত্যাগের পর ‘চ্যাচাফী’ কিবা ‘বাখারী’ দ্বারা মুছিয়া ফেলে; চলিত কথায় ইহার নাম—“থক্ করন।” উত্তম পুরুষশৃঙ্গে জলাভাব বশতঃই ঈদৃশ বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। অবশ্য চাক্‌মাভিগের উচ্চশ্রেণীতে এই সকল কদর্য ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই। মধ্যম শ্রেণীও প্রায় সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অধমশ্রেণীরই গাটি চিত্র। বাহা হউক, ইহাদের পরিচ্ছন্নতার আর একটি সুন্দর বর্ণনা এস্থলে দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বর্ষাকালে পথ ঘাট কদমময় হইলে, কেহ কেহ বংশপাছকা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ বাজীকরদিগের নিকট দেখা যায়। ৬৮ হাত পরিমিত দুইটা বাশে সন্ধান উচ্চতার পদস্থাপনের উপযোগী সুবিধা করিয়া লয়। তদুপরি চড়িয়া ইচ্ছামত বাতাসাঘাত করিয়া থাকে।

[ ২ ]

বর্তমানে জীবাধীনতা অনেকেরই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। প্রায় সকলেই

জী-বাধীনতা। নূনাবিক পরিমাণে তাহার উপযোগিতা স্বীকার করিতেছেন। এই সংস্কারকেরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শ—হুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সময়ে সময়ে উভয় দলে ভীষণ বাধপ্রতিবাদ

লাগিয়া যায়, কিন্তু এবাবৎ তাহার “ছাইভাঙ্গ” কিছুই নীমাংসা হয় নাই। তবে এইমাত্র বুঝা যায়, ইহারা যে স্বাধীনতা লইয়া চিন্তিত, তাহা পর্দাভঙ্গ মাত্র ! পুরুষেরা স্বচ্ছন্দমনে সর্বত্র বেড়ায়, অর্দ্ধাঙ্গের অধিকারিণী হইয়া স্ত্রীলোকেরা কেন পারিবে না,—ইহাই সর্বোচ্চ ভাবনার বিষয় ! ইউরোপ এই নিমিত্ত বড়ই উদ্বার ; আর রক্ষণশীল মুসলমানদিগের সংসর্গে পড়িয়া হিন্দুগণ সেই মহত্ব হারাইয়াছে (১)। যাহা হউক, চাকমাগণ যেরূপ স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাহাতে কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব আছে। তাহা আচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। কবির ভাষায়—

“স্বাধীন সর্বত্র গতি, অথচ সংবর্ত”।

মাধার “হেটের” বদলে পাগড়ি (খবং) প্রচলিত হইয়াছে, তা’ছাড়া কোথাও বাইতে হইলে, সেই ‘খবং’ এরই উপর আর একখানি কাপড়ে মস্তক মাজ ঢাকিয়া অবশুষ্ঠনের মর্যাদা রক্ষা করে। পরন্তু ইহাদের গৃহকত্রীরা অত্যর্থনাশালার গোরব বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পায় না বটে, কিন্তু স্বজাতির নিকট বাহির হইতে কোন আপত্তি নাই। নিতান্ত আবশ্যক না ঘটিলে পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত ঘটে না সত্য, অথচ অনুচ্চ ও অনুচ্চর আলাপে, মিলনে বা ভ্রমণে কোন বাধা নাই। এক কথায়—স্বজাতীয় সকলেই যেন এক পরিবারের ছায়, বিজাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক সম্বন্ধ। পাহাড়ীদের কোন কোন জাতীয় স্ত্রীলোকেরা বাজারেও যায়, কিন্তু ইহাদের সচরাচর তাহা নাই। তবে “মহামুনি” প্রভৃতি মেলাতে স্ত্রীলোকেরাও বাইতে পারে। এতদ্বির সাধারণ পরিবারে আরও অনেক সময়ে মহিলাগণকে গৃহের বাহিরে কাজ করিতে হয় ; রাজপথে যাতায়াতও বিষয় নহে। একন কি, একাকিনী নৌকা চালাইয়া বাইতেও দেখা যায়।

\*১) কাশ্মির লুইন এজন্স আমাদিগকে ঠাট্টা করিয়া ইহাদের কথায় লিখিয়াছেন,—

“The position of the women among them is preferable, in my opinion, to that occupied by the females of Hindoostan. Here is no mock modesty, but nature, pure and simple; the custom of concealing their women and hiding their faces, conveying as it does how much mistrust of man to man exists only among the more effeminate races of Asia. Here, if a woman is condemned for her physical weakness, and forced, moreover, to bear the heaviest share of the toil for bread, she is still honoured as a wife and mother, trusted in her in-comings and out-goings, and her words of advice listened to with respect.” (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein—p. 117.)

অধুনা বলীয় পরিবারের অধুকের সজ্জাত মহলে অবরোধ প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণে রাজ-অমুমোদন ব্যতিরেকে আব্রুক্ষার সাধ পূর্ণ করিতে পারে না। আশা করি সরলা অবলাগণকে অন্তঃপুর-কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দিতে রাজা বাহাদুর বিশেষরূপ বিবেচনা করিবেন।

[ ৩ ]

জী, চাক্‌মালদিগের সর্বপ্রধান সহকারিণী। তাহাদের সম্বন্ধ কেবল শব্দা

দাম্পত্য প্রেম।

লইয়া নহে, স্বামীর সংসার পালনে তাহার প্রাণের মায়ী তুচ্ছ করিয়া অহনিশ খাটিয়া থাকে(১)। এক মাত্র বিগুহ দাম্পত্যপ্রেমই এই কৰ্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের অনাবিল শান্তি নিব্বার! পরিণয় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যুবক-যুবতীর অতি সঙ্কটেই ক্রমশঃ বিনিময় হইয়া যায়। বিবাহের বৎসর পরস্পরের পাশছাড়া হওয়াও সামাজিক বিধি-নিষিদ্ধ। পক্ষীদাম্পতির ন্যায় তাহার বধাসম্ভব সতত একত্র থাকিতে প্রয়াস পায়। কবির নবীনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন :—

“পতি পত্নী একচিত্ত, একই জীবন; উভয় জীবন-শ্রোত বিবাহ অবধি,

গঙ্গা বনুনার মত, এক অঙ্গে পরিণত,

একই বিমল শ্রোতে বহে নিরবধি।” (জুমিরা জীবন—১৭শ শ্লোক।)

পরন্তু কবি স্বীয় বর্ণনার স্বরং সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, উপসংহারে সেই স্বর্গীয় সম্পদে আশ্রয়হারাভাবে গাইয়াছেন,—

“ইচ্ছা হয়, হয়! ওই জুমিয়ার সনে, বিনিময় করি এই বাঙ্গালী-জীবন;

ওঁরে ওই ধরাতলে, লয়ে প্রিয়া বন্ধস্থলে,

লভি স্বর্গ হৃৎ,—ওই জুমিরা জীবন।”

জুমিরা-জীবনের প্রেম-রাজ্যকল্পনার আজ কবির ভৌতিক দেহ ধরার অঙ্গে বিলুপ্ত বটে, কিন্তু তদীয় অমর আত্মা স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত!

(১) পরন্তু তাহাদিগের এই অসম্বিকৃত দেখিরা পান্ডিত্য সভ্যতাভিমাত্রী লুইন (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, P.—116.) লিখিয়াছেন, “In marriage with us a perfect world springs up at the word of tenderness, of fellowship, trust, and self devotion. With them it is a mere animal and convenient connection for procreating their species and getting their dinner cooked.” ইহা পড়িয়া মনে হয়, তিনি এই পার্শ্ব জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] ধর্ম ও [ ২ ] পরবনিয়মাদি ।

[ ১ ]

চাক্‌মাণিগের ধর্মজীবন এ যাবৎ নিরঙ্কুশ, সুতরাং বিশৃঙ্খল। সংজ্ঞা ধর্মের  
বস্তুর পরিচয় নির্দেশ করিতে হইলে, ইহাদের ধর্মবিচারে নানা সমস্যা আসিয়া  
পড়ে। বারইয়ারী পুজার গ্রামবাসীর অনেককেই  
ধর্মসমস্যা ।  
অন্যবস্তুর কর্তৃত্ব করিতে দেখা যায়, দূর হইতে  
কাহাকেই বা অধ্যক্ষ মনে করিব ? তাই অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহার মিশ্র-  
ধর্মাবলম্বী। বস্তুতঃ ধর্মবিপ্লবে ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত ! তাহারই আদু-  
যক্তি ফলে নানা শাখাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং মূলধর্মনিচয়েরও ন্যূনাধিক পরি-  
মাণে পরস্পরের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। তাই কার্যতঃ চাক্‌মাগণ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং  
মুসলমান ধর্মজন্মের অধিকারপীড়িত হইলেও, ইহার একতম প্রধানধর্মের  
অধীন।

রাজা ধর্মের সংরক্ষক। কোন কোন সমাজে তৎপরিচালনভারও রাজ-  
হস্তে থাকে। রাজ-প্রদর্শিত পথে সমাজের সকলকেই অনুসরণ করিতে হয়।

রাজার নেতৃত্ব ।  
বস্তুত ! রাজা—চাক্‌মা জাতির সর্বোচ্চ অধিনায়ক।

তিনি যখন যেই ধর্ম নীতি অবলম্বন করেন, সাধারণে  
বিভিন্ন-বিভিন্ন ব্যক্তিরকে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। “চাটিগাঁ ছাড়া”তেই  
লেখিয়াছেন, ‘যুবরাজ বিজয়গিরি পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসনাধি-  
রোহণ সংবাদ পাইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিরত হন এবং সৈন্তগণ সহ বিজিত  
ব্রহ্মদেশ হইতে পত্নী গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তাহারে  
ধর্ম ও আচারপদ্ধতিগুলিও পরিগৃহীত হইয়া যায়।’ সুতরাং ব্রহ্মদেশবাস হইতেই  
ইহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মিঃ বুচানন (Mr. Buchanan)ও



বার্ষিকদিগের ধর্ম এবং ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাদিগের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)। কিন্তু ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে ইহারা কোন্ ধর্মের আশ্রয়ে ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃস্থ। মাননীয় শ্রীযুক্ত রিজলী মহোদয় ইহাদিগের “সংবাসা” (অর্থাৎ বৃক্ষ শ্রোতাদির) পূজা দেখিয়া অনুমান করেন যে (২), বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে ইহারা জড়োপাসক ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার এযদিও সিদ্ধান্তের উপর আমরা তত আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কেননা প্রায় সমুদয় প্রাচীন ধর্মেরই আদিম বিবরণে তাদৃশী জড়োপাসনার গন্ধ পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, “চাটিগাঁ ছাড়া”র ইহাদিগের আদিম ধর্ম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ অভাস পাওয়া যায়। সেনাপতি রাধামোহন চম্পকনগরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা সমরগিরি সমীপে বিজিত রাজ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

“(ছাজের গাভুরে বকাদি)

ছিহুগা মানুমান অজাদি।”

সেখানকার লোকগুলি বিজাতি বা নীচজাতি।

“(চুঙা কাদিহাই পানিখোই)

ছিহুগা মানজানুন পৈদা নেই।”

সেখানকার লোকের নিকট পৈতা অর্থাৎ উপবীত নাই।

“(দুধে খাদি ছিজেনং)

পৈদা বারাং গরিহাই আমি ছিহু বেরেনং।”

আমরা সেখানে পৈতা কাঁধে লইয়া বেড়াইতাম।

এতদ্বারা আমরা চাক্‌মাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে ব্রহ্মবাসীদের হইতে বর্ণোৎকৃষ্ট এবং উপবীতধারী বলিয়া জানিতে পারি। বর্তমানে প্রবল বৌদ্ধ-ধিকারেও ইহারা ধর্মকর্মের অমুষ্ঠান কালে যজ্ঞসূত্রে অমুকরণে উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আরও একটি কথা অস্বাভাবিক প্রচলিত আছে, “জাদি পূজার যি তিবি।” অর্থ—“ধর্মকামে” মৃত দিবে অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে।

কবিরস।

সুতরাং তাহাদিগের কবিরসের দাবি কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বীকৃতব্যও বটে। আবার কতিপয় স্বার্থাঙ্ক

বর্ণনাকারের অমুগ্রহে ভারতের নানাহানে সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় কবিরসের সৃষ্টি

(১) Asiatic Researches Vol. vi. P. 229.

(২) Tribes and castes of Bengal, P.—172.

হইরাছে। তাহাদের কল্পনার পশ্চিম ভারতে যেইরূপ স্বর্ঘ্যবংশের বাহুল্য, পূর্বভারতে—বঙ্গদেশ ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহে সেইরূপ চন্দ্রবংশের ছড়াছড়ি হইরাছে। বাক্যলার সেনবংশ, উড়িষ্যার কেশরী বংশ, শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং ত্রিপুরার রাজবংশ ও চট্টগ্রামাধিপতি দামোদর প্রভৃতি সকলেই চন্দ্রবংশজ কত্রির বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। বর্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গে ত্রিপুরার “রাজমালা” লেখক স্পষ্টতই লিখিয়াছেন\*,—“মিতাই অর্থাৎ

\* ১৩শ পৃষ্ঠা।

মণিপুর রাজবংশ সাক্ষিগণিত বংশের পূর্বে হিন্দু-সমাজে প্রবেশলাভ করতঃ শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদিগের কুপায় অর্জুন-পুত্র বক্রবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পার্কত্য চট্টগ্রামের চাকমা মণ নরপতিগণ অল্পকাল মধ্যে চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কুপায় চন্দ্রবংশজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।”

বস্তুতঃ ত্রিপুরা এবং চাকমাদিগের কত্রিরত্বের দাবী তুল্যরূপ বিবেচিত হয়। তাহাদের বাসস্থান—নামতঃ চম্পকনগর এবং ত্রিপুরারাজ্য পরস্পর সন্নিবিষ্টবর্তী। উভয় সম্প্রদায়েরই চতুর্দশ দেবতা সম্পূর্ণিত হয়, এবং বিবাহাদি কতিপয় সামাজিক কার্যেও বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শত শত বৎসরের বিচ্ছেদেও তাহাদিগের এতাদৃশ সামঞ্জস্য প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আবার কেহ যেন চাকমা-দিগকে ত্রিপুরাজাতির শাখাবিশেষ বলিয়া সন্দেহ না করেন। পূর্বোক্ত “চাটিগা-ছাড়া”তে “ত্রিপুরাপাড়া”র স্বতন্ত্র বর্ণনা রহিয়াছে। ফলকথা, চাকমাগণও এক, মুলার প্রমুখ নরজাতি-ভাববিদ্ পণ্ডিতগণ নির্ণীত “লৌহিতিক” বা তিব্বতী ব্রহ্মা শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে। অতাপি হিমালয়ের সাহুদেশবাসী ব্রাত্য কত্রির বিরল নহে। এমন কি, সুদূর তিব্বত, চীনবাসীরাও আপনাদিগকে কত্রির বংশপ্রসূত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। বক্ষ্যমাণ চাকমাদিগের চন্দ্রবংশীয় কত্রিরত্বের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে গ্রাণোভিল সাহেবের মতামতবর্তনে ইহাদিগকে “লৌহিতিক কত্রির” অর্থাৎ ব্রাত্যকত্রিরবিশেষ ধরিয়া লওয়া যায়; তিব্বতের “মহাবানধর্ম”ই তাহাদের আদি ধর্ম হইবে।

ইহা একরূপ সর্ববাসীসম্মত যে, ব্রহ্মদেশে বাসনিবন্ধন ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রবেশলাভ এবং পরিপুষ্ট হইতে থাকে। পার্কত্য চট্টগ্রামে উপনিবেশ

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান।

সংস্থাপনের পরেও প্রায় বোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব অব্যাহতরূপে চলিতেছিল। অনন্তর

সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের হিন্দুসাধারণের সংমিশ্রণে পাওয়া যায়। তাহার বহু

বৎসর পরবর্তী রাজা শুকদেব রায়ের নামেও হিন্দু-গণ আছে। কিন্তু তখনও বোধ হয় হিন্দু দেবদেবীগণ চাকমাসমাজে আধিপত্য ক্রমে হিন্দুত্ব পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠে। “পাগলা রাজা”র ক্রুদ্ধ সাধনার সংবাদে হিন্দুধর্মেরই ছায়া স্থাপন করিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রাজা জব্বর খাঁ “শ্রীশ্রীজয়কালী জয় নারায়ণ” নাম মন্তকে ধারণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহারাজা ধরমবর খাঁর সময়ে হিন্দুধর্ম ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি হিন্দুধর্মের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। রাজ্যমাটি রাজত্বধনে জয়কালী সংস্থাপিত করেন। এবং পিতার অনুকরণে মোহর মধ্যে নামের উপরিভাগে “জয়কালী স্বর্গার” বোঁদাইয়া ছিলেন। দৈনিক কালীপূজার নিমিত্ত নিয়মিত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীগণেরও যথাবিধি পূজা এবং নিয়মিতরূপে বাবতীর হিন্দুপূর্ণ প্রতিপালিত হইত। ইত্যাদি বিস্তারিত রূপে তৃতীয় পরিচ্ছেদমাংশে বর্ণিত হইয়াছে। তদীয় মহীয়সী মহিষী-কালিন্দীরাণীর শাসনের প্রথম ভাগে হিন্দুধর্ম আরও পরিষ্কৃত হয়। তিনি বারমাসেই হিন্দুপূর্ণ রক্ষা করিয়া চলিতেন। নিয়মিত শিব ও বিষ্ণুপূজা এবং দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিবহরী ও অবগ্রহাদির যথাবিধি অর্চনা হইত। বিশেষতঃ কান্তনের অমাবস্যার রাণী মহোদয় স্বয়ং কালীপুর কালীমন্দিরে গিয়া পূজা প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতিরেকে হিন্দুতে তাঁহার নিত্য পূজাও ছিল, পূর্বে ইহাও বিবৃত করা হইয়াছে।

কিছুকাল পরে আরাকানের প্রসিদ্ধ ভিক্ষু সংঘরাজ হার্বাংএর গুণাবলি ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া রাজ্যলয়ে উপস্থিত হন। তাঁহার রাণী মহোদয়কে বৌদ্ধধর্মে প্ররোচিত করেন (১)। ক্রমে তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়া যায়; তিনি শুভদিনে যথাবিধি বীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর রাণী বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকল্পে সদচেষ্টান সন্মুখ

(১) কেহ কেহ বলেন, ইহাদের পূর্বে সিংহলে অধীতবিদ্ধ হরিঠাকুর নামধের জনৈক চটগ্রামবাসী ভিক্ষু রাণীকে বৌদ্ধধর্মে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। মি: রিজলীও এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“কিছুদিন পরে আরাকান হইতে একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু আসিয়া রাণীকে বৌদ্ধধর্মের সমর্থন এবং পৌত্তলিকতার বাধা দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।” (Tribes and castes of Bengal, p. 171) তবে ইহার কথাতে কেমন কেমন বোঝা যায়। “পৌত্তলিকতার বাধা দিতে” “ভিক্ষুর” কোন অনুরোধ ছিল কিনা, সন্দেহ আছে। কেবল বৌদ্ধধর্মও পৌত্তলিকতা বর্জিত নহে।

সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার এই প্রথম ও প্রধান কার্য্য রাজানগরের রাজত্বের পার্শ্বে পবিত্র “মহামুনি” মূর্তি প্রতিষ্ঠা। মন্দির বন্ধিত প্রস্তর কলকের অক্ষরে অক্ষরে রাণীর প্রগাঢ় বুদ্ধবিশ্বাস এবং অলৌকিক উদারতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বিধবা হইবার প্রায় ৩৮ বৎসর পরে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর তিন বৎসর মাত্র পূর্বে রাণী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রথম অনুষ্ঠান—এই মহামুনি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি একটি মহাদান করিয়াছিলেন। অনন্তর স্বীয় প্রজাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে তৎপর হইলেন। এই কারণে পালি হইতে অমিয় বুদ্ধ চরিত্র অনুদিত করা হইয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণের ইচ্ছা কিন্তু করালকাল তাঁহার এই পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া রাণীর বৌদ্ধধর্মে অনুরাগ জন্মে। জরাপীড়িত দুর্বল জীবতে কত আর ‘কর্ম’ আশা করা বাইতে পারে ?

বুদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই অবতার বিশেষ। সুতরাং তৎপ্রচারিত ধর্ম কখনই হিন্দুত্ব বর্জিত হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ “গীতার” যে কর্মের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন (১), বুদ্ধ অবতারে তাহাই পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে। কেবল গীতোক্ত ধর্মে ভগবান্ কর্ম হইতে পৃথক, বৌদ্ধধর্মে তিনি কর্মে বিলীন হইয়াছেন! হিন্দুর “তত্ত্বমসি” ভাব “সোহম” জ্ঞানে উন্নীত হইলে ‘ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধো’ পদটি “নির্কীর্ণ”

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার “কর্মযোগ” নামধের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে;—

“ন কর্মণামনারতানৈকর্ষ্যং পুরুষোহনুতে ।

ন চ সংস্তানাদেব সিদ্ধিং সমাধি গচ্ছতি ॥ ৪ ॥”

‘কর্মামুষ্ঠান না করিয়া কেহই নৈকর্ষ্য লাভ করিতে পারে না, এবং কেবলমাত্র সংস্তানসেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪ ॥’

“নিয়তং কুরু কর্ম যং কর্ম জ্যায়োহুকর্মণঃ ।

পরীত যাত্ৰাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥”

‘তুমি সর্বদা কর্ম কর। যেহেতু কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা ভাল। কর্মশূন্য হইলে তোমার পরীতযাত্রাও নির্কীর্ণ হইবে না ॥ ৮ ॥’

“তন্মাদিসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ৯ ॥”

‘অতএব তুমি সর্বদা কর্মসক্তি বিরহিত হইয়া অব্যক্তকর্তব্য কর্মামুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্মামুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥’

লাভ হয়! অতএব বৌদ্ধগণকে অহিন্দু বলা বা বিবেচনা করা কদাপি যুক্তিসঙ্গত নহে। সম্প্রতি জাপানের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ওকাকুরা নামক প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে এতদসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার কথায় বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের এক বিশেষ অঙ্গ। তবে ধর্ম মাত্রেরই অধিকারীভেদ আছে। ‘কর্ম্মে’ বদ্ধপরিকর হইবার পূর্বে লক্ষ্য ধরিয়া উপযুক্ত হওয়া চাই। তাই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মনীষিগণ বৌদ্ধধর্মের কবল হইতে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক স্বার্থ-সংরক্ষণে উত্থিত হইয়াছিলেন।

মহোন্নত কালিন্দীরাগী শেখ জীবনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন ষটে, কিন্তু আমরণ হিন্দুধর্মীহৃদিষ্ট পূজাদিও আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম চাক্‌মা সমাজ হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। পরবর্ত্তী রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়েরও কিছুকাল ধরিয়া ধর্মবত্সর্গ থার প্রতিষ্ঠিত জয়কালীর পূজার্কনা যথারীতি চলিয়াছিল। পরে একবার রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক হিন্দুধর্মের শোষণ।

শিশু কন্তা রোগাক্রান্ত হইলে; তিনি কালী-সমীপে বহু আরাধনাতেও স্নেহ প্রদত্ত কন্তারত্বকে রক্ষা করিতে না পারিয়া, কালীমূর্ত্তিকে পার্শ্ব প্রবাহিতা কর্ণফুলী জলে বিসর্জন দিয়াছিলেন। সেই হইতে চাক্‌মা সমাজ হইতে কালী পূজা উঠিয়া গিয়াছে। তবে এখনও কেহ কেহ হিন্দুদের সংস্থাপিত কালীর নিকট “মানস” পূজা প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ্যে এই কালীপূজা রূপান্তরিত হইয়া “হোইয়া পূজা” আখ্যায় প্রচলিত হইয়াছে। অন্ত্যাপি রাজবাড়ীতে এবং স্কুলের ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানে সরস্বতী পূজাও হইয়া থাকে, এবং শিবপূজা ও লক্ষ্মীপূজা বিকলাঙ্গ হইয়া কোনরূপে মানরক্ষা করিতেছে।

বিগত সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, পার্কার্‌ত্য চট্টগ্রামে ২৫ জন পুরুষ ও ১৭ জন স্ত্রীলোক, এবং পার্কার্‌ত্য ত্রিপুরায় ২ জন পুরুষ হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। বৈষ্ণবেরাই এই হিন্দুধর্মে পুনঃ প্রবর্ত্তনের মূল। তজ্জন্ত তাঁহারা অবশ্য হিন্দুসমাজের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। চট্টগ্রামের “জ্যোতিঃ” সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহোদয় বহুদিন ধরিয়া হিন্দুসমাজের গৌরব আর্ঘ্যমিশন ও রামকৃষ্ণসম্প্রদায়কে এই নানাদর্শ।

বিশ্বাশ্রমধর্মী চাক্‌মাসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মশিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বারংবার আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানেও তাঁহাদিগের কাহারও কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তথাপি নিত্যন্ত পরিশ্রম মাত্র সম্বল বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধু চেষ্টা

সবিশেষ প্রশংসার্হ। চাক্কা বৈরাগী তুলসীমালা ও ভোরকপীনধারী। তাহাদের মুখে প্রায়ই হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায়। বদ, মাংস বর্জনাদি কঠোরতাতেও তাহাদিগের আসক্তি দেখিয়া অশেষ আশার সকার হয়। কালিন্দীরাজীর জীবনী আলোচনার মুসলমান ধর্মের প্রতিও তদীয় অঙ্গুরাগ দেখিয়াছি। ইহা তাঁহার অসীম উদারতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তাহার ফলে পীরের গিরী প্রভৃতি মুসলমানী আচারও সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এতদ্বির যীশুসেবক মিশনারিগণও এই সরল প্রাণ পার্শ্বতীরবিগের মধ্যে ধর্মালোক বিস্তারের নিমিত্ত কার্যমনোবাক্যে অশেষ আশ্রয় বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের বিপুল অধ্যবসায়, বস্তুতঃ ক্ষম্যে অনুভব করিবার যোগ্য! কিন্তু এত চেষ্টা চাক্কা সমাজে অতি অল্পই ফলপ্রসূ হইয়াছে। আজ প্রায় শতাব্দী কালের সঙ্গহ আফ্রানে সাধারণ সম্প্রদায় হইতে অতি সূক্ষ্মের— ৩৪ জন মাত্র ভক্তিতাজন যীশুর মন্দিরযাত্রী হইয়াছে। ভদ্র পরিবারসমূহ কেবল বাবু হুর্গাকিন্দর বেওয়ান এই পথের পথিক হইয়াছিলেন; কিছুদিন পরে তৎক্ষণালোকে মনের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার, তিনি পুনরায় বুদ্ধদেবের “নির্বাণ” পথ ধরিয়াছেন।

চাক্কাদিগের ধর্মকার্য্য মাত্রেরি প্রথমে “হাপত্য পূজা” হয়। ইহাতে বহুমন্তী, চুড়ুলা (পুরুষ) এবং পরমেশ্বরী (প্রকৃতি) পূজা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বেই তিন প্রধান শক্তিতে একগুণ সৃষ্ট, সেই আদিম শক্তিরের সাধনা বাবতীর মানবেই সর্বানো কর্তব্য। যে আতি বত অধিক পরিমাণে এই শক্তিরের ভাব রাখেন, ধর্মজগতে তাঁহারাই তত অধিক উন্নত।

দেবতা।

এতদ্বির ইহারা আরও নানা দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুধর্মের অধিকার কালে চাক্কা সমাজে তেত্রিশ কোটি দেবতার অনেকেই প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের আক্রমণে প্রায় সকলেই প্রভুত্বচ্যুত হইয়াছেন। বর্তমানে শিব, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং নবগ্রহ ভিন্ন আর কাহারও পূজা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ত্রিপুরাদিগের ভার ইহাদের মধ্যেও যে চতুর্দশ সাংখ্য আতীর প্রধান দেবতা আছেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতেও হিন্দু দেব-দেবীর গন্ধ আসে। তৎ কথা :—

১। বৃহত্তারা—সৃষ্টির পরে ইনি লক্ষ্মীকে আনিয়া পৃথিবী ধনদাত্তে পরিপূর্ণ করেন (১)।

(১) বোধহয় ইনি বৃহৎ—তারার অর্থাৎ বঙ্গ সূর্য্যদেব।

- ২। মা-লক্ষী—ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী।
- ৩। ধলধ্বরী—কার্পাসাধিকারিণী। (১)
- ৪। পরমেশ্বরী—আত্মশক্তি (প্রকৃতি)।
- ৫। গঙ্গা—জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী (২)। ইহার নিকট পুণ্য, অন্নয়, নিরাময় প্রার্থনা করা হইয়া থাকে।
- ৬। স্থান দেবতা—বাস্তবদেব।
- ৭। মত্যা—বাস্ত্রবাহন; ইহাকে পুজার ফলে লোকে নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করে। (৩)
- ৮। হাত্যা।—তদীয় উপদ্রব হইতে জুম রক্ষার নিমিত্ত পূজা করা হয়।
- ৯। ফুলকমরী—ফোঁড়া পাঁচড়াদির দেবতা।
- ১০। মেলকমরী—বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি মারীভরোৎপাদিকা দেবতা।
- ১১। মোহিনী।—অনেকস্থলে ইহার আশ্রয় আছে। তথায় নিষ্ঠীবন ত্যাগে কি প্রসবাদি করিলে “মোহিনী দেবতা” আক্রমণ করেন; তাহাতে দ্রুত প্রভৃতি নানা সংক্রামক রোগ জন্মে।
- ১২। কালাধেদর—ইনি নানাস্থানে থাকিয়া আক্রমণ করেন। ইহার দেহ-তাড়িত বাতাসও অনিষ্টকারী।
- ১৩। ভূত—ইনি যেখানে সেখানে মহুঘোর উপর উপদ্রব করেন।
- ১৪। রাথোরাল—রক্ষাকর্তা। তিনি নানা আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

চাক্‌মাগিগের মতে এই চতুর্দশ দেবতা পৃথিবীর পাহারাওয়াল। স্বচ্ছন্দ বিচরণের নিমিত্ত ইহাদিগকে পূজাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে হয়।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোন দিন ইহাদের পূজা হইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই এই চতুর্দশ দেবতার পূজা হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেবদেবীই নাকি স্ব স্ব চক্রে বাস পূজা ও ময়।

(১) ত্রিপুরাঙ্গণ ইহাকে “খুলুমা” আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে।

(২) ত্রিপুরাঙ্গণের মতে ইহার নাম—তুই মা।

(৩) হাওড়া—খুস্ট পকাননতলার ‘দক্ষিণার’ এবং চাক্‌মাগিগের দেবতা “মত্যা” মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। “দক্ষিণারও বাস্ত্রবাহন;” তবে কিনা তিনি কেবল ব্যাঘ্রের দেবতা নহে। (“বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের”—বিশ্বকবি সংস্করণ, ২৬-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

করেন। এই নিমিত্ত পূজাকালে জিরাহল ও সমবেত সকলকে ঘেরিয়া হুজ-বেঠেন করে। যাহারা এই সীমামধ্যে থাকে, তাহারাও নাকি আংশিক ফল পায়। বলা বাহুল্য, এ সমুদয় হিন্দুত্ব বিজড়িত তান্ত্রিক বৌদ্ধমত! তবে ইহারা বলে, এসকল ইহকালের পূজা; পরকালের নিমিত্ত কড়া-তারা-চাকার সেবাই কুলধর্ম। যাহারা পরমবুদ্ধের সাধনা শিখিয়াছেন; তাহারা উপরোক্ত পূজাগুলিকে “বিখ্যা দৃষ্টি পূজা” বলিয়া থাকেন। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, চাক্‌মাগণ বিশেষতঃ জিরাকর্তা পূজাকালে সত্ৰীক উপস্থিত থাকে। “সত্ৰীকম্‌ ধর্মমাচরণং”—হিন্দু-ধর্মের এই সনাতন বিধি ইহাদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রে অধিকাংশ বিকৃত বাঙ্গালা শব্দ, মধ্যে মধ্যে নানা যাবনিক শব্দও মিশ্রিত হইয়াছে। এখানে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল। শুদ্ধীকরণের নিমিত্ত নবী হইতে জল গ্রহণকালে এই মন্ত্রে প্রার্থনা হইয়া থাকে,—

“দেরে মা গঙ্গা, দেরে পানি

অবোধ মানাই (১) শুদ্ধ করি;

শিল ভাঙি পাথর করং (২)

পাথর ভাঙি দৈর্ঘ্য (৩) করং

দৈর্ঘ্যের পানি কোবে (৪) তলং (৫)

অবোধ মানাই শুদ্ধ করং।”

চাক্‌মাবিগের ধর্মশাস্ত্রের নাম—“আগরতারা” অর্থাৎ পৌরাণিক শাস্ত্র (৬)।

(১) মানাই—মুখ্য; (২) করং—করি; (৩) দৈর্ঘ্য—দরিয়া, সমুদ্র; (৪) কোবে—গুহা; (৫) তলং—তুলি।

(৬) ‘আগর’—পূর্বের, ‘তারা’—শাস্ত্র; হুতারা ‘আগরতারা’ শব্দের অর্থ—‘পৌরাণিক শাস্ত্র।’ কিন্তু দেখিতেছি, “বৌদ্ধ-পত্রিকা” সম্পাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন “অগ্রভাগ” (১ম ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা)। তিনি এই অর্থ কিরূপে নির্দেশ করিলেন—বুঝিলাম না। আমাদের এতাদৃশ মন্তব্য “বৌদ্ধবন্ধু”তে প্রকাশ হইলে “পত্রিকা”র সম্পাদক ৮সর্বানন্দ বড়ুয়া এক বকলমি প্রতিবাদপত্র ছাপাইয়া লেখকের উপর নানা কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করেন। লেখক তাহাদের ভ্রম প্রদর্শন এবং উক্ত অন্ত্যার ব্যবহারের ক্ষত্র নোটিশ প্রদান করিলে, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ‘আগর’—অক্ষর, ‘তারা’—আঁটি, অক্ষরের আঁটি অর্থাৎ গ্রন্থ অর্থও করেন। সে বাহা ইউক্ত বাবু ত্রিলোচন দেওয়ানের ঐকান্তিক অনুরোধে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক ত্রীযুক্ত ধর্মবংশ তিস্তু মহোদয় কিছুকাল একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি হইতে ইহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মুখপত্র “বৌদ্ধ-বন্ধু” ও “বৌদ্ধ-পত্রিকা”র প্রকাশ করিতেছিলেন, পত্রদ্বয়ের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বোধহয় ইতি করিয়াছেন।



মোট সপ্তদশ খানি “তারার” বা শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। বর্ণা—১। মালেশ তারার (মালেশবিশ্বের উপাখ্যান), ২। ছাদিংগিরি তারার, ৩। আনিজা তারার (অনিত্য কৰ্ম্মকথা), ৪। আরেণ্ তামা তারার, ৫। সিগল-মোগল তারার (জয়মঙ্গল স্তত্র), ৬।

শাস্ত্র ।

সরকদান তারার, ৭। দাসাপারামি (দশ পারামিতা) তারার, ৮। বড়কুরুক তারার, ৯। ছোটকুরুক তারার, ১০। জীপুদরাতারার (ত্রিকুণ্ড স্তত্র), ১১। সুরাদিজা তারার, ১২। পুহুমফুল তারার, ১৩। ফুহুমফুল তারার, ১৪। সাহসফুল তারার, ১৫। চেরাগফুল তারার, ১৬। স্বামীফুল তারার এবং ১৭। রাথেমফুল তারার। এই সমুদয়ের ভাষা পালি,—তবে কিনা অধুনা প্রায় সমস্ত তারারই, পাঠ দূষিত এবং বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থলে চাক্ৰা ভাষা মিশ্রিত হইয়া সম্পূর্ণ ভুলোচ্ছ্বাস হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোনরূপে পাঠবিপর্যয় ঘটিয়াছে। অন্তর্দেশীয় অস্ত্রান্ত প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির দ্বারা “আগর তারার”ও অনেকের দ্বারা তালপত্র—চাক্ৰা অক্ষরে লিখিত আছে। এবং অল্পটান বিশেষে “তারার”বিশেষ ভিকু বা শ্রমণ কর্তৃক পঠিত হয় ওষধো ‘মাধা ধুইতে’ (১) “বড়কুরুক তারার” ও “ছোটকুরুক তারার” ‘বড় বিবাহে’ (২) “সিগল মোগল তারার,” “জাদি পুজা” অর্থাৎ ধর্ম্মপুজার—“মালেশ তারার” “দাসাপারামি তারার” ও “সাহসফুল তারার” মৃত্যুর পর মুখে গিও দিতে “আনিজা তারার” রাজা বা বড়লোক মরিলে “আরেণ্ তামা তারার” পিণ্ডোৎ-সর্গ কালে—“মালেশ তারার” “পুহুমফুল তারার” “ফুহুমফুল তারার” “জীপুদরা তারার” “সুরাদিজা তারার” “সাহসফুল তারার” ও “দাসাপারামি তারার,” প্ৰশনে দাহন সময়ে “ছাদিংগিরি তারার” এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধে “রাথেমফুল তারার” পঠিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট “চেরাগফুল” “স্বামীফুল” এবং “সরকদান তারার”ত্রয় কেবল ধর্ম্মকথা শ্রবণ মানসেই পাঠ করা হয়। এসমুদয় “আগর তারার” অর্থাৎ পৌরা-নিক শাস্ত্র হইলেও বৌদ্ধাভ্যাসনেই যে ইহাদের হাতে আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইত্যপূর্বকার “যুগভঙ্গ,” “যুগকালার,” “জ্ঞানপ্রবীণ” “মানবজন্ম,” “ককিণী কালার” নামের হস্তলিখিত পাঁচখানি আধ্যাত্মিক গ্রন্থও ইহাদিগের

(১) বৎসরান্তে পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত এবং জাতিদের কাহাকেও বাধে থাকিলে “খিলা কুচেইর পানি” দিয়া মাধা ধুইতে হয়, পরে বিদ্যুত বিবরণ আছে।

(২) রাজা বা সম্রাট ব্যক্তির উন্নতপ্রকার বিবাহ।

কোন কোন প্রাচীন উন্নত পরিবারে পরিদৃষ্ট হয়। এগুলি হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। জলটাকীর উপর শিব ও পার্শ্বতী বসিয়া যে সমুদয় ছত্রহ আধ্যাত্মিক সমস্তা বীমাংসা করিয়াছেন, গ্রহনিচয় তৎসমুদয় কথ্যতেই পরিপূর্ণ।

কালিন্দীরাজী কর্তৃক রাজানগরে “মহামুনি” মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহার সকলিত ইষ্টকমর ক্যং গৃহ প্রস্তুত হয় নাই বটে, তবে সেই বংশ বেত্রবিনির্মিত তৃণাচ্ছাদিত প্রাচীন ক্যং অতাপি স্বর্গীরা রাণীর অপূর্ণ ধর্মপ্রাপ্ততার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাঙা-ক্যং বা বিহার।

মাটি রাজবাড়ীতেও একখানি ক্যং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা রাজভবনের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত বীননাথ ভিকু মহোদয়ের উপর এই মঠের অধ্যক্ষতা রহিয়াছে। এই ‘ক্যং’এ (বিহারে) একটা মনোহর বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত আছেন। এতদ্বিত্ত চাক্‌মাদিগের অধিকাংশ স্থায়ী গ্রামেই অধুনা ক্যং এবং বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা অন্ততঃ একজন ভিকু বা শ্রমণের তত্ত্বাবধানে থাকে। গ্রামবাসীরা বুদ্ধদেবের সেবার নিমিত্ত যে সমস্ত ভক্তি উপাচার অর্পণ করে, তদ্বারা মঠাধ্যক্ষগণের ভরণপোষণ চলিয়া যায়। সম্প্রতি বর্তমান হুপারিটেণ্ডেণ্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয়ের উৎসাহে—রাজাবাহাদুরের তৎপরতার রাঙামাটিতে এক বিরাট ইষ্টকমর বিহার ও তন্মধ্যে পবিত্র মহামুনি মূর্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তদীয় সার্কলের প্রজাগণ হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। তাঁহাদের আশা আছে, প্রতি ‘মাহীপূর্ণিমা’তেই এখানে মেলায় বন্দোবস্ত করিবেন।

বৌদ্ধমতে চাক্‌মাদিগের মধ্য হইতেও কেহ কেহ সংসার ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক “রড়ি” (শ্রমণ) ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু বিরাট সমাজের পক্ষে ক্রুদ্ধব্রতচারী চীবরধারী শ্রমণ সংখ্যা অতিশয় সামান্য। গড়ে প্রায় চারি শত পুরুষ খুঁজিলে তবে একজন “রড়ি” পাওয়া যাইতে পারে। কলতঃ চাক্‌মা “রড়িদিগের” আচার ব্যবহারেও তাদৃশী কঠোরতা নাই। তাঁহারা বেন

রড়ী লোধক ও ঠাকুর।

দ্রৌসঙ্গবর্জিত গৃহী বিশেষ। অনেকে পরিধেয় চীবর বস্ত্রে সাধারণতঃ কাছাও দিয়া থাকে। কিন্তু এতাদৃশ প্রশয় পাইয়াও অনেকে শ্রমণ-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্মেরে প্রবেশ করেন। তাঁহাদিগের লোধক বলা হয়। চাক্‌মাসমাজে “লোধক” নিত্যকাল বিরল নহে। আবার এই ক্রুদ্ধব্রত প্রতিপালন করিয়া এ যাবৎ তিনজন মাত্র (১) “ঠাকুর” অর্থাৎ ‘ভিকু’ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত বীননাথ ভিকু রাজাবাহাদুরের রাঙামাটি (ক্যং) মঠাধ্যক্ষ। শ্রীযুক্ত পুণ-

পূৰ্বেই বলিয়াছি, ইহাদিগের সামাজিক প্রায় বাবতীর যজন পূজাদি 'ওঝা' দেৱ দ্বাৰা চলিয়া থাকে । সমাজে "রঙী" ও "ঠাকুৱেৱ" অভাবই ইহাৰ প্রধান কাৰণ হইবে । তবে কিনা ইহাও সত্য যে, বৌদ্ধধৰ্মবিরুদ্ধ ক্ৰিয়াৰ প্ৰতি "রঙী" ও "ঠাকুৱগণ" ঘৃণা প্ৰদৰ্শন কৰিয়া থাকেন । সুতৰাং সমাজে "ওঝা" শ্ৰেণীৰ অবস্থা প্ৰয়োজন । সমাজেৰ বহুদৰ্শী ও ক্ৰিয়া প্ৰণালীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই "ওঝা" নিৰ্দ্ধাৰিত হইয়া থাকে । উপযুক্ত হইলে তাহাৰে উত্তৰাধিকাৰিগণও এই ব্যবসায় চালাইতে পাৰে । অত্যা সমাজ তজ্জন্ত বাধ্য নহে । "চুঙু লাং" প্ৰভৃতি কতিপয় অমুঠানে "ওঝাকে" পূৰ্বদিন নিমন্ত্ৰণ কৰিতে হয় । সেৱা ত্ৰি "ওঝা" অতি পবিত্ৰভাবে দেব-দেবী স্মৰণ কৰিয়া ভাবী অমুঠানেৰ ফলাফল চিন্তা কৰিতে কৰিতে শয়ন কৰে । বলা বাহুল্য জীসহবাসাদি দুৰ্দ্ধৰ্ম সম্পূৰ্ণ নিবিদ্ধ থাকে । ইহাতে "ওঝা" স্বপ্নে ক্ৰিয়াকৰ্ত্তাৰ ইষ্টানিষ্ট পৰিজ্ঞাত হয় ।

বলিতে কি, ইহাৰা বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াও ভগবান বুদ্ধোপদিষ্ট পঞ্চশীল ( ১ ) বা দশশীল ( ২ ) আচৰণে সম্পূৰ্ণ উদাসীন । অথচ দীক্ষা গ্ৰহণকালে তাহাৰা এই পঞ্চশীল ব্ৰত প্ৰতিপালন কৰিবে বলিয়াই প্ৰতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া থাকে । এবং ফলে সাতদিন মাত্ৰ অতিবাহিত হইলেই ইতি শেষ কৰিয়া ৰাখে । "ওঝাছু" অৰ্থাৎ আবাঢ়েৰ পূৰ্ণিমা হইতে যে "ছাদাং" আৰম্ভ হয় তাহা "ওঝাগ্যা" অৰ্থাৎ আশ্বিনেৰ পূৰ্ণিমাসী পৰ্য্যন্ত তিনমাস ধৰিয়া চলিয়া থাকে । বস্তুতঃ "ছাদাং" বৌদ্ধ মাজেই অতি পবিত্ৰ অমুঠান । এ সময়ে তাহাদিগকে সুস্বাদু খাদ্য, মনোৰম পৰিচ্ছদ এবং জী-সঙ্গম প্ৰভৃতি পৰিবৰ্দ্ধন কৰিতে হয় । কিন্তু দুঃখৰ বিষয় বিয়াটি চাক্ষা সমাজেৰ মুষ্টিমেয় কৰেকজনকে মাত্ৰ এই পবিত্ৰ ব্ৰত পালনে তৎপৰ দেখা যায় । পক্ষান্তৰে এই পৰিজ্ঞাচাৰ ভিক্কুগণেৰ নৈমিত্তিক ব্ৰত । তাহাৰা ইহা ছাড়া এ কয়মাস অ অ 'ক্যাং'এ ৰাতি বাস কৰিতে বাধ্য । অধুনা ইহাও সম্যক প্ৰতিপালিত হয় না ।

চান্দ ভিক্কু 'কাচাং' তীৰে অস্ত্ৰ একটা ক্যাং-এ বাস কৰিয়া থাকেন । কাচাংঙেই অপৰ যুবক ত্ৰিযুক্ত জ্ঞানৱন্ত ভিক্কুসম্মে পৰিচিত, তিনি মহাপ্ৰাং ক্যাং-এ বাস কৰেন ।

( ১ ) পঞ্চশীল—১ প্ৰাণী হত্যা ২ চুৰি ৩ পৰজী হৰণ ৪ মিথ্যা কথন এবং ৫ মানক ত্ৰব্য সেৱন নিবিদ্ধ ।

( ২ ) দশশীল—পঞ্চশীল ও ৬ বৈকালিক ভোজন ৭ নৃত্য-বাগ্গ-গন্ধাদি সেৱা । ৮ ও ৯ উচ্চাসন ও মহাসনে উপবেশন এবং ১০ অৰ্ধস্পৰ্শ নিবিদ্ধ ।

[ ১ ]

যাহা হউক ইহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সংখ্যার নিত্য কম নহে ; তবে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংঘাতে অধুনা নিত্য উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছে । তন্মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মের অধিকার বড়িও বিস্তর, কিন্তু সেই সমুদায় তাত্ত্বিক বৌদ্ধমত প্রভাবে এতই দূষিত যে, হিন্দুসমাজ কোনরূপেই তাহা গ্রহণে সম্মত হইতে পারে না । মোটের উপর বৌদ্ধধর্ম্মেরই সর্কাধিপত্য স্বীকার করা যায় । বিষ্ণু, “ওরাছু”, “ওরাগ্যা”,

পর্ক ও নিয়ম ।

“মাধী পূর্ণিমা” প্রভৃতি সমস্তই বৌদ্ধ পর্ক । তবে কিনা ইহাদের “নবান্ন” নামক আর এক পর্ক আছে, তাহা অবশ্য হিন্দুসমাজ হইতেই পরিগৃহীত । এতদ্ভিন্ন অপর সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই ব্রত বা নিয়ম আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে । তৎসমুদয়ের মধ্যে “চুড়ল্যাং” “চক্রবাহ”, “খামিং টং” “টাক্সোনোৎসর্গ” প্রভৃতি সচরাচর প্রচলিত দেখা যায় । “ধর্ম্মকাম” এবং “হাজারবাতি”ও বৌদ্ধানুষ্ঠান বটে, কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলিয়া সাধারণে করিবার সাধ্য নাই । তাহা ছাড়া, শিবপূজা, লক্ষ্মীপূজা, হোইয়া ( কালী ) পূজা, নবগ্রহ পূজা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর অর্চনাও প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় । এমন কি, গাভীদান, পার্বাটীর শুভমুক্তি ইত্যাদি ব্যবস্থাও এই সমাজে বিরল নহে । অপর পক্ষে “কেসপূজা”, “সত্যপীরের সিন্নি” প্রভৃতি অত্যাধি প্রচলিত আছে । নিম্নে এই সকল পর্কনিয়মাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে ।—

বিষ্ণু।—মহাবিষ্ণুব সংক্রান্তি বৌদ্ধদিগের প্রধান ও পবিত্র পর্কাহ । বসন্তের অবসরিত অনুগ্রহে চৈত্রমাস প্রকৃতিকে মনোরম করিয়া তোলে ; আর তাহারই সর্কাঙ্গীন পরিপূর্ণিতে বৌদ্ধ সমাজের অতি নিমন্তরে পর্য্যন্ত বিশ্বজনীন প্রেমপ্রবাহ বহিতে থাকে । এইদিন বৌদ্ধজননী বিপুল মঙ্গলায়োজন সহকারে পরিবারের শুভকামনা করেন । কেবল ইহা নহে, ধর্ম্মের যাহা প্রধান অঙ্গ, এবং যাহা কর্তব্যের শাসনে নিরামিত, এ হেন শুভ অবসরে সে সমুদায় মহৎ প্রতিষ্ঠাপনরূপে অনুষ্ঠিত হয় । বৌদ্ধ প্রধান এসিয়াখণ্ডে প্রায় সর্বত্রই এই একই উদ্দেশ্য—ভক্তগণ অতি শাশ্বতানে শুচিবিধান করিয়া ভক্তিপূত উপচার-খালা মাধায় পবিত্র বুদ্ধমূর্ত্তির সন্নিধানে প্রাণের বিনীত নিবেদন জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত হয় । কিছুদিন হইল, চিংময়ং নামক স্থানে এক বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে ; বিষ্ণু প্রভৃতি পর্কাহে তথায় অনেকের সমাগম হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আরাকান ও চট্টগ্রামে বুদ্ধদেব “মহাবুনি” মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত । তাই

চাক্‌মা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই সেই হুদ্র মহামুনিদর্শনে গমন করে। (১)

‘কুলবিহু’ অর্থাৎ সংক্রান্তির পূর্কদিন হইতে ইহাঙ্গের তীর্থ কার্য আরম্ভ হয়।

তীর্থ-কার্য।

প্রথমে নানাদিতে গুটি হইয়া মন্দিরের চতুর্পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত বারান্দার বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ঘুরিয়া আকুল প্রাণে বুদ্ধ নাম কীর্ত্তন করিতে থাকে। এক্ষণে কিছুকাল প্রদক্ষিণের পর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক মহামুনির শ্রীচরণপ্রান্তে উপচার-খালা এবং প্রজলিত বর্জিকা স্থাপন করতঃ ভূমিগত প্রণিপাত করে। তদন্তর মন্দিরমধ্যেই পুনরায় বারংবার মহামুনিমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিতে থাকে। অবশেষে যখন প্রান্তিকান্তিতে শরীর অবসর হইয়া পড়ে, তখন বাসার গিরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লয়।

প্রদক্ষিণকালে ইহাঙ্গের স্রুশ্রুণ্ডলার ভাবে—সৌন্দর্য্যের খেলার—এবং সর্বোপরি পবিত্র ধর্ম্মোন্মাদনার দর্শকের পাষণ ছবয় ও বিষয়-বিমুগ্ধ হয়! সমবয়স্ক জী পুরুষ দলে দলে গলাগলি করিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতে থাকে। মুখে পবিত্র বুদ্ধ নাম, এবং মধ্যে মধ্যে অপূর্ব উৎসাহাদীপক খল খল হাস্যঘটাঞ্জড়িত “রেইঙ্‌ খারিয়া” (২) মন্দির বিকল্পিত—মেলাস্থল মুখরিত করিয়া তোলে। অহো, সেই বিহ্বলবিভ্রান্ত নৃত্য এবং উদাস-বিতোর সঙ্গীত পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের অভিনয় দেখায়। কেবল মন্দিরসন্নিধানে নহে, নৃত্য-গীতের এতাদৃশ আনন্দপ্রবাহ পথে—ঘাটে—মন্দিরে—প্রাঙ্গণে সর্বত্রই তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে।

এ ক্ষেত্রে জীলোকদিগের কোন বিশেষ সাজসজ্জা থাকে না। অবগুণ্ঠন ব্যপদেশে কেবল একখানি লোহিত কি শুভ্র ‘ওড়না’ মস্তকোপরি হইতে পশ্চাদিকে ঝুলাইয়া দেয়। পুরুষেরা বিশেষতঃ অনূঢ় যুবকগণ কর্ত্তে পুষ্পগুচ্ছ, মস্তকে

(১) রাজানগরের “মহামুনি”র কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। চট্রগ্রামে ভক্তির ‘পাহাড়তলী’ নামের বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানে মড়রাজা বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত আর একটি মহামুনিমূর্ত্তি আছে, ইহাই অবিকতর প্রাচীন। উভয় স্থানেই এই সংক্রান্তি উৎসবকে বিরাট মেলা হয় বটে, কিন্তু পাহাড়তলীর জনতা সংখ্যা গড়ে রাজানগর মেলার প্রায় দ্বিগুণাধিক হইয়া থাকে। তবে রাজানগর মেলার প্রায় তিন চতুর্থাংশেরও অধিক যাত্রী চাক্‌মা। স্বকীয় ও স্বভ্রাতৃর রাজার এতী ভক্তিমতাই যে উহার প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) “রেইঙ্‌ খারিয়া”—কুইখারিয়া।

বঙ্গি টুপি, গলদেশে আপাদবিলম্বিত কামাল ও ফুকানানা, গিলটির শিকল প্রভৃতি নানাবিধ গহনা ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়। শুধু ইহা নহে, কেহ কেহ বা আবার চূণ, হলুদ বা কাণী মাখিয়া অঙ্কিত সং সাড়ে। এতদ্বির কেহ বেহালা, কেহ কলার্ট, কেহ বা বাঁশী, অপর কেহ বা ছই তিনটি বজ্র যুগপৎ ধ্বনিত করিতে থাকে। ফলে তাহাদের সেই উদ্যম ব্যবহারে—আমাদের উপসংহার না হইতেই তৎসমুদয় বজ্র ব্যবহারের অল্পপযুক্ত হইয়া পড়ে। অন্ততঃ প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষেরই হাতে অন্ততঃ একখানি করিয়া পাখা (১) থাকে। যুবকেরা তাহা হস্ত বা বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য করিবার সময়ও ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আনন্দে অধীর হয়। এবং অধিকাংশ হলে ক্লাস্তি দূরীকরণমানসেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোথাও বা দেখা যায়, কোন প্রণয়িনী শ্রান্ত-ক্লান্ত হৃদয়েরথরকে তাহার শীতল করিতেছে, আর বিমুগ্ধ প্রণয়ী সেই কোমলকর-সঞ্চালনের প্রতি সন্নিহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! আবার কোথায়বা শ্রমালসপীড়িতা কুমারী যুবতীকে কোন অনূঢ় যুবক ব্যঞ্জে তৎপর। হঠাৎ কোন শুভ নিমিষে চারি চক্ষুতে বৈজ্ঞাতিক প্রবাহ খেলিয়া যায়, নীরবে—নিখালে উত্তরে উত্তরের মনোগত ভাব বৃথিতে পারিয়া লজ্জায় অধোমুখী রহে! এইরূপে তথার প্রেমের প্রথম অভিনয়—পূর্ববাগ স্ফুটিত হয়। অবশেষে যুবক যুবতীর হস্তধারণে সাহসী হয়, তখন আর হৃদয়ের উদ্ভ্রান্তভাব যুগের কপাটে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অনেকেই এইরূপে জন্মসংঘ হইতে জীবনসঙ্গিনী নির্বাচিত করিয়া লইয়া থাকে। পরম্পরের মত জানিতে পারিলে, পরিশেষে তাহারা স্ব স্ব অভিভাবকের গোচরীকৃত করে; এবং তাহাতেই বিবাহ হইয়া যায়।

অবশ্য এতাদৃশী ঘটনা তীর্থক্ষেত্রের কলঙ্ক বিশেষ। হার, বর্তমানে অনেক হিন্দু তীর্থস্থান হইতেও এইরূপ নানা ব্যভিচার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ পাণ বৃদ্ধের বর্ণনা বন্ধ্যমাণ পবিত্র বিবরের সঙ্গে দেওয়া উচিত ছিল না। তবে যখন আমরা জাতীয় ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়াছি, তখন ভাল মন্দ বিচার করিয়া কল কি? আমাদেরকে উত্তরই নিরপেক্ষভাবে লিখিয়া যাইতে হইবে। তবে সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিয়া রাখি, এ সকল বৈরাচার ভ্রমসম্প্রদায়ে কথাপি পরিদূষ্ট হয় না।

(১) ত্রীলোকনিসের এই—মাথার ‘গুড়মা’ এবং হাতে পাখা দেখিলে স্পেশীয়া মহিলার কথা বড়ই সঙ্গ হয়।

কথার কথার অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি ; পাঠক, কমা করিবেন। এক্ষণে পুনরায় মূল কথার অবতারণা করা যাউক। পূর্বে যে ভক্তিপূত নৃত্য-গীতের বর্ণনা কথিত হইয়াছে, সেই ভাবে চাক্ষুৰাগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পান ভোজন ও বিরল বিশ্রামাবসর ভিন্ন অহনিশই কাটাইয়া থাকে। অনন্তর পর (বিষ্ণু) বিন প্রত্যুষে নানাদিতে শুচি হইয়া যথাসাধ্য দান-ধৰ্ম্মাশুষ্ঠানে ত্রুতী হয়। অবস্থার কুলাইলে এ সময়ে অনেকে “খামিংটং” বা অন্নমেক, টাঙ্গোনোৎসর্গ প্রভৃতিও করিয়া থাকে। এবং অনেকেই বিক্রমার্থে আনাত জীবিত মৎস্ত ক্রয় করিয়া সমীপবর্তী পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে বেলা আট নর ঘটিকা যাবত কাটাইয়া, অবশেষে পূৰ্বোক্তরূপ নৃত্য গীতের সহিত মহামুনি প্রদক্ষিণ এবং এশিপাতপূৰ্ব্বক প্রার সকলে বিদায় হয়। সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর মেলাস্থলে চাক্ষু বা অপরাপর পাহাড়ীকেও কদাচিৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু মেলা আরও প্রায় ৭৮ দিন থাকে। কোন কোন বৎসর ইহার পরেও কর্তৃপক্ষ হইতে ভাঙিয়া বেওয়ার প্রয়োজন হয়।

বিষ্ণু সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া যাহা লিখিত হইল, তৎসমস্তই মহামুনি-সংপৃক্ত। তাহা ছাড়া বিষ্ণুলক্ষে ইহাদের আরও কর্তব্য রহিয়াছে। এ দিন জীবহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অন্নগ্রহণেরও বিধি নাই। কেবলমাত্র—বেতসাগ্র ও বহুশাক-শুস্কাদি সহযোগে “পাচন” (ভুক্তানি) খাইয়া দিনপাত করে। এতদ্বিন্ন ভক্তিভরে “ছাদং-কারেৎ” (শাস্ত্রকথা) শ্রবণ এবং পরিপাটিক্রমে “রত্নী” “ঠাকুর” প্রভৃতিতে খাওয়ান হয়।

বিশেষত বাহারী মেলার বাইতে পারে না, তাহারাই এই দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নদীতে গিয়া স্নান করে ; এবং বাহারী নদীতে বাইতে পারে না, অস্ত্রের নদীর জল আনিয়া তাহা দগকে অবগাহন করায়। এই নিমিত্ত ‘আরমে’ হৈ-টৈ পড়িয়া যায়—ছেলের দল এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বয়োবৃদ্ধগণকে স্নান করাইয়া থাকে। অনন্তর সকলে সৰ্ব্বাঙ্গে চন্দন মাখে। বলা বাহুল্য, এইদিন অনেকে বাড়ীতে বসিয়াও অন্নমেক, টাঙ্গোনোৎসর্গ প্রভৃতি দান ধৰ্ম্ম করে।

পূর্ণিমা ত্রুত।—বৌদ্ধভাষায় আষাঢ়ের পূর্ণিমাকে “ওয়াছু” বলা হয়। এইদিন হইতে “ওয়া” অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ত্রুত আরম্ভ হইয়া থাকে। তাই “ওয়াছু” বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অতি পবিত্র দিন। শ্রাবণের পূর্ণিমার নাম “ওয়াখংলাত্রে”। কথিত আছে, এই ত্রিপিণ্ডে ইজ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া “ছাবং” করিয়াছিলেন। এতদ্বিন্ন ত্রুতের পূর্ণিমাকে—“তচুং লাত্রে”, ও আশ্বিনের পূর্ণিমাকে “ওয়াখ্যা-

লাত্রে" বলা হইয়া থাকে । এই শেথোক্ত দিনে "ওয়া" উঠিয়া যায় । এই কর্ত্ত্বপূর্ণিমার বিশেষতঃ "ওয়াছু" এবং "ওয়াগ্যাতে" ইহার যথাসাধ্য ধর্ম্মচর্যা অর্থাৎ রড়ী-ভোজন, দান দক্ষিণাদি উৎসর্গ এবং শাস্ত্রকথা শ্রবণ প্রভৃতি করিয়া থাকে । তত্ত্বিন্ন "মাঘী পূর্ণিমা" ( তাবু লাত্রে ) কেও ইহার পর্কাহ স্বরূপে গণনা করে । শাস্ত্রমতে এই দিন বুদ্ধদেব ত্রয়ণে বাহির হইয়াছিলেন । এতদুপলক্ষেও উপযোক্ত ব্রতচর্যা অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে । বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত অপরাপর সকলে বৈশাখ এবং কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতেও পবিত্রভাবে ব্রতচরণ করে ; কিন্তু চাক্‌মাদিগের মধ্যে তাত্‌কালিক অমুষ্ঠান কচিং দেখা যায় মাত্র ।

নবান্ন ।—ইহা মূলতঃ হিন্দু সমাজেরই পর্ক । নূতন ধান বাহির হইলে—সচরাচর কার্ত্তিক মাসেই, ইহা অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে । বাস্তবিক নবান্ন একটি পবিত্র এবং সমীচীন ব্যবস্থা । বৎসরের প্রথম লব্ধ-জীবন যাত্রা নির্বাহের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ সর্কাগ্র দেবতাদির উদ্দেশে দিয়া গ্রহণ করা বস্তুতই মনোহর দেখায় । আমরা সচরাচর কোন প্রিয়জন্য লাভ করিলে, প্রথমে তাহা আমরা যাহাকে অধিতম ভালবাসি—তাহাকেই দিতে অভিলষিত হই । নবান্নও তাদৃশ অমুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নহে । ইহাতে চাক্‌মাগণ নূতন চাউলদ্বারা ( ছাগল বলিসহ ) "চুঙু, লাং" অথবা ( শূকর বলিতে ) "মা-লক্ষীমা"র পূজা করিয়া থাকে । এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মত্ত মাংসাদিসহকারে নবান্ন সজ্জিত থালা অতি পবিত্র ভাবে পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে এক ভিন্ন ঘরে ক্রিয়ৎকণের নিমিত্ত স্থাপন করে । তাহাতে কোন কীট বা পতঙ্গ আকৃষ্ট হইলে তাহারা প্রোতান্ন্য গ্রহণ সিদ্ধ মনে করিয়া লয় । অনন্তর সেই প্রসাদ নদীজলে বিসর্জন দিয়া আসে । এস্থলে ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, নবান্ন উপলক্ষে ভোজ্যভক্ষ্য যথাসম্ভব অধিক হয় ; এবং অপরিমিত সুরাপ্লাবনে অতিথি—অভ্যাগত ও প্রতিবেশিবর্গ পর্য্যন্ত ডুবিয়া রহে ।

চুঙুলাং ।—এই সঙ্গে দেবী পরমেশ্বরীরও পূজা হইয়া থাকে । চাক্‌মাসমাজে ইহা একটি অতি পবিত্র ও অবশ্য করণীয় অমুষ্ঠান । বিশেষতঃ চুঙুলাং না হইলে বিবাহ সিদ্ধই হয় না, স্ত্রী পুরুষের যে কেহ ইচ্ছা করিলে সেই বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে । মথেরী বিবাহ, সন্তানজন্য, গৃহনির্মাণ প্রভৃতিতে "চুঙুলাং" নামধের গৃহদেবতার পূজা করে ; তাহা হইতেই চাক্‌মাদিগের "চুঙুলাং" পূজার উদ্ভব সম্ভব । পরন্তু চাক্‌মাদিগের বিশদকালেও ইহা অমুষ্ঠিত হয় । এতত্ত্বিন্ন সজ্জিতপন্ন অনেকে প্রতি বৎসরেই ইহা করিয়া থাকে । জিরা পদ্ধতি যথা :—



পূর্বদিন বিধিমাতে ওঝাকে নিমন্ত্রণ করা হইলে, সে যথেষ্ট ভাবী চুঙালাওর ফলাফল জানিতে পারে। পরদিন প্রাতে আদিয়া ওঝা দৈর্ঘ্য সাতঘোড়া ও প্রহ্ম সাতঘোড়া বাণের 'চ্যাচাড়ী' দ্বারা ছোট একখানি 'চাঙারী' প্রস্তুত করে। তাহার এক পার্শ্বে একটি পাতার একখানি ক্ষুদ্র 'ছই' দেওয়া হয়। অত্র পার্শ্বে বাণের তিনখানি বাধারী তেপারা আকারে বসাইয়া তাহার মাথায় একটি পাতা জড়াইয়া দিয়া থাকে। ইহাদের সংস্কারমতে—এই ষয় খানি জ্বীলোকের এবং অপর 'ছই' খানি পুরুষের উদ্দেশে বিনিম্বিত হয়। পুরুষকে প্রায়শঃ বিবেশাভিতে বাইতে হয়। সুতরাং জ্বী-পুত্রাদির নিমিত্ত তাৎকালিক খাদ্য সংস্থান মানসে 'ছই'য়ের নিম্নে একটি ডিম রাখা করে। ইহা ছাড়া, দুইটি ক্ষুদ্র খুড়ির একটিতে চাউল ও অপরটিতে ধাত্ত পরিপূর্ণ করতঃ যথাক্রমে জ্বী ও পুরুষের দিকে রাখে, এবং খুড়ি দুইটির পার্শ্বে দুইটি মত্তপূর্ণ পাত্রও স্থাপিত হয়। অতঃপর ওঝার "আগ্‌চাওরা" (১) হইয়া গেলে সচরাচর তিনটি কুকুট এবং বিবাহাদি কোন বিশেষ উপলক্ষ থাকিলে তৎসঙ্গে একটি শূকরও বলিদান করে। পরে মোরগের পদ, মস্তক ও হৃৎপিণ্ড, এবং শূকরের মস্তক, শোণিত এবং সমুখ ও পশ্চাতের বিপরীত ক্রমে দুই খানি পদ সিদ্ধ করিয়া অগ্রভাগে কদলী-পত্রোপরি রাখিয়া দেয়। তৎকালের ক্রিয়াকর্তা সতীক আসিয়া প্রণিপাত করে, এবং প্রাপ্ত মত্তপাত্রদ্বয় বিনিম্বয় করিয়া থাকে। তখন দম্পতি পুনরায় 'নওবৎ' করে, ও ওঝা কৃতকর্ণের ভাবী শুভাশুভ পরীক্ষা করিয়া দেখে। যেমন, মোরগের অঙ্গুলীগুলিতে অত্যধিক ফাঁক থাকিলে ক্রিয়াকর্তী অনিষ্টব্যয়িনী হয়। নখে হৃৎপিণ্ড জড়াইয়া ধরিলে গৃহস্থের অবদল সূচনা করে। এইরূপে নানা পরীক্ষা আছে, অবশেষে চাউলগুলি ঢালিয়া আবার মাগিয়া দেবে। কথিত আছে, এই মাগে চাউল কম পড়িলে গৃহস্থ নিপাত এবং বেশী হইলে আরও বৃদ্ধি হইবে। ন্যূনাধিক্য না ঘটিলেও বিশেষ অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে। তন্নিমিত্ত বধ্যবিধি লক্ষ্যপূর্ণ করিয়া কুকুট বলি প্রদান করে। চুঙালা অঙ্গুলীকালে

(১) "আগ"—পরীক্ষা, "চাওরা"—দেখা। ওঝা দুইটি কাঠাল পাতা তদভাবে বাঁধপাতা হক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যস্থলে রাখিয়া আঁখিতে জুতলে নিষ্কল্য করে। যদি পাতা দুইটিই চিং হইয়া পড়ে, তবে বৃত্তিতে হইবে—'হাসিতেছে।' অত্বে দুইটিই উলটিয়া পড়িলে বিরাম ভাব সূচনা করে। কিন্তু ইহার কোনটিই সফলভাঙ্গাপক নহে। দ্বিতীয় ভূতীরবারের পরীক্ষাতেও যদি পাতা একটি চিং এবং আর একটি উপুড় করিয়া কেলিতে না পারে, তাহা হইলে সেই পাতা দুইটি পরিবর্তন করিয়া লয়।

চতুর্দিকে সূর্য বেষ্টিত করা হয়। প্রচলনানুসারে উক্ত সূর্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কারাক্ষ ময়োচ্চারণ পূর্বক অমৃতানকারিগণের (শুক্লবের দক্ষিণ ও ত্রীলোকের বাম) হস্তপ্রকোষ্ঠে জড়াইয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে ইহাও উল্লেখ প্রয়োজন, সাধারণ “চঙলাঙে” “চাঙারী” ব্যতীতির আবশ্যক হয় না, কেবল একটা ডিম, তিনটা মোরগ এবং চাউল, মগ্ন ইত্যাদি হইলেই চলে।

“মা-লক্ষ্মী-মা” (১) পূজা।—এই পূজার ওয়া প্রথমে দুইটা পাতা পূজাহানে রাখিয়া তত্পরি একটি “মারাই” (২) প্রোথিত করে। পরে ক্রিষ্ণা-কর্তী সন্ন্যাসী সততুলোদক-অর্ঘ্যদান পূর্বক অগ্নিপাত করিলে, “আগ্‌চাওরা” হয়। অনন্তর একটি মোরগ বলি দিয়া, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া লয়, এবং একটি খুড়িতে পাতা পাতিয়া তত্পরি একখানি খালার মাংসগুলি কিয়ৎকাল রাখিয়া দেয়। অবশেষে পুনরায় সততুলোদক অর্ঘ্যদানে “শালান” করিয়া মাংসে শরীক্ষা ক্ষেপে।—যদি মোরগের অঙ্গুলি গুলি উপর্যুপরি থাকে, তবে বিপদ নিশ্চয়। আর যদি একপার্শ্ব অঙ্গুলী তিনটির মধ্যে অপর পার্শ্ব অঙ্গুলীটি আশ্রয় লয়, তাহা মৌভাগ্যের লক্ষণ।

“হোইয়া” বা “কালাইয়া” পূজা।—ইহা কাশীপূজার প্রকার বিশেষ মাত্র। “হোইয়া” বিবিধ—“পাঁচ পাতার” এবং “সাত পাতার হোইয়া”। “সাত পাতার হোইয়া”র অতিরিক্ত কার্য কেবল “হোইয়া সংস্থাপনের পূর্বে নিকটবর্তী থালে অন্তত একটি ছাগ বলিদান একান্ত প্রয়োজন। একটি সুদীর্ঘ বাঁশে কাপড় জড়াইয়া, তাহাতে “পাঁচ পাতার হোইয়া”র পাঁচখানি এবং “সাত পাতার হোইয়া”র সাতখানি (বাঁশের) মোটা ‘বাখারী’ আড়ভাবে ঝাক্ ঝাক্ করিয়া বাঁধিয়া দেয়; এবং প্রত্যেক ‘বাখারী’ দুইপার্শ্বে দুইখানি করিয়া নতুন “খাদী” ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। পরে গৃহসমুখীন প্রাঙ্গণে একখণ্ড মোটা বাঁশ প্রোথিত করিয়া তদ্বাধ্যে একটি ডিম রাখে এবং তাহার উপর উক্ত সুদীর্ঘ

(১) লক্ষ্মী টেঁকাদিগণেরও ঐচ্ছ্যাবিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহারাই এই পূজার একখানি কুসুম গৃহ প্রস্তুত করে। শিলাখণ্ডবিশেষকে লক্ষ্মী কল্পনা করিয়া গৃহমধ্যে স্থাপন পূর্বক সপ্তগ্রহ বিশিষ্টলাত গাছি সূতা দ্বারা বেঁটন করিয়া লয়। অনন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া শুক্ল, মোরগ প্রভৃতি বলি দেয়। পরিশেষে সেই প্রকারী মাংস সকলে আর্বোদের সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

(২) “মারাই”—বাঁশের বাখারী চাহিয়া একপ্রান্তে হুটু করা হইলে “মারাই” নামে অভিহিত হয়।

বাশ অর্থাৎ “হোইয়া” সংস্থাপন করে। ইহার পাদমূলে একটি বেদী প্রস্তুত করা হয়; এই সঙ্গে আশুভক্ষিক বস্তু দেবতার পূজা করিতে হইবে, বেদীতে শুভখানি “মারাই” পুতিয়া বখানিয়মে পূজার্চনার পর শূকর, মোরগ ইত্যাদি বলি প্রদান করিয়া থাকে। এই মাংসে নিমন্ত্রিতগণকে খাওয়ান হইয়া গেলে, অপরাক্তে ওষা পূজাহানে দণ্ডায়মান হইয়া গৃহাভিগৃহে তুলা বর্ষণ করিতে করিতে গৃহস্থকে “রাজার বাটার পান খাও” “এক দানার লক্ষ দানা (শস্ত্র) পাও”, “লোকে তোমাকে নমস্কার করিয়া সম্মান করুক” প্রভৃতিরূপে আশীর্বাদ করিতে থাকে। অনন্তর সমাগত সকলে “হোইয়া” কাঁধে লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী বাড়ী ফিরে, এবং প্রত্যাবর্তনের পর ওষা “ঝিলা কুঁচোর” জলে সংস্কার করিয়া পুনরায় পূর্বস্থানে স্থাপন করে। ইতি পূজা পদ্ধতি শেষ। পরদিন প্রাতে কাগড়গুলি খসাইয়া বাশটি নদীজলে ভাসাইয়া দেয়।

শিবপূজা।—ইহাতে সাতটা মোরগ, একটি বড় শূকর, একটি শূকর শাবক এবং এক টাকার নানাবিধ ফলোপচার ও তৈল, ঘৃত ও মসলা ইত্যাদি প্রয়োজন। বাসগৃহের নিকটে ছোট একখানি “দান ঘর” উঠাইয়া, তন্মধ্যে আবার ক্ষুদ্রতর একখানি গৃহ রচনা করে। ইহার নাম “গোয়াই (গোঁসাই) ঘর”। তাহাতে একটি জলাধার অর্থাৎ ঘট স্থাপন করা হয়। রড়ী বৃহত্তর গৃহে বসিয়া পূজা সম্পাদন এবং পিষ্টক আহার করেন। পরদিন প্রাতে নিকটবর্তী মাঠে অন্নবেদী সংগঠিত করিয়া পুনরায় পূজা ও “আগর তারা” পাঠ হয়। পূজাকালে অন্নোপরি কীট পতঙ্গাদি পতিত হইলে, সাকল্য সূচিত হইয়া থাকে। অতঃপর প্রতিবেশিগণকে লইয়া বিরাট ভোজ্য চলে। খাওয়ার সময় বৃদ্ধগণ ব্যাঙ্গনাতির আশ্বাস তুলনার পূজার শুভাশুভ ফল বিচার করে।

নবগ্রহ পূজা।—ইহা কথঞ্চিৎ হিন্দু-অনুকরণেই অনুষ্ঠিত হয়, তবে পূজাকার্য “ঠাকুরগণ” দ্বারা নির্বাহিত হইয়া থাকে। পূজার ঘট এবং উপচারাদিও বখানিয়মে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, হিন্দুদৈবজ্ঞগণোপদিষ্ট গ্রহ-শক্তিই এই পূজার উদ্দেশ্য।

কেরপূজা। (১)—“জুম” কাটার পর অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুন মাসে এবং “জুম” ক্ষেত্র স্ফাটনাত্মক ভূমিত হইয়া উঠিলে অর্থাৎ আবহাওয়া-প্রাণ মাসে—বৎসরে দুইবার

(১) ত্রিপুরাবাসিনের মধ্যেও এই পূজা প্রচলিত আছে। পূজার সময়সাময়িক কালে এক বিধা দুই রাত্রি (পার্বত্য) ত্রিপুরাবাসিগণকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এমন কি নৃশক্তিও

এই পূজা করিবার নিয়ম । প্রতিবেদী সকলে মিলিয়া নবীকুলে পূজা করে । ইচ্ছাতে কুকুর পর্য্যন্ত বলি দেওয়া হয় । সোভাগ্য সম্পদ লাভাশাতেও অনেকে “কেরপূজা” করিয়া থাকে । প্রবাদ আছে, এই পূজার পূর্ব্বতন রাজগণ নরবলি প্রদান করিতেন । অধুনা “কেরপূজা” বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে ।

সত্যপীরের সিরি ।—মুসলমান সমাজের অবতার বিশেষ ( ১ ) হইলেও সত্যপীর বহাদর হইতে “সত্যনারায়ণ” আখ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়েরও পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন । হিন্দুগণ নারায়ণ ঠাকুরের এত রকমবেরকমের সাজসজ্জাও পরিচর্য্য হইতে না পারিয়া ফকিরী আলখল্লা এবং ‘নব্রমান দাড়ী-গোঁপ, গার কাঁথা শিরে টোপ, হাতে আশা কাঁধে ঝোলা ঝুলি” ( ২ )—ইত্যাদিতে সাজাইয়াছেন । বস্তুতঃ হিন্দু ও মুসলমানগণ বহুকাল যাবত একত্র বাস নিবন্ধন এই শ্রেণীর মিশ্র দেবতার পূজা উভয় সমাজেই প্রচলিত হইয়াছে । প্রাচীন কবি ফকিররাম দ্বাস উদার প্রাণে লিখিয়াছেন,—

“দেখ থাকে পুরাণ, কোরাণ থাকে দেখো ।

জেই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো ।”

ক্রমে ইহা চাক্‌মাসমাজেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে । শনি মঙ্গলবারে কোন কোন স্থলে বা বারনির্কিঁশেবে পাঁচপোয়া চাউলের আটা, মধি, দুগ্ধ, ঘৃত, কলা প্রভৃতি উপচারের সহিত পূজা স্থাপন করা হয় । অনন্তর প্রতিবেশিগণ উপস্থিত হইলে সকলে সমভক্তি প্রণিপাত করে এবং উপচার রাশি একত্রে মাখিয়া “সিরি” প্রস্তুত করিয়া থাকে ইহাই সত্যপীরের প্রসাদ—গ্রহণে যাবতীয় আপদ বিপদ

গৃহের বাহির হইলে চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্ডাই তাঁহার অর্ঘদণ্ড করিয়া থাকেন ।” ( রাজমালা—উপঃ ২৮ পৃষ্ঠা । )

( ১ ) সত্যপীরের জীবনীবিবরণ নানা জনশ্রুতি আছে । তন্মধ্যে অধিকাংশের মতে—মনহর হালক নামধের জনৈক বোগদাদ নগরবাসী সর্দার ‘আমি সত্য’ ‘আমি সত্য’ বলিতেন । তাঁহার এই ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য, কতিপয় গোড়া ঈশ্বর-নিবাসী কর্তৃক অবশেষে তিনি নিহত হন । কিন্তু তখন তাঁহার রক্ত হইতেও সেই বাক্য উচ্চারিত হইতেছিল । এই কারণে তদীয় দেহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার মানসে জালাইয়া ফেলা হয় । কিন্তু সেই চিতাত্মক হইতেও ধ্বনি উদ্ভিত হইতেছিল, ‘আমি সত্য’ ‘আমি সত্য’ ইত্যাদি । কবি রামেশ্বর সত্যপীরের উর্দ্ধ বক্তৃতা দিয়াছেন । তাহার দুই পংক্তি যথা :—

“জগত সত্যপীর বেরা জগত সত্যপীর ।

তেরা দুঃখ দূর করত ও হার করীর ॥”

( ২ ) কবির ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের ‘সত্যপীরের কথা ।’

দ্রীভূত হয়। কোন বিশেষ কারণে প্রসাদ তখনে কাহারও নিবেদন থাকিলে, মন্তকে স্পর্শ করিয়া রাখে।

ধর্মকাম ।—ইহার অল্প নাম “জাপিপূজা”। বিজন অরণ্য-মধ্যে পূজার স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে ভিন্ন বয়ে মুখবন্ধ পূর্বক ভাত পাক করিয়া তথায় লইয়া যায়। বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বে “ঠাকুর” তদভাবে “রত্নী” বা “লোধক” “আগর তারা” পাঠ করেন। অনন্তর পূজাস্থানে পাত্রেপরি একটি অন্নপিণ্ডকে মোচাগ্র আকারে বসাইয়া সূচাগ্র ভাগে অপর একটি ক্ষুদ্রতম পিণ্ড স্থাপন করা হয়। এবং চারিপাশে কলা, ইক্ষু, বাতাসা, মিঠার, ব্যঞ্জন এবং পিষ্টক প্রভৃতি নানা উপচাররাশি সাজাইয়া বিদ্য থাকে। সংকীর্ত্তন আছে, যদি কোন-রূপে ক্ষুদ্রতর পিণ্ডটি অলিত হয়, তাহা হইলে ক্রিয়াকর্ত্তা নিশ্চয়ই অচিরে পঞ্চদশ ব্রত (১) তাহার চতুস্পার্শ্বে ধ্বজা দেওয়া হয়। তখন সঙ্গীক ক্রিয়া কর্ত্তাও নবাগত সকলে সম্মতি প্রদান করিয়া উঠিলে, পুরোহিত (ভিক্ষু, রত্নী বা লোধক) “দাসাপারামি তারা” পাঠ আরম্ভ করেন এবং ক্রিয়াকর্ত্তা ও তৎপরিবারস্থ সকলে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই শাস্ত্র পাঠ প্রস্তাবে নাকি সেই অন্নপিণ্ড হইতে বাষ্প নির্গমন আরম্ভ হয়। অতঃপর ১৪টি কুকুট, একটি শূকর এবং একটি শূকরী বলিপ্রদান করে। তাহার কিয়ৎ পরে দৈব প্রেরিত একটি উর্গনাত আসিয়া অন্নপিণ্ডের চতুস্পার্শ্বে জাল বিস্তার করিয়া থাকে। এই মাকড়সা না আসিলে পূজাও সিদ্ধ হয় না। অপরতঃ যদি উর্গনাত পুরোহিতের পদাঙ্কুঠে সূতা জড়ায়, তবে তাহার আয়ুশেষ জানিবে। এইরূপে পূজা সমাপ্ত। পরে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঠাকুর, রত্নী ও লোধকদিগের ভোজন হইয়া গেলে, প্রধান পুরোহিত ‘সাহসকুলু তারা’ পাঠ করতঃ ক্রিয়া সম্বন্ধ করেন।

হাজার বাতি—তাল কবার সহস্র প্রদীপ। হিন্দুদিগের নীপাহিতা ও এই এই ‘হাজার বাতি’তে বহুল সাদৃশ্য আছে, দুই হইতে দেখিলে এক বলিয়াই মনে আসে। বস্তুতঃ ক্রিয়াস্থলের গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণই বিভিন্ন। বাণ ও বাধারী দ্বারা এমন কার্যকার্য প্রকাশ করা হয় যে, দেখিলে বিশ্বাস লাগে। একদল সরল অথচ সুলভ শিল্প বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। চারিদিকে চারিখানি স্থগঠিত

(১) এই ব্রত প্রস্তুত প্রক্রিয়াও বিধিবদ্ধ আছে। একবার মাত্র বিবাহিতা স্ত্রীলোককে মুখবন্ধ করিয়া ইহা নির্দোষ করিতে হয়।

দ্বার । ভিত্তরে চারিকোণার এবং মধ্যস্থলে মঞ্চসংবলিত পাঁচটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহ, তথ্যও প্রদীপ স্থাপনের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে । এতদ্বিত্তি চতুর্পার্শ্ববর্তীবেষ্টনে কদলীমূলক এবং সারি সারি বাতি সুসজ্জিত হয় । ধ্বজাদণ্ডেও বাতি প্রদানের ব্যবস্থা আছে । সন্ধ্যাপ্রমাগম মাত্রই ক্রিয়াস্থল উজ্জলিত হইয়া উঠে । বাতি সংখ্যা কেবল হাজার নহে, সহস্রে গুণিয়া লইবারও সাধ্য থাকে না ।

সর্বপ্রথমে একখানি “টান্দোন” উৎসৃষ্ট হয় । তদনন্তর অমুঠাতা সহধর্মিণী এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনাদির সহিত সাতবার ক্রিয়াস্থল প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দ্বার সমীপে পূর্বমুখী হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে বসিয়া যায় । স্ত্রীলোকদিগের মাথায় “ধবং,” আর পুরুষেরা গলবস্ত্র ; পশ্চৎ সকলেই ভূমিতলে জাহ্নু পাতিয়া উপবিষ্ট । উৎসর্গকালে ক্রিয়াস্থল ও সমবেত সকলকে বেষ্টন করিয়া সাতগুণ সূতা দেওয়া হয় । ইহাদের বিশ্বাসমতে যাহারা এই সূত্রলহরীর বাহিরে থাকে, ক্রিয়া প্রাপ্তগে উপস্থিত হইলেও তাহারা কোন ফলভাগী হইবে না । পশ্চিমদ্বারের পার্শ্বে একটি গর্ত করিয়া জলপূর্ণকরতঃ ক্ষুদ্রতম সংস্করণে সরোবরে গঠিত করে । “ঠাকুর” বা “রড়ী” তন্তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখে তালবৃন্ত ধারণ পূর্বক ( ১ ) মন্ত্র ও “তারার” পাঠ আরম্ভ করেন । উৎসর্গ সম্পাদিত হইলে কর্তা এবং তদীর গৃহিণী উক্ত সরোবরে যথাসাধ্য দক্ষিণা প্রক্ষেপ করে । তখন উপস্থিত অপরাপর সকলেও স্ব স্ব ভক্তি ও সামর্থ্যমুরূপ দক্ষিণা তাহাতে দিয়া থাকে ।

ধামিং টং—বার্ষিক ভাবার—“ধামিং” অর্থ অন্ন, “টং” অর্থ পর্কত, অর্থাৎ অন্নপর্কত । কেহ কেহ ইহাকে বিস্তৃত বাংলাতে “অন্নমেক”ও বলিয়া থাকে । বস্তুতঃ ‘ধামিং টং’ নাম দেখিয়াই বুঝা যায় যে, ইহা ব্রাহ্মবাসীদের হইতে অমুকৃত । হরিদ্রা মিশ্রিত অন্নদ্বারা চতুর্কোণাকারে কেহ সপ্তন্তর কেহ বা পঞ্চন্তরে পর্কত সাজাইয়া সর্বোপরি একটি অন্নশূঙ্গ স্থাপন করে । তাহা ছাড়া প্রত্যেক কোণারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্নশৈল স্থাপিত হয় । এবং তৎসঙ্গে দ্রুত, চিনি, সিন্দূর, চন্দন, পান, সুপারি, পোশ, নারিকেল প্রভৃতি নানা উপচার দিয়া থাকে । এই অন্নমেক “ঠাকুর” এবং “রড়ীদিগকে” উৎসর্গ করা হয়, এবং সঙ্গে বিশিষ্ট ভোজও চলিয়া

( ১ ) বৌদ্ধমতানুসারে বাহাতে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন না ঘটে, তজ্জন্ত তিস্ত বা ভ্রমণগণ সম্মুখে তালবৃন্ত ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে ।

থাকে। কোন কোন পরিবারে এককালে দুইটা “খামিং টং” উৎসব হয়। তন্মধ্যে এক “খামিং টং”এর ভাতগুটিতে হলুদ মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পরন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দশ পনের দিনেও “খামিং টং”এর উৎসব অন্ন শৃগাল-কুকুরে পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। আখিনের পূর্ণিমা অর্থাৎ “ওরাগ্যা”ই “খামিং টং” উৎসর্গের প্রকৃত সময়। এতদিন বিহু এবং বৈশাখ ও মাঘী পূর্ণিমারও ইহা অম্লমিত হইয়া থাকে।

চক্রবাহ—ইহাও বোদ্ধত্ব। বেড়াবারা বিরাট ব্যহ গঠিত হয়, তাহাতে দুইটা মাজ খার রাখা হয়। দর্শক প্রবেশ করিলে সহজে পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না; মিশাহারী হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শুভদিনে বিশেষতঃ বৈশাখ, আষাঢ় বা আখিনের পূর্ণিমার “রড়ী” “ঠাকুর” প্রভৃতিকে দান দক্ষিণাদি দিয়া এই ব্যহ উৎসব হয়। এই সঙ্গে ছামং-ফারেক শ্রবণ এবং ভোজাদিও চলিয়া থাকে। মধ্যাহ্নে একখানি মঞ্চ করে, তাহাতে রড়ী প্রভৃতি উপবেশন করেন; আর সকলে ব্যাহভ্রমণ হলে জীহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুষ্যোপার্জন করে। পরন্তু তাহাদের এই প্রদক্ষিণও অনেকটা “মহামুনি মন্দির” প্রদক্ষিণের দ্বায়। অপূর্ব কুইধ্বনি সহকারে বিভ্রমবিহ্বল নৃত্য আগন্তকের পক্ষে অতিশয় আনন্দপ্রদ। বিগত ২৪ শে আশ্বিনী বধন ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’র লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুর রাঙামাটিতে শুভাগমন করেন, তখন তিনিও এই নৃত্য দেখিয়া অতীব বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

টাকোনোৎসর্গ—“টাকোন” অর্থ ধ্বজা। টাকাইয়া দেওয়া হয় বলিয়াই ধ্বজা নামান্তরে “টাকোন” আখ্যা পাইয়াছে। সোরা কি দেড়হাত পরিমিত পরিসর বিশিষ্ট ১০।১২ হাত দীর্ঘ নূতন ধবলবস্ত্রে নানা ফুল ‘লতা’ কাটিয়া এক প্রান্তে বাঁশের ‘চাচাড়ী’ নির্মিত ত্রিভুজাকৃতি একখানি “চ্যাজ” বদ্ধ করত অপর প্রান্তে একটি সুদীর্ঘ বাঁশে বুলাইয়া দেয়। কথিত আছে, এই ধ্বজার বাতাসে কত ধূলিকণা স্থানান্তরিত হয়, প্রতিষ্ঠাতার তত্ত্ববৎসর স্বর্গবাস ঘটে। পূজারম্ভের সাপ্তাহিক শ্রাভে, বিহু, ওরাহু প্রভৃতি পর্বে এবং শিঙোৎসর্গ, হাজার বাতি, খামিং টং, চক্রবাহ ইত্যাদি অম্লমিত উপলক্ষে উক্ত ‘টাকোন’ উৎসর্গীকৃত হয়। উৎসর্গকালে “রড়ী”, “ঠাকুর” প্রভৃতিকে পরিপাটি ভোজন এবং দক্ষিণা দান আবশ্যক। আবার একপ্রকারের “ফুল টাকোন” প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যুবকদের জীড়া বিশেষ নাক, ধর্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাতে কাপড়ের পরিবর্তে কেবলই পুশ কাপড় প্রথিত হয়; ঘুর হইতে দেখিতে বড়ই মনোরম দেখায়।

এতদিন গান্ধীদান ও ‘পারবাটার’ শুদ্ধমুক্তি ইত্যাদিও ধর্ম্মার্জন-মানসে  
 গান্ধীদান ও বাটছাড়া। অমুষ্ঠিত হয়। ‘গান্ধীদান’ শব্দেই অমুষ্ঠের কথা  
 বিলম্বিত হইতেছে। শুভদিনে বা কোন ধর্ম্মাহুতান  
 উপলক্ষে “ঠাকুর” কি “রত্নীকে” দক্ষিণাদির সহিত পরস্বতী গান্ধী সম্প্রদান করা  
 হয়। আর পাপমুক্তির কামনাতেই “বাটছাড়া” অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য  
 ‘পারবাটা’র শুদ্ধ বিমুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অবশ্য তন্নিমিত্ত ‘পাটনৌ’কে  
 পূর্বে দাবী-অমুরূপ প্রাপ্য দিয়া বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

এই সমুদয় ব্যতিরেকে চাক্‌মাসম্প্রদায়ে আরও অনেক ক্রিয়ামুষ্ঠান আছে,  
 তৎসমুদয় পারিবারিক কার্যে বা রোগ কি বিপদমুক্তি কারণে করা হইয়া থাকে।  
 ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তৎসমস্ত এখানে উল্লিখিত হইল না,  
 যথাস্থানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।



# অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

## সমাজ-বিধি এবং স্ত্রী-আচার ।

ধর্মের শাসন ছাড়াও সমাজের এমন কতকগুলি বাঁধাবিধি নিয়ম থাকে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে সমাজরক্ষার নিমিত্ত বাহ্য নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তৎসমুদয়কে দৃশকর্মাদির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বটে, তথাপি অবশ্য প্রতিপাল্য জ্ঞানে সকলকেই তত্তৎসমাজের বিধিব্যবস্থাগুলি অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। যে সমাজের তাদৃশ বন্ধন নাই, তাহা কখনই সমাজ-পদবাচ্য হইতে পারে না। সেই সমুদয় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে, সমাজ নিশ্চয় ধ্বংসাস্তিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং সমাজের বিধিব্যবস্থাগুলির মস্তকে বাহ্যর পদাঘাত করিতে চাহে, তাহার। যে কেবল সমাজদ্রোহী তাহা নহে, সমস্ত জাতির অধঃপতনের মূলেও তাহার। স্থায়তঃ দায়ী। আবার যে সকল ব্যক্তি সমাজ বিশেষের ব্যবস্থিত রীতিনীতির প্রতি সমালোচনার কশাঘাত প্রয়োগ করেন, পৃথিবীতে তাহাদের তুল্য অপর কোন নীচমনা জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। স্বয়ং বাহ্য করিতেছি তাহাই সত্য, তত্ত্বিন্ন সমুদয় মিথ্যা, ইত্যাকার ধারণা মনে কখনই আসিতে দেওয়া উচিত নহে।

সাধারণ চাকমাদিগের মধ্যেওঁ বোড়হস্তে অভিবাদনের রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাহার। “সালাম” কথাটিও উচ্চারণ করিয়া থাকে। যতদূর বুঝা যায়, ইহা মুসলমান সংসর্গেরই অপ্রতিবিম্বের পরিণতি। এখানে চাকমাসমাজের হুকা আদানপ্রদানে নমস্কারের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তজ্জনওঁ মুসলমান সমাজের নিকট খলী বলিয়া বোধহয়। পরন্তু ইহাদের সন্মোদন মাথুর্য্যে

নিষ্ঠাচার।

হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ হইয়া থাকে। অপর বরোজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত স্থলে ঠাকুর দাদা সম্বন্ধ বুঝাতে আয়ু (আর্ঘ্য), পিতৃব্য সম্পর্কে “থুয়া” (থুড়া), বড় তাই সম্পর্কে “ডাকু”

(দাদা), বরকনিষ্ঠ যুবক “গাভুর” (১) এবং শিশুকে “চিকণ” (খোকা) বলিয়া আহ্বান করা হয়। বিশেষতঃ ‘ডাঙ্গ’ কথাটি এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত যে, বাকালীগণও ইহাদিগকে সাধারণ সম্বোধনে ‘ডাঙ্গ’ বলিয়া থাকে। এই সকল ছাড়া ইহাদের সমাধে অতিথি অভ্যাগত সেবা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘরে অভ্যাগত উপস্থিত হইবামাত্র প্রথমে পাদপ্রক্ষালনের উদ্যোগ হয়। তৎপরে “সাঁকো” সরিষানে ইন্দ্রোপরি কলসী পূর্ণ জল এবং একটি ঘটা কি মেটে “কোত্তি” রক্ষিত থাকে। অতঃপর পান তামাকাদি এবং যদি বিশেষরূপে জানা থাকে যে আগন্তুক পানেও অভ্যস্ত, তাহা হইলে এই সঙ্গে নানাবিধ মজ্ঞও প্রস্তুত হয়। বিবাহাদি শুভ-কর্মের নিমন্ত্রণকালে—পান, সুপারি, লবঙ্গ প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া থাকে। অধুনা কোন কোন স্থলে এ সকলের পরিবর্তে পরিবার প্রতি এক একটি পরমা দ্বারা ‘মানাইয়া’ নিমন্ত্রণ করিতে দেখা যায়। নিমন্ত্রণে বংশও মর্যাদা বিশেষদেই বসিবার স্থল নির্ধারিত হইয়া থাকে। অতঃপক্ষে সম্পর্কের সম্মানও গণনা করা হয়। সমশ্রেণীর দুই তিন জন মিলিয়া একত্রে আহার করিতেও ইহারা কিছুমাত্র

সঙ্কচিত হয় না। বিশেষতঃ ‘চিকণ’ গুলি বয়োজ্যেষ্ঠের সহিত থাইতে কোন আপত্তিই হইতে পারে না। অধিক

কি, সম্পত্তির একত্র ভোজনও সাধারণ পরিবারে বিরল নহে। কিন্তু জীলো-কেরা প্রায় স্বামীক পূর্বে খায় না। তবে কিনা যখন তাহাদিগকে কার্যে বাহির হইতে হয়, অথচ স্বামী ঘরে থাকে না, তখন তাহারা বাধ্য হইয়া অভ্যস্ত স্বামীকে কেলিয়া খায় বটে, কিন্তু পূর্বে স্বামীর নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া “মোচা” (পুটুলী) বাধিয়া রাখে। তৎকালব্যৱসায় প্রতি ইহাদের একটা বিশেষ সাবধানতা দেখা যায় যে, বিড়ালের মুখস্পর্শ ঘটিলে তাহা বিষবৎ পরিবর্জন করে।

কেশ ভূষণে ইহারা নিতান্ত অসৌভাগ্য হইলেও চুলের প্রতি ইহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায়। অনেক পুরুষ বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকেরা চুল রক্ষা করে (২); অবশ্য শিক্ষিতগণ এই ব্যবস্থাবান নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর সন্তান মাত্রেই

(১) পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থলে অত্মাপি “গাভুর” শব্দটি যুবক বা বলশালী, কোথার বা মজুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) পুরুষদিগের চুল রক্ষা পুরাকালেও বিরল ছিল না—

“গলার নামের সৈন্ত নাহি বাঁধে কেশ”—কৃত্তিবাস।

“পরম হৃদয় লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল”—বিজয় গুপ্ত।

চুল কেলিয়া দিবার বিধি আছে বটে, কিন্তু যুতবৎসা সারীর যত্নাদি করিবার

চুলে বহু ।

পর যে পুত্র অঙ্গগ্রহণ করে, তাহার চুল একগুচ্ছ

কোন দেবতা উদ্দেশে রাখিয়া দেওয়া হয় । পরে

পুত্র বয়স্ক হইলে উদ্দিষ্ট দেবতার মানং দান করিয়া সেই চুল কেলিয়া দেয় ।  
এতদন্তর পিতা মাতার মৃত্যুতে ‘হাড় ভাঙ্গাইবার’ পরে মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা  
আছে । ইহাদের মহিলাগণ চুল পেছন দিকেই আঁচড়ায় । সিঁতি কাটে না  
সত্য, কিন্তু পশ্চাদিকে খোঁপা বাধিয়া থাকে । এবং বালিকারা তাহা মনোহর  
বনফুলে সজ্জিত করে । বস্তুতঃ জানিনা কেন, সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই  
কেশের প্রতি কামিনীদিগের আদর রহিয়াছে । চাক্ষুস সম্প্রদায়ে সুদীর্ঘ কেশ  
রাশি মণ্ডিত কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই, চুল ভিজিবার ভয়ে ডুব দিয়া স্নান করে না ;  
হয় সাত দিন অন্তর সুবিধা মত সময়ে ক্রমক তন্ন বা লতা বিশেষের নির্ঘাস  
দ্বারা চুল পরিষ্কার করিয়া লয় ।

ইহাদের চুখন-প্রথারও অভিনবত্ব আছে । অধরে অধর মিশাইয়া শীৎক্রান্তির

চুখন বিধি ।

পরিবর্তে গুণ্ডস্থলে মুখ স্পর্শ করিয়া জোরে নিশ্বাস

গ্রহণ করে । ইহা কতক পরিমাণে আমাদের শিরো-

জ্ঞাণের অসুস্থকৃতি হইবে ।

পার্কটীর জাতির অনুষ্ঠান যুবকগণ রাজিকালে প্রায়ই বাড়ীতে থাকে না ; গ্রামের  
সকলে মিলিয়া “ক্যাং” বা অপার কোন গৃহে রজনী যাপন করে । তাহাতে সেখানে

অনুষ্ঠানসমিতি ।

তাহাদের বথেছ আমোদ প্রমোদ করিবার সুবিধা

বটে । তাহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে ;

দলের সকলেই তদার আদেশ পালানে বাধ্য । পরন্তু দলভুক্ত দিগের চরিত্র রক্ষার  
নিমিত্তও তাহার দায়িত্ব থাকে, তজ্জন্ত সে সকলেরই চরিত্রের উপর সুতীক্ষ্ণ নজর  
রাখে । মিঃ হার্ণটার লেখার দেখা যায়, সাঁওতাল Annals of Rural  
দিগের মধ্যেও এতাদৃশী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । Bengal, P—217.

ছোটনাগপুরের কোণদিগের বর্ণনাতেও কর্ণেল ডেটন লিখিয়া গিয়াছেন,  
“প্রতি গ্রামেই অবিবাহিত যুবকদিগের রাজিবাসের নিমিত্ত এক বস্ত্র গৃহ থাকে ।  
তাহার সমুখে বিতীর্ণ বোলা জাঙ্গা রাখা হয় ; সেখানে তাহারা নানাবিধ ক্রীড়া  
করিয়া থাকে । দলের বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকগণ কনিষ্ঠদিগের উপর আধিপত্য করে ।”  
অজ্ঞাত্য টাংচ্যা। অর্থাৎ বৈৎন্যক সম্প্রদায়েও স্বেচ্ছা প্রথা সাধারণ, কিন্তু চাক্ষুস-  
দিগের মধ্য হইতে ইহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে । রাজিতে “আমের”

অবিবাহিত যুবকগণ “ক্যাং” : বা কোন নির্দিষ্ট গৃহে থাকে বটে, কিন্তু কোন দলপতির ব্যবস্থা এক্ষেপে আর নাই ।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্বজাতীয় অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের অবাধ-মিলনে প্রায় কেহই হস্তক্ষেপ করে না । পিতা মাতা বা অপরাপর অভিভাবকগণ তাহাদের আশ্রয়-

অবাধ মিলন ।

প্রমোদে বাধা দান অসম্ভব মনে করে এবং তাহা “গাভুর মিলার বিয়ুতি” অর্থাৎ যুবক যুবতীর আশ্রয়-জ্ঞানে নিজেরা সরিয়া যায় । কোন কোন অভিভাবককে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি “বরসের সময় আশ্রয় আশ্রয় করিবে তাহাতে আপত্তি কি ? তখন আমরাও কি করি নাই ?” কোন কোন কস্তার পিতা এবংবিধ সংমিলনে প্রেরণ দিয়া হুহিতার পাণিপ্রার্থী যুবকগণকে খাটাইয়া লয় । একবার জনৈক শিক্ষক কোন বালককে এক্সপ অর্থে সঙ্গমের নিমিত্ত শাস্তি দিয়াছিলেন । তাহাতে বালিকার অত্যন্ত অভিভাবক অতিশয় হুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন “মাঠারবাবু, তনিকাম আপনি নাকি × × কে শাস্তি দিয়াছেন, কিন্তু দেখুন,—সে এমন অস্ত্রায় কাজ ত কিছুই করে নাই ।” তখন শিক্ষক মহাশয় গতিক বুঝিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, “কাজ অবশ্য অস্ত্রায় না হইলেও তাহাদের বরসোচিত হয় নাই ।” সত্য বলিতে কি, এই শ্রেণীতে বিবাহের পূর্বে অনেক যুবতীরই এক বা ততোধিক প্রণয়ী থাকে এবং অধিকাংশ স্থলে এই বনিষ্ঠতা হইতেই বিবাহ ঘটিয়া যায় । কিন্তু বিবাহের পর আর কাহারও চরিত্র দোষ তনা যায় না ; এবং ইহাও বিশেষ প্রশংসার কথা, বিজাতীয়ের সহিত উপগতা চাক্কা রমণী এত বিরল যে, নাই ধরিয়া লওয়া যায় । সহস্র প্রলোভনেও নাকি তাহার বিজাতীয়ের প্রার্থনা স্মরণ সহিত উপেক্ষা করে, ইহাও কম প্রশংসনীয় নহে ।

স্বজাতীয় হইরাও যুবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি কেহ তাহাকে লইয়া পলারন করে, তবে সেই উচ্ছ্রাল যুবকের ৬০ টাকা পর্যন্ত অর্থও হইতে পারে ।

এতদতিরিক্ত যুবতীর পিতৃগ্রামবাসী ছেলেদের হইতে ব্যক্তিচারে হও ।

‘উত্তম-মধ্যম’ ‘অর্দ্ধচন্দ্র’ প্রভৃতি ‘উপরি’ লাভও আছে । আর কোন ব্যক্তি সম্মতি সহকারেও অন্তের বিবাহিতা পত্নী লইয়া পলারন করিলে, তাহাকে ৪০ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং প্রণয়িনীর দ্বারা স্বরূপ তৎস্বামীকে তাহার বিবাহকালীন বাবতীর ব্যয় দিতে হয় ; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়িনীর উপর খাস দখলের অধিকারও লাভ করে । যেহী, খুড়ী প্রভৃতি কতিপয় নিকটতম সম্পর্কের মধ্যে, অবৈধ প্রণয় সংঘটিত এবং

প্রকাশিত হইলে উভয়েরই ৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও শাস্তির শাস্তি বিহিত হয়। যদি চাক্ষুস রমণীর সহিত কোনও বিজাতীয় পুরুষের গুপ্ত প্রণয়ের প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অপরাধী গ্রামের সকলকে একটি শূকর দিয়া পরিপাটিক্রমে নিমন্ত্রণ খাওরাইতে বাধ্য হইয়া থাকে। নিমন্ত্রণের লোভে অনেকেই তাদৃশ ঘটনা আবিষ্কার করিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখে; পক্ষান্তরে বিজাতীয় দৃষ্টান্তগণও “শূকর দেওয়া” রূপ লজ্জাজনক শাস্তির ভয়ে তেমন পাপ কামনা মন হইতে দূর করে।

যে কোন অভিযোগ প্রথমে “হেডম্যান” সমীপে উপস্থিত হয়। তিনি স্বীয় ক্ষমতাতীত বিচার-ভার রাজাবাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজাও আবার

আপন ক্ষমতা বহির্ভূত বুলিলে তাহা সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিচার।

বাহাদুরের কাছে পাঠাইয়া থাকেন। সালিসী

বিচারে যদি কোনও অভিযোগের প্রকৃত দোষী নির্ণয় হুজুহ হয়, তখন এক অভিনব প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। একসের পরিমিত চাউল পরিপূর্ণ একটা পাত্র “কাং” মধ্যে পবিত্র বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে একরাত্রি রাখিয়া দেয়। পরদিন অতি প্রভাতে সকলে সমবেত হইয়া সন্দেহযুক্ত অপরাধীকে সেই পাত্র হইতে একমুঠি চাউল চিবাইতে দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি নির্দোষ হইলে ইহাতে তাহার কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু যদি দোষী হয়,—তবে সে কেবল চিবাইতে অসমর্থ হইবে এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে নাকি তাহার রক্তবমন আরম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রমাণিত অপরাধীর প্রতি শাস্তি-পরিমাণ গুরুতর হয়। দোষী অর্থদণ্ড দিতে অসমর্থ হইলে প্রাচীন নিয়মাত্মক নিজেস্ব মজুরী হিসাবে নির্দ্ধারিত কালের নিমিত্ত বিচারকের দাসত্ব গ্রহণ করে।

অবশ্য বিরল হইলেও বিবাহবন্ধনচ্ছেদ এই সমাজে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে। সাধারণতঃ ইহাদের পুরুষেরা কিঞ্চিৎ অধিকতর কামাতুর, স্ত্রীর তাহারাই সর্বসংস্রবতঃ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সহিংসতার মাত্রা অতিক্রম করিলে, ইহার প্রাণরক্ষার প্রতি শাস্তিবিধান করিতেও ছাড়ে না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার

গলিয়া যায়। কল কথা, ভাবার বাহাকে স্ত্রৈণত্ব বলে,

দাম্পত্য বিচ্ছেদ

(Divorce)।

ইহাদের সমীপে তাহা নিন্দনীয় নহে। তথাপি প্রায়শঃ

মহিলাগণ কোন কারণে স্বামীর সহিত মনোমালিন্য

ঘটিলে, অমনি তাহার সংসর্গ-বিমুক্তির নিমিত্ত হেডম্যান সমীপে প্রার্থনা উপস্থিত করে। এমন কি, স্বামী যদি মনোমত্ত রসজ্ঞ না হয়, তরিসমিত কোন কোন ভামিনী স্বামীর উপর পুরুষ-হীনতা আরোপ করিয়া বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ

প্রার্থনা করে। হেড্‌ম্যান জেদুশ বিচারে গ্রামের দশ বয়োবৃদ্ধের সহিত পরামর্শ করিয়া নিষ্পত্তি করেন। বিচারকালে কোন কোন স্থলে তাহাদের দাম্পত্যপ্রণয়ের গভীরতাও পরীক্ষিত হয়। কাণ্ডেন লুইন এবং বিধ রহস্যময় একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা—“একদা সন্ধ্যার সময় কয়েকজন পল্লীবাসিনীর সহিত কোন রমণী জল আনিতে নদীতে গিয়াছিল। এমন সময় তাহার স্বামী অপর যুবতীগণকে পরিচিত জনৈক যুবকের সহিত হাসি-তামাশা করিতে করিতে তৎপ্রান্ত জল ছিঁটিতে দেখিতে পায়। সে ইহাতে নিজ প্রেমিণীরও চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়া তখনই সেই যুবককে নানা ভৎসনা এবং সকলেরই সম্মুখে ত্রীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। তাহাতে যুবতী অতিশয় মর্দ্যাহতা হইয়া এই স্বামী পরি-  
ত্যাগের নিমিত্ত হেড্‌ম্যানের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। হেড্‌ম্যান ও গ্রামের অপর বৃদ্ধগণ প্রথমে নানারূপে তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। অবশেষে তাহারা পরামর্শ করিয়া সেই শীতকালে বিনা শয্যায় দম্পতিকে এক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রাতে আসিয়া দেখিলেন, যুবতী তথাপি বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের প্রার্থনা করিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা যুবতীকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ৩০ টাকা অর্থদণ্ড করতঃ বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ অনুমোদন করেন।” (১) এইরূপে যাহার দোষে দাম্পত্য-প্রণয় ছিন্ন হয়, তাহাকেই দণ্ডভোগ করিতে হইয়া থাকে। পুরুষেরাও এ কার্যে প্রার্থী হয় না, এমন নহে; তবে সচরাচর খুব কম এবং তাহা সহজেই মীমাংসিত হইয়া যায়। হেড্‌ম্যান যে সমুদয় বিচার গুরুতর উপলব্ধি করেন; তৎসমস্ত রাজ-সরকারে পাঠাইয়া থাকেন। এখানে এই বিচারের নিমিত্ত একখানি বর আছে, তাহাতে দম্পতিকে নির্দিষ্ট কয়েক মাসের নিমিত্ত থাকিবার আদেশ হয়। হয়তঃ ইহাতেই পরস্পরে মিলিয়া যায়, অতথাৎ যথাবিধি বিচার মীমাংসা হইয়া থাকে।

(১) এসম্বন্ধে বাসিরাদিগের এক কোঁতুললোকীপক ব্যবস্থা আছে। তাহাদের দাম্পত্য বিচ্ছেদের সময় উভয় পক্ষের আত্মীয় বান্ধবেরা উপস্থিত থাকা আবশ্যক। ত্রী স্বামীকে একটি পরস দেয়, স্বামী তাহা নিজ হইতে আর এক পরস সহ ত্রীকে ফিরাইয়া দেয়। ত্রী পুনঃ ছই পরসই স্বামীকে প্রত্যর্পণ করে, সে উহা কেলিয়া দেয়। তখন এক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে সমগ্র পরিতে তাহাদের দাম্পত্য বিচ্ছেদ সংবাদ ঘোষণা করিয়া থাকে।

চাক্ৰমাসমাজে অবরোধপ্রথা অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও ভাগিনের বধু এবং ভাত্রবধু সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বিধি-নিষিদ্ধ। বোধ হয় এই সমুদয় হিন্দু সমাজেরই সংসর্গজাত কল। কিন্তু আবার সন্দেহ স্পর্শনবিধি। হয় যে, ভাত্রবধুকে স্পর্শ করা যখন প্রায় বাবতীয় পার্কতে জাতির মধ্যেই বারিত রহিয়াছে, এমন কি—সর্ববাহুল্যসম্বত আদিম বর্কর সাঁওতালদিগের ভিতরেও এই বিধি অতি সাবধানে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তখন ইহাতে হিন্দুসমাজের কতদূর দাবী আছে? আর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহাদের মধ্যে বেরদের “পিঁধন” কাগড় পুরুকেরা পাকত্বকে ছোঁয় না।

বিবাহের পূর্বে ঋতুদর্শন ইহাদিগের মধ্যে নিন্দা বা লজ্জাকর নহে। তবে কিনা এই রজস্বলাকালে বতদিন “গায়ের পানি ভাঙে”  
“গায়ের পানিভাঙন।”  
অর্থাৎ রক্তস্রাব থাকে—সচরাচর তিনদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অন্তচি ধরা হয়। সাধারণ স্পর্শদোষ ধরা না হইলেও অপরের ঘরে কি ধর্মকর্মে যোগদান করিতে পারা যায় না। এবং এই সময়ে প্রায় পরিবারে তাহাদিগকে পাক করিতেও দেওয়া হয় না।

গর্ভিনী ইচ্ছামত খাইতে পায়, তাহার ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা এক বুড়ি শুদ্ধ মৃত্তিকা আনিয়া প্রসূতির শয্যা-পার্শ্বে রাখে, এবং শুধুপরি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। পাঁচ দিনের মধ্যে এই অগ্নি নির্ঝাপিত হইতে ঘের না। অতঃপর মাটিও কেলিয়া  
ধেওরা হয়। যদি প্রসবের সময় সবিশেষ কষ্ট হয়,  
গঙ্গাপূজা।  
একটা ছাগল প্রসূতির মাথা “নিছিয়া” নদীতে

বলি প্রদত্ত হয়, ইহারই নাম গঙ্গাপূজা।

প্রসবের দিন হইতে ১৫ দিন যাবৎ প্রসূতি অন্তচি থাকে। রজস্বলাকালের জায় তাহার। এই কয়দিন সংসারের সমুদায় কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

জাতাশৌচ ও এসবে  
ব্যবস্থা।

পরন্তু কেবল প্রসূতি নহে, সন্তানের পিতাও এই পনের দিন এবং “ওকা” (বাঁজী) বধুজাত সন্তানের নাতী খলিত হওয়া পর্যন্ত অপৌচ জ্ঞেয় করে।

এই সময়ে তাহার। ক্যং ঘরে বা কাহারও পূজাগৃহে উঠিতে পারে না। অপৌচ্যভাৱে সকলে “ঘিলা-কুচোই-সোনাকুপা”র জল দিয়া পবিত্র হয়। বলিতে তুলিয়াছি, রজস্বলা কি প্রসবের অনধিক পরেই স্নানের ব্যবস্থা

আছে (১) । সন্ধ্যার প্রসবের পরদিন প্রহতি “কানি বেনা” (২) লইয়া নিকটবর্তী খালে স্নান করিতে যায় । সংস্কার আছে, খালে গিয়া স্নান না করিলে প্রহতির স্তম্ভ হয় না । তত্তির প্রহতির খাত্ত পানীরের প্রতি কোন বাধা ব্যতিক্রম থাকে না । কানীন সন্তান অগ্নিবার সম্ভাবনা ঘটিলে, তৎপ্রসবের নিমিত্ত পৃথক “ছেলেফুটানী ঘর” আবশ্যক । কারণ সেই গৃহ আর কোনও কার্যে ব্যবহৃত হয় না । অবশ্য ব্যক্তিচারী ব্যক্তির স্বক্কেই সেই ব্যয়ভার পড়িয়া থাকে ।

সাপ্তাহিক শ্রাক পর্যন্ত ইহাঙ্গির অশৌচ গ্রহণ বিধি । গোষ্ঠির ভিতর বনিষ্ঠ সম্পর্ক মাঝেই অশৌচ পালন করে । এই সময়ে ইহার নিরামিষ ভোজন এবং

অশৌচ বিধি ।

বিলাস বাসনাদি ছাড়িয়া কাল কাটার ; পতি বিরোগ-বিধুরাগণ কোন অলঙ্কারই ধারণ করে না । বুধতী বিধবাগণ স্বামীর অশৌচান্তে পুনরায় অলঙ্কার সজ্জা করে বটে ; কিন্তু অনেকেই “হাঁচুলী” ( গলভূষণ ) আরতি চিহ্ন জ্ঞান করিয়া ধারণে বিমূখ হয় । বুদ্ধা বিধবাঙ্গির কোন গহনাই থাকে না এবং পরিধানেও কেহ কেহ হিন্দু বিধবার তায় ধানের কাপড় ব্যবহার করে ।

ইতিপূর্বে আমরা “ঘিলা কুচোইর পানি”র কথা নানা অমুষ্ঠান বর্ণনা প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি । অন্তর্চিত দূরকরিবার ইহাই একমাত্র উপ-

“বুর পারন ।”

করণ । ঘিলা ও কুচবাটা, জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সোণারূপা ধৌত জল এবং কিঞ্চিৎ মৃত ও প্রদান করা হয় । ইহাই “ঘিলা কুচোইর পানি” আখ্যায় কথিত হইয়া থাকে । এই জলে দক্ষিণ জুলপি বা মস্তক বিধৌত করিলেই পবিত্রতা সাধিত হইয়া যায় । এইরূপে বিশুদ্ধ হওয়ারকে “বুরপারন” বলে । নদী তীরেই এইকার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । অমুষ্ঠানান্তর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পশাদিকে অবলোকন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ । বৎসরে অন্ততঃ একবার হইলেও প্রত্যেকের “বুর পারন”

(১) চৈত্রমাসীনঙ্গির মধ্যেও ঈদুলী প্রথা রহিয়াছে । তাহার কলে প্রায় প্রতি গৃহেই স্তৃতিকা-স্নান করিয়া জিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রহতির রক্ত শোষণ করিতেছে । এইরূপে কত অবলা যে নিরত যত্নের কোলে আশ্রয় লইতেছে, তাবিলেও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে । কিন্তু হায়, বেশকলীর দৃষ্ট তথাপি এই বিকে পড়িতেছে কই ?

(২) “কানি-বেনা”—নেকড়ার দড়ি । ইহার একপ্রান্ত অগ্নিসংযুক্ত করিয়া প্রহতি সঙ্গে নের, নতুবা ভূতাদি হইতে ভয় পাইবার সম্ভাবনা আছে ।



অর্থাৎ “মাথা ধোওয়া” অবশ্য কর্তব্য । তাহা হইলে আর কোন আপদ বিপদের সম্ভাবনা থাকে না । সচরাচর ইহা বৎসরের প্রথমেই করিয়া লওয়া হয় । পূর্বে এই উপলক্ষে চাকমারাজ ১লা বৈশাখ ওরা ও অপরাপর লোকজন সমভিব্যাহারে সপরিবারে নদী তীরে গমন করিতেন । ওরা পূজাতে ছাগ মোরগাদি বলিদান করিলে উপরোক্তরূপে সকলেরই বিমুক্তি সম্পাদিত হইত । অনন্তর ওরা কতিপয় প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিলে রাজা বাহাদুরও তৎসমুদয় সঙ্গে সঙ্গে পুনরুচ্চারিত করিতেন । পরিশেষে রাজা অতীত কাণ্ডের জ্ঞাত কমা এবং নবাগত বৎসরের নিমিত্ত সুবিধান প্রার্থনা করিতেন । সজ্ঞাত পরিবারস্থ আর সকলে দ্বিতীয় এবং অপর সমুদায় পরবর্তী যে কোনদিন নির্বাচনে স্ব স্ব পরিবারের “বুরপারন” কার্য সম্পাদন করিত । আজ কয়েক বৎসর হইতে রাজা বাহাদুর প্রাপ্ত বয়সে বালির সহিত পূজা করেন না, ঐ দিনমাত্র ভগবানের নামাদি গ্রহণে অতি পবিত্রভাবে কাটাইয়া থাকেন ।

কাহাকেও ব্যাঘ্রে হত্যা করিলে জাতির সকলেই তজ্জন্ত অশুচি থাকে । তজ্জন্ত যথানিয়মে বিশোধন ব্যবস্থা না করিলে এক বৎসরের মধ্যে সেই ব্যাঘ্র পুনরায় সগোত্রজ এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিহত করে । এই কারণে গোঞ্জির সকলে পরামর্শ করিয়া যথাসম্ভব সম্বরে এক দিন নির্দিষ্ট করে, এবং সেই দিন সকলে এক স্থানে বা নিত্যন্ত অসুবিধা জনক হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়া নদীতটে এক খানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত পূর্বক ওরা দ্বারা তাহাতে পূজা করায় । এই পূজা গৃহে অপর কাহারও অবস্থানাধিকার থাকে না । পূজার সমাগত প্রত্যেক পরিবার এক একটি কুকুট এবং যে পরিবারের লোক নিহত হইয়াছে, তাহাদের হইতে একটি ছাগল বলিদান করা হয় । এ সময়ে “বড়কুক্ক” এবং “ছোট কুক্ক” “তার”ও পঠিত হইয়া থাকে । অনন্তর পুরোক্ত “ঘিলাকুচোইর পানি”তে বলিজাত কিঞ্চিৎ রক্ত মিশ্রিত করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাহাতে দক্ষিণ জুল্পী ধৌত করে এবং পরিশেষে সেই কেণ ধৌত জলপূর্ণ পাত্র নদীতে ডাসাইয়া দেয় ।

কাহারও গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলে নদীতীরে “বুরপরা পূজা” করিয়া

বুরপরা পূজা ।

সাতটা কুকুট এবং একটি ছাগল বলিদান করা হয় ।

পরে উক্তরূপে সেই বলিজাত শোণিত “ঘিলাকুচোইর পানিতে” বিশাইয়া তদ্বারা পরিবারের সকলে মানসিকচেনার পথ্যাক্রমে দক্ষিণ

জ্বলন্ত বিদ্যোত করে। অনন্তর ক্রিয়াকর্তা “ওয়াকে” একটি টাকা, একখানি গামছা, একটি কুর্কট, একবোতল মদ এবং একটি অসুন্নীয়ক বক্ষিগায়ত্রী প্রদান করিয়া সপরিবারে আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অর্ঘ্যপ্রদানের নিমিত্ত ইহাদের সমাজে তণ্ডুলোদক ব্যবহৃত হয়। অতি সামান্য পরিমিত তণ্ডুলের সহিত সেই জল শাস্তি অর্ঘ্য ও আশীর্বাদ প্রদানের জন্যও ব্যতিত হইয়া থাকে। আশীর্বাদ প্রদান করিবার সময়ে তণ্ডুল এবং বীজহীন কার্পাস তুলা নিষ্ঠাবন-সংপৃক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

---

# নবম পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] দশকর্ম—প্রাথমিক কর্তব্য ও বিবাহ ইত্যাদি ;

এবং

[ ২ ] অন্ত্যেষ্টি, হাড়ভাসান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান ।

[ ১ ]

যদিও চাকমাগণ এক সময়ে হিন্দুধর্মের অধিকারে ছিল, কিন্তু গুত্ব করেক বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রবল সংঘর্ষণে দশাচারের অনেকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার বিভিন্নধর্মের সাহচর্যে দু'একটি অভিনব অনুষ্ঠানও এই সমাজে

সংক্রামিত হইয়াছে। কর্মসংখ্যা নিতান্ত বহুল না দশকর্ম।

হইলেও অতিশয় বিশৃঙ্খল। এমন কি, সাধারণ এবং সজ্ঞাত পরিবারের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পার্থক্যের প্রকৃতি নির্দেশ করিলে স্থলতঃ বলা যায়, সজ্ঞাত অর্থাৎ উন্নত সম্প্রদায় আপনাদের ক্রিয়াকর্মে যথাসাধ্যরূপে হিন্দুধর্মের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন, সাধারণ বুল এ বাবৎ ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ফলে তাহাদিগের মধ্যে নানা উচ্ছৃঙ্খলাচার প্রচলিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি যে প্রধান ভিত্তির উপর অনুষ্ঠিত হয়, যতদিন পর্য্যন্ত সেই ধর্ম সন্মুখে কোম এক মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া না যায়, ততদিন ইহাদের মধ্যে এক অভিন্ন-আচার চলিবার আশা নাই। বর্তমানে উন্নত সম্প্রদায়েরা সমাজের মধ্যে একটা 'সংস্কার' আন্দোলন করিবার চেষ্টা করেন, আর সাধারণ সকলের তাহা গ্রহণ করিয়া উঠিতে অনেক দিন চলিয়া যায়, ইহাই পরম্পরের মধ্যে পার্থক্যতাবের একমাত্র কারণ। যাহা হউক এ স্থলে সাধারণ ভাবে উন্নত সম্প্রদায়েরই কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করা হইল।

প্রাথমিক কর্তব্য।—পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয় বন্ধনকে জোড়জনমান এবং

অবস্থাবিশেষে বাকী পোড়ান প্রভৃতি আত্মবৃত্তিক উৎসবও চলিয়া থাকে । কিন্তু হুহিতা লাভে এবিধ অনুষ্ঠান অতি অল্পই ঘটে । নামকরণ ও অন্নপ্রাশন । নামকরণ বলিয়া ইহাদের কোনও ক্রিয়াবিশেষ নাই । অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন বৈবীণ্যতির উপর ভারাপণ করিবার ব্যবস্থাও দেখা যায় না । পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধগণ স্নেহগর্ভ সংকীর্ণ নাম নির্বাচিত করে ; তাহাই শেষে ‘ভাক নাম’ হইয়া দাঁড়ায় । নিত্যকৃত বিকৃত ও নাইলেও তাদৃশ নামে সন্তানের প্রকৃতি উপলব্ধি হয় । যথা, “বুঝা” ( বুড়ে ) নামে বুঝা যায়—ছেলেটা বড়ই অলস, এবং “পিড়াতাড়া” নামের ব্যক্তির ভাবে যে কোনদিন “পিড়া” ( পিড়ি ) ভাবিয়াছিল অর্থাৎ সে যে হুলকার, সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় । জন্মস্থান বিশেষেও নামকরণ হইয়া থাকে । যেমন, “বড়কনে” জন্ম হইলে পুত্র “বড়কল্যা” এবং কন্যা “বড়কলী” নামে আখ্যাত হয় । কালের কবলে অনেক পুত্র কন্যা হারাইয়া যদি পরিশেষে কোন সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলে সেই সন্তানের জন্ত অতি জঘন্য নাম নির্দেশ করা গিয়া থাকে । বিশ্বাস—তাদৃশ নামে যমেরও ঘৃণা হইবে ! শেষে সন্তান বয়স্ক হইলে স্বীয় পছন্দানুরূপ বা গুরুগণ কর্তৃক একটা সত্যভাব্য নামে আখ্যাত হয় । অনেক স্থলে স্কুলে ভর্তি হইবার সময়ে শিক্ষকগণই শিশুদিগের বিকৃত নাম পরিবর্তন করিয়া লইয়া থাকেন । আবার পিতা মাতা কর্তৃক এমন নামসকলও নির্বাচিত হইতে দেখা যায়, যেন তাহাতে সন্তানের জীবন দীর্ঘ ও গৌরবশূন্য হয় । এই আশার প্রায় সন্নিধান এবং মহাত্মারতোক্ত নামই রাখা গিয়া থাকে । কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর নামেও অনেকে সন্তানের নামকরণ করে । তাহা অজ্ঞানিলের ভ্রান্ত কঁকতালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কামনার নহে ; ইহারা আশা রাখে, সন্তানকে শুভ্রাম্বের দেবতা অনুগ্রহ করিবেন । এইরূপে চাক্ষু সমাজের প্রায় সবস্ত নামই হিন্দুশ্রদ্ধাভিধর্মিত । অন্নপ্রাশনেরও কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই ; শুভরাত্রি তজ্জন্ত অনুষ্ঠানবিশেষেরও প্রয়োজন হয় না । সন্তানের অনেক দিন ধরিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করিতে থাকে । তিন বৎসরের শিশু তাহার কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর সহিত স্তন্যপান করিতেছে, এ হেন দৃশ্য বিরল নহে । পরন্তু ইহাদিগের এক প্রধান বিশেষত্ব যে, কোন রমণী অপর রমণীর গর্ভভাত শিশুকে স্বীয় দুগ্ধ প্রদান করে না ; এমন কি শিশুর মাতা পীড়িতা হইলেও নহে ।

কর্ণবেধ ।—কর্ণবেধের প্রথা থাকিলেও ইহাদের ইহাদের সর্বাঙ্গে ‘কর্ণবেধ’ বলিয়া কোনও ক্রিয়া বিশেষ নাই । উক্ত পরিবারে এই উপলক্ষে মাত্র আনন্দ

আত্মদানাদি করা হয়; তা' ছাড়া ধর্মার্থে কিছুই অতুষ্টিত হয় না। সাধারণতঃ সন্তান ছয় সাত বৎসরের হইলে সিং বা অন্তর্গত যন্ত্রবৃক্ষের কণ্টক দ্বারা কান ছখানি ছিদ্র করিয়া লয়। পুরুষেরা দুই কানে দুইটাবার ছিদ্র করে, কেহ কেহ তাহাতে রূপার আঙুটী ধারণ করে। নতুবা ছিদ্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করেই না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের দুই কানে অন্যান্য বার এবং বাম নাগিকায় একটা ছিদ্র করাই সাধারণ নিয়ম। বাস্তবিক অবলাগণ গহনা পরিধানের নিমিত্ত কিম্বদন্তি নির্ভররূপে ক্ষতবেধনা সহ্য করে। ইহা যে কেমন গম্ভীর বুদ্ধিতে আসে না।

দীক্ষা।—আট নয় বৎসরের সময় শুভদিনে সচরাচর বিবৃৎ বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং মাঘের পূর্ণিমার বালকগণের “চা-মনি” অর্থাৎ দীক্ষা হয়। “ঠাকুর” (তিতু) তদভাবে “রড়িগণ” (শ্রমণেরা) এই দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষাপ্রার্থীগণ পূর্বাঙ্কে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া বখাবিধি পবিত্রতা সাধন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্বক সপল্লব ঘট-দীপ-তুল ইত্যাদি সমুখে পশ্চিমাত্ম হইয়া উপবেশন করে। অনন্তর সপ্তশুভ সূর্য দ্বারা এ সমুদায় বেষ্টন করতঃ তৎপ্রান্তবর হস্তে লইয়া “দশলীল” আচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অবশেষে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত ও গুরুদক্ষিণা দান করিয়া শ্রমণ ব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু ইহার কৃচ্ছ্রসাধাত্মক অধিকদিন পালনে অনেকেই পরাভূত হয়; অধিকাংশ সকলে সাত দিন মাত্র আচরণেই ক্লান্ত মনে করে। আর বাহারা বাবজীবন এই ব্রহ্মচর্য ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে; তাহারা প্রথমে “রড়ী” এবং সিদ্ধ হইলে “ঠাকুর” আখ্যা পায়। চাক্ষুসভার প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, স্ত্রীলোকদিগের দীক্ষা ব্যবস্থা নাই।

যৌবনোন্মোহ।—বালিকাগণ ত্রয়োদশ বৎসরে এবং বালকেরা বোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে যৌবনের অধিকারভূক্ত হয়। কেহ কেহ রোগ-জীর্ণতার সকলের সহিত অগ্রসর হইতে পারে না। আবার অনেকে ‘ইচ্ছুকই থাকিয়া’ যায়। সাধারণ-শ্রেণীতে—কোন বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠে, তখন সে অনন্তনির্ভরতার “কুম” কর্তন করে। ইহাই সেই যৌবনপ্রাপ্তির প্রধান নিদর্শন। (১) পুত্রের যৌবনপ্রাপ্তিতে পিতামাতা প্রতিবেশী এবং অগণ্যসংখ্যক আত্মীয় স্বজনাদি লইয়াই আনন্দ-উৎসব করিতে বাধ্য।

(১) মন ও ত্রিশ্রুতাপদের এই যৌবন প্রাপ্ত সন্তান “গোয়ালীচোলা” অংখ্যার অভিহিত হয়। তখন হইতে তাহারা যন্ত্রাসের কুমারীগণের সহিত মিলনে কোন বাধাবদ্ধক নাই। পুরুষ অঙ্গ প্রাণের কুমারীসহ মিলনে দুই টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

বিবাহ ।—ইহাদের মধ্যে এমন কি যাবতীয় পার্শ্বভ্রাতৃত্বের মধ্যেই বালাবিবাহ বিরল প্রচলিত । পরন্তু কত বয়সে যে বিবাহ হইবে তাহাও নির্দিষ্ট নাই । কোন কোন ব্যক্তি আবার চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যায় । বিবাহ হইলে ইহাদের “বুড়া-বুড়ী” আখ্যা হয় । নতুবা বয়স যত অধিক হউক না কেন, “গাভুর” (কুমার) ও “মিলা” (কুমারী)—অভিধা থাকে । বিগত আধমহাদেশীয় বিবরণীতে দেখা যায়, চাক্‌মাদিগের মধ্যে—

শ্রেণী	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদুর্দ্ধ বৎসরের	মোট
পুরুষ	৪২৩৯	৫৫৭১	১৬১১	১৮৪৬	১২২৬	৬০	১৪৫৫৩
স্ত্রী	৪০৩৬	৪৯২৪	১৩১৫	৭৬৬	১২৯	৩৫	১১২০২

অবিবাহিত । চল্লিশোর্দ্ধ বয়সের এই ৬০ জন পুরুষ এবং ৩৬ জন স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হইবার আশা কোথায় ? অপর ২০—৪০ বৎসরের যে সকল স্ত্রীলোক অত্ৰাপি অবিবাহিতা, তাহাদেরও অনেকে চিরকুমারী থাকিবে । তবে অধিকাংশ পুরুষদের দার-পরিগ্রহ করিবার সম্ভাবনা আছে । পক্ষান্তরে “বিবাহিতের” তালিকায় দেখা যায়, চাক্‌মাদিগের—

শ্রেণী	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদুর্দ্ধ বৎসরের	মোট
পুরুষ	০	১১	১১	২৭৪	৬০১০	৪১১২	১০৪২৮
স্ত্রী	৫	১২	১৫২	১৪৪৩	৬৪৬৩	২২৩১	১০৩০৭

পত্নী-পতি লইয়া আছে । সুতরাং এই উভয় তালিকা তুলনা করিলে সহজেই পরিলক্ষিত হইবে যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সে পুরুষের এবং ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের অধিক পরিমাণে বিবাহ ঘটিয়া থাকে । পরন্তু পরবর্তী তালিকায় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১০৪২৮ হইলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিঞ্চিৎ ১০৩০৭ জন মাত্র হইল, দেখিয়া সন্দেহ হয় । এই ১২১ জনকে যুঁত-দারও বলিতে পারা যায় না ; কেন না তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর

মহাভারতীয় দ্রৌপদী বা আধুনিক তিব্বতীয় সম্প্রদায়ের মত ইহাদের সমাধে একত্রে বহু-স্বামী-গ্রহণ-প্রথা (Polyandry) ও প্রচলিত নাই, অধিকতর বহু-স্ত্রী-গ্রহণ প্রথা (Polygamy) রক্ষিত আছে (১)। তবে এইমাত্র অনুমান করা যায়, বর্জিতপত্নীক পুরুষগণকেও বিবাহিত সংখ্যার গণনা করা হইয়াছে। অপর তালিকার আছে, চাক্‌মাদিগের মধ্যে—

শ্রেণী	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ২৫ বৎসরের	২৫ হইতে ৩০ বৎসরের	৩০ হইতে ৩৫ বৎসরের	মোট
বিপত্নীক	০	২	০	৭	২১৫	৭২৫	৯৮৯	১৩১৩
বিধবা	৩	১	১	১৩	১৬৫	১১৭২	১৩৫৫	২৬৮০

অতএব মোট ২২৮৬৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৩৫৫ জন মাত্র অর্থাৎ এক ষোড়শাংশেরও নানসংখ্যক স্ত্রীলোককে বৈধবা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। তাহাতে আবার প্রোঢ়া অর্থাৎ বাহাদের পুনর্বিবাহের সময় সম্পূর্ণরূপে অতীত হইয়া গিয়াছে, তেমন বিধবার সংখ্যা ১১৭২ জন। আর ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক মৃতদেহ অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অনেক কম। ইহাতে সহজে অনুভূত হয় যে, যুবতী বিধবাগণের প্রায়ই পুনর্বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু সেই বয়সের বিপত্নীকগণের কথা দূরে থাকুক চল্লিশোর্ধ্ব যে ৭২৫ জন মৃতদেহ পুরুষের সংবাদ পাওয়া গেল, জরা পীড়া বা সাংসারিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি বিশেষ অন্ত্রবিধার না পড়িলে, তাহাদিগেরও অনেকে পত্নী-বিয়হিত হইয়া অধিক দিন থাকিবে না।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পিতৃকুল লইয়া “গোষ্ঠী” এবং বাসস্থান জেদে “গোছা” আখ্যাত হয়। সেই হেতু একই “গোছা”র বিবাহের কোন বাধা

(১) কিন্তু একসময়ে দুই পত্নীর অধিক কাহারও পরিদৃষ্ট হয় না, এমন কি তৎপ্রতি সাধারণের যুগার আভাস পাওয়া যায়। তাহার কথাতেই বলে—

“হিলে বিলে তিন জোপ,  
মুসলমানের তিন ঘোণ।”

অর্থাৎ বিলাসিতে বেরন জোঁক যথেষ্ট, তেমন মুসলমানের স্ত্রী অনেক। (মুসলমানবহুগণ সমাজিকভাবে কথা করিবেন)।

নাই। অথচ “সগোষ্ঠিতে” বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়াই সমাজের ব্যবস্থার

এত দিন এই বিধি নির্দিষ্টভাবে চলিয়া আসিয়াছে।  
বিবাহে সম্বন্ধ বিচার।

একমাত্র সেই দিন কুমার রমণীমোহনের বিবাহে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল; তিনি সগোষ্ঠী হইতেই পরীগ্রহণ করিয়াছেন। সমাজবন্ধন এই যে শিথিল হইল, এখন হইতে বোধ হয় ইহা অব্যাহত চলিবে। যাহাত ভয়ী, পিস্তৃত ভয়ী প্রভৃতির পাণিগ্রহণও যথেষ্ট প্রচলিত, বরং সেইগুলি যেম প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাগিনেয়ী, বড়শালী প্রভৃতির সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্তা ও বিধবা ক্রীলোকদিগকে ঘেবরেরাও বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্ত তাহারা বাধ্য নহে।

সচরাচর বিবাহ পঞ্চবিধ। যথা,—অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসারে—

১। পাত্রী তুলিয়া আনিয়া ও ২। পাত্র তুলিয়া নিয়া বিবাহ, ৩। বড় বিবাহ,

৪। গৃহজামাতা আনয়ন এবং ৫। মনোমিলনে পরিণয়।  
বিবাহের শ্রেণীবিভাগ।

এতদ্ব্যতীত প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহই সমধিক প্রচলিত। বিশেষতঃ ধনবান-সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভিন্ন “বড় বিবাহ” হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকারের বিবাহকেও সমাজ ঘণার চক্ষে দেখে; একজ্ঞ অবস্থা ভাল থাকিলে কেহই ইহাতে স্বীকৃত হয় না। এতদ্ভিন্ন বিধবা এবং পরিত্যক্তা মহিলাদিগের বিবাহ ত আছেই। বিবাহের শ্রেণীবর্ণনার বন্ধের লেখকগণেরা ক্রীষক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর “প্রমোদ লহরী” নামক পুস্তকে নানা কৌতুকগর্ভ বিবাহের পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে তিনি, কোন পুস্তক অবলম্বনে জানি না, চাক্‌মাগণকে “খ্যরংখা” হইতে পৃথক করিয়া বিবাহের দুই বিভিন্ন পদ্ধতি চিহ্নিত করিয়াছেন। তাহার আনিতে ভুল হইয়াছে যে, চাক্‌মাগণ “খ্যরংখা” শ্রেণীর এক বিশেষ শাখা মাত্র। তদীয় “খিরংখা” বিবাহের বর্ণনা পাঠে বোধ হয়, “খ্যরংখা” শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শাখা মতবিবাহেরই চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহা সর্বাংশে যথাযথ না হইলেও, তিনি যতদূরস্তে তুলিপাত করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। তবে তিনি চাক্‌মাদিগের সম্বন্ধে বাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার আলোচনা না করিয়া পারি না। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন,— “চাক্‌মাদিগের বিবাহ আরম্ভে আনুষ্ঠানিক এবং উপসংহারে পৈষ্ঠিক হইলেও মূলে সৌত্রিক বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।” কিন্তু ইহা খাটি আনুষ্ঠানিক নহে। প্রাকৃতিক প্রথম প্রকারের বিবাহে যদিও অনুরতাভাবের লক্ষণ আছে, তাহা ঠিক অনুরত পরিজ্ঞাপক নহে। কারণ স্থল বিশেষে কতকর্তী যে পণ গ্রহণ করিতে



বাধ্য হয়, তাহা বিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থে অভাবে পড়িয়া মাত্র, কোন লাভের উদ্দেশ্য নহে। নতুবা অধিকাংশ বিবাহের মূলেই মনু-বিহিত গান্ধর্ব-রাক্ষস প্রথা রহিয়াছে। এইরূপে তাহার বর্ণনার সহিত আরও দু'এক স্থলে অনৈক্য দেখা যায়, তাহা ছাড়িয়াই গেলাম।

( অভিভাবকগণের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ। ) পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতামাতা অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত “তাইনমাং” ( পরামর্শ ) করিয়া পাত্রী অমুসন্ধান করিতে থাকে। তাহাদের মনোমত কত্তার সমাচার পাইলে কোন কোন সময় পুত্রকেও প্রকারান্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়। অনন্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত অভিপ্রেত

প্রস্তাবনা।

কত্তার পিত্রালয়ে বরের পিতার যাওয়া একান্ত অপরি-  
হার্য। তদভাবে মূল অভিভাবককেই যাইতে হয়। প্রথম বারে—মদ, পান-  
সুপারি এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। পরন্তু কখনই কলা নিবেনা;  
তাহাতে বিফল মনোরথ নরকবাদী সম্মত। বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উঠাইতে  
অতিশয় সতর্কতা গ্রহণ করা গিয়া থাকে। পাত্রের পিতা বলে—“তোমার ঘরের  
নিকট একটি মনোহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে একটি চারা রোপণ  
করিয়া কৃতার্থশ্রম্য হইতে চাহি।” ইহা হইতেই কত্তার পিতা মূল কথা বুঝিয়া  
লয়। যাতায়াতের সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি  
দৃষ্টি রাখে। কেন না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা  
ভাঙিয়া গিয়াছে। যদি কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে মোরগ, জল বা ছুঁই লইয়া  
দক্ষিণপাশ্বে যাইতে দেখা যায়, তবে লক্ষণ—শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা  
গেলে, অথবা কোন কাক যদি বাম পাশ্বে বসিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা অশুভ  
লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি তাহারা পথে আসিতে কোনও জীবজন্তুর মৃত-  
দেহ দেখিতে পায়, তবে আর পট্টকমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাবতীর  
আরোজনও বন্ধ করিয়া দেয়। বৃদ্ধদিগের মধ্যে এমন বহু উদাহরণ শুনা যায়  
যে, এই সমস্ত শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি অবহেলা—পক্ষান্তরে প্রভূত অনুধের  
কারণ হইয়াছে। পশ্চিমধ্যে এইরূপ শুভাশুভ দর্শন লইয়া ছোটনাগপুরের ওরাওন  
জাতির মধ্যেও বড় বেশী কঠোর বিধান আছে, তবে তাহারা কেবল কত্তাকর্তার  
বয়স্কর্শনে গম্ভব্য পথে মাত্র এই শুভাশুভ কলের শাসন মানে। এ স্থলে ইহাও  
বলিয়া রাখা উচিত, “ছাদং”-এর সময় অর্ধাং আঘাটপূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের  
পূর্ণিমার মধ্যে বিবাহের কোনরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়বারেও প্রথমবারের জ্ঞার অধিকতর পিষ্টক, মোরগ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ বাজার উভয় পক্ষের সুবিধা অসু-  
বিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। এবং উপস্থিত পাত্রের সহিত সন্ধ করিতে পাত্রের  
পিতামাতার অভিমতও অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বারেও  
সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় না। অনন্তর তৃতীয়বারেও দ্বিতীয়বারানুরূপ “তব্ব”

সামগ্রী লইয়া যায়, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও থাকে।  
বন্দোবস্ত।

এবার পণ ধার্য করা হয়। সাধারণতঃ ৫০।৬০  
তোলা রূপার গহনা এবং ১০০।১২০ টাকা পর্য্যন্ত কস্তার পণ নির্দ্ধারিত হইয়া  
থাকে; সম্ভ্রান্ত পরিবারে কস্তাপণের (১) প্রচলন নাই। এই সময়ে কস্তা  
তুলিয়া আনা হইবে, কি বরকে তুলিয়া নিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, প্রস্তাব উপস্থিত  
হয়। বর তুলিয়া নিয়া বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্য অন্ত, কিন্তু ইহা খুব  
বিরল প্রচলিত। হিন্দু সমাজের কলঙ্ক কুলীন সম্প্রদায়ের মত যৌতুকের সাম-  
গ্রীতে গৃহপূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাদের সমাজে এযাবৎ হয় নাই। বর পাত্রের  
পিত্রালয়ে গিয়া বিবাহ করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান মনে করে। পরন্তু ভাবী  
বৈবাহিকের কথিরলোলুপ এমন কোন বরের পিতা চাকমাজাতিতে দেখা যায় না,  
এবং তাদৃশ বরবিক্রয়ের প্রথাও ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই। সে বাধা হউক,  
উপরোক্ত প্রস্তাবে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে, ততদিন  
ধার্য করে। ফসলের কার্য্য হইতে অবসর কালাই বিবাহের প্রশস্ত সময়; এই  
নিমিত্ত গচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই দিন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ এই সময়ে  
হাতে টাকা পরসারও অভাব হয় না এবং সকলে কাজকর্ম্ম হইতেও কিঞ্চিৎ অবসর  
পায়। এইরূপে কথাবার্তা সাব্যস্ত হইয়া গেলে কোন কোন বরের পিতা ভাবী  
পুত্রবধূকে উদ্বাহস্থিরতা জ্ঞাপক একটি অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়া আইসে। অবশেষে  
বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে বরপক্ষ কস্তার পিতার নিকট হইতে অচিরে  
উপস্থিত বিবাহের নিমিত্ত মত্ত প্রস্তুত করিবে কি না অনুমতি লইয়া যায়।

বিবাহের পূর্বদিন বে সকল বাত্বকরেনা আসে, তাহাদের প্রথম বাত্ব হইতে  
বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের কৃতান্ত গণনা করে। এই প্রথম বাত্বকে “খোলা-

(১) আরও সুখ সংবাদ কুকিদিগের মধ্যে কস্তাপণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শুনা যায়, পূর্বে  
কোনও বালিকার বিবাহে পণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে বিবাহের অব্যবহিত পরেই দম্প-  
তীর মৃত্যু ঘটে। তদবধি এই সর্ব্বনাশিনী প্রথা রহিত হইয়াছে।

মানসি" (১) বলা হয়। এতদ্বিধ বরণক্ষীয় কোন স্ত্রীলোক কলাপাতার পান এবং সুপারী দুইটা 'পুটুলী' করিয়া একত্রে নদীতে অধিবাস দিনের কাৰ্য।

তাসাইয়া দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি 'পুটুলী' দুইটি মিলিত হইয়া তাসিতে থাকে, তাহা হইলে ভাণী সম্পত্তির প্রগাঢ় সন্ডাব সূচিত হয়, অন্যথা 'পুটুলী' দুইটি বিপ্রকৃষ্ট হইয়া তাসিলে পরস্পরের মধ্যে চিরজীবনই মত্তভেদ ঘটিয়া থাকে। বিবাহ বয়ের বাড়ীতে হইবার কথা হইলে, তখনন্তর সেই মহিলা নদী হইতে এক কলসী জল লইয়া আইসে; পক্ষান্তরে কস্তাপক্ষ হইতে জল তোলায় হয়। তদ্বারা বিবাহের দিন বরকস্তাকে জান করা-ইয়া থাকে। অধিবাস দিবসে বরকস্তা উত্তরণক্ষেত্রেই গৃহসম্মুখীন হইবারে সপল্লব মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

১। পাত্রী তুলিয়া—আনিতে হইলে বিবাহের পূর্ক দিন, পথ যদি দূরবর্তী হয় তবে তাহারও পূর্কে অর্থাৎ বাহাতে বিবাহদিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বয়ের বাড়ীতে উপনীত হইতে পারা যায় সেই হিসাবে, বয়ের পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা নানাবিধ ব্যাভাদি সমস্তিবিহারে কস্তা আনয়নের জন্য ব্যাভা করে। তাহাদের সঙ্গে সগোত্রজা এক অনুচা কিশোরী সুরঞ্জিত "ফুলবারে" (২) এর মধ্যে করিয়া পূর্কনির্দিষ্ট সমস্ত গহনা, দুই দুইখানি "পিধন" (৩), "খাচী", চাবর, "খবং" ও কুর্তা (তন্মধ্যে একটি ফুলবিহীন ও অন্যটি "ফুলদার"; এই "ফুলদার" কুর্তা বিশেষতঃ বিবাহেই ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা এ সময়ে গহনাগুলি বাধিয়া নিয়া থাকে) একখানি চিরুণী, এক বোতল নারিকেল তৈল লয়; এবং তৎসঙ্গে একটী বোরস, ৭০০ সুপারী ও ৭০০ পানের বাড়া (৪) উপঢৌকন যায়।

এবিকে কস্তাকর্তা বিবিধ ভোজ্যোপকরণ আহরণ করিয়া থাকে। এবং বরণবাগিণের নিমিত্ত প্রাপ্ত স্ত্রী ও পুরুষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৈঠক স্থান গঠিত হয়। তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে কস্তাপক্ষীয়গণ স্বাগতসন্ডাবাদি দ্বারা

(১) ইহাতে প্রাপ্তে একটা জারগা করিয়া তাহাতে পান-সুপারী, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া ঘট স্থাপিত করে; এই নিমিত্ত টাকাও একটা দিতে হয়।

(২) "ফুলবারে"—"চাচাড়া" নির্মিত হুড়ি বিশেষ।

(৩) "পিধন"—স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র। বিবৃত পরিচয় পরে দেখিয়া হইবে।

(৪) পানের বাড়া—এক এক খণ্ড পাতার কিংবা পান এবং কিসলয়ে সুপারী ইত্যাদি দ্বারা

তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াথানির্দিষ্ট স্থানে বসায় ; এবং তখন মদ, তামাক ইত্যাদি শিষ্টাচারোপহার অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে ।

অভ্যর্থনা ।

কিয়ৎকাল পরে পাত্রীপক্ষীয় সকলে নানা মঙ্গলারোহনের সহিত প্রথমে উপরোক্ত কিশোরীকে গৃহে তুলিয়া, পরে অন্তান্ত বরযাত্রীগণকেও ঘরে লইয়া যায় । এই সময়ে আরদেলে স্থাপিত মঙ্গল ঘট এবং প্রতীপাদিও উঠাইয়া আনা হয় । পরে গহনাদি ব্যবতীর দ্রব্য কস্তার পিতামাতা বুঝিয়া লয়, এবং সকলে আহার করিয়া উঠিলে বরপক্ষীরা মহিলাগণ সেই গহনা এবং পরিচ্ছদের এক প্রস্ত (set) পাত্রীকে পরাইয়া দেয় ।

অনন্তর সকলে নিদ্রা যায়, এবং পরদিন প্রত্যুষে ঘট প্রতীপাদি বখাছামে স্থাপন পূর্বক অপরাপর শুভাহুষ্ঠানের সহিত পিতামাতা চুহিতারত্নকে বিদায় দান করে । এই সময়ে “সাঁকো”র পথ বন্ধ করিয়া সপ্তপুত্র কস্তাবাত্রী ।

নূতন টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় । বরপক্ষীরেরা পাত্রী বাহির করিয়া আনিতে কস্তার মাতা স্তূতাপানি ছিঁড়িয়া দেয়, ইহাতেই তাহাদের সহিত কস্তার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (১) ! বাহা হউক, কস্তার সমজ্ঞান্যাহারে তাহার পিতা কি পিতামাতা উভয়েই গিয়া থাকে । বরের বাড়ীতেও নানা মঙ্গলারোহনের সহিত পাত্রী তুলিয়া লইবার প্রথা আছে । এই বিবাহদিন প্রাতেই “চুড়লাং” পূজা হইয়া থাকে ।

রাত্রে (কোন কোন পরিবারে গণৎকার-নির্দ্ধারিত লগ্নে) বরকস্তাকে উপযুক্ত বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া শয়নকক্ষে বিবাহবেদী-উপরি উপবেশন করায় । স্বী

উদাহ জিরা ।

বরের কোনও আত্মীয় এবং আত্মীয়া বরকস্তার প্রতিনিধিত্ব তার গ্রহণ করিয়া বখাক্রমে তাহাদের পশ্চাতে বসে । তাহাদিগকে “হাঁরলা” এবং “হাঁরলী” বলা হয় । হাঁরলা একখানি শুভ্র নববস্ত্র লইয়া উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, “কোড়গাঁট বাঁধিবার হুকুম আছে ত ?” সকলে বলিয়া উঠে—“আছে” “আছে” “আছে” । সম্মতি পাইবা রাত্রিই “হাঁরলা-হাঁরলী” উক্ত বস্ত্রের দ্বারা সম্পত্তিকে বন্ধ করে । তখন তাহার পরম্পরকে “বধাপুল্যা তাত”

(১) ত্রিপুরাদিগের মধ্যেও ইদৃশী প্রথা আছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ । পাত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার সময় তাহার ভরী বা জাভুবু (বাহই) দ্বারে একটি নীল বীণ আঁড় করিয়া থাকে । বরপক্ষীরেরা তাহা ভাঙ্গিয়া কস্তা লইয়া আসে ।

অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম্ব মিশ্রিত অন্ন এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ার, কলে মুখম্পর্শ করাইয়া থাকে। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামী মুখে এবং স্বামী বাম হস্ত দ্বারা প্রাণস্নিহীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ মুখমধ্যে উল্লিখিত ভক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্য এই কার্যেও “ছায়লা-ছায়লী”র বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেননা, উপস্থিত সাধারণের (১) সম্মুখে নবদম্পতির ত্রোড়ানিপীড়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়ই থাকে। তখন তাহারা স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে সমর্থ নহে; প্রাতি কার্যেই অভ্যর্থী সহায়তা অপেক্ষা করে। ইহা আর খুলিয়া প্রকাশের চেষ্টা বৃথা, বিবাহিত পাঠকপাঠিকাগণ সহজেই বক্তব্য বিবরণ দ্রুতরসম করিতে পারিতেছেন। খাওয়ানোর বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত বয়োবৃদ্ধগণ নবীন দম্পতীর মস্তকে শুভাশীষবাক্যের সহিত নদীজল বর্ষণ করে। ইহাই স্বস্তি বাচন—পক্ষান্তরে কর্মের সাফল্য ঘোষণা! অনন্তর দম্পতী আচম্বিতে উঠিয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত যদি নবোঢ়া পূর্বে উঠে, তবে সে সর্বদা স্বামীর অপরিমিত ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সংস্কারের আশ্বাস আছে। পরে স্বামী স্ত্রী দুই পৃথক স্থানে নিজায় রাজি কাটার।

পরদিন অতি প্রত্যুষে দম্পতী গাত্রোথান করিয়া অনেক “ওষার” সহিত মদীকূলে যায়; এবং তথায় দুইটা ঘোরগের রুধির, ‘ঘিলা’ ও ‘কুঁচ’ বাটা, কিঞ্চিৎ মশু ও সোনারূপার জলে “মাখা ধুইয়া শুদ্ধ” হয়। ইহাকে বিবাহের “ব্রূপায়ণ” বলে। অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই তাহারা বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে। পরিশেষে আহাঙ্গারির পর আত্মীয়স্বজাতি সমাগত স্ত্রী পুরুষ সকলে (অবশ্য দুই ভিন্ন দলে) সজ্জা করিয়া বসে। তখন নবদম্পতী তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্ষাদ গ্রহণ করিতে উপনীত হয়; এবং যথোচিত অভিবাদন পূরঃসর পূজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিজীবনপূজ-সতুল-তুলা শুভনির্ম্মালা স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতীর কিছু আর্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ এ সময়ে কস্তার পিতা নবজামাতাকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়া দেন,—(‘বীর কস্তাকে জামাতার হস্তার্পিত করিয়া)

(১) এখানে ‘সাধারণ’ বলিতে স্বজাতীয় বুঝিতে হইবে। প্রত্যুত ইহাদিগের মধ্যে অবলোভ প্রধার কটোরতা না থাকিলেও স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহারোও বিবাহ দেখিতে দেয় না; এমন কি স্বজাতীয় বন্ধুও বন্ধুর বিবাহ দেখিতে ভাগ্যান্বিত নহে।

ইহাকে গ্রহণ কর। আমি বড় সাধ করিয়া ইহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম ।

জামাতার প্রতি উপদেশ ।

এ নিত্য বালিকা, গৃহকর্ম কিছুই জানে না । যদি কোন সময়ে তুমি কর্মস্থল হইতে আসিয়া দেখে যে, ভাত পুড়িয়া ফেলিয়াছে, অথবা তজ্জপ অপর কোন দোষ করিয়াছে, তবে তাহাকে শিক দিও, প্রহার করিও না । এক্ষেপে তিন বৎসর চলিয়া গেলেও যদি অনিষ্ট করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রহার করিতে পার, তজ্জপ আমি অসন্তুষ্ট হইব না । কিন্তু একবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিলে, আমি তোমা হইতে প্রাণের মূল্য দাবী করিব । অনন্তর কতাপক্ষী, সকলে এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনদিগেরও প্রায় অনেকে বিবাহ বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করে ।

বিবাহের দুই তিন দিন পরে বর নানাবিধ মণ্ড এবং পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়াসমভিষাহারে খণ্ডরালয়ে গমন করে এবং তথায় দুই চারি দিন অবস্থানের

বিবাহের ছুইদ ভাঙান ।

পর সঙ্গীক চলিয়া আইসে । ইহারই নাম “বিবাহের ছুইদ ভাঙান” অর্থাৎ ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিত্রতা ( ? ) নষ্ট হইয়া যায় । এমন কি, ইহা না হইলে নবদম্পতীর একত্র বাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে, এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চও উঠিতে পারে না । চাক্‌মাসমাজের ইহা অতিশয় উল্লেখযোগ্য সংস্কার । পরন্তু সেই বৎসরেরই বিবৃৎ সংক্রান্তিতেও নববিবাহিত যুবককে সঙ্গীক খণ্ডরবাড়ী বেড়াইয়া বাইতে হয় । বাস্তবিক বিবাহের পর ইহারা যেন পক্ষিদম্পতী, অথবা অনেকটা পাণ্ডাত্য সম্প্রদায়ের মত । সত্য উভয়ে একত্রে থাকিতে চেষ্টা পায় । বিশেষতঃ প্রথম বৎসর পরস্পরের পাশ ছাড়া হওয়া কোনরূপেই বিধিসঙ্গত নহে ।

২। বর তুলিয়া—নিয়া বিবাহ এবং উপরি বর্ণিত বিবাহ-পদ্ধতিতে বিশেষ কোন তারতম্য নাই ; কেবল বর গৃহের কার্যগুলিও কস্তার পিতালয়ে হইয়া থাকে মাত্র । ইহাতে বরবাত্রীদিগের সহিত বরও গিয়া থাকে । তাহারা বাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীর পিতালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, সেই হিসাবে বাজা করে । বলা বাহুল্য, “বর তুলিয়া বিবাহে” “বিবাহের ছুইদ ভাঙাইবার” প্রয়োজন হয় না ।

বড় বিবাহ ।—রাজপরিবার এবং সম্রাট দেওয়ান পরিবার ভিন্ন অপর সাধারণে এ বিবাহের অধিকারী নহে । ইহা একপক্ষে যেমন ব্যয়সাধ্য পক্ষান্তরে তেমনি বংশধর্য্যাদাসাপেক্ষ । বিবাহের আনুষ্ঠানিক অপরাপর কার্য—পাত্রী তুলিয়া আনিয়া বিবাহেরই অন্তরঙ্গ । তবে সেই সবে আত্মীয়দিগের ত কথাই নাই । অধিকন্তু তিন বানি অতিরিক্ত গৃহ নির্মিত হয় । তাহার এক ঘরে বরপক্ষ, আর এক ঘরে

কর্তাপক থাকেন। অপর গৃহ ধানি “কুল-ঘর” নামেই আখ্যাত; তাহাতে নবদম্পতিকে যথাবিধি বসাইয়া “ঠাকুর” (ভিক্স) “জয়মঙ্গলস্থত্র” রূপান্তরে “সিদ্ধলমোগলতারা” তনাইয়া থাকেন। পূর্বকালে সাধারণ বিবাহেও এই “তারা” (শান্ত্রগ্রহ) পঠিত হইত; এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত। এই “বড় বিবাহে”ও নবদম্পতিকে “ছুইদত্তাঙাইয়া” আসিতে হয়।

গৃহ আমাতা।—বাহুরা নিত্যস্ত সদলহীন এবং বাহাদুরের পরিবারে অপর কেহ নাই, তাহার খণ্ডরবাড়ীতে গিয়া খণ্ডরেরই ব্যয়ে বিবাহ করিয়া থাকে। পাত্র তুলিয়া নিয়া বিবাহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। গৃহ আমাতা হইলেও আজীবন খণ্ডরবাড়ীতে অবস্থান অধুনা প্রায় ঘাটয়া উঠে না। অনেকেই আপনাকে স্বশক্তিতে পরিবারচালনক্ষম বুঝিলে জীকে লইয়া সরিয়া পড়ে। বাহা হউক, বর্তমানে এই শ্রেণীর বিবাহ কমাচিং পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুসমাজ হইতেও ইহা বহুপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নতুবা কুলীন পরিবার যেরূপ ভায়ব্রত হইয়া উঠিতেছিল, এতদিন উহা সেই ভাবে প্রবল থাকিলে সম্ভবত এতদিনে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইত!

মনোমিলনে বিবাহ।—ত্রিপুরাসমাজে এই বিবাহ “হিকুনানানী” আখ্যায় প্রথিত। প্রাচীনকালে হিন্দুসম্প্রদায়ে যে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশের “কোর্টশিপ” (Courtship) এবং ব্রাহ্মসমাজের মনোমিলন পদ্ধতিতে তাহার কিঞ্চিৎ গন্ধ পুণ্ডর্য যায়। ইহাতে দম্পতী পরস্পরকে “স্বং” মে পতি—“স্বং মে ভাঙ্গিয়া” ইত্যাকার ভাণে গ্রহণ করিলে “গান্ধবী বিবাহ” সম্পাদিত হইয়া যায়। ফলতঃ এইরূপ পরিণয় অতি আদম প্রথা। অনেক দিন হইতে ইহা লইয়া নীতিশাস্ত্রবিদসমাজে গভীর গবেষণা চলিতেছে; এদ্বারা তাহার কোন প্রকৃষ্ট ধীমাঙ্গা হিরীকৃত হয় নাই। সত্য বটে, পুরুষের অধিতীর্ষা সঙ্গিনী। সুখে দুঃখে—সম্পদের বিপদে এ হেন সমতাগী আর কেহই নহে। গৃহস্থ, এমন কি সংসারিক যাবতীর সুখ—শান্তি তাহারই উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে পতিই অরলার অনন্তগতি। এগের সামান্য বৈদ্যনাট্য অনান্যইতেও এ রূপগতে স্বামী ভিন্ন তেমন জ্ঞান কেহ নাই। তবে স্বামী স্বীকৃতির অধিকারিত অঙ্গসমূহ স্বয়ং নির্বাচন করিয়া লওয়া কি সমীচীন ব্যবস্থা নহে? কিন্তু তাহার নির্ধারণের কিরূপ উপায়, ইহাই আগে চিন্তা করিবার বিষয়। নীতিজ্ঞ পাণ্ডিত্যেরা বলিয়াছেন, নৌকাক্রম মনে প্রবেশ করিলে বহুব্যয়ের প্রকৃতি বড় অল্প প্রায় হয়। বিশেষতঃ অপরিসংখ্য বুদ্ধির সহিত রূপজবোহ বিলিত হইলে কি যে ভীষণ হলী

করে, তাহা স্বরণ করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ! স্বভাবের মনোমুগ্ধ-  
বিভ্রান্ত যুবক-যুবতীতে যে সন্মিলন সংগঠিত হয়,  
যৌবন ও যুবক-যুবতী ।

তাহা সকল সময়ে সুফলপ্রসূ হইবার ভরসা কোথায় ?  
আবেগ ফুরাইলে, উত্তেজনা দমিত হইলে, পরস্পরের চিত্তপার্থক্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর  
হইতে আরম্ভ হয় ; এবং তাহারই ফলে—“কোর্টসিপের” পরিণামে “ডাইভোর্স”  
( Divorce ) এবং মনোমিলনের ক্ষেত্র বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটতে থাকে ।  
তাদৃশী দুঃস্বপ্নের তাড়নাতেই বোধহয় হিন্দুসমাজ হইতে স্বয়ম্বর প্রথা রহিত  
হইয়াছে । অধুনা চাকমাগণও ইহা ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ; সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের  
ইহা একরূপ নাই বলিলেও চলে । কিন্তু সাধারণ সমাজে মনোমিলনে সম্বন্ধ বন্ধ  
অধিক, অভিত্যাকবদিগের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ তাহার অর্ধেকও নহে । এই বিবাহকে  
মমুর ভাবায় “গার্লফ্রেন্ড-শিফট” করিয়া যায় ; ইহার সহিত পুণ্যচাত্য সমাজের  
স্পেনীয় ও ফরাসীর বিবাহব্যবস্থার গাঢ়তর সাদৃশ্য রহিয়াছে ।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইহাদের সমাজে অনুৎ এবং  
অনুচাদলের সন্মিলন প্রায় অব্যাহত । যুবক-যুবতীর মধ্যে সেই সুযোগে প্রণয়-  
শক্তি জন্মিলে, কিবা “মহামুনি” মেলায় হুচিৎ পূর্বরূপে মনোমিলন হইয়া গেলে,  
তাহারা উভয়ে একযোগে পলাইয়া যায় । এদিকে  
প্রণয়ে পলায়ন ।

পিতামাতা বধন জানিতে পারিলে, তাহাদের পুত্র বা  
কন্যা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া  
হেডম্যান সন্নিপে যুবকের নামে অভিযোগ জনায় । উপায়ান্তরে যুবকের  
পিতামাতাও যুবতীর পিতামাতার নিকট তাহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রার্থনা  
করে । অবশেষে যুবক-যুবতী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে হেডম্যানের কাছে  
বিচার উপস্থিত হয় । যদি যুবতীর অনিচ্ছা সবেই বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া  
গিয়াছে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই দুর্ভাগি যুবকের ৬০ টাকার পর্যন্ত অর্থও  
হইতে পারে । অন্যথা পরস্পরের স্বীকৃতি পাইলে  
বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্যার পিতামাতাকে সম্মত

সম্মতিতে বিবাহ ।

করিয়া তাহাদের বধাবিধি বিবাহ হইয়া যায় । কোন কারণে অভিত্যাকবদিগের  
সম্মতি পাওয়া না গেলে, ওষাট ঘরি যুবক-যুবতীর সম্বন্ধ প্রবল থাকে, তাহার  
পুনরায় পলায়ন করে । এইরূপে চারিবার পর্যন্ত পলাইতে পারিলে কন্যার  
পিতা আর কুলমর্যাদাবাহিনী রাখি করিতে পারে না । এবং সেই অচ্ছেদপ্রণয়ী  
পণ হইতে মুক্তি পায় । কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দ্বিতীয়বার পলায়নের পর আর



কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে “চুড়ু লাং” পূজা এবং নৃতন কুটুম্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি ভোজ ভিন্ন অপরাপর আনুষ্ঠানিক কার্য না করিলেও চলে; হয়ও না।

কোন কোন সময় এবং বিধ সম্মিলনে ভগ্নমনোরথ হইয়া ভীষণ করুণাত্মক অভিনয় ঘটে; তখন ইহা চিরজীবনের তরে অন্তঃখের হতাশ প্রণয়।

কারণ হইয়া থাকে! কাণ্ডেন লুইন স্বীয় পুস্তকে\*

এরূপ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে তাহারই মর্ম্মানুবাদ তুলিয়া দেওয়া সম্ভব বোধ

করিতেছি :—

\* The Hill Tracts of  
Chittagong and the  
dwellers therein—P.  
72-73

“ভূপিয়া নামে জনৈক যুবক সস্ত্রামুলা নামী বালিকার সহিত প্রণয়সম্পন্ন হইয়াছিল। ইতিপূর্বেই সস্ত্রামুলা মাতৃহারা হইয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরাদেন সন্ত্রীক ভিন্ন গ্রামে বসতি করিত। সস্ত্রামুলার অপর ভ্রাতা হীরাদেন ও বুদ্ধপিতার সহিত জন্মের সময় “মইনঘরে” বাস করিতেছিল। ভূপিয়া তাহাকে বিশেষ ভাল বাসিত; একটি চিত্র।

কোনরূপেই তাহার পাশ ছাড়ি হইতে চাহিত না। জন্মকারণের সহায়তা প্রভৃতি ব্যাপদেশে সে সর্বদাই তাহাদের পরিবারের ভিতর থাকিতে প্রয়াস পাইত এবং প্রায় প্রতিদিনই তাহাদের বাড়ীতে আহার ও “ভনীতে” শয়ন করিত। কিন্তু সে এত দরিদ্র ছিল যে, সস্ত্রামুলার অভিভাবকদের সহিত প্রস্তাবক্রমে বিবাহ করিবার সাহস পায় নাই। এইরূপে প্রায় দুই বৎসরধরিয়া তাহাদিগের প্রণয়ের আদান প্রদান চলিতে থাকে। অবশেষে উভয়ে একযোগে পলায়ন করিল। ঘটনার অবশিষ্ট কথাগুলি হীরাদেনের মুখেই প্রকাশ করা যাইতেছে।—‘গত শুক্রবার আমি যখন কার্যস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘তোরা ভগ্নী কোথায়? অনেকক্ষণ হইল সে জল আনিতে গেল, কিন্তু অদ্যাপি ফিরে নাই। অকস্মাৎ ভূপিয়া আমাদের এখানে নিরন্তর ঘুরিত। আমার সন্দেহ হইতেছে, বুঝিবা সস্ত্রামুলা তাহারই সঙ্গে পলাইয়া গেল।’ এই কথার আমি আরও দুই তিন জন যুবককে সঙ্গে লইয়া ভগ্নীর উদ্দেশে বাহির হইলাম। এক ক্ষুদ্র সমিতিরূপে তাহাদের সহিত দেখা হইল। ভূপিয়া অগ্রে; সস্ত্রামুলা তাহার হস্তধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। এই দৃশ্যে আমি ক্রোধাক্ত হইয়া হস্তহিত না ধারি তাহাকে আঘাত করিতেই সে একপার্শ্বে লোকাইয়া পড়িল এবং সেই আঘাত আমার ভগ্নীর উপর পড়িয়া তাহার পার্শ্বদেশ কাটিয়া কেলিল। হায়! তৎক্ষণাৎ সেও ‘ভাই’ বলিয়া পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইল। আমি শুনে পলাইয়া গেলাম। যদিও আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানিতাম না যে, তাহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে। কেননা, প্রেম-সমস্তা অসুস্থকান—আমাদের জাতীয় প্রথা নহে। যদি ভূপিয়া আমাদের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপিত করিত এবং নিয়মিত পণ দিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা বন্ধুবান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকেই বিবাহ দিতাম। কিন্তু সে বিবাহের উপযোগী ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিতেন না বলিয়া তাহা করে নাই। অগত্যা সস্ত্রামুলাকে লইয়া পলাইয়া ছিল।’ ইত্যাদি।

হায়রে, উদ্যম প্রণয়ের পরিণাম ! ইহা ছাড়া এইরূপই প্রায়শঃ ঘটে যে, কোন রমণী একজনকে পূর্বে বিশেষরূপে আর্দ্রাঙ্গ দিয়াছিল, শেষে ঘটনাচক্রে অপরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যায়। ইহাতে সেই হতাশপ্রণয়ী জীবনের সমতা তুচ্ছ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইহলোক হইতে সরাইতে সচেষ্ট হয়। বৎসরে এদেশের দুই চারিটা হত্যা এই নিমিত্তই ঘটিয়া থাকে।

বিধবা এবং পরিত্যক্তা রমণীদের বিবাহে।—বিশেষ কোনও আমোদ-উৎসবাদি হয় না, কেবল স্বগ্রামবাসী সকলকে একটি ভোজ দেওয়া গিয়া থাকে মাত্র। পূর্বপতির ঔরসজাত সন্তানাদি অধিকাংশস্থলে তাহাদের পিতৃ-লয়েই থাকে, আর নিতান্ত অপোগণ্ড হইলে যদি মাকে ছাড়া থাকিতে না চাহে, তাহা হইলে পরবর্ত্তীস্বামীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু স্বৈচ্ছাক্রমে দান করিয়া না গেলে কেহই বৈপিত্তিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না।

গর্ভধানাদি ইহাদের সমাজে নাই। পুংসবন্ সীমন্তোন্নয়ন, সাধুভক্ষণ প্রভৃতি গতিগীসংস্কারগুলিও এই সমাজে কোন কালে ছিল কি না, কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু এই সকলের পরিবর্ত্তে প্রস্থিতিদিগের মঙ্গলার্থ প্রসবের পূর্বে ও

পরে “গাংশালা” (১) ব্রত অহুষ্ঠিত হয়। গর্ভের গাংশালাব্রত।

প্ৰথম মাসে অথবা প্রসবের পর ততদিন নির্দেশ করিয়া, পূর্বদিন যথানিয়মে “ওঝা” নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী নদীতীরে—জলপৃষ্ঠ হইতে কিছুদূরপরিভাগে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে। অনন্তর বাড়ীতে আসিয়া একটি হাঁড়িতে একটা আস্ত সুপারী স্থাপন পূর্বক উহার মুখ “খাদী” দ্বারা আবৃত করিয়া লয়। পরে সুদীর্ঘ সূতার এক প্রান্ত সেই “হাঁড়ির” গলার সাতপাক জড়ার এবং হাঁড়িটা সাতবার গতিগীর বা প্রস্থতির মন্তক ‘নিছিয়া’ যথাসম্ভব সোজাসুজি পথে সেই “গাংশালা”র লইয়া আসে। কিন্তু সূতাখানি এত লম্বা থাকে যে, তাহার এক প্রান্ত লেই “হাঁড়ি”তে আবদ্ধ রহিলেও অপর প্রান্ত ‘পোয়াতি’র আবাস গৃহে থাকে। ব্রতকার্য্যে প্রথমে “আগু চাওয়া” হইয়া গেলে পূজা ও বলিদান প্রভৃতি ক্রমে সম্পাদিত হয়। অনন্তর “ওঝা” সূতা ধরিয়া অগ্রসর হয়; এবং প্রস্থতির স্বামী সেই “হাঁড়ি ও বলিদত্ত মোরগ লইয়া অনুসরণ করিতে থাকে।

(১) “গাং”—নদী, “শালা”—গৃহ; নদীতে গৃহ প্রস্তুত করিয়া যে ব্রত অহুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ‘গাংশালা ব্রত’ কহে

“হাঁড়ি”টা গৃহে আনিয়া তুলিয়া রাখিবার পর, এদিশে একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম “আগিদা”। অরিশেবে সাধ্যমতে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীগণকে ভোজনদানের ব্যবস্থা আছে।

[ ২ ]

অন্ত্যেষ্টী।—মৃত্যুর পরে স্নানাদি করাইয়া শবকে নববস্ত্র পরিধান করায় ; এবং “বিজ্ঞাপা”র তিনটি বংশবোঝা সংস্থাপন করিয়া তত্পরি শয্যা রচনা পূর্বক উহারে তাহাতে চিৎ করিয়া শোওরাইয়া রাখে। অনন্তর শবের শিরোদেশে

ও ঋদ্রপ্রান্তে দুইটি অন্নপিণ্ড এবং বক্ষোপরি কতক খই ও একটি টাকা রাখার পর রত্নী “মাশেম

তার” পাঠ আরম্ভ করেন। রাজা বা গণ্যমান্ত লোকের মৃত্যুতে “আরেন্তানা তার”ও পঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে “চুল” (চোল) বাদ্য চলে, এবং শবরক্ষক যুবকগণ এই “চুল” বাজাইয়াই রাজি যাপন করে। অন্ত্যেষ্টির আরোজন এবং আত্মীয় স্বজনের আগমন পর্য্যন্ত শব এইরূপে থাকে। পরে সুবিধানুসারে দিনে চরম সংস্কারের নিমিত্ত সকলে প্রস্তুত হয়। “বৃধবার—লক্ষ্মীবার ;” স্তব্ধ হইয়া সেদিন মৃতসংস্কার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া অনেক পরিবারে শুক্রবারেও অন্ত্যেষ্টী হুগিত থাকে। কিন্তু শব মৃতদিন গৃহে থাকে, ততদিন বাড়ীতে উঠুন জলে না। তাহার সকলে নিকটবর্তী আত্মীয় বা “আদমের” অপর কাহারও গৃহে একে একে আহার করিয়া আসে।

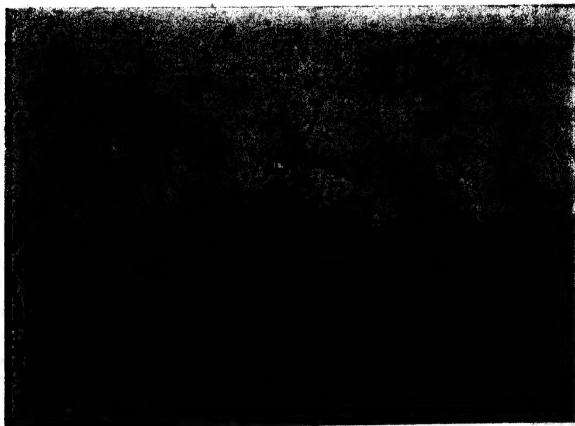
নির্দিষ্টদিনে সংস্কারের যথাবিধি আয়োজন হইলে পূর্ব স্থাপিত অন্নপিণ্ডের হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখস্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দেয় ; এবং তৎকালে পুনরায় দুইটি সত্তপক অন্নপিণ্ড স্থাপন করে। অনন্তর শবের পাদকনিষ্ঠাকুলিতে সত্তপক হস্তের এক প্রান্ত বদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত একটি মোরগশাবকের

অঙ্গুলিতে বাধিয়া দেয় ; মৃতব্যক্তির পরিবারস্থ সকলে

সেই মোরগশাবক ধরিয়া থাকে। তখন “আদমের” জনৈক ব্যাবৃত্ত হস্তের নিয়ে একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া “ভাগল” (বা) হস্তে সমাগত আর সকলকে জিজ্ঞাসা করে,—“মরা হইতে জীবিতদের সঘন ছিন্ন করিতে হকুম আছে কি না ?” তাহার যুগলং “আছে” “আছে” বলিয়া উঠিলে, মধ্যস্থলে একই ধারে মৃত-জীবিতের স্পর্শ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে “আনিজা তার” পাঠ আরম্ভ হয়, এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতেই সকলে শবকে স্থানান্তরিত করিয়া চলে। সচরাচর স্রোতবর্তী-তীরেই স্থান নির্ধারিত হইয়া থাকে।

তথায় আনিবনের পর শেখোক্ত অন্নপিও দুইটা হইতে সাতবার কিকিং কিকিং শবের মুখস্পর্শ করাইয়া পরিত্যাগ করে ।

পূর্ণবয়স্কের মৃত্যুতেও সমর্থ হইলে আশানে রথ টানিবার আয়োজন করা হয় । এই রথ নিশ্চাপেও জাবার ইতরবিশেষ ব্যবস্থা আছে । রাজপরিবারে বা তদ্ব্যনিত কেহ মরিলে “পঞ্চময়” রথ প্রস্তুত হয়, অপর সাধারণের মৃত্যুতে একটিনাত্র শূল থাকে । একটি কাঠমঞ্জুর নানা সুগন্ধ দ্রব্যাদির সহিত শব রাখিয়া, সেই শবধার মধ্যেপরি স্থাপন করে । অন্তঃপর উপস্থিত সকলে সমান দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর



বিপরীতাস্থিতে টানিতে থাকে । তাহাদের একপক্ষকে “বর্গের দূত”, অপর পক্ষকে “নরকের দূত” কল্পনা করা হয় । কলা বাহন্য, তাহাদিগের হার-জিতের দ্বারা মৃত্যুস্তির পরলোকের স্থান পরোক্ষিত হইয়া থাকে । পরন্তু এই আখ্য নিরূপনে এমন চাতুরী থাকে, প্রায়শই “বর্গের দূতের” জয় হয় । পূর্বে এই রথ টানিবার নিমিত্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিতদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত । বর্তমানে বিবাহিতের সংখ্যা অধিক হইয়া যাওয়াতে “গোহা” ভেদে অথবা নদীর বিপরীত-তীরবাসীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে । বলিয়া রাখা ভাল, এই সময়ে বাজ, বাদ্যপোড়ান প্রভৃতিও একটি আয়োজন ।

শব সচরাচর দাহ করিয়া বিনষ্ট করা হয়। কিন্তু অমূল্যতত্ত্ব শিশুশব ভূপ্রোথিত করাই সাধারণ বিধি। যদি কেহ তাদৃশ শবকেও পোড়াইতে ইচ্ছা

শবদাহ।

করে, তাহা হইলে মুখে কড়ি স্পর্শ করাইয়া জ্বালাইতে পারে। অপর বসন্ত, বিশুটিকাদি সংক্রামক রোগে মৃতদেহ প্রথমে ভূগর্ভে পুতিয়া রাখে; অনন্তর দুই তিন মাস পর সেই শব তুলিয়া যথানিয়মে জ্বালাইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এসকল ছোঁয়াচে রোগের শব সত্ত্বজ্বালাইলে, তথাবিধ রোগে হত্যাশন প্রায় গ্রীষ্ম ঔৎসর্গ করিবে। ইহাদের শবদগ্ন করিবার নিমিত্ত চুল্লীর প্রয়োজন হয় না। দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা গুঁড়ি স্থাপন করিয়া তদুপরি পুরুষের নিমিত্ত পাঁচ তবক এবং স্ত্রীলোকের সাত তবক সন্ন কাঠ সাঝাইয়া লয় (১)। মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রশাখাও দেওয়ার নিয়ম আছে, ধনশালী মহাশয়েরা তৎপরিবর্তে চন্দনকাঠ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া এই চিতার উপরিভাগে একখানি চক্ষাতপ টাঙাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর পুরুষের শব পূর্বাভিমুখ এবং স্ত্রীলোকের শব পশ্চিমাভিমুখ মন্তকে চিতার উপর সংস্থাপিত করা হয়। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র তদভাবে অপর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাতবার চিতা প্রাক্‌ক্ষিপ পূর্বক মুখাঘি দান করিলে আরও অনেকে চতুর্দিক হইতে অগ্নিসংযোগ করিয়া থাকে। এই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির গৃহের একটি খাম, কি একটি বাঁশ বা যে কোন একটি অংশ পরজন্মের আশ্রয়ার্থ দগ্ন করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কের মৃত্যুতে প্রজ্ঞানকালেও বাস্তোৎসবের প্রচলন আছে, অবস্থাপন্ন হইলে, রাজী পোড়াইবারও ব্যবস্থা করা হয়। পরিশেষে দাহকার্য সমাধা হইয়া আসিলে “রড়িগণ” “ছামিগিরি তারা” পাঠ করেন। গর্ভাবস্থায় মরিলে আগে পেট চিরিয়া ভ্রূণ বাহির করতঃ, তৎপর জ্বালায়; এবং সেই ভ্রূণকে সমাধিস্থ করে (২)। আর যদি কেহ ভূতগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়, তাহা হইলে সেই শব অর্জদগ্ন হইবার পর বন্ধের নিম্নে বিখণ্ডিত করিয়া ফেলা হয়। সংস্কার আছে, নতুবা সেই ব্যক্তি

(১) মধ্যদিগের মধ্যেও স্ত্রীলোকের নিমিত্ত অধিকতর কাঠ ব্যবহৃত হয়। চাক্‌মাগণ তাহাদিগের হইতে ইহা অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু জানি না, ঈদৃশী ব্যবহার কোন বিশেষ রহস্য নিহিত রহিয়াছে। কাপ্তেন লুইনও এতৎপ্রসঙ্গালোচনার লিখিয়াছেন—স্ত্রীলোকদিগের অধিকতর বুদ্ধি এবং তৈলাক্ত পদার্থের আধিক্যনিবন্ধন দাহোপকরণের কম প্রয়োজন হইবার কথা, কিন্তু ইহার তৎফলে আরও অধিকই ব্যবহার করে।

(২) এই প্রথা পার্শ্ববর্তী মধ্য ও ত্রিশুরাদের মধ্যেও আছে, হিন্দুদের হইতে অনুকৃত অনুমান হয়। পরন্তু এই পেট চিরিবার ভার বামী তদভাবে দেবরের কাছেই পড়ে।

পুনরুজ্জীবিত হইয়া নানা অহিত সংঘটন করে। পুরাকালে আত্মহত্যাকারীদিগের প্রতিও ঈর্ষী ব্যবস্থা প্রদত্ত হইত। যাহা হউক, শব ভস্মাবশিষ্ট হইলে সমাগত সকলে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। বলিয়া রাখা ভাল, এই কিরীয়ার কালে তাহারা অতি সাবধান রহে।

হাড়ভাসান।—অস্তোষ্টির পরদিন প্রত্যাবে চিতা হইতে কতকগুলি অস্থিমাংস সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট ভস্মরাশি স্রোতোজলে নিক্ষেপ করে। অনন্তর সংগৃহীত হাড়গুলি (১) একটি হাঁড়িতে রাখিয়া মৃতব্যক্তির অনেক সগোত্র তাহার মুখ বন্ধ পূর্বক লইয়া সেই স্রোতস্বতীর জলে নামে। তাহার হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রে একপ্রান্ত বাধিয়া দেওয়া হয়; অপর প্রান্ত তাহার সম্পর্কে সম্মানিত সেই গোত্রেরই কেহ তীরভূমি হইতে টানিয়া ধরে। এদিকে চাপঘারা “হাঁড়ি”টা জলপূর্ণ হইলে ডুব দিয়া তাহা ঠেলিয়া দিতেই, তীরস্থিত ব্যক্তি অলগত ব্যক্তিকে সূতার আকর্ষণ তুলিয়া আনে। অতঃপর “রড়ী” ও “ঠাকুর”দিগকে দান-দক্ষিণা উৎসর্গ করা এবং পরিপাট্যরূপে খাওয়ান হয়। এই সময়ে শ্মশানভূমিতে ঘেরা দ্বিবারও ব্যবস্থা আছে।

শ্রীক।—কোন কোন গোষ্ঠিতে অস্তোষ্টির দিন হইতে সাতদিন পরে,

সাপ্তাহিক।

আবার কেহ বা মৃত্যুদিবসের সাতদিন পরে সাপ্তাহিক শ্রীকক্রিয়া সম্পাদন করে (২)। এই আত্মশ্রীক-কার্য শ্মশানভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাধারনরূপে তিনু ও শ্রমগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। ক্রিয়াস্থলে প্রেতাশ্মার প্রীত্যর্থে ধ্বজা, খট্টা, শয্যা, নানাবিধ বাসন ও মস্ত, অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্যপ-করণ দক্ষিণাসহ উৎসর্গ করে। অনন্তর সপরিবারে কলসী ধরিয়া জল ঢালে; যদি পরিবারের কাহারও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে সে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রে একপ্রান্ত ধরিয়া রহে, অপরপ্রান্ত দানভূমিতে আনিয়া উক্ত কলসীগলে জড়ায়। এই সময়ে সমাগত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা প্রেতাশ্মার উদ্দেশে ধ্বজাপ্রতিষ্ঠা এবং ‘দান ধররাত’ ইত্যাদি পুণ্যাহুতান করিয়া থাকে। কথিত আছে, ‘ধ্বজাদানের এতই কল যে, তৎসকালনে শ্মশানের বস্তুগুলি

(১) ধনাত্মগণ ইহা হইতে কয়েক খণ্ড অস্থি গদ্য নিক্ষেপনার্থ রাখিয়া দেন।

(২) এক করদিন পরিবারহ সকলে প্রত্যহ সায়কালে “কারক” শ্রবণ করিয়া থাকে; তদুপলক্ষে শ্রোতৃগণের প্রত্যেকে এক বোড়া করিয়া বাতি জ্বালায়।

সেই পৰিচালিত হয়, সুতৰাং তত বৎসৰ নিৰ্দিষ্টে বৰ্গবাসের অধিকার লাভ করে।' সুতৰাং ধৰ্ম্মা সংখ্যার বেদী হইলে বৰ্গবাসের সুবিধাও অধিক ঘটে। এতদ্ব্যতীত ভোজাদিও বখাণ্য পৰিণামি হইয়া থাকে।

ইহাদের সমাজে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবারও রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকেই করে। মুক্তাধিকারের বাদ্ধাণ্য বার্ষিক। তারিখ ধরিয়াই বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন গণনা করা হয়। ইহাতেও ভিক্ষু এবং শ্রমণদিগকে নানাবিধ দান ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ ভিন্ন পূৰ্ব্বোক্তরূপে জল ঢালাও হয়; তা'ছাড়া অপর কোন বিশেষ বিধান নাই।

পিণ্ডদান।—ইহাকে সাধারণ কথায় “ভাত দেওয়া” বলা হয়। বৌদ্ধগণও পুনর্জন্মবাদী। চাক্ৰমারা বলে, ইহলোকের সৃষ্টি ও হ্রস্বতির ফলাফলসারে মানবগণ দেবদেবী হইতে কীট-পতঙ্গাদি ত্রিভুগুণোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। সুতৰাং কামনা ও কৰ্ম্মফলে অনেকে পুনরায় মানবজন্মও গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা আবার পূৰ্ব্ববংশেও জন্মলাভ করে। কথিত ‘পিণ্ডদান’ দ্বারা একদিকে যেমন পূৰ্ব্বপুরুষের তৃপ্তি সাধিত হয়, অপর দিকে তাহার বর্তমানে কে কোথায় আছে—তাহারও অনেকটা সন্ধান লাভ হয়; এবং কেহ কেহ উদ্ধারও লাভ করে। আপনাপন গোষ্ঠিতে মাত্র পিণ্ডদান করিবার নিয়ম; সংগোষ্ঠিত যে কেহ “গোষ্ঠীর” সকলেরই উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে পারে। পরন্তু কত পৰ্য্যায় পর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রদান করা হইল, প্রত্যেক গোষ্ঠিতেই তাহার একটা হিসাব থাকে। তিন, চারি বা অবস্থা বিশেষে ততোধিক পৰ্য্যায়ান্তর গোষ্ঠীর সম্বন্ধিত ব্যক্তি এ হেন পবিত্র কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে ‘অশেষ পুণ্যার্জন করে।’

এ উপলক্ষে সমুদয় জাতিবর্গ, এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা বিবাহিতা ও বিধবাগণ তাহাদের সম্ভব সম্ভতি সমভিষাহারে আহুত হয়। নদীতীরে অপ্রাপ্তপিণ্ডক মৃত স্ত্রী ও পুরুষগণের নিমিত্ত বয়ঃক্রমালসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দুই-সমাস্তমাল শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন কৃত্রিম ‘শ্রশান’ প্রস্তুত করে। ‘শ্রশান’ আর কিছুই নহে, বাঁশদ্বারা সীমাবদ্ধ কতিপয় ক্ষেত্র মাত্র। পূৰ্ব্বদিন সন্ধ্যা সময়ে সকলে উক্ত স্থানে গিয়া প্রোক্ষণাগণকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসে, তখন হইতেই কেহ কেহ মূচ্ছিত হয়। সকলে গিয়া তাহাদিগকে আপনাপন পরস্পরকর্তৃক পূৰ্ব্বপুরুষ সন্মোদনে আহ্বান করিতে থাকে; যে পরিচয়ের সংজ্ঞা লাভ হয়, সে-ই তৎকালিক ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বিধানে—তৎসংলগ্নবরগণ তাহার আকাঙ্ক্ষাপূরণে তৎপর হয়;

এইরূপে সেই রাজি অভিযাহিত হইলে পরদিন “ঠাকুর” ভবভাবে “রড়িগণ” তাহাদের নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রস্তুত যকোপরি উপবেশন করিয়া, “মালেশ,” “দ্বীপুন্দর,” “জুয়াদিজা,” “পুহুমকুলু,” “কুহুমকুলু,” “সাহসকুলু” এবং “দাসপারামি-তারার” পাঠ করেন। অনন্তর গৃহস্থ ও অপরাপর শিশুদাতৃগণ গলগলী-কৃত-বাসে প্রত্যেক প্রেতজ্ঞার উদ্দেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র “আধার” (১) এবং “মেজাং”এর উপরিস্থাপিত নবখালায় এক এক অর্দ্ধ মধ্যমোরগ, কিছু কিছু শূকর-মহিষাদির মাংস ও তাত, নারিকেল, কলা, মিশ্রি, শুড়, নানাবিধ মিষ্টান্ন, মত্ত প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন পুরোহিতগণ সমন্বয়ে উৎসর্গ মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। মন্ত্রপাঠকালে কোন “আধারের” উপর কীট-পতঙ্গাদি পতিত হইলে, সেই পাত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তি তথাপতিত তিথ্যাগুণোমি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। এসময়ে আবার জ্ঞাতি বা সমবেত কুটুম্বদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। তখন শিশুদাতা সমুদয় শিশুপাত্রসহ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া এক একজনের সম্মুখে এক একটি “আধার” আনয়ন করতঃ পাত্রোদ্দিষ্ট নামোল্লেখে বলিতে থাকে, “তুমি আমার অমুক (পিতা বা পিতামহ প্রভৃতি) হইলে, মদন্ত শিশু গ্রহণ কর।” এইরূপে এক একটি পাত্র ‘বাচাই’ করিতে করিতে সেই মূচ্ছিত ব্যক্তি হঠাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু-রুম্মালীনপূর্বক কাদিতে থাকে। যে পাত্রোদ্দিষ্ট নামে এই চৈতন্ত সম্পাদিত হয়, সে মূচ্ছিত ব্যক্তিরূপে অঙ্গগ্রহণ করিয়াছে, স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। অনন্তর যথাযোগ্য দান দক্ষিণাদিসহ তাহারই হস্তে তথাকথিত শিশু অর্পিত হয়; শিশু-গ্রহীতা তাহা হইতে স্বেচ্ছামুসারে উপাদের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন শিশুদাতা তাহাকে (বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও), ভূমিগত এগিপাত করিয়া ‘তুমি আমার অমুক (পিতা পিতামহ প্রভৃতি), এক্ষণে অমুক (পুত্র বা পৌত্র) রূপে অঙ্গগ্রহণ করিয়াছ। আহা! মেহের কি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ জন্মে জন্মেও আমাকে ছলিতে পারিতেছনা,’ ইত্যাদি নানা প্রিয়ালোপের সহিত সরসহ আলিঙ্গন করিয়া তাহার আপাধমন্তক দেখিয়া লয়। ক্রিয়াস্থলে জ্ঞাতিবর্গের সকলেরই উপস্থিত ব্যক্তিব্যায় প্রধান প্রয়োজনীয়তা এই যে, তাহাদের কেহ যদি ভিন্ন হানে থাকিয়া এই শিশুদানকালে মূচ্ছিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তদুদ্দিষ্ট শিশুদাতা ব্যক্তিকেই চৈতন্ত লাভ ঘটে না, স্ততরাং বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনা। ইহারা

(১) “আধার”—শিশুপাত্র; স্ক্রু হুপ্‌ড়ী বিশেষ।



আরও বলে, পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কীট, পতঙ্গ, কুকুর, শূগালাদি তিৰ্য্যগ্ৰন্থানে  
 জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এই পিণ্ডদানমাত্র মুক্তি ও তুপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ  
 প্রাণত্যাগপূর্বক মুক্তিলাভ করে। ব্যাঘ্র কুম্ভীর প্রভৃতির করালগ্রাসে বা  
 জলমগ্ন কি উষ্মকন্যাস্থিতে গতাস্থ ব্যক্তিগণও এই পিণ্ডদানে উদ্ধার পাইয়া যায়।  
 অতঃপর এইরূপে পিণ্ডপাত্রাদি লইয়া প্রাপ্তকৃত্র শ্রমানে উপস্থিত হয়; তথায়  
 প্রত্যেক প্রেতাশ্মার নির্দিষ্ট স্থানে পিণ্ডপাত্রাদি স্থাপনপূর্বক পার্শ্বে প্রত্যেক  
 প্রেতাশ্মার উদ্দেশে নানা কারুকার্য সমন্বিত এক একখানি স্তব্ধ ও বস্ত্র "টালোন"  
 প্রবাহিতা নদীকূলে বিলম্বিত ও দক্ষিণাউৎসর্গ করে। মৃত্যু মন্দানিলে সেই  
 ধ্বজানিচয় সঞ্চালিত হইয়া অমৃত্যুতার অক্ষয় পুণ্য ও যশোবোধবার সঙ্গে সঙ্গে  
 বহু ধূলিকণা স্থানান্তরিত করে, প্রেতাশ্মা তত বৎসর স্বর্গসুখভোগ করিতে পায়।  
 বিগত ১৩১৫ সালের ২রা ফাল্গুন কেমাহরবাসী শ্রীজয়চরণ থিসা নামা কুরাকুটী  
 গোছার সুরেশ্বরী গোষ্ঠীজ অনেক চাক্ৰা যে পিণ্ডদানোৎসব করে, তাহাতে  
 ১৮০ জন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদত্ত হয়। তাহাদের গোষ্ঠীতে ৮০ পরিবার।  
 এই কার্যে তাহার প্রায় সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

# দশম পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] প্রাচীন সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ ধারণা ;

৩

[ ২ ] প্রবাদ বাক্য ( Proverbs. ) ।

[ ১ ]

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির ভিতরেই নানাধিক পরিমাণে কতিপয় সংস্কার এথাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর প্রদীপ্ত সত্যতালোকেও তৎসমুদয়ের উচ্ছেদ সাধন করা বাইতেছে না! অনেকে বিশেষতঃ নব্য যুবকেরা বলিয়া থাকেন, এই সকল সংস্কার জাতীয় দুর্বলতা হইতে সজাত ।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহারা এই আবার বয়সাদিক সংস্কার ।

এবং শক্তিস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ‘কুসংস্কারের’ ভক্ত হইয়া পড়েন । এরূপ দৃষ্টান্ত সমাজে প্রায়শঃই ঘটিতে দেখা যায় । এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যৌবন-মদ-দৃপ্ত উদ্ধতাচারী কোন কোন যুবক পুরুষ পরম্পরাগত সংস্কারের মন্তকোপরি পদাঘাতে নানা উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটাইয়াও হঠাৎ দৈবশক্তির সামান্য আঘাতেই এত যে কাতর হয়, অতি সময়েই বরাকষ্ট অশ্রুজ্ঞান অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে নতশির হইয়া পড়ে! যাহা হউক, মধ্যযুগে সমাজবিপ্লব বাদৃশ ভীষণ ভাবে গড়াইতেছিল, সুধের বিষর, এক্ষণে তাহা আর নাই । ঝড় ধামিয়াছে,—শ্রোত ফিরিয়াছে—দেশের লোকের মতি-গতিও প্রাচীনকে সম্মান করিতে ছুটিরাছে ।

পক্ষান্তরে ইহা সত্য যে, এ সমুদায় সংস্কারের উপর অত্যাচার করিলে কল না হইয়া যায় না ।

কল ।

হয়তঃ কোনটা স্থূল দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে, অথবা কোনটা পরোক্ষ-ভাবে তেজোবিকাশ করিবার সুযোগ অসুসন্ধান করে । তবে সংস্কারগুলি বেক্রপ ভাবে ধর্ম ও অমঙ্গল-পাশে বিজড়িত, সেই সমস্ত কি পরিমাণে যে সারগর্ভ—তাহাই সন্দেহের বিষয় । যতদূর সম্ভব, সাধারণকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই

তাদৃশী গর্হিত যুক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। তৎপরিবর্তে সরল ভাবে কারণ নির্দেশ করিয়া গেলেই আশা করি এই কঠোর বৈজ্ঞানিক যুগে অধিকতর আদৃত হইত। তবে পরিণাম সমালোচনা না করিয়া পূর্বপুরুষের বহুদর্শিতা-প্রসূত উপদেশ-জ্ঞানে অন্ধ বিশ্বাসেই সংস্কারগুলি প্রতিপালন করিয়া যাওয়া মন্দ নহে।

অধুনা চাক্ষুশদিগের মধ্যেও ‘সংস্কার’ সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। এখানেও শিক্ষিতাভিমাত্রী নব্য যুবকেরাই তাহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইবেন সন্দেহের বিষয়। কেমনা সমাজের

সংস্কার চেষ্টা।

অধিকাংশ ব্যক্তিই এই সমস্তের প্রতি একরূপ অগাঢ় তস্তিমান যে, তাহারা সহজে বিচলিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্ত সমাজের যে কোনও অনিষ্ট ঘটিবে, সেই আশঙ্কাও নাই। বরং সকলে ‘সংস্কারের’ ভাড়াতে হইলেও কর্ণে ত্রুটি হউক, তাহাই আমাদের আর্থনা।

কোন সমাজের বাবতীয় সংস্কারগুলি তালিকাভুক্ত করা কখনই সম্ভবপর নহে। কেবল নমুনা প্রদর্শনের নিমিত্ত চাক্ষুশ তালিকা।

জাতির কয়েকটি মাত্র সংস্কারের উল্লেখ করা

গেল: —

### অমঙ্গলসূচনা ।

শক্বে।—রাত্রিকালে কাক বা ঘুঘু এবং অপরূহে মোরগের ডাক অন্তত হুচনা করে। কুকুটীর উচ্চশব্দ যে কোন সময়ে অমঙ্গলজ্ঞাপক। শুকবৃকে ধ্বজন ডাকিলেও অন্তত ঘটে।

দৈবযোগে।—রাত্রে টিরাশাখী উড়িলে বেশ ছাড়খারে যায়। মোরগে নয়ম ডিম পাড়িলে গৃহস্থের অন্তত হুচিত হইয়া থাকে। “কেয়া কাপড়” অর্থাৎ গামছা ভালিয়া গেলেও অমঙ্গল।

পশুপক্ষীদ্বারা।—আগমে বানর চুকিলে কিবা বাঘ ঘরে ঢুকিয়া, “ভাতের মোচা (গুটুনী)” খাইলে ভাল নহে। গৃহের মধ্যে মোষাছি প্রবেশ করিলে সবংশে বিনাশ নিশ্চিত। ঘরের মধ্যে অগ্নির হাগল উঠিলে, অতিথির আগমন হুচনা করে। বনি “মইন ধরে” গিয়া বাঘ উঠে, তাহা হইলে পরিবারের সকলেরই “বাধা ধোওয়া” আরম্ভক। একতর ঘরের চালে চিল, পেচক, শূন্য বা গৃহিনী

পড়িলে অথবা কুকুর উঠিলে অন্তত জ্ঞাপন করে। তৎক্ষণৎ বর্ধাসম্ভব সময় পূজার আরোহণ করা হইয়া থাকে। কেবল শেখোক্ত স্থলে কুকুরের কান কাটিয়া দেওয়া হয়; এবং সপরিবারে “মাথা ধোয়।”

যাত্রাকালে।—খালী কলসী দেখিলে অমঙ্গল ঘটে, পূর্ণ কলসী দেখা গেলে কার্যসিদ্ধি নিশ্চিত। হাঁচি পড়িলে ভাল নহে; কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাওয়া প্রয়োজন। সর্প বা শৃগাল দক্ষিণ হইতে বামে গেলে কুলক্ষণ সূচনা করে, বিপরীতে শুভ। মন্তকে আঘাত পড়িলে অন্তত; ইহাতেও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। যদি বস্ত্র কুকুট ডাকিতে ডাকিতে কাহারও অভিন্নুখে আসে, তাহাতেও অমঙ্গল সূচিত হয়। সর্প দক্ষিণ হইতে বামদিকে গেলে অঘাতা, কিন্তু বাম হইতে দক্ষিণ দিকে গেলে শুভ ঘটবার সম্ভাবনা। বিবাহের প্রস্তাবার্থ গমন সময়ে যদি কোন জীবের শব দেখা যায়, তাহা হইলে সেস্থলে বিবাহ প্রস্তাব পরিত্যাগ্য।

### নিষেধ ব্যবস্থা ।

বারবিশেষে।—বুধবার কোন প্রধান কাজ করিতে নাই। এমন কি বাকী হইতে কোথাও যাত্রা করাও নিষিদ্ধ।

পানভোজনে।—বিড়ালের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ, কুকুরের পানাবশিষ্ট বা যে “কোস্তির” জলে পা ধোওয়া হয়, অথবা যে কুয়ার জলে লোকে স্নানটুকরে তাহার জলপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বর্ধাধিকক্ষণের ছিমগাছের ছিম তক্ষণে সর্পবিষ অনিবার্য্য হয়।

ক্রীড়ায়।—কাঁকড়া লইয়া খেলা নিষেধ। কীট লইয়া খেলা করিলে বজ্রপাত ঘটে।

স্পর্শে।—চলিবার সময় সন্তানের গারে বিশেষতঃ মন্তকে “শিঁধন” লাগিলে, সন্তানের অমঙ্গল ঘটয়া থাকে। সোনা, রূপা, চাউল প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধন সামগ্রী পায়ে লাগা ভাল নয়। যদি কোনরূপে পাদস্পর্শ ঘটে, তবে তখন তখন তাহা মন্তকে স্পর্শ করাইবে।

আচার-ব্যবহারে।—জলে প্রস্তাব করা, এবং ভাতাক দেবনের পর সুখ ঘোওয়া নিষেধ। পুকুরে স্নান করিয়া বাস। পুকুরে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে ব্যক্তিস্থে প্রশংসা হইয়া থাকে। প্রত্নবে রে'দ উঠিবার পূর্বেই উনারের

ছাই কেলিয়া না দিলে পরে সেই ছাই আর মাটিতে ফেলা যায় না; তাহা অপর কোন পাত্রে উঠাইয়া রাখিতে হয়। বিপ্রহরের পর মঞ্চ পরিষ্কার কিংবা উনান লেপাদি কাজ করিতে নাই। খালে নিয়া—মাটির হাঁড়ী, ঘর লেপিব্যার “নাতা” প্রভৃতি ধোওয়া ভাল নয়। জাতির কেহ যদি নূতন কোনও নিয়ম বা কার্য আরম্ভ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই জাতির অপর কাহারও তাদৃশ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে।

### বিশেষ বিধি।

উপবেশনে।—কোন স্থানে বসিবার পূর্বে কিঞ্চিৎ ‘থুথু’ প্রক্ষেপ না করিলে মার্গদেশ ভারী হইয়া “পুনখোড়া” রোগে কষ্ট পাইয়া থাকে।

দোলা প্রস্তুতে।—প্রথম জাত সন্তানের জন্ত দোলা প্রস্তুত করিতে পারা যায়; কিন্তু অমুজাত আর সমুদয় পুত্র কন্তাকে তাহাতেই দোলাইতে হয়। নতুবা পরবর্তী, কাহারও নিমিত্ত নূতন দোলা প্রস্তুত করিলে, সেই সন্তানের মৃত্যু ঘটে। বিষম লাগিলে।—পানাহার করাইবার সময় যদি হঠাৎ শিশু সন্তানের খাসরোধ ঘটে, তাহা হইলে মাতা এক শব্দ করিতে করিতে আন্তে আন্তে সন্তানের মস্তকে করাঘাত করিয়া থাকে।

গোষ্ঠীবিশেষে।—“পিড়া ভাড়া” গোষ্ঠী মিষ্টকুমুড়ের বীজ ভণন করিতে পারে না; তাহার অন্তর্গত করিলে তাহাদের ক্ষেত্রে বাঘ আসে এবং উপদ্রব করে। “কোমরং” ও “কাল” গোষ্ঠী লাউ কুমুড়াদির নিমিত্ত ‘মাচা’ দিতে পারে না। “সিঙিয়া পুনা” গোষ্ঠী কিছু উদ্ভাগে রাখিবার জন্ত ‘মাচা’ দিলেও অমঙ্গল ঘটে। “নাহুকুতুয়া” গোষ্ঠীর সেরী, আড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ। এতদ্বিত্ত কচুরোপণেও তাহাদিগের বাধা আছে। এইরূপে কোন কোন গোষ্ঠী মানকচু খাইতে এমন কি ছুঁইতেও পারে না। কাহারও বা পেচক ধরা উচিত নহে।

শুকর কাটিলে।—“আরমে” শুকর কাটিলে বালকবালিকাদিগের নাকে, বগলে এবং কনুই ও জাহ্ন প্রভৃতিতে কাঁচা হলুদ বাটিয়া দেওয়া হয়, নতুবা তাহারা অগবেষতা হইতে ভয় পাইতে পারে।

সর্পহত্যায়া।—বাপ মারিলে মাথা ও লেজ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখে; জা'না হইলে সেই সর্পের পুনর্জীবিত হইবার সম্ভাবনা রাখে।

শব সংকারে।—বাহারী বাঘের “হু” অর্থাৎ ঘর জানে, মৃত্যুর পর যদি

তাহাদিগের শব অবিলম্বে পোড়াইয়া না ফেলে, তবে তাহারা পুনর্জীবিত হইয়া মনুষ্য ধরিয়া যায়। এমন কি, শত শত খণ্ড করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিলেও যাত্রা আবার সমস্ত একীভূত হইয়া উৎপাত আরম্ভ করে। সেই জন্ত এইরূপ শবের তালু এবং উদরে লৌহ প্রেক প্রোথিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা অতি উত্তম প্রতিবেদক। লৌহ সংস্পৃষ্ট জিনিষের উপর ভূতপ্রেতের অধিকার থাকে না। অতএব এ সকলের হাত হইতে নিরাপদ থাকিতে হইলে লৌহের কোন দ্রব্য সঙ্গে রাখিতে হয়।

### স্বপ্নফল ।

যদি স্বপ্নে শিকার লব্ধ কোনও প্রাণীভোজন করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে অচিরে মৃত্যু ঘটে। স্বপ্নে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়াছে দেখা গেলে, অপমানিত হইতে হয়। স্বপ্নে মৎস্য প্রাপ্তিতে অর্থলাভ হইয়া থাকে। মৃতলোককে স্বপ্নে দেখিলে পরদিন মাংস খাইতে নাই, নতুবা অনিষ্ট ঘটে। স্বপ্নে “চামনী” (দীক্ষা) হইতেছে দেখা ভাল নহে; চুল ছাটিতে দেখাও ভাবী অমঙ্গল-জ্ঞাপক। যদি কেহ স্বপ্নে শ্রোতের তুল্যকূলে নৌকা বাইতে দেখে, তাহাতে অমঙ্গল হয়; প্রতিকূলে বাইতে দেখিলে শুভ ঘটয়া থাকে।

### বিবিধ ।

শনি মঙ্গলবারে চিৎড়ি মৎস্তের জর হয়, স্তবরাং ঐ সকল দিনে চিৎড়িমাছ অধিক সংখ্যায় ধরিতে পারা যায়।

গ্রহণের কারণ নির্দেশে কথিত হয়, “চন্দ্রসূর্য্য কোন সময়ে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া রাহু হইতে কিছু দূর নিরাছিল; কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলেও, তাহারা তাহা পরিশোধ করিতে পারে নাই। তদবধি তাহারা রাহুকে দেখিলেই ‘পাশ কাটরা’ পলায়ন করে। রাহু ইহাতে কোপ-পরতস্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতক-গণকে সুবিধামত পাইলেই উদরসাৎ করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহারা মলমূত্র দিয়া পলাইয়া যায়।” এই কারণে গ্রহণসময়ে ইহারা বন্ধুকের আওয়াজ করিতে থাকে। অজ্ঞাতঃ উদ্ধাপাতকেও ইহারা কোন অমঙ্গলের চক্ষ দেখে না। ইহাদের মতে ‘এক তারা অপর তারার বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায়’—মাত্র। তাই তাহা ইহাদের ভাষায়—“তারা আমাই”।

অনেক সময় এই দেশ ইন্দুরের উপদ্রবে সাতিশয় কতিপয় হয়। পালে পালে ইন্দুর আসিয়া, সমুখে বাহা পায়—লুটিয়া যায়। তাহারা ক্ষেত্রের শতও নষ্ট করে

এবং হতভাগ্য পাহাড়ীদের ধানের গোলাও শূন্য করিয়া ফেলে। পরন্তু ইহাই আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতেই অন্তর্ধান হয়! কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন (১), “গত ১৮৬৪ অব্দে যখন ইন্দুরের উৎপাত আরম্ভ হয়, তখন পাহাড়ীরা আমাকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল যে, এই সকল ইন্দুর কালে বস্ত্র কুকুট হইয়া থাকে।” প্রমাণ স্বরূপ তাহারা, বস্ত্রকুকুটের লম্বা পালককে যাহা মাটি ছেঁড়াইয়া যায়, ইন্দুর জনের লেজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল।”

[ ২ ]

সমাজে আর কতিপয় গাথা থাকে, তৎসমুদয় বহু অভিজ্ঞতা প্রসূত, সুতরাং অমূল্য উপদেশে পরিপূর্ণ! সহস্র ব্যাখ্যা বা বক্তৃতায় যাহা সম্ভব নহে, এই এক একটি মাত্র উপনামূলক সতর্কসত্যে তদপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ততার সহিত মনের উপর প্রবল আঘাত করিয়া থাকে। আমরা

প্রবচন।

যদি এই মহা বাক্যগুলি হৃদয়ে চির জাগরুক রাখিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কখনও কর্তব্য ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দৈববাণী উথিত হয়; তাহার সুগভীর নির্ঘোষে ভাবী ফলাফল জানিতে পারিয়া উপযুক্ত সময়ে সাবধান হইতে পারি। অতীত দুঃখের বিষয়, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার বড় একটা সংবাদ রাখেন না। তাহারা ছই চারিটা বিজাতীয় ‘ইডিয়ম’ (Idiom) শিখিলেই জীবনকে ধস্তাধরিত করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর হইল, চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কালেক্টর মিঃ এণ্ডার্সন কতিপয় “চট্টগ্রামের প্রবাদ বাক্য” (Chittagong Proverbs) উদ্ধার করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। লিখিতে লজ্জা ও ক্ষোভে লেখনী নত হইয়া যায়,—আধুনিক অনেক স্বদেশবাসী তাহা পাঠেই দেশের প্রবচন শিক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে তৎপ্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আশা হয়, বৃষ্টি বা দিন ফিরিল। সুতরাং প্রত্যেক দেশের সহযোগী সাহিত্য সেবকগণকে এই জ্ঞান অন্বেষণ করি যে, তাহারা যেন স্ব স্ব দেশের এতাদৃশ কর্তব্যানুশাসন বচন নিচর অতীতের ওদাসিত্ব হইতে রক্ষা করিতে যত্নশীল হন। চাক্‌মা সম্প্রদায়ে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের কিয়দংশ বিজাতীয় ভাবে গঠিত, কোন কোনটা কেবল ভাষান্তরিত মাত্র। এস্থলে কেবল ইহাদের সম্পূর্ণ নিরূপণ করেকটা প্রবচন প্রদত্ত হইল।

“বড় পণ্ডিত হলে পথের কুরে হাগন ।” ১।

“আপন আন্দাজ পাগলে বুঝে ।” ২।

“উয়রে উয়রে ব-যায়,  
কলগ-মানজে থান্ নপায় ।” ৩।

“একা বুদ্ধি যার, গুণৎ দরি তার ;  
ছেত্তেরা বুদ্ধি যার, পুনৎ দরি তার ।” ৪।

“কুকি দেজৎ নুন যেচেদে হয় ?” ৫।

“কেতায় ছব গরে, নালা কাবা খায় ।” ৬।

“খেইৎ ন জানে মরি পায়,  
বইৎ ন জানে লরি পায় ।” ৭।

১। অত্যধিক পবিত্রাচারী লোকেরা পথের ধারেই বাছ করে, অর্থাৎ যাহারা বেশী খাটি দেখাইতে চায়, তাহাদের গলদ খুব বেশী।

২। নিজের ভাল পাগলেও বুঝিতে পারে।

৩। বাতায় উপর উপর দিয়াই প্রবাহিত হয়, গিরিগঙ্গারবাসীরা তাহা অনুভব করিতে পায় না।

৪। যাহার একমাত্র বুদ্ধি অর্থাৎ এক বিষয়ে মাত্র জ্ঞান, সে ( নৌকার ) “গুণ দড়ি”র স্থায় কার্য চালাইয়া থাকে। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অত্যধিক, তাহার মার্গে দড়ি পড়ে; অর্থাৎ সে রজ্জুবদ্ধ হয়। c/o “অতিচালাকের গলায় দড়ি।”

৫। কুকিদেশে লবণ ( অর্থাৎ যেখানে যাহার বিশেষ অভাব ) যাচঞা করিতেছে।

৬। দুশ্চরিত্র পাপ কার্য করে, নপুংসক তাহার শাস্তি ভোগ করে। অর্থাৎ একে দোষ করে, নির্দোষ তৎশাস্তি পাইয়া থাকে।

৭। খাইতে না জানিলে মরিতে হয়, এবং বসিতে না জানিলে নড়িতে হয়।

“গরম ভাতে ক্ষুধা বেজার ।” ৮।

“গাঞ্জর আগাৎ শুই,  
থুরা ভাৎ থেখা তুই ।” ৯।

“গিরিগুণে শূকর ফাটোয়া হয় ।” ১০।

“শব্দ হনি গোয়ালপারা,  
দৈ-দুধ ছেত্তেরা ।” ১১।

“চিলের দরে কি কুরা ন পুজিব ?” ১২।

“ছাগল দিলে দরি নদিলে ।” ১৩।

“তুই বাঙাল ছাগল হইয়ছে ?” ১৪।

“তুছ খলাৎ কুরা-আক্যাৎ ইহয়ে ।” ১৫।

“নামু নচিনি ছালাম্ গরন ।” ১৬।

৮। ক্ষুধার সময় গরম ভাত দেওয়া হইলে ক্ষুধা লোপ পায়, অর্থাৎ উচিত ব্যবস্থায় সকলেই বিরক্ত হয়।

৯। গাছের অগ্রভাগে গোসাপ রহিয়াছে ; ( অগচ ভাইপো পিতৃব্যকে বলিতেছে ) থুড়া, ( উক্ত গোসাপ দিয়া ) ভাত খাইয়া যাও।

১০। গৃহস্থের প্রকৃতি অনুসারে শূকর অমিতাচারী হয়।

১১। গোয়ালপাড়ার শব্দ শুনিয়া, দৈ-দুধ পর্যাাপ্ত মনে করা।

১২। চিলের ভয়ে কি মোরগ পুঁষিব না ? c/o “চোরের ভয়ে বিবাহ না করা।”

১৩। ছাগল দিলে, তার দড়ি দিলে না ?

১৪। তুই বাঙ্গালীর ছাগলের স্থায় ( সর্বদা গা-দেঁসা ) হইয়াছিস।

১৫। তুব-ভাণ্ডার লোভী মোরগের স্থায়।

১৬। ঠাকুরদা অর্থাৎ পূজনীয়কে না চিনিয়া সেলাম করা।



“নুন খেই শুণ গরন।” ১৭।

“পেকোয়াও পরিবার গং,  
ঝিলাবোয়াও ভাঙিবার গং।” ১৮।

“ফকির লগে কাল বাঙাল,  
হরিণ লগে চঙরা পাগল,  
খঞ্জন সমায়ে চেগা পাগল।” ১৯।

“ফুল-বারি গার ন সর,  
চাবুক-বারি পরাণে মাগেরা” ২০।

“বকা ছেয়ে কবা।” ২১।

“বর গাংর চাইরম্,  
বাদীও ধুইরম্।” ২২।

“বিলেলে কুণ্ডর।” ২৩।

“বুরা বাদরে গাছং উড়ে।” ২৪।

১৭। নিমক খাইয়া উপকার করা।

১৮। পক্ষিটা পড়িতেই ডালটা ভাঙিয়া  
গেল। c/o. ‘কাক তালির।’

১৯। বান্দালীর সর্দদা ফকিরের পেছনে  
পেছনে থাকে। সেইরূপ ছোট হরিণীর সহিত  
বড় হরিণ এবং খঞ্জনর সঙ্গে চেগা নামক পক্ষী  
পাগলপ্রায় ঘুরে।

২০। ফুলের আঘাত সহ্য হয় না; চাবু-  
কের আঘাত এাণে চায়।

২১। বকপালের মধ্যে যেমন কাক, অর্থাৎ  
‘হংসোমধ্যে বকো বধা’।

২২। বড় নদীও দেখিব, “বাদী”ও ধুইব।  
c/o. ‘রথ দেখা ও কলা বেচা।’

২৩। বিড়ালের সহিত (যেন) কুকুর—  
ইহাদের সর্দদাই ঝগড়া বাধে।

২৪। বুরা বানরও গাছে উঠিয়া থাকে।

“ভাত নেই গরু পিলা।

উলু পারা চুল-ঝুবা।” ২৫।

“মইলার গাছ কাবদে,  
ভাগিনার নরম পায়।” ২৬।

“মাণিক্যা-ব্যাপর ছিন্নিখানা।” ২৭।

“মাহুজ্ বৃষি পুগিয়ে কামরায়।” ২৮।

“মুরা-উয়রে তুণ্ডন বাচ্।” ২৯।

“বা-নাঙে ন্যোই,  
মেজ্‌বাজা ঘরং গেলেও ন্যোই।” ৩০।

“বার বাপরে কুমুরে থার,

২৫। ভাত খাওয়ার চাউল নাই, (হকুম  
হইতেছে)—‘পিঠা কর’। (অন্ততঃ তৈল  
অভাবে) চুলের খোপা উলু অর্থাৎ সরু ছনের  
প্রায় হইয়াছে।

২৬। মায়া গাছ কাটিতেছে, ভাগিনের  
জানিতেছে যে—নরম।

২৭। ‘মাণিক্যর বাপ’ নামক এক ব্যক্তি  
সিগ্নির নিমন্ত্রণে যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ার  
কিছু পাইয়াছিল না। তদবধি তাহার ন্যায়  
দুর্দশাগ্রস্ত লোককে উক্ত প্রবচন দ্বারা ঠাটা  
করা হয়।

২৮। মাহুজের প্রকৃতি বৃষ্টিময়ী পুঁই নামক  
কীটবিশেষে কামড়ায় অর্থাৎ নিরীহ পাইলে  
কুত্রও জ্বালাতন করে।

২৯। পাহাড়ের শৃঙ্গোপরিস্থিত তুণ্ডন বীশ  
অর্থাৎ ঝাড়ে একমাত্র বীশের জায় বায়র  
অমুসারী—বিবেকসম্মানহীন ব্যক্তি।

৩০। বার জন্ত নাই, তার বিমুগ্ধ বাড়ীতেও  
নাই।

তার পোয়ার খেউ দেশে দরায় ।” ৩১ ।

“যে ফুল নিল, সেই ফুল পিঁধে ।” ৩২ ।

“যেই কুণ্ডরের লেজ বেড়া,

চুমাং ভোরেলোও উজু নহয় ।” ৩৩ ।

“যেমন তাজাবি সেমন নাম,

সামুলেজী পিঁধরান ।” ৩৪ ।

“লুর-শূর চাল-উপর উথিলে,

যুগযুগি ডাঙর হয় ।” ৩৫ ।

“ধায়দে মাছোয়া দাঙর,

নরেন্দ্রে পুরাবুয়া দোল ।” ৩৬ ।

“ছুকুরে কুচু-টেঙেরা ছুপু পেলো—

ন এরো ।” ৩৭ ।

“সভামধ্যে কর্গরা ভাত ।” ৩৮ ।

“সময় থাকতে বান ;

দিন থাকতে হাঁট ।” ৩৯ ।

“সাত ওয়ার পোরা মারে ।” ৪০ ।

“ছেদাম্ ত্বেই ভেদাম্

মৈনর উপর তিন আদাম্ ।” ৪১ ।

“ছেদাম্ ত্বেই ভেদাম্ ত্বেই এতুমা হা,

গাং কুলে নি ভিজ়েই ভিজ়েই থা ।” ৪২ ।

“ছেদাম্ ত্বেই যার, তিন মোগু তার ।”

৪৩ ।

“হেইদ এলে গাজ্ তগাতুগি ।” ৪৪ ।

৩১। যার বাপকে কুমীরে খায়, সে ঢেউ দেখিলেও ভয় পায় ।

৩২। যেই ফুলকে নিন্দা করা হয়, সেই ফুলই পরিশেষে পরিধান করে ।

৩৩। যেই কুকুরের লেজ বাঁকা, চুঙার ভরিলেও তাহা সোজা হয় না ।

৩৪। তান্যাবিবি যে রকম, তার নামও তেমনি ; তার পিঁধনখানিও “সামুলেজী” ফুল বিশিষ্ট ছিল ।

৩৫। ধোঁয়ারের শূকর চালের উপর উঠিলে গর্জন বাড়ে ।

৩৬। যে মাছটা পলাইয়াছে, তাহা খুব বড় ছিল ; যে ছেলে মরিয়াছে, সে বড় হৃদয় ছিল ।

৩৭। শূকর যদি কচুর ঘেরার অর্থাৎ কচু-খেতের সন্ধান পায়, আর ছাড়়ে না ।

৩৮। সভার মধ্যস্থলে পাহাতাত অর্থাৎ এক বিষয়ের আলোচনার সময় অন্য বিষয়ের উত্থাপন ।

৩৯। সময় থাকিতে বাঁধ ; দিন থাকিতে হাঁটিতে থাকে ।

৪০। সাত খাজীতে সম্মান নষ্ট করে ।

৪১। বুদ্ধি হক্কি কিছুই নাই, অথচ পাহা-ডের শূঙ্গে তিন পাড়া বসাইতে চায় ।

৪২। বুদ্ধি হক্কি কিছুই নাই—‘হা’টা এত বড় ; নদীর কূলে নিয়া ভিজ়াইয়া ভিজ়াইয়া থাও । অর্থাৎ নিষ্ঠারীন আশায় কোন ফল নাই ।

৪৩। যার বুদ্ধি হক্কি নাই, তার তিন স্ত্রী । অর্থাৎ সে এক স্ত্রীতে বর চালাইতে পারে না ।

৪৪। হাতী আসিয়া পড়িলে, তখন (তাহাকে মারিবার জন্য) গাছের অগ্নুসন্ধান হয় ।

“হেইদ-পুনং কুণ্ডরে ভুগে।” ৪৫।

“তেরা খেইয়া বাঘ-দরে খেই যাদে,

চিংখেইয়া বাঘ-লাগৎ পায়।” ৪৬।

“চিগন মরিচ-ঝাল বেচ্।” ৪৭।

৪৫। হাতীর পেছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। অর্থাৎ কেহ কেহ অপ্রাকৃত সাহসও প্রদর্শন করে।

৪৬। মাংসভুক বাঘের ভয়ে পলায়ন করিতে হুদপিণ্ডুক বাঘের সম্মুখে পড়ে।

৪৭। ছোট লঙ্কার ঝাল বেশী।

“খের-তলেও সোনা ধায়।” ৪৮।

“রাদা ত্লেই দেজং,

কুরিড় গব্‌গবি।” ৪৯।

“গাজ চিনে বাগলে,

মাহুচ্ চিনে আগলে।” ৫০।

৪৮। খড়ের তলায়ও সোনা থাকিতে পারে।

৪৯। যে দেশে পুং-মোরগ নাই, তথায় স্ত্রী-মোরগের শব্দই বড়।

৫০। বাকল দেখিয়া গাছ চেনা যায়, এবং আঁচরণ দেখিয়া মাহুষ চেনা যায়।

# একাদশ পরিচ্ছেদ ।

## আহার্য ও পানীয় ।

প্রধানতঃ দেশের প্রকৃতিভেদেই খাদ্য ও পানীয়ের বিভিন্নতা ঘটয়া থাকে । শীত প্রধান এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশ কখনই একই নির্দিষ্ট তালিকাধীনে চলিতে পারে না । একস্থানে মত্তমাংসাদি উষ্ণতর ভক্ষ্য না হইলে আত্মরক্ষা কঠিন হয়, অত্রস্থানে শাকার ভোজনেই যথেষ্ট হয় । সুতরাং যে স্থানে যাহা অনাবশ্যক—তাহাই অখাদ্য, রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একবারে অস্পৃশ্য; অথচ তাহাই অত্রস্থানে জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন । ইহা হইতেই জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা আসে এবং ধর্ম্মাচর্য্যার স্থূল ব্যবস্থাপ্তিও নানারূপে পৃথগীকৃত হইয়া পড়ে । পরন্তু যদ্বারা শরীররক্ষার সাহায্য হয়, তাহা সকল দেশের সকল জাতিরই ধর্ম্মানুমোদিত ! প্রথমে শরীর পরে ধর্ম্ম,—ইহাই পণ্ডিতবর্গের মত (১) । অতএব আবশ্যক ও সৌকর্য্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভিন্নবিধ ভোজ্য প্রচলিত থাকিতে পারে, তাহাতে নিন্দার কোনও কথা নাই ।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভেদে খাদ্যবিচার যেমন স্বাভাবিক, পক্ষান্তরে তাহার আহার পদ্ধতিও বিভিন্নরূপ হইয়া যায় । শীতপ্রধান দেশে “কাঁটা-চামিচ” না হইলেই নয়, আর আমাদের দেশে একমাত্র হাতেই আহার পদ্ধতি । ইহাতেও আবার কেহ বা ডান হাতে কেহ বা বাম হাতে (২), কেহ কেহ বা উভয় হাতে, কি যেকোন হাতে আহার করে । চাক্‌মাগণও এই শ্রেণীতে সম্প্রদায়ভুক্ত । তবে সাধারণতঃ ইহারাত

(১) “শরীরমাদ্যং থলু ধর্ম্মসাধনং”—কুমারসম্ভব ।

(২) ডাক্তারগণের মতে যে হাতে জলসৌচ করা হয়, পাদ্যাদ্রব্যে তাহা স্পর্শ না করাই কর্তব্য ; কেন না তাহাতে ক্রিমিভিধ থাকে । এই ভিন্ন পুনরায় কোনরূপে শরীরাত্মস্থিরে চকিতে পারিলে কুটিয়া যায় ।

দক্ষিণ হস্তেই গ্রাস গ্রহণ করে এবং বামহস্ত মংস্যের কাঁটাদি ছাড়াইতে সাহায্য করিয়া থাকে। বলিতে কি, ইহাদেরও উচ্ছিষ্টে অন্তর্নিহিত সংস্কার নাই (১)। নিমন্ত্রণাদিতে বা প্রীতিভোজে সতরঞ্চ তদতর্বে কেবল “পাটী” বিছাইয়াই আহায়ে বসে; নতুবা সচরাচর সকলে “পিড়ি”তে বসিয়াই আহার করিয়া থাকে। কিন্তু ধনবান মহাশয়েরা আহার কালে ধাতুক “ভোজন বেড়ের” (২) উপর থালা রাখা করেন; আর সাধারণ পরিবারে “ভোজন বেড়” অভাবে বাঁশের চাঁচাডী নির্মিত “মেজাং” (৩) এর উপর থালা, মুগুর বাসন কিম্বা কদলী পত্রে (“পৈ”এ) ভোজন করিয়া থাকে। “পৈ” চিং করিয়াই পাতা হয়। ভাতের মধ্যে মধ্যেই “তৈন” অর্থাৎ ব্যঞ্জন লয়; সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাটার ব্যবহারও আছে। ইহাদিগের সচরাচর প্রচলিত খাদ্য ও পানীয়ের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

চাউল—ভাতপেরই প্রচলন অধিক; সিদ্ধ একরূপ নাই বলিলেও হয়। পাহাড়ী চাউলে তৈলের ভাগ কিছু বেশী এবং অধিকাংশই মোটা। কিন্তু ইহার চাউলগুলি এমনি ছাটিয়া খায় যে, সহসা দেখিলে মোটা চিকণে প্রভেদ বুঝা যায় না। তত অধিক পুরাতন চাউল মাত্রই পছন্দ করে না। এমন কি তৈলাক্ত হইলেও নূতন চাউলই খায়; এবং বৎসরান্তে উদ্ধৃত ধান বিক্রি করিয়া নূতন খরিদ করে।

দাল—খুব কম প্রচলিত; নিমন্ত্রণাদিতে বা ভক্তপরিবারে মাত্র সময়ে সময়ে দেখা যায়। কিন্তু শিমের বীজের দাল ইহারা অতিশয় ভালবাসে।

শাক—নীনা রকমেরই আছে; তন্মধ্যে এই কয়টাই সমধিক প্রচলিত। উচ্ছে শাক, “লেংরা শাক,” “উজল শাক,” ঢেঁকি শাক, “মাইরা শাক,” কচু শাক, “লেংরা শাক,” বাথুরা শাক, গিমা শাক, পুঁই শাক, “ইয়ং শাক,” “আমিলা-পাতা শাক,” প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন নবোদিত আম পাতা, পেরারা পাতা, কাঁঠাল

(১) পরন্তু যে হাতে আহার করে, সেই হস্তেই মুখপ্রক্ষালন করিয়া থাকে। অনেকে মুখ-প্রক্ষালনজন্য বাঁহবার বাগণ হইতে আর উঠে না। মন্দের ছুইটি বাঁশারী কাঁক করিয়া ‘কুলি’ করিয়া লয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত “ওলদান” ব্যবহৃত আছে।

(২) প্রায় বিতত্তি পরিমাণ উচ্চ ত্রিপদ “বেড়” বিশেষ। ইহার উপর থালা স্থাপন করিয়া ভোজন করা হয় বলিয়া, “ভোজন বেড়” নামে কথিত হইয়া থাকে।

(৩) মেজাং—সচ্ছিন্ন বুড়ি বিশেষ; ইহাতে ভোজনবেড়ের কাজই চলে।

পাতা প্রভৃতিও শাকের শ্রেণীভুক্ত হয়। শাক পাক করিবার সময় লবণ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় না। খাওয়ার সময় কাঁচা কি পোড়া লঙ্কা তাহাতে “গুলি-গুলি” আহার করে। কোন কোন শাক আঙুণে চড়াইবারও প্রয়োজন হয় না। “ভুভুজি” কুটিয়া লবণ সহ বাঁশের মধ্যে ভরে। অনন্তর “শুতাইতে-শুতাইতে” যখন নরম হইয়া আসে, তখন বাটা লঙ্কা মিশাইয়া আনন্দের সহিত আহার করে। বিশেষতঃ লাউ পাতা, কুমুড় পাতা প্রভৃতি কেবল কিয়ৎকণ রগড়াইয়া এবং “লেলম পাতা” মাত্র কিয়ৎকণ বগলতলার রাখিয়া ঈষৎ হইলে লবণ ও মরিচ সহযোগে সচ্ছন্দে খাইয়া ফেলে। ইহারা লেবু পাতা, তেঁতুল পাতা, কামরাঙ্গা পাতা ইত্যাদিতে টকেরও সমধিক প্রিয়।

তরকারী—ইহাদের অপরিখ্যাপ্ত। জুমে সশা, কুমুড়, “মারফা”, বেগুন, চাকুমা কচু প্রভৃতি যথেষ্ট মিলে। কাঁচাকলাদি এখানে এত অধিক ও সুলভ যে, কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে ৫১৬ গুণিত মূল্য দিয়াও এমন পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এ পাহাড়ের মান ও ওল কচু অতিশয় প্রসিদ্ধ; একরূপ আর কোথাও মিলে না। উহা অতি অল্প আয়াসেই এত সিদ্ধ হইয়া যায় যে, নূতন ভোক্তা কচু কি আলু খাইতেছে, উপলব্ধি করিতে পারে না। এখানে নানারকমের আলু প্রাপ্ত হওয়া যায়। শূকর ও সজারু যে সকল মূল আহার করে, ইহারা তৎসমুদয়ই আপনাদের খাণ্ডভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহাতে দরিদ্র পরিবারের বহুল অভাব নিবারিত হয়। বিশেষতঃ গত দুর্ভিক্ষে একমাত্র এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকাংশ পরিবার আত্মরক্ষা করিয়াছে। এ দুর্ভিক্ষে যদিও সজদর গভর্ণমেন্ট এবং স্থানীয় রাজস্ববর্গ প্রায় লক্ষাবধি টাকার সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি কথিত মূল্যাদি সুলভ না হইলে খুব সম্ভব—এই পার্শ্বভ্য চট্টগ্রাম হইতে দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী কালের করাল কবলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইত। এক বা দুই স্তুটি চাউলের সহিত প্রকৃত পরিমাণে “বাঁচরী” অর্থাৎ বংশাঙ্কুর এবং মূল্যাদি সিদ্ধ করিয়া ৫১ জনবিশিষ্ট পরিবার চলিয়াছে। শেষোক্ত উপকরণ বিশেষতঃ বাঁচরী শীঘ্র জীর্ণ হয় না, সুতরাং অনটনকালে ইহাতেই দম্বোদর পরিপূরণ করিতে পারিলে কিছু বৈশী সময়ের জন্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়। “বাঁচরী” দুর্ভিক্ষকালেরই প্রধান আহাৰ্য্য সত্য, কিন্তু সচরাচর তাহাও বেতসাগ্র প্রভৃতি সুখান্ত বস্ত্রণেই আহার চলে। কলা, বেগুন, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরিতরকারী সম্বন্ধে ইহাদের একটা প্রধান বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় যে, কাঁচা অপেক্ষা পাকতেই তাহাদের আগ্রহ বেশী। সততই তনিত্তে

পাই, এই সকল পাকা তরিতরকারীর বীজ ছাড়াইয়া পাক করিলে অভিন্ন সুস্বাদু হয়। তরকারীর মধ্যে ডালনা, চচ্‌রীরই প্রচলন অধিক; তন্নিম্ন লাউ, “মারফা” প্রভৃতি কোন কোন তরকারীর “কোর্কোরা” অর্থাৎ ছেঁচকীও খাইতে দেখা যায়।

ফল—ও নানাবিধ মিলে। বিশেষতঃ আরণ্যফলের অভাব নাই। যে যে ফল বানরে আহার করে, তৎসমুদয়ই ইহারা খাইয়া থাকে। ইহা অতি সুন্দর নির্মাচন বটে। আদিম মানবসমাজে, বর্তমান ভক্ষ্যসমুদয়ের নির্মাচনে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইহাদিগের চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমরা তাঁহাদের আবিষ্কৃত পথে পদক্ষেপ করিতেছি মাত্র। অতিশয় বুদ্ধিমানেরা যে সত্তত “নগণশ্রাগ্রভৌ গচ্ছেৎ” মন্ত্বের আড়ালে থাকিতে চেষ্টা করেন, সকলেই যদি তাঁহাদের পছা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে সংসারের উপায় কি হইত জানি না! ফলের সাধারণ নাম “গুলি”। কুল, কাউ প্রভৃতি “খট্টাগুলি” (অন্নফল) ইহারা সাতিশয় ভালবাসে এবং আম, চালতা, তেঁতুল প্রভৃতির “কাজী” অর্থাৎ অম্ল প্রায়শই খায়।

মৎস্ত—সত্ত অপেক্ষা পঁচাতেই আগ্রহ বেশী; এমন কি কোন কোন মাছ ইচ্ছা করিয়াই পঁচাইয়া খায়। ভক্ষণীয় মৎস্তের বিস্তারিত তালিকা আর কি দিব? কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, “ছুছুং” ছাড়া আর কোনও মাছ খাইতে ইহাদের বাধা নাই।

শুক্টি—তাজা মাছ হইতেও অধিকতর উপাদেয় বলিয়া গণ্য; বিশেষতঃ অগ্নি-উত্তাপে শুক হইলে—আমর আরও বাড়ে। বাজারে দেখিয়াছি, নিম্নশ্রেণীর চাক্‌মাগণ, চিঙি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্তের শুক্টি চিবাইয়া সুস্বাদু কিনা পরীক্ষা করে। ইহাদের সমাজে শুক্টি বলিতে কেবল শুক মৎস্যকে বুঝায় না, মাংসের শুক্টিও আছে। পাঁঠা ব্যতীত অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ জন্তর মাংস জুইচারিবেলা খাইয়া বাহা উদ্ধৃত থাকে, শুকাইয়া রাখে। পরে তাহা আবশ্রুতক্রমে পাক করিয়া আহার করে। শুক্টি “মিশাল” নামেই পরিচিত, তরকারী দ্বায়েই ইহা মিশাইয়া দেওয়া হয়।

মাংস—নানা প্রাণী হইতেই আহৃত হয়। পাখীর মধ্যে শকুনী, তিৎসাজ প্রভৃতি কয়েকশ্রেণী ভিন্ন অপর গুলি খাইতে আগন্তি নাই। সাপের মধ্যে—“অন্নল সাপ”, “হুতানাল সাপ”, “মোহুখা সাপ”, “বামন পাদ সাপ”, “হুমাচাক সাপ” (ইহা খাইতে গন্ধ করে), “কালকর সাপ” (ইহার শরীর

হইতে মোরগের গন্ধ উঠে ) মাত্র বাদ । জাপ মারিয়া প্রথমে মাথা ও অঙ্গাদি ফেলিয়া দেয়, অনন্তর আঙুণে সৈকিয়া চামড়া ছাড়াইয়া কেলে ; অপরাপর প্রক্রিয়া সাধারণ । সর্প সমাজের নিকট সম্প্রদায়েরই খাও বটে, কিন্তু গোসাপ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি শুনা যায় না । অধিকন্তু যাবতীয় মাংসের মধ্যে “গুই”য়ের মাংসই নাকি সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু ; ভেকের মাংস দ্বিতীয় । বেঙ নানা জাতীয় আছে । তন্মধ্যে “গাছ বেঙ”, “শাক বেঙ”, “ভাট বেঙ”, “ভোবা বেঙ”, “কর্কড়ি বেঙ”, “কুহুবিচি বেঙ”, “ঘর বেঙ”, “কোণা বেঙ”, “চুড়া বেঙ”, “ঘিলা বেঙ”, “খচ্ছোরা বেঙ” ইত্যাদিই সচরাচর পরিচিন্তিত হয় । শ্বেষোক্ত হুই জাতীয় বেঙকে আঘাত করিলে ফুলিয়া উঠে । সাধারণ চাকমাগণ বর্ষাগমে বৃষ্টির পর রাত্রে মশাল জালাইয়া যষ্টিহস্তে ভেকশিকারে বাহির হয় । পূর্কোক্ত বেঙের মধ্যে কোন কোনটা আবার খাইতে নিষেধ আছে । কারণ যথা,—“ঘিলা বেঙ” খাইলে মাথা ঘুরায় ; “খচ্ছোরা” বেঙের গলমধ্যে একখানি কাল পর্দা থাকে, তাহা খাইলে গলা ফুলিয়া যায়, এমন কি প্রাণবিয়োগেরও সম্ভাবনা । “কর্কড়ি” ও “ভোবা বেঙ” তজ্জাতীয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট । গুনিতে পাই, বেঙের অগ্রবিধ পাক হইতে ভাজাই অধিকতর সুখাদ্য । পশুর মধ্যে শূকর, মহিষ, হরিণ, ছাগল, বাঘ, বিড়াল প্রভৃতি অনেকেই খাণ্ডশ্রেণীতে পরিগণিত ; কেবলকুকুর, হাতী, গরু ইত্যাদি কয়েক জাতীয় পশু মাত্র ভক্ষ্যতালিকা হইতে মুক্তি পায় । বিবাহে মহিষকাটা অবশ্য কর্তব্য ! শূকর মারিয়া চামড়া ফেলিয়া দিলে একবারে সালা হইয়া যায়, পাকপ্রক্রিয়া অপরাপর মাংসের জ্ঞায় । বরাহ-মাংস অতিশয় তৈলাক্ত, কিন্তু মহিষমাংস বড়ই নীরস ; মাংসের পরিমাণ সামান্য হইলে সঙ্গে ‘খোড়’ দিয়া পাক করিয়া থাকে ।

ডিম ।—হংস, কুকুট, কচ্ছপ ও গোসাপের ডিম্বই ক্রমোৎকৃষ্ট । কাক, ময়না খঞ্জন, দয়েল, চিল, পেচক শকুনী প্রভৃতি ব্যতিরেকে আর সমুদায় পক্ষীর ডিম্বই ইহারা খায় ।

শামুক ও কীটপতঙ্গ—নিম্ন সম্প্রদায়ের সচরাচর আহাৰ্য্য । প্রায় সকল জাতীয় শামুকই তাহারাই খাইয়া থাকে । ইহাদের ভাবায় কীট-পতঙ্গ উভয়েরই সাধারণ আখ্যা—“পোগ” অর্থাৎ পোকা । “পোগ” নাকি ভাজিয়া খাইতে অতিশয় সুস্বাদু ; বিশেষতঃ “চেরাই পোগ” ভাজা সর্বোৎকৃষ্ট । এই পতঙ্গবিষয় সংগ্রহের নিমিত্ত ইহারা বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময় গৃহসম্মুখে একখানি সাবা কাপড়



পাতে, এবং তাহার কিয়দূর উপরে একটি মশাল রাখে। অনন্তর হুইখও বাঁশের বাধারী লইয়া বাজাইতে বাজাইতে ডাকিতে থাকে,—

“চে-রে—চে-রে—চে-রে.....

চেরাই পোগা চেরাইয়া,

অংচেরে অংইয়া ;

ধোপ কাপড় পড়ি-বা

হাগনি-চালং মরি-বা ;

তোরে পেলেন খাইয়া ;

তোরে মজা'লৈ ভাত মজা,

কুহু গেলায়ে বাদরী গোছা ?” ইত্যাদি—

তাহাতে রাশি রাশি মদলুক পতঙ্গ অমল-আলিঙ্গন প্রয়াসে আত্মসমর্পণ করে, ও বস্ত্রখণ্ডে পতিত হয়। কিন্তু “ওরা-কালে” “চেরাইপোগ” ধরা নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত “খুলাপোগ” বালি হইতে ফুৎকার দ্বারা এবং যুংরাপোগ মাটি খুঁড়িয়া বাহির করে।

লবণ—সাধারণতঃ আমাদের হইতে কিঞ্চিৎ বেশী খায়। পাতান্ন খাওয়া ইহাদিগের জাতীয় পদ্ধতি। বৈদেশিক লবণের পশার বৃদ্ধির পূর্বে ইহারা এক রকম পার্কৃত্য বাঁশের ভগ্নে জলের দ্বারা দিয়া লবণ বাহির করিত। তা' ছাড়া পাহাড়ের স্থলবিশেষে এমন প্রস্তরখণ্ড সকল আছে, তৎসমুদায় হইতে লবণাক্ত জল নিঃসৃত হয়। অতাপি তাহাতে অনেকে উপকৃত হইতেছে।

লঙ্কা মরিচ—অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমন কি, পোড়া শুক্টির মাধা, রসুন, ও লবণ সহযোগে যে “মরিচবাটা” প্রস্তুত হয়, তাহাতে লঙ্কার ভাগ এত থাকে যে,—দেখিতেই ভয় হয়; অথচ ইহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত জুকুঞ্জনমাত্রও না করিয়া তাহা খাইয়া ফেলে! মরিচাদি পেষিবাদ নিমিত্ত শিলনোড়ার প্রচলন বিরল। ‘চারী’র গঠনে মাটির “কুখ্যা” প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লয়। সেই কুখ্যার মধ্যে লঙ্কা দিয়া শুতাইতে শুতাইতে নরম করিয়া থাকে। অমেকে অত্যন্ত অশ্লুবিধাও স্বীকার করিতে চাহে না; আশুনে একটুকু সৈকিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া তরকারীতে দিয়া থাকে। এতত্তির—

তৈল ও গোলমরিচের—ব্যবহারও সাধারণ সম্প্রদায়ে কচিং ঘটে।

গরমমসলা নাই বলিলেই হয়; তৎপরিবর্তে ততুলচূর্ণ তৃষ্ণ করিয়া রাখে;

তাহার কিছু কিছু তরকারীতে ছড়াইয়া দিলে নাকি মসলার গন্ধ পাওয়া যায় ।  
যত ইহাদিগের পক্ষে অল্পত, কিন্তু অনেকেই খাইতে চাহে না ।

পিষ্টক—বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য । আত্মীয় বাড়ী বাইতে,  
প্রধানতঃ বিবাহের প্রস্তাবনাসূচক ‘তবে’ পিঠা নেওয়া একান্ত আবশ্যিক ।  
পিষ্টক নানাবিধই প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কয়জাতীয়ের বিবরণ যথা ; ১ ।  
“খগাপিদা ;—” জলাসিক্ত “বিনি” চাউল পাতার মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে ;  
অর্থাৎ একটি জলপূর্ণ “হাঁড়ি”র মুখে অপর একটি সচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রতর “হাঁড়ি” বেশ  
করিয়া আঁটিয়া লাগায়, পরে তাহা জ্বলের উপর স্থাপন করিয়া উপরের পাत्रে  
পত্রমণ্ডিত তণ্ডুলগুলি রাখে এবং তাহার মুখেও ঢাকনী দেয় । ইহাতে নীচের  
পাত্রোখিত বাষ্পে উপরিস্থিত পিঠা সিদ্ধ হইয়া যায় । ২ । “বিনি পিদা ;—”  
“বিনি” চাউলের আটা পাতার মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে । এই হই পিঠাতেই  
নারিকেল ‘কোড়া’ দিবার রীতি আছে । ৩ । “কলা পিদা ;—” যে কোন  
চাউলের মিহি আটার পাকা কলা মাখিয়া লয় । অনন্তর তাহা পাতার আরতা-  
কারে মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে । চট্টগ্রামে ইহা “কলাবড়া পিঠা” নামে প্রসিদ্ধ ।  
৪ । “বেঙু পিদা” ;—যে কোন চাউলের মিহি আটাতে যৎসামান্য জল মাখিয়া  
পাতার চতুর্ভুজাকারে মোড়ে ; অনন্তর বাষ্পে সিদ্ধ করে । এই পিষ্টক  
সচরাচর রোগীকে পথ্য স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে । ৫ । “সাজা পিদা” ;—  
খুব মিহি চাউলের আটার ডেলা করা হয় । তাহা বাষ্পে সিদ্ধ করার পর  
চূর্ণ করিয়া তদুপরি নারিকেল কোড়া ছড়াইয়া দেয় । অতঃপর কিঞ্চিৎ জল  
মাখিয়া পুনর্বার গোলা করে এবং তন্মধ্যে গুড় কি চিনি দিয়া হাতে কি খালার  
ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডিম্বাকৃতি করিয়া লয় । অতঃপর তাহা বাষ্পে সিদ্ধ করা  
হইয়া থাকে । ৬ । “বরাপিদা” ;—“বিনি” বা অপরসাধারণ চাউলের মিহি  
আটার কিঞ্চিৎ জল মাখিয়া তৈলে ভাজিয়া লয় । ৭ । “পাকোন ( মুসলমানী  
আখন্ন—পাকোয়ান ) পিদা” ;—চাউলের মিহি আটা ( তন্মধ্যে “বিনি” চাউলের  
আটাও সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া দিলে ভাল ফুলে ) ও গুড়ে কিঞ্চিৎ জলদ্বারা  
একত্রে মাখিয়া, তাহা তৈলে ভাজিয়া থাকে । এই শেবোক্ত হই পিষ্টকের  
আকৃতি গোলাকার । পিঠা সাধারণতঃ শূকরের চর্কিতেই ভাজা হয় ; নিতান্ত  
অভাব না হইলে সরিষা বা অপর কোন তৈলে ভাজে না । কেন না,  
শূকরের চর্কিতে নাকি অধিকতর মুখরোচক হইয়া থাকে । ৮ । “হুঁ-ই পিদা” ;—  
চাউলের আটা নারিকেলের মালার করিয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে ।

৯। “ইন্দুর লাবি পিলা” — চাউলের আটার জল রাখিয়া ইহাদের লাবের আকারে আকারে পাকায়, পরে চিনি যোগে সিদ্ধ করে। বাশ্পে সিদ্ধ পিষ্টক পর্য্যন্ত হইলে, ইহারা তাহা আগুনে সেকিয়া খাইয়া থাকে।

ভাজাপোড়া—ইহাদিগের মধ্যে খুবই কম প্রচলিত। চিড়ে বা মুড়ির ব্যবহার সকলে অজ্ঞাপি শিখে নাই। কেবল মাত্র “ধান খোলা” করিতে অর্থাৎ খই ভাজিতে জানে। ইহারা ভুট্টা—সিদ্ধ, পোড়া ও ভাজা ত্রিবিধ রূপেই খাইয়া থাকে।

জল—ও ভাত পাহাড়ীগণ এত পরিষ্কার খায় যে, তাহারা তজ্জন আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য। খাওয়ার এবং “ফেলা খোলা” করিবার “পানি” (জল) বিভিন্ন থাকে। যে সময়ে খালের জল বোলা হয়, তখন ইহারা ঝরণার জল পান করে। পানীর জল সংগ্রহের নিমিত্ত চাক্ষুস রমণীরা এই দুর্গম পার্শ্বতা পথে দূরবর্তী স্থানে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। খাবার জলের ঝরণা যথাসাধ্য পরিষ্কৃত রাখে; কাপড়কাটা প্রভৃতি হইতে দেয় না। আমি যখন এখানে নূতন আসি, সেই সময়ে রাঙামাটি স্থল বোর্ডিং এর একটি ঝরণার স্নান করিতাম। সেই ঝরণার জলই বোর্ডিং এর ছাত্রগণ পান করিত। কিন্তু আমি পূর্বাভাস বশতঃ স্নানের পূর্বে ‘তয়েল’ (towel) খানি ঝরণার ডুবাইয়া লইতাম। ইহাতে যে কোন আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। এক্ষণে কয়েকদিন গেলেও ছাত্রেরা লজ্জার আমাকে কিছু বলে নাই। অনন্তর একদা জনৈক বুদ্ধিমান ছাত্র অতি বিনীত কোণে আমাকে তাহাদের আপত্তির কথা জানাইল। বলিতে কি, আমি তাহাতে যেমন লজ্জিত হইয়াছিলাম, পক্ষান্তরে পানীর জলের প্রতি তাহাদিগের এক্রপ সাবধানতা দেখিয়া ততোধিক স্ত্রীতিলাভ করিয়াছিলাম।

ক্যাপ্টেন লুইন লিখিয়াছেন (১),—“এই পাহাড়ে এক রকমের লতা আছে, তাহা কাটিলে স্বচ্ছ ও সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। উচ্চ পর্য্যন্ত লজ্জনরাধিদিগের এই লতার রসই একমাত্র পিপাসা নিবারণের উপায়। আশ্চর্যের বিষয় যে, লতাখানিকে এক ঘরে কাটিলে কিছুই পাওয়া যায় না, আবার ৩৪ ঘরে কাটিলেও শুকাইয়া যায়। কিন্তু যদি তাড়াতাড়ি ( উপরে ও নীচে হুই স্থানে ) হুই ঘরে কাটা যায়, তাহা হইলে এক বড় মাসের প্রায় অর্ধেক পরিষ্কার নীতল

জল বাহির হয়। পাহাড়ীরা বলে, লজাখানিকে যখন কাটা যায়, তাহার জল উচ্চ মুখে ধাইতে চাহে।”

ইহারা ভাত খাইবার সময় জল পান খুব কমই করে। কিন্তু পরে যখন তৃষ্ণা পায়, তখনই তাহা পরিভূক্ত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত জুমে খাইবার কালে তথার খাইবার জলের অভাব বুলিলে বাড়ী হইতে চুঙা করিয়া জল লয়। “কোত্তি” (১) করিয়াই ইহাদের জল পানের নিয়ম। তাও মুখ না লাগাইয়া খায়; ইহাতে অবশিষ্ট জল দূষিত হইতে পারে না।

দধি-দুগ্ধ—ও ইহাদের যথেষ্ট সত্য, কিন্তু অতি অল্প লোকেই সচ্যবহার করে। বিশেষতঃ পেটের অসুখ হইবার ভয়ে মহিষের দুধ বা দই প্রায়ই খায় না। যাহাদের খাইবার অভ্যাস আছে, তাহারা মাত্র গরুর দইদুধই খায়। তন্মধ্যেও আবার অনেক আহারের পর মুখক্ষালনের শেষে এই দুধ বা দধি খাইয়া থাকে। অত্যন্ত পাহাড়ীরা বাঁশের চুঙাতেই দই জমায়; তাহাতে তৈলাক্ত অংশ নষ্ট হয়। সুতরাং চুঙার মহিষের দধিতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা কম। ইহারা দুধ হইতেও দইকে অধিক পছন্দ করে।

সুরা—ইহাদিগের মধ্যে অতিশয় সাধারণ (২)। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ভাটি রহিয়াছে। ইহারা ইচ্ছানুসারে সুরা প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু বিক্রয় করিবার ক্রমতা নাই। স্ত্রী এবং বর্তমান শিক্ষিত সমাজে মাত্র মত্তের প্রচলন অধুনা কিঞ্চিৎ বিরল, নতুবা ইহারা অভিভাবকের সম্মুখে সুরাপানেও লজ্জা বোধ করে না। বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে পান তামাকের সহিত মদের বোতলটিও যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এতদ্বিধা নিমন্ত্রণে ইহা অব্যবহৃত চলে। এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর কিছুক্ষণ পরে পরে মত্ত পরিবেশন করিবার ভার থাকে। বিবাহ, উৎসব এবং নানাবিধ ধর্ম্মকার্যে ইহার ব্যবহার এত অধিক যে, গুলিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয় (৩)। কুমার বাহাদুরের বিবাহে দেখিয়াছি, এক স্ত্রুবৃহৎ স্বর কেবল মত্তকলসীতে পরি-

(১) জলপাত্রবিশেষ, পঠনপ্রণালী গাড়ুর ন্যায়।

(২) পান পাত্র—সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে অবশ্য কাচের বা গাভুর গ্লাস ব্যবহৃত হয়। দরিদ্রগণ “নরানসুক” বাঁশের পাত্রেই প্রয়োজন সাধন করে। এই বাঁশ আরোতনে ৩৮ বনফুট এবং পরিধিও প্রায় ৬ ছয় ইঞ্চি পরিমিত হইবে।

(৩) “রাজহান” পাঠে বেরূপ জানিতে পারি, সুরাপ্রীতিতে রাজপুতগণও ইহাদের হইতে বড় কম নহে। অতিবিসংকারের “সারার পেরালা” রাজপুত গৃহীর আবশ্যকীয় গৃহসরঞ্জাম; স্বেচ্ছাচলি ও রূপোদ্যানেও পানকার্যে তাহাদের অত্যধিক আগ্রহ।

পূর্ণ ছিল। এই সমস্ত মদ প্রকাশসাধারণের “ভেট”-প্রদত্ত। এইরূপে ইহাদিগের জাতীয় উপঢৌকন মাত্রই অল্পবিস্তর মত্ত থাকে। সামাজিক কোন কোন কার্যে মদ একরূপ প্রয়োজনীয় যে, বাহাদের পানের অভ্যাগ নাই, তাহাদিগকেও অন্ততঃ মত্তকে স্পর্শ করাইতে হয়। গ্রামে ওলাওঠা প্রভৃতি মহামারী উপস্থিত হইলে আবালাবুদ্ধবিনিতা সকলেই মদে বিভোর থাকে। ইহাদের ধারণা, এই বিবেক মধ্যে অপর কোনও বিষ স্থান পাইতে পারে না। এইরূপে ইহাদিগের মত্তপানের কারণ অপরিহার্য নহে। পরন্তু মত্ত পানে ইহারা যে সর্বস্বান্ত হইয়া বাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। এতৎসম্বন্ধে আমি নিজের আর কিছু না বলিয়া, নিয়ে ১৩১১ সালের ১৮ই শ্রাবণ “জ্যোতি”তে প্রকাশিত একখানি প্রেরিতপত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি, ইহা হইতেই পাঠক-পাঠিকাগণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন :—

“ইহারা দেশীয় কৃষক অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিতে পারে ; তাহাদের অপেক্ষা বেশী আয়ও করে। ইহারা এত পরিশ্রম ও আয় করিয়াও সুখী হইতে পারিতেছে না। বৎসরের ধান্ন ঘরে জমা থাকে না। দিন দিন ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে। কারণ, ইহারা সকলেই খুব বেশী পরিমাণে মত্ত পান করে। প্রতি ঘরে ঘরে মত্ত প্রস্তুত হয়। মত্তপান করার কোন নিয়ম নাই ; যত ইচ্ছা তত পান করে। ইহাদের মদের তৃষ্ণা এত বেশী যে, দেখা গিয়াছে ভাত খাওয়ার চিন্তা অপেক্ষা মদ তৈয়ার করার বেশী আগ্রহ। যতদিন ইহাদের ঘরে ধান্ন থাকে, ততদিন মদের ভাণ্ড খালি থাকে না। দুই তিন দিনের পরিশ্রমে বাহা আয় হয়, ৪।৫ জন একত্রে তাহা মজলিসে ব্যয় করিয়া দেয়। ছোট বড় মজলিস সর্বদা গঠিত হয়। সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়া বাহা আয় করে, তাহার অর্ধেক কেবল স্ত্রীরাক্ষসীর সেবার অপব্যয় করে এমন নহে, মত্তপানে অজ্ঞান হইয়া অনেকে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বাদবিসম্বাদ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই সম্পর্কীয় বহু সংখ্যক মালিশ মোকদ্দমা হইয়া থাকে। পুরুষেরা সময়ে সময়ে মদের প্রসাদে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির উপরও যথেষ্ট উপদ্রব করিয়া গৃহকে অশান্তিময় করিয়া তোলে। আবার ইহাদের বিবাহ, পর্ক, উৎসব ও নিমন্ত্রণাদিতে অনেক বেশী পরিমাণ মত্ত প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন যত ইচ্ছা তত মত্তপান করিতে পারে। সেই সময় অতিরিক্ত মদ পান করিয়া কত জনের অবস্থা কতরূপ তাহার পরিসীমা থাকে না। এই সকল অপব্যয়ে জমিহাদের বৎসরে ধান্ন জমা থাকে না ; বর্ষাকালে কেহ কেহ অনশনও থাকে।”

এই সমুদ্র হুয়া গচরাচর দ্বিবিধ উপায়ে প্রস্তুত হয় । প্রথম সাধারণ মন—প্রস্তুত করিতে আগে পর্য্যুসিত ভাঙে “মূলী” (১) মাখিয়া পাতার আচ্ছাদিত বাঁকাতে মাখিয়া দেয় এবং উপরেও পাতা ঢাকা দিয়া থাকে । ২।৩ দিন পরে তাহাতে রসসঞ্চিত হইতে দেখা গেলে নিয়মিত জলের সহিত কলসীতে পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করে । সেইরূপে আরও ২।৩ দিন মাখিয়া পরে তাহা চুয়াইয়া লয় । এই সাধারণ মত্ত দ্বিতীয়বার পরিশ্রুত করিয়া লইলে শক্তি অতিশয় তীব্র হয় ; তাহার নাম “দোচুরানী-মদ” । ইহা অপেক্ষাকৃত চূর্ণত বলিয়া সাধারণ্যে বিরল ব্যবহৃত । দ্বিতীয় “জোগরা” ;—তাহার প্রস্তুত প্রণালীতে পরিশ্রমের ভাগ কম । বিনি চাউলের ভাঙে “মূলী” মাখিয়া কলসীপূর্ণ করত মুখ বন্ধ করিয়া রাখে ইহাতেই তাহাতে রস সঞ্চিত হয় । এই রসের নামই “জোগরা” । “জোগরা” বাইতে খুব মিষ্ট, এবং মাদকতাও মধুর ! তত্ত্বপরিবারে ও ক্রীসম্প্রদারে ইহারই প্রচলন অধিক । পরন্তু মুখতৃষ্ণা এবং মূহুমাদকতার আমোদ কেবল ইহাতেই সম্ভবে ! পূর্বোক্তরূপে সঞ্চিত রস নিঃশেষ হইলে, তাহাতে জল দিয়া আবার কয়েক দিবস ধরিয়া রাখে । অনন্তর সেই জলেও যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টি ও মেশা লাভ হয় । এইরূপে তিন চারিবার পর্য্যন্ত জল দেওয়া বাইতে পারে ; কিন্তু ক্রমশই শক্তি কমিয়া আইসে । মাদকতা নিতান্তই কমিয়া আসিলে, কেহ কেহ এই মিশ্রিত জল চুয়াইয়া লয় ; তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মত্তে পরিগণিত হইয়া থাকে ।

তামাক ।—ইহাদিগের কথাই খুঁদা । মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন গ্রী ও পুরুষ সম্প্রদারে আর প্রায় সকলেই সেবনে অভ্যস্ত । এমন কি, অনেকে গুরুজনের সাক্ষাতে বাইতেও লজ্জাবোধ করে না । তবে গাঁজা, আকিও, এবাবৎ ইহাদিগের মধ্যে ভেদন প্রবেশ লাভ করে নাই ।

পান—ও ইহাদের সাতিশর প্রিয়বস্তু । অবিরত পান চিবাইতে পারিলে ইহার নিকেকে ধন্য জ্ঞান করে । কোন স্থানে বাইতে হইলেও “পানের থল্যা” কোমরে লইতে ভুলে না । এই “থল্যা” অর্থাৎ থলিতে পান, সুপারি, চুণের কোটা ইত্যাদি সম্বন্ধে রক্ষিত হয় । বৃদ্ধগণ পানের সহিত তামাকপাতাও

(১) “মূলী” ।—চাউলের আটার সহিত “বড়পেভাঙলা”, “পেমা”, “কাটোরাভগর” গাছের ছাল, “বেরলবি” লতা, ইক্ষুপাতা প্রভৃতি সমুদ্র কিংবা যে কোন পদের রস মাখিয়া ডেলা ডেলা করতঃ খেদে পোড়াইয়া লয় ; ইহা দেখিতে মাধাটে ।

খাইয়া থাকে। খয়েরের প্রচলন পূর্বে ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি প্রায় সকলেই তাহা ধরিয়াকে। এতদ্বিন্ন অপরাপর মসলা সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভিন্ন দেখা যায় না। প্রত্যুত পান, সুপারি, চূণ—বাহা নিত্য ব্যবহার্য্য, ইহাদিগের অনায়াস লভ্য। প্রত্যেক বাড়ীতেই “গাছ পানের” “ক্ষেত” রহিয়াছে; বস্ত্র “রামসুপারি” ইচ্ছা করিলে সহজে পাইতে পারে; এবং শায়ক গোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিয়া লয়। শুনিয়াছি, এই পানের আদান প্রদান দ্বারাই যুবক-যুবতীর প্রণয়-প্রস্তাব চলিয়া থাকে; সন্দেশ যথা,—যদি মসলাদি সহযুক্ত পানের মধ্যে করিয়া কোন ও ফুল বা ফুলের পাপড়ি কাহাকেও প্রদান করা হয়, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, “আমি তোমাকে ভালবাসি”। প্রত্যর্পণে যদি অধিক মসলা এবং বিশেষ ভাবে সজ্জিত কোণার পান লাভ হয়, তাহা হইলে “আস”—ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে; অথবা প্রতিদত্ত পানে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাসংযোগ থাকিলে “আমি এখন পারিব না,” কি ভিতরে অঙ্গার খণ্ড দেওয়া হইলে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

পরিশেষে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, উপরিউক্ত খাণ্ড ও পানীয় তালিকা চাক্ষুশ-সমাজের সাধারণ শ্রেণী অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ বাহাদুর দ্বারা পুষ্ট, তাহা-দিগকে দেখিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে। ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খাণ্ড-নির্বাচন প্রায় উন্নত সভ্যতাহুমোদিত। ইহাদের কেহ কেহ মন্ত্র-মাংস কি মন্ত্র সম্পূর্ণই পরিত্যাগ করিয়া আছেন। পক্ষান্তরে ক্রমে মধ্যশ্রেণী সাধারণ শ্রেণী হইতে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া ভদ্র সম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছেন,—ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

## চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ।

চাকুমাদিগের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা শাস্ত্র নাই। তাহারা অনেকে রোগ অবধৌতিক ব্যবস্থা মাত্র অবলম্বনেই সারিবার চেষ্টা করে। বিশেষতঃ

সুসভ্য মহাশয়দের ছায় ইহার অহনিশ শরীরের চিকিৎসা। সেবার তৎপর নহে; তদ্বিকে অতি সামন্তই হুটি

রাখে। অনেকের সাংসারিক অবস্থাতেও তাহা পোষাইয়া উঠে না; কাজে কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও অনেকে অনেক সময়ে নীরব থাকিতে বাধ্য হয়। তবে ইহা সত্য যে, ইহার প্রথমে প্রায়শই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া রহে।

সমাজে হাতুড়ে বৈজ্ঞের সংখ্যাই অধিক। তাহারা মুষ্টিযোগ এবং “ঝারা-কু” মাত্র সম্বল লইয়া ব্যবসার চালাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রুতচক্র ও মৌননাথ বৈজ্ঞের নামই সর্কোপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। এই সকল বৈজ্ঞের অনেকে

অধুনা “কবিরাজী শিক্ষা” বা তথ্যবিধ পুস্তক আশ্রয়ে আয়ুর্কৌদ শাস্ত্র মন্বনেও মনোযোগ দিয়াছে, বটে কিন্তু

তন্মধ্যে কেহই এবাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তথাপি উন্নত সম্প্রদায়ের আয়ুর্কৌদোক্ত চিকিৎসার প্রতি ভক্তিমস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে কল্পজন বাঙ্গালী কবিরাজও বাস করেন, কঠিন রোগে চট্টগ্রাম হইতে সুবিজ্ঞ কবিরাজ আনান হয়। সম্প্রতি ইংরাজরাজের কুপার এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতিও ইহাদিগের অমুরাগ পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের ব্যবস্থাই ইহার কারণ (১)। অজ্ঞতঃ কিছুকাল হইতে খুষ্টিয়ান মিস-

(১) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাঙামাটি ও বাম্বরবনে মাত্র দুই খানি হাসপাতাল ছিল; সেই সনের উভয় হাসপাতালের রোগীসংখ্যা একত্রে ১১৪৭৭। অনন্তর লামা, বড়কল, রামগড়, মাহালহরী এবং মাণিকছড়ীতেও দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই সকল সরকারী চিকিৎসাগারে গত ১৭৭৪ (১৯০৮ খৃঃ অব্দ) মে ৩০ ৫১২ জন রোগী সাহায্য পাইয়াছে, তন্মধ্যে অল্পচিকিৎসা ৭২৮। এই তালিকার এক রাঙামাটি হস্পিটালেরই রোগী সংখ্যা ১২৪৬০ জন; তাহাতে



নারীসমূহ এই দরিদ্র পাছাভীষিগের চিকিৎসাবিধানের প্রতি সান্তিশ্বর মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন (১)। তদ্বারাও এলোপ্যাথির প্রতি ইহাদের অস্বাভাবিক দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। রাজ পরিবারের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত স্থানীয় গভঃ হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। জনৈক কবিরাজ রাজসরকার হইতে ঐরূপ বৃত্তি লাভ করেন। কিছুদিন গত হইল, রাজা বাহাজুরের সাহায্যে শ্রীমান মহনমোহন দেওয়ান কলিকাতা কাঞ্চল বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। যদিও তিনি সরকারী কর্মে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা স্বজাতি ও স্বদেশের বহুল উপকার ঘটবে, আশা করা যায়।

রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রত্যেক জাতিতেই আছে সত্য, তবে সাধারণতঃ ইহাতে বিবিধ উপার অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ গুজরা অপেক্ষা চিকিৎসাকেই আরোগ্য লাভের প্রকৃষ্টতর পন্থা মনে করেন। অপর দলের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুতঃ ইহা ক্রবসত্য যে, গুজরার প্রতি উদাসীন থাকিলে শত চিকিৎসাতেও ফললাভ অসম্ভব। (২) বিশেষ কি, কেবল গুজরার উপর নির্ভর করিয়াই অনেককে রোগকবল হইতে রক্ষা পাইতে দেখা গিয়াছে। চাক্‌মাদিগের প্রায় সকলেই শেবোক্ত

গুজরা।

মতাবলম্বী; ইহারা গুজরার নিমিত্ত বধাসাধ্য সাধন থাকে, কানারও অসুখ হইলে প্রতিবেশী অপরেরা আসিয়া সাহায্য করিতে পরাজুথ হয় না।

indoor ২২, outdoor ১২৩৬১ এবং অল্প চিকিৎসা ১৬৩। এই জিলার চিকিৎসা কার্যে ১৯০৭-০৮ সনে গভর্নমেন্টের ১৪৬৮৫. ৫ পাই গিয়াছে; পর বৎসরের ব্যয় পরিমাণ ১৬০৯৬১১ পাই। এসময় বলিতে হয়, এখানকার ভেক্সিনিসানের নিমিত্ত গভর্নমেন্ট বার্ষিক প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

(১) এখন ১৯০৫ অব্দে রাঙাঘাটতেই তাঁহাদের এই চিকিৎসা বিভাগ খোলা হয়। সেই বৎসর রোগীসংখ্যা প্রায় ২০০০ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী বৎসরেই তাহা চল্লিশোনার হানান্তরিত করেন; তত্তির সময়ে সময়ে ঘুরিয়াও তাঁহারা ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। ঐরূপে ১৯০৭ সনে তাঁহারা চল্লিশোনার ১১২১৪ এবং মক্‌মলে ৬৮ জন রোগীকে চিকিৎসা-সাহায্য প্রদান করেন; তন্মধ্যে ১২৪টা অল্পচিকিৎসা ছিল।

(২) কথিত আছে, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কালীচরণ লাহিড়ী মহোদয় জনৈক রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া গৃহের ছানি-অভাব কর্মে ‘এক্সপ্লসন’ এক গাড়ী পড়ক ঘরীয়া দিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে ঔষধ প্রয়োগই চিকিৎসার একমাত্র প্রক্রিয়া নহে, প্রকার বিশেষ মাত্র । সাধারণ অস্থখাদিতে—১। মন্ত্রপূত কবচ ধারণ বা “কু” কাড়িলেই যথেষ্ট,

তদপেক্ষা কঠিন রোগে—২। মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হয় ।  
চিকিৎসা-সাধা ।

কোন কোন রোগ নিত্যন্ত সাংঘাতিক হইলেও, মাত্র এই বিবিধ চিকিৎসার আশ্রয়জনক উপকার প্রাপ্ত হইয়া যায় । কবিরাজী, ডাক্তারী বা হাকিমী প্রভৃতি চিকিৎসা এই শেখোক্ত শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত । আর বধন বুঝা যায় রোগ সহজে দূর হইবার নহে, তখন—৩। দ্বৈততা বিশেষের পূজা অস্থগিত হইয়া থাকে । ইহাতেই নাকি রোগের চরম শাস্তি হইয়া যায় ।

### কবচ ও মন্ত্রপ্রয়োগে চিকিৎসা ।

গুনিতে পাই, কবচ ও মন্ত্রশক্তিতে নানা বিশেষ হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়া থাকে । ইহারা প্রাচীনকালে এতৎ প্রভাবে ভূতপ্রেত লাচাইতে পারিত ; আরব্যোপজ্ঞাসের বৈদ্য-বলীকরণ ক্ষমতাও ইহাদের দ্বলত ছিল না । অর্থাৎ কবচ বা মন্ত্রবলে সেকালে অসাধ্যসাধন হইত, কিন্তু নানা অত্যাচার অবিচারে এখন সে শক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে । তথাপি অধুনা মন্ত্রশক্তিতে সাপ ধরা বা সাপের বিষ নষ্ট করা চলে । এমন কি, ইহাতে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি হুষ্টিচিকিৎসা রোগগুলিও নিবারিত হয় ; এবং আমরণ জ্বর, বাত প্রভৃতির উপশ্রব শূন্য হওয়া যায় । মন্ত্রের এই দৈবীশক্তি শিক্ষিতসমাজও অস্বীকার করেন না ।

মন্ত্রের সাধারণ আখ্যা—“কু” । ইহা পাঠের পর কুংকার দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে, বিশেষতঃ অস্ত্রলোকে কেবল “কু” মাত্র গুনিতে পার বলিয়াই বোধ হয় ইহার এই সংক্ষিপ্ততম অভিধা প্রস্তুত হইয়াছে । কলতঃ এই মন্ত্রগুলি ইহাদের স্বকীয় সম্পত্তি কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয় । তাহা ও তাব দৃষ্টে এই সমুদয়ের কোন কোনটী যে অনতিপূর্বেই ( চট্টগ্রামের ) হিন্দুসমাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে । নমুনাস্বরূপ সাধারণ একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি ; যথা—

“ওম্ হকার ।

(মৌপীর নাম)এর বীধব্ দশবীর দশ দুয়ার ।

আঠার মোকাম তিরব্ বিরজন,

আজ্ঞা করিবে কালিকা-চন্দ্রিকার ;

হিতে বীধব্, পিতে বীধব্,

বীধম্‌ চৌচালা।

চোখেতে চোখ বীধম্‌, বম রাজার পোলা।

আকাশের ইল্ল বীধম্‌, পাতালে উনকোটি নাগ।

(রোগীর নাম)এর পক্ষ প্রাণী রক্ষাতাক্‌।”

প্রত্যয়ে খালিপেটে নদীর স্রোতোহতিমুখী জলে একটা কলসী পূর্ণ করিয়া, সেই জল উক্ত মন্ত্রপূত করিয়া লয়; তদ্বারা স্নান করিলেই যে কোন অন্ন বিদূরীত হইয়া থাকে। “দায়ৎ থণ্ডাস লাগিলে”ও অর্থাৎ যদি কোন বা কোনপ্রকারে দূষিত হইয়া পড়ে, ঐ মন্ত্রপূত জলে ধুইয়া লইলে, তাহা অচিরে শুকাইয়া যায়। এতদ্বিন্ন এই মন্ত্র শরীরে পড়িয়া দিলে—“গা-বন” হয়, অর্থাৎ ভূত-প্রেত-সাপ-বাব প্রভৃতি হইতে দেহ নিরাপদ থাকে।

### মুষ্টিযোগ।

মুষ্টিযোগ দ্রব্যগুণের সরল চিকিৎসা। উৎকৃষ্টতর সংস্করণে ইহাই ডাক্তারী, হাকিমী, কবিরাজী প্রভৃতি নানাবিধ সংজ্ঞার অভিহিত হইয়া থাকে। অপরাপর চিকিৎসার যুক্তিতর্কের মীমাংসা আছে সত্য, কিন্তু মুষ্টিযোগের কৃতিত্বসংবাদ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। স্নেহের বিবর, এখনও চারিদিক্‌ হইতে ইহার আবিষ্কার চলিতেছে। আশা করি, এইরূপে ক্রমে ভগবানের সৃষ্টিরাজ্য মানবসম্প্রদায়ের অধিগত হইয়া পড়িবে। এস্থলে চাক্‌মাসমাজে প্রচলিত কয়েকটা মুষ্টিযোগতত্ত্ব উদ্ধৃত করিলাম। বলা বাহুল্য, মন্দির সংগ্রহ অতি সামান্যমাত্র! পাহাড়ীদের বিশেষতঃ চাক্‌মাদিগের প্রত্যেকে কিছু না কিছু পরিমাণে ইহার থবর রাখে।

১। কাটা দায়—“রাঙা মোছা মা” গাছের (১) শিকড় অথবা ‘বীধকাপুর’ সহযোগে তেরমী পাতা বাটিয়া দেয়।

২। পোড়া দায়—সাপের তৈল দিলে শীঘ্রই সারে।

৩। নালী দায়—গোরমুনের পাতা ভস্ম করিয়া ঘায়ের মুখে দিলে নালী ভরিয়া আইসে।

৪। দক্ষতে—“দন্তলং পাতা”, কেরোসিন তৈল, লবণ ও ঝুল মিশাইয়া আতপতন্তকরতঃ মালিশ করে।

৫। কেশ কোঁড়া—“বেইশাক” বা “হরিণকান শাক” বাটিয়া এলেন দিলে উপশমিত হয়।

(১) যে সকল লতা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, “উবল কোটেননের” মধ্যে তাহাদের চাক্‌মা বান রাখিতে পারা ইহালাস।

৬। বিষ-কোঁড়ায়—“হরিণকান শাক”, বিছুটি পাতা এবং “ডুলপান” বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপশমিত হয়।

৭। পাঁচড়া-কোঁড়া—“ফুলশোয়ানি” গাছের বাকল, নিমের পাতা এবং ভাট-পাতা সিদ্ধজলে ধুইয়া ফেলিলে শীঘ্রই সারিয়া যায়।

৮। বাত কোঁড়ায়—বিছুটি পাতা ও “ডুলপান” অথবা রাঙা মুছানি পাতা এবং “কাঁবাখ্যা লুদি” বাটিয়া দিয়া থাকে।

৯। আঁকুল হাড়ায়—“হরিণকান শাকের” পাতা এবং ভেরেণ্ডা পাতা বাটিয়া প্রলেপ দেয়।

১০। গতিশীল বা অস্থির বাতে—“মোনচড়া” পাতা, বিছুটি পাতা, “ডাইনের হাত পা”, গোষটি পাতা প্রভৃতি বাটিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করত বাতের ফুলার লেপিয়া দিলে সারিয়া যায়।

১১। চোখে রক্ত আসিলে—“ঘের লতির” ছুইপ্রান্ত উত্তমরূপে কাটিয়া লয়। পরে তাহার একপ্রান্ত রক্তবেষ্টিত চক্ষুর উপর ধরিয়া অপরপ্রান্তে ফুৎকার দিলে তদ্ব্যবস্থিত রস চোখে পড়ে, ইহাতে চোখ পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রকারান্তরে একজাতীয় খেতপ্রস্তর জলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘষিয়া সেই জলে চোখ ধুইয়া ফেলিলেও আরোগ্য লাভ হয়।

১২। শিরশীড়ায়—পাতি লেবুর শিকড় তাহার রসে পিসিয়া কপালে প্রলেপ দিলে সারিয়া যায়।

১৩। মাথাধরায়—বাটা সরিষা একখণ্ড নেকড়াযোগে মাথার বাঁধিয়া রাখিলেই কমে।

১৪। কেশ উঠা—“ধোপচুরা কুল” গাছের শিকড় বাটা জল মাখিলে নিবারিত হয়।

১৫। একশিরা—“হালগাছ” ও “কোনই গাছের” শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে সারে।

১৬। সান্নিপাতিকে—“বারেক্যা লুদি”র রস ক্ষীত স্থানে লাগাইলে কমে। অথবা “তেলসর গাছ”, “বাঁদরসার গাছ” ও অৰুখ গাছের বাকল সিদ্ধজলে মুখ ধুইলে এবং তৎসমুদয় বাটিয়া বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে সান্নিপাতিক দূর হয়।

১৭। হাত পা ভাঙিলে—“হাড়তাড়া” লতার পাতা বাটিয়া জৈবহুৎ করত জাহত স্থানে লাগাইলে শীঘ্র সারিয়া যায়।

১৮। কানপাকা—“আদা গুন্‌গুনি” (মণ্ডুরী) ও “জোতানিক্সিন” পাতার রস অথবা পাটিপাতার রস দিলে আরোগ্য হয়।

১৯। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে—কত স্থানে ঘরের “মূলী” বাটির দিলে ভাল হয়।

২০। ককবৃদ্ধি রোগ—সমান ওজনের তিত পটলের দানা, আপাং ও সাপের পিত্ত পিবিয়া খাওয়াইয়া দিলে কমিয়া যায়।

২১। কাস রোগে—“চেরম্বা” পাতার রস কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া খাইলে নিরাময় হওয়া যায়।

২২। বুক বেদনার—“সিগিরাসিক” ও ভেঙ্গবহল পাতা বা “ডাটনাঙা” গাছ কাটির প্রলেপ দেয়।

২৩। “শুকর পীড়া” অর্থাৎ গলা ও গণ্ডহুল ফুলিয়া গেলে—শুকরের দাঁত ঘষিয়া বহির্ভাগে প্রলেপ দিয়া থাকে।

২৪। পেট কাঁপিলে—খুব তীব্র মস্ত পানেই সারিয়া যায়।

২৫। কোষ্ঠকাঠিন্দে—কচি পেরারা পাতা খাইলেই বিশেষ উপকার লাভ হয়।

২৬। আদাশরে—“দেয় লতি”র কচি পাতা লবণ সহযোগে খাইলে, আরোগ্য লাভ করা যায়।

২৭। পেট কামড়িতে—“আদা গুন্‌গুনি” (মণ্ডুরী)র রস অথবা সাপের পিত্ত খাইলে—কমে।

২৮। প্রথম—খেতবর্ণের হইলে লালা “ভাইট” এবং রক্তবর্ণের হইলে রাঙা “ভাইট” কুল গাছের শিকড় বাটির সর্ষাঙ্গে মালিস ও তাহার রস পান করাইলে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

২৯। সাধারণ জরে—“বুলপুত্তি শাক” গরম করিয়া তাহার রস কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে পান করিলে অনাময় হওয়া যায়।

৩০। ‘নোরাবিছ’ অর্থাৎ অবিরাম জ্বর বিশেষে—“কম্বারেস”, কাঁটাবারিস ও “বর্জিয়াল সুধি”র রসে গভীরশূক ঘষিয়া তাহাতে একখণ্ড বহি-প্রতপ্ত লৌহ ডুবাইয়া লয়। ইহা পানে প্রায়শই আরোগ্য লাভ করা যায়।

বস্তুতঃ এ সকলের মধ্যে এমন ভাল ভাল ঔষধও আছে, বাহ্যিকের কৃতকার্যতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। দ্রব্যগুণের অকৃত শক্তিতে অনেক স্থলে অস্ত্র-চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় না, এমন কি পাখরী পর্যন্ত এইরূপে সারিয়া যায়। আবার কোন কোন স্থলে একরূপ অববৌদ্ধিক চিকিৎসা দেয়া গিয়া থাকে।

হু'একটি উদাহরণ যথা,—কোঁড়াদি পাকিলে অরুণরাগলাহিত উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা হুঁড়িয়া দেয়। কাটা বা সত্তর না শুকাইবার হইলে, তাহাতে সলবণ কাঁচালকাবাটা বেশ পুরু করিয়া দিয়া তত্পরি এক প্রতপ্ত লৌহখণ্ড কিয়ৎকালের জন্য চাপিয়া ধরে ।

### ব্রতপূজাদি দ্বারা চিকিৎসা ।

এই সমস্ত নিয়মাদি বিস্তৃত ধর্মচর্যা নহে, রোগের করাল কবল হইতে বিমুক্তি লাভের প্রয়াস মাত্র ! বিপদের প্রবল সংঘর্ষে হৃদয় বলের পরীক্ষা হয়। মহাপুরুষেরা তাদৃশ “বিপদে ধৈর্য্য” এবং সংসাহসকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু বলিতে কি, বিপদের অসহ্য তাড়নায় বাধ্য হইয়া অনেক গোঁড়া নাস্তিককেই দেবতাবিশেষের প্রতি ভক্তিমান হইতে এবং তথা কথিত ধর্ম্যচরণে তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বারা পীড়ার শাস্তি যাহাই হউক, মনের শাস্তি যে নিশ্চিত লাভ ঘটে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চাক্‌মাগণ যাবতীয় রোগে বিশেষতঃ ছশ্চিকিৎস্য কিংবা বহু চিকিৎসাতেও অনাময় রোগ সমুদয়ে নানা অপদেবতার শক্তি কল্পনা করে, এবং নানা উপচারে সেই সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিরাময় হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। নমুনা-স্বরূপ এস্থলে তথাবিধ পূজার একটি মস্তুর উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা :—

“হে-হ” বাপ-মা সকল,

( অমুক ) কে অর দেয়—জারিদেয় ।

এই তুন ( ১ ) ধরি ভাল পরিবার লাগি—

( চাউল পূর্ণ একখানি ডালায় আস্তে আস্তে যা দিতে দিতে )—

এক বারি ( ২ ) দেগর ( ৩ ) একদিনের পথখুন ( ৪ ) এজ ( ৫ )—

দুই বারি দেগর দুদিনের পথখুন এজ ।

তিন বারি তিন দিনের পথখুন এজ ।

চের ( ৬ ) বারি দেগর চের দিনের পথখুন এজ ।

পাঁচ বারি দেগর পাঁচদিনের পথখুন এজ ।

ছবারি দেগর ছদিনের পথখুন এজ ।

সাত বারি দেগর সাতদিনের পথখুন এজ । উ—উ—উ—উ—উ ( কুই )

( ১ ) তুন—হইতে; ( ২ ) বারি—বা; ( ৩ ) দেগর—দিতেছি; ( ৪ ) পথখুন—পথ হইতে; ( ৫ ) এজ—আস; ( ৬ ) চের—চারি;

“হেঁ দেদি (১) এজ ন (২) লই;

আগরে (৩) এজ কাক্যা (৪) লই;

কুলং (৫) পোয়া কুলং করি আন;

কোরং (৬) পোয়া কোরং করি আন;

হাঁদরা পোয়া হাঁদাই আন। উ—উ—উ—উ—উ (কুই)

“খেরা দেইন (৭), মুরং দেইন, গুচ্চা দেইন, উ—উ—উ—উ—উ (কুই)

বাঙাল দেইন, চাক্‌মা দেইন, গির-ঘরর পুং দেইন—খি দেইন,

উ—উ—উ—উ—উ (কুই)

মুই দেগর মাথাং করি,

তুমি লও হাতং করি,

এজ, দালি (৮) খই—বাপ মা সকল লোক।”

ইহা “মাটীশুকর” দিব্যর মজ্জ, পূজাবিধি অনতিপয়ে বর্ণিত হইবে। এই একমাত্র মন্ত্বেই ইহাদের অপদেবতাসমুদয়ের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বিজাতীয় গন্ধও তেমন নাই, ভাবাও “ঝাড়া-ফু” এর মন্ত্বের জ্ঞান সংস্কৃত শব্দ বিজড়িত নহে। সুতরাং ঐক কথার, এই মন্ত্বেগুলির উপর চাক্‌মাদিগের জ্ঞান সঙ্গত দাবি রহিয়াছে।

এদাদাগানা।—শিশুসন্তান যদি কোনও অপদেবতা কর্তৃক ভয় পায়, তাহা হইলে এই ব্রত অকুণ্ঠিত হয়। ইহাতে মাতা “সাঁকোর ছুয়ারে” ভয়প্রাপ্ত সন্তানকে কোলে লইয়া বসে; সম্মুখে “মেজাং” এর উপর একখানি থালায় একটি চাকা, একটি কলা, একটি ডিম এবং ভাত, শুড় প্রভৃতি রাখা হয়। তত্‌পরি একখানি বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া পিতা একপ্রান্তে তুলিয়া ধরে। তখন লাউয়ের খোলে চাউল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিতে থাকে, “কে তোমাকে গালি দিয়াছে? বাপে কি বলিয়াছে? মা কি বলিয়াছে?—আর কেহ কিছু বলিবে না,—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আর” ইত্যাদি ইত্যাদি। ইত্যবসরে যখন একটা মাছি বা অপর কোন কীট ঐ থালায় উপর পতিত হয়, পিতা অমনি আচম্বিতে কাপড় খানি চাপিয়া ধরে; তখন মাতা শিশুকে নিয়া দোলার তুলিয়া রাখে। ওঝা “মেজাং” এ একখানি সুদীর্ঘ হস্তের একপ্রান্ত জড়াইয়া অপর প্রান্ত ঐ দোলনার বাধিয়া বের। অসম্ভব পিতা উক্ত থালাপূর্ণ উপচাররাশি

(১) হেঁদেদি—শ্রোত নির হইতে; (২) ন—নোকা; (৩) আগরে—শ্রোত-উর্ক হইতে;

(৪) কাক্যা—ডেলা; (৫) কুলং—কোলের বা কোলে (৬) কোরং—কাঁকের বা কাঁকে;

(৭) দেইন—ডাইন; (৮) দালি—ডালি।

শিশুর নিকটে লইয়া গিয়া সম্মুখে ধরে ; তাহাতে শিশু টাকা কি শুড় ধরিলে ভাল নহে—ভুক্তির যদি ভাত কলা কি ডিম ধরে তাহা হইলে শুভলক্ষণ ।

খ-ফেলা ।—সাধারণ অরাদিতে কদলী বৃক্ষাংশ, একটি পাতা, এবং চাউল একটি হাড়িতে সিদ্ধ করিয়া পত্রচ্ছাদিত ডালার ঢালিয়া লয় । পরে তাহা রোগীর মাথা “নিছিয়া” দূরে নিয়া ফেলিয়া দেয় । পাছে তাহা নেওয়ার সময় “ওঝা” স্বীর ছায়া মাড়ায়, তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান থাকে । তাই বোধ হয়, ইহা সচরাচর বেলা তৃতীয় প্রহরে পশ্চিমদিকে নিয়া নিহিত করিবার ব্যবস্থা সাধারণ্যে প্রচলিত । এই “খ” ( আশ্বদ ) ফেলিয়া প্রত্যাবর্তনান্তে ওঝা জিজ্ঞাসা করে, ‘অমকের অমুক ব্যারামের নিমিত্ত “খ” ফেলিয়া আসিলাম গিয়াছে ত ?’ বাটস্থ সকলে এক সঙ্গে উত্তর দেয়—‘গিয়াছে, গিয়াছে, গিয়াছে’ ।

সংবাসা পূজা ।—সাংঘাতিক পীড়া বা তাদৃশ বিপদ উপস্থিত হইলে, এই পূজা অহুষ্ঠিত হইয়া থাকে । ইহাতে চারিটি কচু-ডগার একখানি ক্ষুদ্র ভেলা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সমচতুর্কোণাকৃতিকৃত একটি পাতা দ্বারা “ছই” দেওয়া হয় এবং ছই প্রান্তে ছই খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বজাও প্রোথিত করে । অনন্তর ওঝা “ছই”য়ের নিম্নে একটি সিদ্ধ ডিম্ব এবং তাহার ছই পার্শ্বে ছইটি অন্নপিণ্ড স্থাপন করিয়া, রাজি প্রভাত হইতে না হইতেই সজ্জিত ভেলা নদী স্রোতের অন্নকূলে ও প্রতিকূলে সাত বার টানিয়া আচম্বিতে বাম হস্ত দ্বারা ডিমটি গ্রহণপূর্বক ভেলাখানি স্রোতের অন্নকূলে ছাড়িয়া দেয় । প্রত্যাবর্তনান্তে অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, অমকের ব্যারাম বা বিপদের নিমিত্ত যে সংবাসা পূজা করিলাম, তাহা ভাল হইয়াছে ত ?’ যদি পৃষ্টব্যক্তি উত্তর করে “ভাল হইয়াছে,” তবেই ভাল । অনন্তর ডিমটি “ওঝা” স্বয়ং অথবা অপর কোন বালকে খাইয়া ফেলে ।

মাটি-শুকর ।—হুচিকিংস্তরোগবিশেষে—বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় গৃহসম্মুখস্থ প্রাকল ভূমিতে চারি খানি “বাধারি” প্রোথিত করিয়া নানাবিধ পুত্রে বেষ্টিত করে । মধ্য স্থলে একখানি ডালা চাউল পূর্ণ করিয়া রাখা হয় । অনন্তর “ওঝা” মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করে, ইহা কিকিং পূর্বকই উল্লিখিত হইয়াছে । পরে রোগী আসিয়া দণ্ডবৎ করিলে “ওঝা” “আগ-চার,” এবং একটি মোরগ শাবক ও একটি শূকর বলিদান করে । এই প্রসাদী মাংস সন্ধ্যা না হইতেই প্রতিকৌদিককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয় ।

সাঁজ-কুরা ।—“মাটিশুকর” প্রতীকার পাওয়া না গেলে সাঁজ (সন্ধ্যা) কুরা মোরগ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে । ইহাতে বিশেষ কোনও প্রক্রিয়া নাই । সন্ধ্যার সময়



একটি ঘোরগ কাটিয়া অস্ত্রাদি ফেলিয়া দেয়, অন্তঃপর তাহা চালের উপর ভুগিয়া রাখে। কিছুক্ষণ পরে নামাইয়া দেখে, তাহার কোনঅংশ দেবতা ভক্ষণ করিয়াছে কি না। যদি খাইয়া থাকে, তবে ভাল; নতুবা বিপদ নিশ্চিত জানিবে।

চেলা শূকর।—যে রোগ এত কঠিন বোধহয় যে, উপরিউক্ত প্রতিবিধানে অব্যাহতি লাভের আশা নাই, তন্নিমিত্ত এই “চেলা শূকর” দানের ব্যবস্থা হয়। এক ঝুড়ি পরিপূর্ণ চাউল ও খই, এবং একটি খড়ের মনুষ্যমূর্তি লইয়া ওঝা রাত্রিকালে দেবতা ডাকিতে ডাকিতে নিম্নপ্রদেশাভিমুখে গমন করে। দূরবর্তী নিবিড় জঙ্গলের বনস্পতি-মূলে তাহা স্থাপন করিয়া তথায় একটি পুংজাতীয় স্তম্ভে শূকর বলি দিয়া থাকে। ইহার মাংস কোন ব্যক্তি খায় না। পূজা সিদ্ধ হইলে যত্ন স্থাপনের উদয়সাৎ হয়; নতুবা কেহ স্পর্শও করে না, পঞ্চভূত পঞ্চভূতেই লীন হইয়া যায়। এই কার্যে “ওঝা” একটাকা পারিতোষিক পাইয়া থাকে।

কাল পূজা।—কোনও অপদেবতার আশ্রয়ে রোগ ধরিয়াছে সিদ্ধান্ত হইলে এই পূজা করা হয়। চট্টগ্রামের হিন্দুদিগের মধ্যেও “কালপূজার” প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু পূজাপদ্ধতি ইহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা নদীতীরেই পূজাস্থান নির্ধারিত করে। মজই ইহাদিগের “কালপূজার” প্রধান উপচার।

সাত-নিখিক।—সপ্তাহের কোন্ দিম কোন্ দেবতার আক্রমণে ব্যারাম হয়, সেই সেই দেবতার পূজাবিধিই বা কি,—ইত্যাদি সংক্রান্ত এক বিবরণী পুস্তিকা প্রায় প্রত্যেক “ওঝার” নিকটে আছে। তদনুসারেই এই নিখিং পূজা চলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া চান্দ্রনিখিকও আছে, তাহাতে কোন্ তিথিতে কোন্ দেবতার আক্রমণে পীড়া হয় এবং তাঁহাদের পূজা প্রক্রিয়া—বর্ণিত আছে।

ধানমানা।—ইহার অল্প নাম “খাং-পূজা।” “খাং” অর্থ চাঁদা; প্রতিবেশী সকলের সম্মিলিত চাঁদার অহুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহা “খাংপূজা” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নদীতীরে পূজার স্থান এবং শনি বা মঙ্গলবারে পূজার দিন নির্ধারিত হয়। পূজার নিমিত্ত প্রতিবেশী প্রত্যেক পরিবার হইতে কিছু কিছু চাউল, খই এবং এক এক চুড়া মস্ত আসে, এতদতিরিক্ত “ওঝা”ও দুই চুড়া মস্ত পাইয়া থাকে। বধাবিধি পূজা শেষ হইলে “আগ্ চাওয়ার” পর সকলে সত্ৰভুলোহক অর্থাৎ প্রদানপূর্বক প্রণিপাত করে। অনন্তর বলিধান করা হয়। ইহা একটি বিরাট ব্যাপার! একত্রে এতগুলি প্রাণিবধ ইহাদিগের আর কোন অহুষ্ঠানে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে—পাঁচা দুইটি, শূকর দুইটি, পারাবত এক বোড়া এবং প্রত্যেক পরিবারের সঙ্করে এক একটি ঘোরগপ্রাণ সমর্পিত হয়। চাঁদার

পরিমাণ বেশী হইলে এই সঙ্গে মহিষ বলিও প্রদান করা হয় । বলির পরে “ওঝা” নৈবেদ্য হইতে আচম্বিতে কিছু চাউল গ্রহণ করিয়া পুনরায় পরীক্ষা দেখে । অযুগ্ম সংখ্যায় শুভ এবং যুগ্ম সংখ্যায় অশুভ সূচিত হয় । শেষোক্ত স্থলে পুনঃ পুনঃ তিনবার পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেখিয়া থাকে । প্রত্যেক গৃহস্থই ভাত, অপরাপর ব্যঞ্জন এবং সামান্য লবণ মসলাদি সঙ্গে আনে । এখানে মাংসমাজ পাক করিয়া আমোদ আহ্লাদে ভোজন করে ।

এই পূজা সিদ্ধ হইলে “আদমের” যাবতীর অমঙ্গল বিদূরিত হয় । বিশেষতঃ মারীভরাস্ত্র গ্রামবাসীর আসন্নবিপদ মুক্তির ইহাই অমোঘ উপায় । ভিন্ন গ্রামে ওলাউঠা বা বসন্তাদি দেখা দিয়াছে—গুনা গেলে, ইহার। বধাসম্ভব সম্বন্ধে “ধানমানা” পূজা অমুষ্ঠানে তৎপর হয় । এতদ্বিরূপ যাহাতে তাহাদের গ্রামে সেই দূষিত রোগের বীজ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্ত কয়েকদিনের নিমিত্ত ইহার।

“পাড়াবন” অর্থাৎ পাড়া বন্ধ করে । পূর্বে সচরাচর

পাড়া বন ( বন্ধ ) ।  
সাতদিনের জন্ত করা হইত, সাধারণের অসুবিধা ঘটে বলিয়া অধুনা উক্ত সংখ্যায় তিন দিন, প্রায়শঃ একদিনের নিমিত্তই করা হয় । কিন্তু এই নির্দিষ্ট দিনে আদমে কাহারও প্রবেশাধিকার থাকে না এবং সেই পাড়ার লোকেরাও বাহির হইতে পারে না । কাহাকেও বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে যাইতে হইলে সেই দিনই পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিতে হয় । কিন্তু আদমের বহির্ভাগে থাকিতেই পরিধের বস্ত্রাদি প্রক্ষালিত করিয়া, তবে প্রবেশ করে । আদমের চতুর্দিকে পতাকা এবং “বানর ( ১ ) ঝুলাইয়া” দিয়া ‘প্রবেশ নিষেধ’ আজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করা হয় । ইহা ছাড়া তাহার। এই করদিন পবিত্রভাবে পূজাচরনা সহকারে কাল কাটাইয়া থাকে ।

এইরূপে দূষিত ও সংক্রামক পীড়ার ইহাদের সতর্কতা অসাধারণ । পরিবারে কাহারও কুষ্ঠব্যাধি হইলে বাড়ীর অনতিদূরে পৃথক ঘর করিয়া তাহাকে রাখে এবং নির্দিষ্ট একজন গিয়া যথা আবশ্যক সাহায্য করে । ইহা দ্বারা রোগীকে যে স্থগা করা হয়—তাহা নহে ; যেন তৎসংসর্গে অপরকেও ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্ত সাবধান থাকে মাত্র ।

চাক্ষুর্মানিগের মধ্যে চর্মরোগ অতিশয় সাধারণ । বলা বাহুল্য, পরিষ্কার

( ১ ) “বানর”—বিশেষতঃ পরিমিত বংশধরমাত্র । “হোরাইজেন্টেলবার”-আকারে ধাঁধ পুতিয়া তাহাতে ইহা ঝুলাইয়া দিলেই, লোকে—“বানর ঝুলাইয়াছে” বলিয়া ‘প্রবেশ নিষেধ’ বুঝিতে পায় ।

পরিচ্ছন্নতার অভাবই তাহার কারণ। গ্রীষ্মকালে কর্ণসমাপনান্তে “গা-ধুইবার” নিয়ম আছে বটে, কিন্তু পরিষেব বস্ত্র প্রায়ই প্রবর্তিত হয় না। শীতকালে স্নানের নাম করিলেও স্নানে অনেকের শরীর শিহরিয়া উঠে। সম্প্রতি উপদংশেরও বিস্তার প্রাদুর্ভাব দেখা বাইতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যেই এই রোগের আক্রমণ অধিক। দুই পুরুষ অর্থাৎ শতক বৎসর পূর্বে এই পীড়ার অস্তিত্বও

চাক্‌মাসম্প্রদায়ে অজ্ঞাত ছিল। অধুনা আরও দুইটি

বিশেষ রোগ :

রোগ বিশেষ পশার লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম—“চানাপীড়া”। ইহা প্রথমে সামান্য পালাজ্বররূপে দেখা দেয়, ক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবিরাম ভাব ধারণ করে। জিহ্বা ও কণ্ঠনালিতে দূষিত দ্রব হয় এবং পরিশেষে প্রলাপাদি উপসর্গ আসিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করে। অপরটি—“নোরাবিছ্” অর্থাৎ নৃতন বিষ। ইহা প্রবল অবিরাম জ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই রোগের উপদংশেরও পরবর্তী কালে ইহাদের ভিতর আগমনী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়া, দূষিত জলবায়ু, উপযুক্ত খাদ্যভাব, ক্রমি, বাতব্যাধি, উদরার জ্বতিও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পাঁচ মাস মাংস ও অত্যধিক লব্ধা ভক্ষণ, এবং পরিকারপরিচ্ছন্নতার জটিলেই এই সমুদয় রোগ জন্মিয়া থাকে।

১৯০১ ইংরাজীর আদম জুমারিতে দেখা যায়, এই পার্শ্বতা প্রদেশে,—

উন্নত			কাল-বোবা			বঙ্গ			কুঠ প্রভ।		
মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
১৫৮	৮২	৭৬	৮০	৪০	৩৭	১৩৭	৮২	৫৫	৬২	৫০	১২

মোট ২৫৭ জন পুরুষ এবং ১৮০ জন স্ত্রীলোক রক্ত ও বিকলাঙ্গ। বাঙ্গালার অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে উন্মাদের সংখ্যা বেশী; অতিরিক্ত সন্ধ্যাবনই ইহার প্রধান কারণ হইবে। কেননা যে সকল দেশে মাদক দ্রব্যের প্রচলন অধিক, তৎসকলই বিকৃত মস্তিষ্কের বাহন্য পরিণত হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখান যায়—ইংলণ্ডে বঙ্গদেশ অপেক্ষা পাগলের সংখ্যা শতকরা ১০ অধিক। বোধহয় আর খুলিয়া লিখিতে হইবে না যে, পার্শ্বতা চট্টগ্রামের সমুদয় আধবাসীদের অল্পপাতে অংশতঃ চাক্‌মারিদের অবস্থা অনারাদে-অজ্ঞান করিয়া তওয়া সহজসাধ্য।

# ব্রহ্মোদয় পরিচ্ছেদ ।

[১] পোষাক পরিচ্ছদ—গহনা,

এবং

[২] অগ্ন্যন্ত আবশ্যকীয় সরঞ্জাম ।

[ ১ ]

পোষাক পরিচ্ছদ জাতিবিশেষের প্রধান বহিঃনিদর্শন। বাসস্থানের শীতা-  
তপভেদে নির্দ্ধারিত হইলেও এই বহিরাবণ মাত্র দর্শনে জাতীয় পরিচয় লাভ  
করিতে পারা যায়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রবল প্রবাহে সে সুবিধা  
নষ্ট হইয়া যাইতেছে; উদার-অনুকরণের আঘাতে  
জাতীয় বিশেষত্ব সমুদয় বিলুপ্ত প্রায়! অত্রে পরে  
কা' কথা, অধুনা পিতামাতা প্রবাসাগত পুত্রকে চিনিয়া উঠিতে পারিতেছেন না ;  
প্রণয়িনী—জীবনার্দ্ধভাগিনী বিদেশাগত প্রাণপতিকের হঠাৎ কক্ষদ্বারে উপনীত  
দেখিয়া সতীত্বের মর্যাদা-রক্ষাভয়ে আকুলপ্রাণে পলায়ন করিতেছেন ; প্রাণাধিক  
পুত্র কস্তাগণ আগন্তুককে দেখিয়া অপরিচিত জ্ঞানে দূরে দাঁড়াইয়া আছে ; বর্তমানে  
এইরূপ ঘটনা আরব্য কি-পারস্ত উপস্তাসের অভিনয় বা “গুলিখোরী গল্প” মাত্র  
নহে। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, এই ‘ইজবকের’ দলে হিন্দুদিগের সংখ্যা  
অধিক ; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত চাকমা সম্প্রদায়েরও হুঁচকারজন এই সজ্জা গ্রহণ  
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনুকরণ অবশ্য নিবারণ নহে। তবে ভাল ছাড়িয়া  
মন্দের অনুবর্তী হওয়া কখনই কবাহি নয়। এখানে গরবে প্রাণ আইচাঁই করে ;  
গারে চান্দখানি রাখাও অসম্ভব হইয়া উঠে ; তাদৃশী অবস্থার—গজি, সার্ট,  
গুয়েট্‌কোট্‌, স্পেন্‌কোট্‌ ইত্যাদি ইত্যাদি শীতপ্রধান দেশোপযোগী হিমনির্যাতক  
পোষাকসমূহ আটরা নিরন্তর “পাখা” “পাখা” করিবার আবশ্যিকতা

কি, বুঝিতে পারি না (১)। এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কতিপয় জাতীয়-হিতৈষী হুজুগ তুলিয়াছিলেন, ‘চাদর উঠাইয়া দেওয়া হউক’; কিন্তু হায় হতভাগ্য হিন্দুসমাজ! যদি পিতৃ-পিতামহাচারিত গাত্রাবরণের সেই একমাত্র নিদর্শন উত্তরীয় বস্ত্রখানিই বিসর্জন করিবে, তবে আর রাখিলে কি? বাউক আর অধিক বকিয়া ফল কি, ইহা হইতেই যদি অহুচিকীর্ষু ভ্রাতৃবৃন্দের পূর্বে একবার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলেই আমাদের অস্তিত্বপ্রায় সিদ্ধ হয়। এক্ষণে আমরা আলোচ্য বিষয়ের পুনরবতারণা করি।

চাক্‌মা সম্প্রদায়ের পুরুষদিগের পোষাক সাধারণ হিন্দুগণের ছায়, দেখিতে

(পুরুষদিগের) ‘বড়ুয়া’ অর্থাৎ বাঙ্গালী মধ্য বলিয়াই মনে হয়।

প্রোচুসমাজ মস্তকে “ধবং” বাঁধিয়া থাকে। ইহা

পোষাক-পরিচ্ছদ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত

আছে; প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ববর্তী “কাটুয়া কত্তার আমলে”ও “ধবং” এর গৌরব-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাগড়িকে মঘেরা “গবং” বলে, তাহা হইতেই “ধবং” শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তদ্বারা মনে হয়, ইহারা মধ্যদিগের হইতেই পাগড়ির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে; কিন্তু পুরাকালে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়েই পাগড়ির সবিশেষ প্রচলন ছিল (২)। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নহে। ইহা ছাড়া শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে সার্ট, কোটের ব্যবহার প্রচুর। বর্তমানে সেই পুরাকালের “ছিলুম” (আঁড়রাখা) নিঃস্ব গরীব হুঃখীর মাত্র সম্বল হইয়াছে। তাদৃশী হীনাবস্থার না পড়িলে “গাম্‌ছাখানি”ও কেহ পরিধান করিতে চাহে না। তবে দরিদ্রজগৎ সচরাচর “লেংটি” মাত্র পরিয়াই জীবনাতিপাত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত চাক্‌মাগণ শিকারে কিবা দূরবর্তী স্থানে বাইতে হইলে “করুজাল”-(খলিবিশেষ) মধ্যে আবশ্যকীয় ডব্যাদি পূর্ণ করিয়া স্বকোপরি ঝুলাইয়া লয় এবং কোমরে “পানর খল্যা” (খলি) রাখে। তদ্ব্যতীত আবার পান বাঁধিয়া রাখিবার নিমিত্ত একখানি

(১) এদেশপ্রবাসী জনৈক ইউরোপীয় লেখকই বলিয়াছেন,—“We, in England, wear many articles of clothing, simply because life could not be preserved in that climate without them; but here any large amount of clothing is absolutely insupportable. True modesty lies in the entire absence of thought upon the subject.”

(২) মাদিকচাঁদের গানেও দেখা যায়,—“কার লজ পাগড়ি রাখিহ সন্তক উপর।”

“পানরপানি”ও থাকে। পরন্তু এই “কর্জাল”, “পানর থল্যা” এবং “ভাগল” (দা) ইহাদের পথ-পার্থ্যটনের বিশেষ সজ্জা। এহুণে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, কোন কোন চাক্ষুষ যুবককে রৌপ্যবলয় ব্যবহার করিতেও দেখা যায়।

রমণী লমাজে এযাবৎ জাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ যথেষ্ট প্রচলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদেরও অনেকে অধুনা অগুরুগোংকণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছে।

বিশেষতঃ রাজা ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরি-  
(শ্রীলোকদিগের) . বারের মহিলাগণ সচরাচর সাড়ীই পরিধান করিয়া  
পোষাক-পরিচ্ছদ . থাকেন; এবং ‘জ্যাকেট’ ‘বডি’ প্রভৃতি অবস্থাপর

পরিবার-মাজেই প্রায় সাধারণ। এইসঙ্গে অনেক বাড়িতে কুস্তনীল, কেশরঞ্জন প্রভৃতি গন্ধতৈল, এলেন্স এবং সুবাসিত সাবানও স্তম্ভিক পরিমাণে আমদানী হয়। বিলাসিতার খরস্রোতে একে একে সমুদয়কে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। বাহা হউক এক্ষণে আমরা ইহারিগের প্রকৃত জাতীয় পরি-  
চ্ছদ খুঁজিয়া লই। পরিধেয় বস্ত্রের আখ্যা “পিঁধন”। ইহার বর্ণ নীল, মধ্যে প্রায় চারি অঙ্গুলী বিস্তৃত লোহিত বর্ণের দুইটি সুদীর্ঘ ডোরা (১) থাকে। দৈর্ঘ্যে দেড় মোর দিবার মত, তিন হাত পরিমিত হইবে। পরন্তু উহা পড়িবার এমনি বাহাছরী যে, ইহারা লজ্জাশীলতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াই লোক সাধা-  
রণের সমক্ষেও প্রস্তাবাদির নিমিত্ত বসিয়া বসিতে পারে। কাপড়ও এত মোটা, তাহার মধ্যদিয়া স্থায়ীশক্তিও প্রবেশলাভ করিতে সুবিধা পায় না। এক একখানি “পিঁধন” ওজনে বোধ হয় ৭৮ সের হইবে। এক জোড়ায় একজনের প্রায় দুই বৎসরাদিকাল অবাধে চলিয়া যাক। যোবনোন্মুখিনী হইতেই রমণীগণ “খাদী” দ্বারা বুক ঝরিতে আরম্ভ করে। বক্ষোবন্ধনকে ইহারা এত আবশ্যকীয় মনে করে যে, জ্যাকেট, বডি পরিয়াও তত্ক্ষণি “খাদী” বাধিয়া থাকে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ পিঁধনের পরিবর্তে যে সাড়ীর ব্যবহার করেন, তৎপ্রান্তভাগ দ্বিগুণ সচরাচর তাঁহাদের বক্ষোবন্ধন চলে। খাদী বিবিধ,— “রাঙাখাদী” ও “ফুলখাদী।” সাধারণতঃ রাঙাখাদী যুবতীগণ এবং ফুলখাদী প্রাচীনীরা ব্যবহার করে। “ছিলু” অর্থাৎ কোর্তীও ইহাদের মধ্যে কম প্রচলিত নহে। বিশেষতঃ বিবাহকালে “ফুলছিলু” না হইলেই নয়। এতদ্ব্যতীত

(১) টাঙ্গুরী রমণীর পরিধেয় বস্ত্রও প্রায় এই অশুরূপ; কেবল লোহিত ডোরার একট, প্রায় এক ফুট বিস্তৃত হইয়া পাইয়ের অধিকার পায়।

মস্তকে “ধবং” বন্ধন প্রত্যেক মহিলায়ই একান্ত কর্তব্য। সচরাচর সকলে শয্যা হইতে পাত্রোখানকালে “ধবং” বাধিয়া উঠে, এবং স্নানের সময় পর্যন্ত তাহা সময়ে রক্ষা করে। কিন্তু পূজা, বিবাহ বা উপরাপার উৎসবের সময় ইহারা অহর্নিশ মাথায় “ধবং” রাখিতে বাধ্য হয়। অধুনা সম্রাটের রমণীগণ লাড়ীর অঞ্চলভাগ মাথায় দিয়াই “ধবং” এর বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। “ধবং” মাথায় থাকিলেও ইহারা জনসমাগম স্থানে গমনকালে, তত্ত্বপরি স্ত্রী বা লোহিতবর্ণের ‘ওড়না’ ঢাকা দিয়া যায়; তাহাই ইহাঙ্গিণের অবশুষ্ঠন। এই ‘ফেসন’ যে স্পেনীয় মহিলাগণের মধ্যেও দেখা যায়, তাহা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। বিগত ১৩১১ সনের “মহামুনি মেলায়” দেখা গেল, “কুরাকুটা” গোছার পুরাঙ্গনাগণ লোহিতবস্ত্র-মস্তকেই আসিয়াছিল। পরন্তু শ্রেণীবিশেষে পরিচ্ছদের তাদৃশ কোন ভারতম্য আছে বলিয়া শুনা যায় না।

এই বনবাসিনীগণ বনফুলে সাজিতেই অধিকতর ভালবাসে। রাজকন্যা ও রাজপুত্রবধূ সীতাদেবী স্বীয় বনবাস কালের বর্ণনার একদা কবির ভাষাতে বলিয়াছিলেন :—“তুলি কুবলরে (অতুল রতন সম) পরিতাম কেশ; সাজিতাম ফুলসাজে; হাসিতেন প্রভু, বনদেবী বলি মোরে সম্ভাবি কোতুকে!” বস্তৃতঃ ফুলসাজে এই ফুলরাণীগণকে দেখিলে স্বর্গীয়া অপ্সরা গহনা।

বলিয়াই ভ্রম হয়! রজতকাঞ্চনের বিবিধ ভূষণাবলী প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সজ্জার তুলনার কত যে তুচ্ছ, ইহাঙ্গিকে দেখিয়াই তাহা সম্যক্ জরজরম হয়। হায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে বর্তমানে সোণারূপার কৃত্রিম আভরণ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে! সম্ভবতঃ তাহা নগর প্রাকৃতিক ভূষণ ব্যৱহারের অন্ত্রাবধা নিবন্ধনই অন্ত্যস্ত আতির অমুকরণে বাধ্য হইয়াছে। নিরে অলঙ্কারসমূহের একখানি তালিকা দেওয়া হইতেছে। তদ্ব্যতীত যে সকল গহনা চট্টগ্রাম ও বঙ্গের অপরাপর স্থানে ব্যবহৃত আছে, তৎসমুদয়ের পার্শ্বে তারা চিত্র-স্থাপিত হইল; সুতরাং তদ্বারা পাঠক পাঠিকাগণ ইহাঙ্গিণের নিজস্ব অলঙ্কার সহজেই বাছিয়া লইতে পারিবেন। খোপায়—চোরি; কানে—(নিম্নভাগে) কজফুল, রাজবোড়, ঝিরমিলি এবং নাদেং; এই শেষোক্ত তিনটি খাস রসী। মধ্যদিগের মধ্যেও এই গহনাখানি প্রচলিত আছে; তবে আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। উহাদের “নাদেঙের” পরিধি প্রায় তিন ইঞ্চি হইবে। পাহাড়ী মহিলাদিগের কর্ণলতিকারক্ সাতিশয় বিস্তৃত। পূর্বে যে “ছাক্” আতির আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাদের রমণীগণের কানের ছিদ্র এত বড় করা হয়

যে, বাঁশ ভিন্ন অপর কিছুতেই উহা রক্ষা করিবার সুবিধা নাই; কর্ণপ্রান্ত আসিয়া প্রার স্বক্বেশ চূষন করে। চাক্‌মামহিলার কর্ণলতিকারকু তাদৃশ বড় নহে। কেবলমাত্র “রাভবোড়” পরিধানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বৃহত্তর ছিন্নের প্রয়োজন; তৎপরিধি কোনরূপে একইকিমাত্র হইতে পারে। এতদ্বিত্ত ইহা-দিগের প্রত্যেক কর্ণে চারি-পাঁচটি ছিন্ন করা হয়। তৎসমুদয়ে “বদলি” পরিধান করিয়া থাকে। নাকে—সোনানগ\*, গলার—ইঁচুলি\*, চন্দ্রহার\*, মটরদানা\*, (সাধারণ পরিবারে) “টাকার ছড়া” এবং (নিত্যস্ত গরীবজঃখিনীরা—বিশেষতঃ কুমারীগণ) পুঁতিরলহরী মাত্র পরিয়া থাকে। বাহুতে—তাড়বোড়\*; নীচের হাতে—কুচী\*, বাহ\*, কঙ্কণ\*, এবং রসিকবালা\* প্রভৃতি নানারকমের বালা আছে। অধুনা নব্যসমাজে নানাবিধ সুরঙ্গিন কাচও পরিগৃহীত হইতেছে। আঙুলে—আঙুটি\* খুবই সাধারণ। পারে—নিটোল “চরণমল”\*, ইহার পরিধি তত অধিক থাকে না; যথাসম্ভব ছোটখাটো করা হয়, যেন কোনরূপে পারে জড়াইয়া থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সমুদয় গহনার অধিকাংশই রৌপ্য নির্মিত। কেবল “সোনানগ” এবং কোন কোন স্থলে “বদলি”গুলিমাত্র সোনার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে এক্ষণে কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বর্ণালঙ্কারের পশার বাড়িতেছে; এবং প্রাচীন-প্রথার গহনাস্তলিও ক্রমশঃ নির্কাসিত হইতেছে। কিন্তু সাধারণ পরিবারে রাজা বা তৎক্ষমতালব্ধ বেত্তরানের অনুজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ বাহ, চন্দ্রহার, চরণমলপ্রভৃতি রৌপ্যালঙ্কার পরিধানও সক্ষম নহে, প্রত্যুত স্বর্ণভরণের ব্যবহার ত তাহাদিগের পক্ষে কদাপি অসম্বোধিত হইতে পারে না। পূর্বে ইহাও বলিয়া আসিয়াছি, ইহার। স্বামীর মৃত্যুতে অন্ততঃ সাতদিনের নিমিত্ত যাবতীয় অলঙ্কার বর্জন করে; পরে অস্ত্রান্ত গহনা ধারণ করিলেও পুনর্কিবাহিতা না হওয়া পর্য্যন্ত “ইঁচুলী” গলার দিতে পারে না। বৃদ্ধা বিধবাগণ অলঙ্কারমাত্রই ধারণে বিমুখ হয় এবং কেহ কেহ হিন্দুবিধবার অমুকরণে ধামের কাপড় পরিধানে বিরহবিধুর জীবন কাটাইয়া থাকে।

[ ২ ]

সাজসজ্জামের মধ্যে সম্পন্ন মহাশয়দিগের বাড়ীতে প্রার কোনও জব্যের অভাব দেখা যায় না। এমন কি, আমাদের দেশের সাধারণ জমীদার-গৃহেও তাদৃশ জার-সরঞ্জাম সকলের থাকে না। তাহাদের গৃহের আসবাবাবি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক সভ্যতাহ্রবোধিত। সুতরাং তৎসমুদয়ের অনাবস্তক বিবরণী দিয়া বক্তব্য

আসবাব।



প্রসঙ্গের নিরর্থক কলেবর বর্জিত করিবার প্রয়োজন মনে করি না। কেবল নিঃ-  
প্রায় সাধারণ পরিবারের চিত্রখানি এস্থলে অঙ্কিত করিয়াই এবিষয়ে কান্ত হইবে।  
অমিতব্যয়িতারূপ রাহগ্রাসে ইহাদের সুখশী নিরন্তর কবলিত হইতেছে।  
তাহারাই ফলে এবং উত্তমর্ণদিগের কুপায় ইহারা দিন দিন দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর  
হইয়া যাইতেছে। অনেককেই কদলপত্রে ভোজন এবং লাউয়ের খোলে  
জলপানে কোনরূপে হতভাগ্য জীবন অতিবাহিত করিতে হয়! হয়তঃ ঘরে  
কাঁথাখানি পর্য্যন্ত নাই, অথচ তাহাদের উৎপাদিত তুলায় লেপ প্রস্তুত করিয়া  
কত লোকে শীত নিবারণ করিতেছে। যখন পার্কৃত্য প্রদেশের নিদারুণ শীতে  
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় করিয়া তোলে, জীর্ণ-দীর্ণ বস্ত্রখণ্ড মাত্র তাহাদের সেই  
হুমসয়ের সঞ্চল হয়। এবং গৃহমঞ্চের মধ্যভাগে যে অগ্নি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা  
আছে, হিম-নির্যাতন তাদৃশ অসহ্য হইলে পরিবারের সকলে তাহার চতুর্দিকে  
বসিয়া গোষ্ঠিস্থ উপভোগ করে। এবং সেই সময়ে প্রিয়তমার অনলদীপ্তি-প্রদীপ্ত  
মুখচন্দ্রখানি দেখিতে দেখিতে—পাহাড়ী যুবক অপার আনন্দে অধীর রহে।  
কলতঃ ইহাই তাহাদের শান্তি—ইহাই তাহাদিগের সুখ। হায়! এসমুদয়  
দরিদ্র পরিবারে রাত্রিতে তৈল জ্বলাইবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নাই; ‘বাখারী’র  
অশাল মাত্র অনন্ত ভরসা। তাহাদের সাধারণ কার্য্য গৃহমধ্যে রক্ষিত অগ্নির  
প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতেই নির্বাহিত হইয়া থাকে। নিম্নে সাধারণ গৃহস্থেরই  
নিত্য আবশ্যক কতিপয় সামগ্রীর উল্লেখ করা গেল :—

“তাগল”—অর্থাৎ দা। ইহা সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয় কর্তনাস্ত্র। ইহা  
দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠার ইঞ্চি হইবে। অগ্রভাগ প্রশস্ত, ধার একপার্শ্বে—বাটালির  
জ্ঞার। বাট সচরাচর গাছ কিংবা বংশগুঁড়িরই বেওয়া হয়; তবে শেবোক্ত ব্যবস্থাই  
প্রকৃষ্টতর। ওজন—ব্যবহর্তার শক্তি-অনুযায়ী; অবলা এবং বালকদিগের “তাগল”  
অবশ্য হালকা করা হয়। তরিতরকারী সংগ্রহে, গৃহাদি নির্মাণে এবং জুমের কার্য্যে  
“তাগলের” নিত্য ব্যবহার। খন্ডা, কুড়ুল, কোদালী, বাইস প্রভৃতির কার্য্য,  
ইহারা এই একমাত্র “তাগল” দ্বারা নির্বাহ করে। এমন কি, পূর্বে তৎসমুদায়  
অস্ত্রের নামগন্ধও ইহারা জানিত কিনা সন্দেহ। অধুনা অবশ্য কৰ্ম্মসৌকর্য্যার্থে  
অনেকেই “মাড়ি কোড়নী” ( খন্ডা ), “বাইচ্” ( বাইস ) প্রভৃতি ছ’একখানি  
গ্রহণ করিয়াছে। পথপর্য্যটনেও “তাগল” ইহাদিগের প্রধান সহায়। এতদ্বারা  
তাহারা একদিকে যেমন এই পরমতাকীর্ণ দেশে পথভ্রম ঘটিলে জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা  
করিয়া লয়, অপর দিকে তেমনি বস্ত্রজন্তর করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া

থাকে । বিশেষতঃ এই পার্কিত্য পথের পার্শ্বে অজগর সাপ প্রায়ই বিচরণ করে । তাহারা সুবিধা পাইলে পথিকের পদবেষ্টনপূর্বক বিষম অনর্থ ঘটায় । সুতরাং সে সময় যা সঙ্গে থাকিলে পদবেষ্টিত সর্পের মাথাটা কাটিয়া ফেলিয়া কোনরূপে রক্ষা লাভ হয় । এককথায় এই অস্ত্রব্যতীত ইহাদিগের জীবন যাপন একরূপ অসম্ভব । সাধারণ প্রত্যেকেরই সঙ্গে তাহাদের স্বয়ং “তাগল” থাকিতে দেখা যায় । ইহা হয়তঃ হাতেই থাকে, অন্তথা নিতম্বের দক্ষিণপার্শ্বে—পরিধেয়াস্ত্রালাে শুঁ জিয়া রাখে । ইহার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ সাবধানতার প্রয়োজন, নতুবা কর্তক নিজেই আহত হয় । সচরাচর দক্ষিণ স্বক হইতে বাম পদের দিকে এবং প্রত্যানয়নে ঠিক বিপরীতাভিমুখে আঘাত করা হইয়া থাকে । পুরাকালীন যুদ্ধাস্ত্রগুলি এই ‘দা’ বিশেষমাত্র । তবে কিনা সেগুলি অতিশয় লম্বা ও ভারী । মালয় দেশীয় “পৈরংলটক” এর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে । একালে তৎসংস্কার যুদ্ধাস্ত্র কোষনিবদ্ধ করিয়া কটিদেশে ঝুলাইয়া লওয়া হইত । ইহাছাড়া জুমের শস্ত বপন করিতে—“চুচ্যাং তাগল” ব্যবহৃত হয় । ইহার অগ্রভাগ “চুচ্যাং” অর্থাৎ শূঁচালো । শস্ত বুনবার সময় ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত করা হয় । তন্নিম্ন এদেশে অনেকে এমন এক রকমের ক্ষুদ্র ল ব্যবহার করে, তাহার লৌহাঙ্গ খুলিয়া ফিরাইয়া লইলে বাইসের কাজ চলে । “চারি”—কান্তবিশেষ । কিন্তু ইহার গঠনে বিশেষত্ব আছে । লম্বে তাদৃশ অধিক নহে এবং তত বক্রও নয় । কারণ লম্বা কান্তে দিয়া জুমক্ষেত্রে সুবিধা হয়না । তাহাতে এক শস্তের গাছ ছেদনকালে অপর শস্তের গাছও কাটাযাইবার আশঙ্কা আছে । বলা বাহুল্য, ধাত্তাদি গাছ কর্তনের নিমিত্তই এই “চারি” ব্যবহৃত হয় । ইহা দেখিতে ঠিক ‘কাটারী’র স্থায় ; ধারে কান্তের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা কাটা আছে ।

“চুল”—( ডোল ), “বারাং” “দিংরা” প্রভৃতি বংশনির্মিত ধাত্তাদি রক্ষণা-ধার । বৃহত্তর “বারাং”কেই “দিংরা” কহে । “কালোয়াং”ও বংশনির্মিত বুড়ি বটে, ইহা খান কাটিতে, তরি-তরকারী সংগ্রহ করিতে, কাঁঠাদি বহন করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পরন্তু এই সমুদয়েরই সাধারণ আখ্যা—“থুকং” । এতন্নিম্ন বংশনির্মিত আরও কয়েক রকমের বুড়ি আছে ; তৎসমূহ বিভিন্ন কার্যে আবশ্যক হয় । যথা—“পুল্যাং” করিয়া জল সিঁচে, “কুকং” বীজশস্ত্রগইবার এবং তিল তুলিবার সময় প্রয়োজনে আসে । “ফুল বারাং” এর মধ্যে গোবাকী কাপড়, গহনা পত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদি রক্ষা করা হয় । তা’ছাড়া কার্পাস রাখিবার নিমিত্ত

“ফালি”; শস্তাদি শুকাইতে “ছাবরা”, তলই; মাছ ধরিতে “লুই”, “ঝোড়া”, “জে-চেই”, “ভুসু-চেই”, “রাম-চেই” “আং-চেই” “ডুব” শস্তাদি ঝাড়িতে চালিতে একমাত্র “চাললই”; ঔষধাদি রাখিবার “ছাম্মোয়া”, ভাত খাইবার “মেজাং” ইত্যাদি ইত্যাদি ছোটখাটো নানাবিধ জিনিষ থাকে। এসমুদয়ের মূল্যও অবশ্য বেশী নহে, প্রায় সকলেই নিজেরা তৈয়ার করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত মাছ রাখিবার “ডুলা”, শস্তাদি মাপিবার “আড়ি” “সেরা” এবং ছেলে ঘোলাইবার “ধুলন” প্রভৃতি কতিপয় জিনিষ মাত্র বেতদিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

“ডাবা” ইহাঙ্গের পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয়। ইতিপূর্বে তামাকের ব্যবহার প্রাচুর্যের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই ইহার আবশ্যিকতা স্বদয়ঙ্গম হইবে। সম্পন্ন পরিবারে নারিকেলের খোল এবং কেহ কেহ বা “মাট্যা ( মুগ্ধ ) হুকা” ব্যবহার করে। নতুবা বাঁশের ডাবাই সর্বসাধারণ। পথপর্ষাটন কি জুমকেজের নিমিত্ত বংশ হুকাই প্রারম্ভ প্রচলিত দেখা যায়। ইহা এক পাক বাঁশ মাত্র, মধ্যে কয়েক বসাইবার জন্য একটি নল বসান থাকে। উর্দ্ধ প্রান্ত খোলা। মুখমধ্যে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিয়া বা হস্তদ্বারা বিস্তৃতপথ সঙ্কুচিত করিয়া তাহাতে মুখ প্রদানে মনের সাথে ধূম পান করিতে থাকে। প্রতি পরিবারে এইরূপ ডাবা ( মধ্যকথায়—চিবিৎ ) অনূন ২। ৩টা দেখা যায়।

চড়্কা, চড়্কা ও ধনু ।—কার্পাসের বীজ ছাড়াইতে “চড়্কা”, ধুনিবার নিমিত্ত “ধনু” এবং সূতা কাটিবার জন্য “চড়্কা” ও ইহাদের অনেকের ঘরে থাকে।

সাধারণ পরিবারে মুগ্ধরপায়েই প্রায় যাবতীয় ব্যবহার চলে। কিন্তু মুগ্ধর ভাণ্ডও এদেশে সাতিশর দুর্লভ! কারণ এখানে কুস্তকার নাই, তদ্ব্যসায়ের প্রতিও এখানে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। পূর্বে ইহার এই মৃত্তিকাপাত্রের ব্যবহারও জানিত না, বাঁশের “চুঙার” করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিত (১)। অপরাপন্ন জাতির অল্পকরণেই অবশেষে তাহাদের মধ্যে “হাঁড়ী”, “পাতিল”, “তেলইন”, “ঘড়া” ( কলসী ) ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে যে সকল মৃত্তিকার জিনিষ এখানে আমদানী হয়, পথে তৎসমুদয়ের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায়ীরা অবশিষ্টগুলি অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। পরন্তু মূল্য বাহাই হউক, হুকা, কড়ি এবং হাঁড়ীপাতিলাদি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীগুলি

(১) এখানে অনেক পরিবারে কোন কোন ব্যক্তি (অবশ্য সব করিয়া) “চুঙার” পাক করিয়া খায়, তাহাতে নাকি ব্যক্তির আশা বাড়ে।

প্রত্যেক সংসারে অবশ্যই থাকে। অবস্থান্তরে কাঁসা-পিত্তলের বাসনাহিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তের উল্লেখ আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

এই পার্কৃত্যপ্রদেশে গাছের অভাব নাই। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে আস্বাবাদিতে কাষ্ঠের ব্যবহার এত কম যে, ভাবিলে অতিশয় দুঃখ হয়। সাধারণতঃ ঢেঁকি, মঞ্চের “সাঁকো” এবং মহিষের গলার “ঘটি” প্রভৃতি হুঁচাটি জিনিষ মাত্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হয়। শিল্পজ্ঞানের অভাবই ইহার বিশিষ্ট কারণ হইবে! তবে বর্তমানে অবস্থাপন্ন পরিবারে বিদেশীয় সাজসরঞ্জামাদি তাদৃশ বিরল নহে। নিতান্ত দরিদ্র না হইলে—‘আলমারী’ থাকুক আর নাই থাকুক, বাজ, সিন্দুক প্রভৃতি অবশ্যই আছে। তত্ত্বিন্ন লোকের চাব প্রযুক্তি হওয়া অবধি সাধারণ পরিবারেও কাষ্ঠের কতিপয় সরঞ্জাম বাড়িয়াছে। যথাসময়ে উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি যে, ইহাদিগের মধ্যে বাঁশের আরও একটি আসবাব আছে, তাহা বজ্রাদি রাধিবার ‘আল্‌না’ বিশেষ; নাম “সারবাঁশ”। ইহা সচরাচর “গুদী”র মধ্যেই থাকে।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

( কৃষি । )

[ ১ ] জুম—হল—বৈজ্ঞানিক চাষ ;

এবং

[ ২ ] ধান কার্পাসাদি উৎপন্ন দ্রব্য ।

[ ১ ]

“বাগিচ্যো বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি কৰ্ম্মণি ।”

লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান অর্দ্ধমাত্রায় হইলেও কৃষি মানবের জীবন স্বরূপ । সংসারে যে সমুদয় স্বার্থকোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য মনুষ্যরক্তে লোলুপ হয়, কৃষিতে তাহারও নিবৃত্তি ঘটে । কৃষি ও শিল্পদ্বারা প্রকৃত পক্ষে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, বাগিচ্যো কেবল ধনের হস্তান্তর ঘটে মাত্র ।  
কৃষি ।

হার, যে ভারতে মিথিলাদীঘর জনক স্বহস্তে হল চালনা করিতেন, তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া অভিমান-দৃষ্ট আমরা ঈদৃশ লোক-হিতকর কার্যকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করি ! সত্য বটে অধুনা ভারতের চারিদিকে এই কৃষিশিল্প লইয়া আলোচনা চলিতেছে, এবং স্থানে স্থানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় সে আন্দোলন অতি সামান্য মাত্র । ভারতভূমি স্বর্ণপ্রসূ ; ভূভাগ প্রায় বিনা ব্যত্রেই অনন্ত রত্নরাশি প্রদান করিতেছে । যদি আমরা কৃষির প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হই, তাহা হইলে রপ্তানীরক্ষসী শতব্রিহ্মা বিস্তারেও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না ; বরং তাহাতে রত্নগর্ভা ভারতের ঐশ্বর্য দিন দিন ত্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে ।

পাঠক ভনিয়া শ্রুণী হইবেন, যে কৃষিকর্ম্মের প্রতি চাক্ষুসিগের অবজ্ঞার ভাব

মাত্রই নাই। বংশ ও শিকারভিমান নির্কিংশে ইহাতে প্রায় সকলেরই আসক্তি  
বেধা যায়। সমাজে দেওরান তালুকদারেরা নিজেরা  
সমাজের আসক্তি।

সমস্ত কাজ করেন না বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব সাহায্য  
করিতেও পরাধুখ হন না। বিভাগের ছাত্রগণও অবকাশ পাইলে অসঙ্কচিত  
চিত্তে কৃষিকর্মে যোগদান করিয়া থাকে, এবং পাঠ্যজীবনের উপসংহারে যতদিন  
না অভিলষিত কর্মের যোগাড় হয়, অর্থাৎ যখন আমাদের যুবকগণ তাম-পাশায়  
কি উৎসব-আমোদে উন্নত থাকে, সেই সময়টুকুও ইহার কৃষিপ্রভৃতি গৃহকর্মের  
সবিশেষ তৎপর থাকে! তাই নব প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে  
বড়ই উপযোগী হইয়াছে, আশা হয় কালে এতদ্বারা এদেশ পার্কৃত্য সুইজারল্যান্ডের  
স্তায় মনোরম হইয়া উঠিবে।

বস্তুতঃ এই পার্কৃত্যপ্রদেশে কৃষির উপযোগী বিস্তর ভূমি পড়িয়া আছে ;  
সামান্য চেষ্টা করিলেই আবাদ করা বাইতে পারে। ভূমিও বিশেষ উর্বরা ;

চেষ্টা।

তাছাড়া আবার বহুকাল যাবৎ অনাবাদে পতিত  
থাকার যথেষ্ট বল সঞ্চিত রহিয়াছে। এহেন ক্ষেত্রে  
একটু মনোযোগের সহিত চাবের নিমিত্ত খাটিলেই উন্নতি নিঃসন্দেহ। অভাবের  
তাড়নায় এবং কর্মক্ষেত্রের ভীষণ প্রতিযোগিতায় ইহার ক্রমেই চাবের গুরুত্ব  
উপলব্ধি করিতেছে। এতৎপ্রতি প্রজাসাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণমানসে  
বর্তমান রাজা বাহাদুর রাজবিলাস নামক স্থানে সুবিত্তীয় ভূমিখণ্ডে “মডেল ফার্ম”  
খুলিয়াছেন এবং কুমার বাহাদুরও অপর এক “আদর্শ কৃষিক্ষেত্র” খুলিয়াছেন।  
তাঁহাদের গুণভর্যে সকল হউক, ইহাই কামনা।

ইহাদিগের কৃষিকর্ম বিবিধপ্রকারে নির্বাহিত হয়। প্রথমতঃ জুম এবং দ্বিতীয়  
হল। এই ‘জুম’ শব্দটি ইতিপূর্বে বহুবার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, তাহা

জুম।

বুঝিতে হয়তঃ অনেকেরই কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু  
পার্কৃত্যপ্রদেশ যাহেই অর্থাৎ যে সকল ভূমিতে হল-  
চালনার সুবিধা নাই তাহাতে, জুম করা হয়। সর্বত্র ভারতের সমুদয় পার্কৃত্য  
ভাতির মধ্যে এই প্রকার কৃষি চলিয়া থাকে। হিমালয় হইতে স্ত্রাম পর্যন্ত ইহার  
বিস্তার দেখা যায়। ইহা ব্রহ্ম ও আরাকানে “টংগ্যা” এবং মধ্যপ্রদেশে “ধৈরা”  
নামে প্রসিদ্ধ। আর বাঙ্গালার এই “জুম” শব্দটি “জলম” শব্দ হইতে প্রস্তুত কিনা,  
সুধীসমাজের বিবেচ্য—কেমনা ইহাও গমন অর্থাৎ স্থান পরিবর্তনশীল। যেখানে  
এক বৎসর জুম করা হয়, তাৎ বৎসরের মধ্যে সে ক্ষেত্রে পুনরায় সেইরূপে জলম

করা চলে না। সুতরাং অনানুসঙ্গিক্য বিস্তীর্ণ ভূমি থাকিলে এই প্রথা যম্ম নহে।  
কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম প্রয়োজন হইলেও বৎসামাত্র মূলধনে চলিতে পারে। অথচ  
বার্ষিক চারিটাকা মাত্র লাভের—এক দম্পতী সচরাচর দুই একর, নিয়মিত পোড়া  
( কেননা ভালপোড় না হইলে জুমক্ষেত্রে ঘাস কম হয় বলিয়া পরিশ্রমের বাধব  
যটে, ) তত্ত্বার উপযোগী “আকাব্বন” (নিবিড় জঙ্গল) পাওয়া গেলে, চারি একর  
পর্যন্ত জুম করিতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ সাধারণ পরিবারে ইহাই  
একমাত্র উপজীব্য। সেন্সাস রিপোর্টে নির্ধারিত হইয়াছে, ইহাদিগের ১৪৭৭২  
পুরুষ ও ১২৭৮৯ স্ত্রীলোক কৃষিকারী; তন্মধ্যে ১৪০২৩ পুরুষ ও ১২০৬০ স্ত্রীলোক  
জুম করিয়া থাকে।

পরন্তু এই জুম প্রথার ফলাফল লইয়া বর্তমানে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইহাতে  
প্রধান আপত্তির কারণ—প্রথম বহুদ্রব্য নষ্ট হয়, দ্বিতীয় তাহাদের স্থিতিহীনতা  
বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই প্রথম আপত্তি  
জুমের ফলাফল। সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। কারণ যে যে স্থানের  
বনজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হওয়ার সুবিধা আছে, গভর্ণমেন্ট প্রায় তত্ত্বৎস্থানসমূহ,  
এই পার্শ্বতা প্রদেশের প্রায় চতুর্থাংশ ভূমি (১), রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন।  
সুতরাং যে সকল স্থানের বহুদ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার উপায় নাই, জুমপ্রথা  
না থাকিলে সে সব ক্ষেত্র পতিত থাকিত। এক্ষণে সেই সকল স্থানে কত ধন  
সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে। তদ্বারা দেশেরও কত উপকার হইতেছে এবং গভর্ণমেন্টও  
কত লাভ লাভ করিতেছেন। পক্ষান্তরে ইহাতে চাষের কতি বাটবার আশঙ্কা  
নাই। কেননা পাহাড় (যেখানে চাষ চলে না) ছাড়া জুম হয় না। আর এই  
পাহাড়গুলি প্রধানতঃ বাঁশবনে আচ্ছন্ন, জুমিয়ারা প্রধানতঃ বাঁশবন অঙ্গুসন্ধান  
করিয়াই ক্ষেত্র নির্বাচন করে। বাঁশের উৎপাদিকাশক্তি এত অধিক যে,  
একবার জুম করিয়া গেলে—৫৯ বৎসরের মধ্যে সেই ভূমি পুনরায় জুমের উপযুক্ত  
হয় না। কিন্তু জুমে জঙ্গল কমায় বলিয়া বৃত্তিও কমিয়া যাইতেছে। ভূতপূর্ব  
ভেটুটী কমিশনার মিঃ কোর্বিল একথা বলিয়াছিলেন, “এই জুমের কালে কর্ণকুলী  
নদী এক সময়ে বালিতে মজিয়া যাইবে।” বস্তুতঃ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কলিঙ্গা

(১) আর ১৬৭৫ বর্গমাইল ছিল। তন্মধ্যে হইতে “চাষের ভূমির বিস্তারের নিমিত্ত” মত  
১লা বে. (১৯০২) মাস্তুরী পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেন্ট বা ইরানী উপত্যকাবীহৃত “রিজার্ভ”  
ছাড়িয়া বিলাসেব।

উঠিতেছে, এখন শীতকালে ইহার অনেক স্থানে হাঁটিয়া পায় হওয়া যায় (১)। সম্প্রতি “নাইটিং সেন্সুরী” নামক পত্রিকার ত্রিযুক্ত কে, নিম্নোক্ত ইহার কারণস্বরূপ বলিয়াছেন, জঙ্গল কাটিয়া ফেলিলে সমিহিত বরণাগুলি শুকাইয়া যায় ; কাজেই শীতসময় নদীর জল কমিয়া আইসে। তিনি আরও বলেন, জঙ্গলকর্তনে নিকটবর্তী ভূমির উর্বরতা হ্রাস হয় ; সুতরাং আবাদী ভূমির পরিমাণ বেগী হইলেও, ফলে উৎপন্ন অধিক হয় না। দ্বিতীয়তঃ জুমদ্বারা যে স্থিতিহীনতা বৃত্তিকে প্রেরণ দেওয়া হয়, তাহা কতকটা সত্য বটে। যদিও অধুনা কোন কোন জুমিয়ার স্থায়ী বাসস্থানও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা খুবই বিরল এবং অধিকাংশই চিরস্থায়ী নহে। দুঃখের বিষয় চাকমাদিগের অনেকেই অমিতব্যয়িতার প্রায় রিক্তহস্ত থাকে, মূল ধনের অভাবে বাধ্য হইয়া জুমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে বাধ্য হয় ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পমত শ্রেণীর মধ্যগণ তেমন নহে।

পৌষ-মাঘ মাস হইতেই ইহার জুমের উপযোগী নিবিড় বনভূমি অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরন্তু জুমক্ষেত্র যথাগাধ্য একে অপরের অনতিদূরে নির্দীপন করিবার চেষ্টা করে ; তাহাতে বীজবপন, ঘাস উৎপাদন, ফসল সংগ্রহ প্রভৃতিতে ইহার পরস্পর পরস্পরের সাহায্য পায়। ফলতঃ প্রারম্ভে—যখন মল্লকর সঞ্চালনে তরুলতা নবীন-ললিত সূক্ষ্মা ছড়াইয়া চতুর্দিক আকুল করিয়া তোলে, এবং বসন্তের এতেন সম্ভার—কোকিলের অশ্রান্ত অমুরাগে পরস্পরকাতরা বিরহীগণ অন্তরে অন্তরে ভুবান্ধে জলিতে থাকে, তাহাদিগের সহানুভূতিতেই যেন সেই

সুখ-দুঃখের সন্নিধানকালে “জুমিরাগণ” বিরহীগণুল-  
কর্তন ও দাহন।

বৈরী বৃক্ষ-বল্লরীর সর্কনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়। বাহারী পূর্বপুণ্য-কালে বিরাটকার, অথচ কসলৈর কোন অনিষ্ট ঘটাইবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ বৃক্ষগুলি মাত্র বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেই যে হতভাগ্যগণ বহুগাছার হইতে রক্ষণ পাইল তাহা নহে ; অনন্তর যখন চৈত্র্যশেষে হতাশনের শোলজিহবার “শাণ্ডবদাহন” অভিনীত হয়, তখন মনে হয়, এরূপ মরমে জলিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাহাদের সে সময়েই জুমিরাগিগের কুরাল “তাগলা”বাতে নিহত

(১) পূর্ববঙ্গ ও আসামের বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর সার লেফল্ট হোয়ার কে, সি, এস, আই ; সি, আই, ই, মহোদয়ের গত পরিদর্শনকালে স্থায়ী অধিবাসিবর্গ কর্তৃক ফুলীর এই চর কাটিবার প্রাৰ্থনা উপস্থিত করিয়াছিলেন ; তাহাতে তিনি বিশেষ আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। আশা করি অচিরে অকৃতঃ রাজ্যমাটি পঞ্চম শীতকালে অবাধে টিবার চলিবার সুবিধা ঘটিবে।



হওয়া ছিল ভাল। কর্তনপর্কের পর হইতে ইহাদিগের সহধর্মিণীগণও প্রাণান্তপণে স্বামীসহায়তায়-ভ্রমণ কর। ইহাদের সেই কর্মজীবন বর্ণনায় অতীত। চৈত্রেয় ঋতুর মর্ত্তণ্ডময়খমালা ধূ ধূ করিয়া অলিতেছে, মনে হয় যেন—সরসর এবার কালাগ্নি সদৃশ কোণবহ্নিতে ত্র্যম্বক ভস্মীকরণে উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই দিকে জ্রক্ষেপ মাত্র না করিয়া জুমিয়া দম্পতি অনাবৃত মস্তকে—অবিচলিত উৎসাহে স্বকাৰ্য্য সাধনে নিরত রহিয়াছে। সরসর ধারায় বর্ষ প্রবাহিত হয়, ধর্মনিচয়ের ঘন ঘন সঞ্চালনে গৌরাজ আরক্তিম হইয়া উঠে, এই অবকাশে একবার পরস্পরের দৃষ্টিতে আসিলে যাবতীর ক্লান্তি অবসান পায়, বিশ্রাম আকাজকা মিটিয়া যায়! সুরসিক বাহার। সেই নির্জন প্রদেশে উদ্ভ্রান্ত রাগিণীর লহরী তুলিয়া অপূর্ণ প্রণয় সঙ্গীতে আকুল পিয়াসা চরিতার্থ করে; এবং গানের উপসংহার সূচক “কুই” ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রাণের উৎফুল্লাভাব পরিফুরিত হয়। এতদতিরিক্ত উপহাস-বিদ্রূপ এবং ঠাট্টাকৌতুক ইত্যাদি ইত্যাদি কতই আছে। দম্পতির এহেন সম্মিলিত শ্রম কত যে বিগুহ আনন্দপ্রদ, তাহা কল্পনার আসিবে না,—কার্য্যে অমুভব করিবার সামগ্রী !!

বস্তুতঃ জুমে অধিসংযোগ এক ভীষণ ব্যাপার! সে সময়ে সবিশেষ সাবধান না থাকিলে বিঘম অনিষ্ট, এমন কি প্রাণ-বিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। আগুণ লাগিলে চৌদিগ্বেদ গিরিগুহার বায়ুদেব দিশাহারা হইয়া যান, তাই রোষে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ইত্যন্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া আততায়ীর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করেন। এইরূপে সমুদয় বনহুলীতে যোর দাবদাহ উপস্থিত হয়, কোন কোন সময় সেই উদার হতাশন-জিহ্বা লোকবসতি আক্রমণ করিয়া অসীম ক্ষতি সংঘটিত করে! আগুণ দিবার পূর্বে গুহ বৃক্ষবল্লীর এমনি সুকোশলে সাজাইতে হয়, যেন সর্কাংশে সমতাকে অলিতে পারে, এবং তাহা অকর্তিত জঙ্গলের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। সচরাচর বাতাসের নিশ্চল সুযোগেই অধিসংযোগ করা হয়, তখন জুমিয়া দম্পতি সপন্নব শাখা-হস্তে অনলমেঘের সীমা রক্ষা করে। যদি সর্কাক্রকের অব্যাহত প্রভাবে নিত্যকাল বৃহত্তর কাষ্ঠগুলি ব্যতীত আর সমুদয় ভস্মসাৎ হইয়া

আনুনী-ছুতা ।

একাধিক ইঞ্চি পরিমিত ভূপৃষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা জুমে গুহলক্ষণ মনে করিয়া থাকে। অনন্তর দৃষ্টাবশিষ্ট কাষ্ঠগুলিকে ক্ষেত্রপার্শ্বে সরাইয়া ফেলে; তাহারই সাধারণ সংজ্ঞা—‘আনুনী-ছুতা’, আমাদের কথায়—প্রথম বাহন।

একপে বগনের কাণ্ড। বরুণদেব পবিত্র দেহধারার ধর্মীকে নীতল করিলে,

জুমিয়া পরিবারের জী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই কটিদেশে খাত্ত, তিল, ভুট্টা, লাউ, কুমড়, শসা, আলু, কচু, মার্কি, বেগুন, চিনার, কার্পাস, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ শস্তের বীজপূর্ণ “কুম্ব” লইয়া “চুচ্যাং তাগল” হস্তে ধৈর্যে অবতীর্ণ হয়। তাগল দ্বারা দক্ষিণ হস্তে সমুদ্রে জুজ বপন।

জুজ গর্ত করিয়া বামহস্তে তন্মধ্যে কতক মিশ্রিত বীজ রোপণ করে। এই সকল গর্ত তিন ইঞ্চির অধিক গভীর করা হয় না ; বীজবপনের পর সামান্ত মৃত্তিকা উপরিভাগে চাপা দেওয়া হয়।

অনন্তর বৃষ্টি পড়িলে যখন বাবতীর শস্তের চারা উঠিয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে মধ্যে যে সকল আগাছা জন্মে, তৎসমুদয় অন্ততঃ তিনবার পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। প্রথমবার জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বাছন হয়, তাহার নাম—“বীজপোতনা”। দ্বিতীয়বার আষাঢ় মাসে এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ বাছন প্রায়শঃ শ্রাবণ মাসেই হইয়া থাকে। এই দুই “ছুতা”কে ইহার বধাক্রমে “ছুতীকুচ্যা বা কোমর ছুতা” এবং “মিরছুতা” সংজ্ঞায় অভিহিত করে ; এতদ্ব্যতীত জুমক্ষেত্র নিড়ানের আবশ্যক হয় না। পরন্তু জুম-কৃষিতে বৃষ্টি অধিক হইলে তরি-তরকারীর গাছ-গুলি প্রায় নষ্ট হয়, কার্পাসেরও অপকার ঘটে।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন কল বোশ ছইগুট হইয়া উঠে, সে সময়ে তাহার “জুম পূজার” ব্রতী হয়। ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী কোনও বনস্পতি-ছায়ার বাঁশের একটি কার্পাসবৃক্ষাকৃতি প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাদের মোট জুমপূজা।

যত দেবতা আছেন, প্রত্যেকেরই উদ্দেশে এক একখানি “মারেই” ছই-ছু’খানি পাতার গাঁথিয়া তন্মূলদেশে প্রোথিত করিয়া থাকে। প্রথমে “বৃহত্তারা” দেবের পূজার নিয়ম, অনন্তর গঙ্গাপূজা। ইহাতে নদীকূলে ছইটি ছাগল বলি দিতে হয়। পরে “গইরা” প্রভৃতি অপ-দেবতাকে পূজা করিয়া একটি শূকর, ১৬টি মোরগ এবং হাঁস, পারাবত ইত্যাদি বলি দেয়। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণের আড়ম্বরও কম নহে, পূজার মতই প্রধানতম উপচার। সঙ্গে একখানি “তাগল”ও দেওয়া হয়। অতঃপর ধান পাকিলে “মা-লক্ষ্মী-মা”র পূজা করিবার রীতি আছে। ইহাতে পূজা পদ্ধতির কিছুই নাই, কেবল ওয়া ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া একটা শূকর অথবা ছইটি মোরগ কাটিয়া দেয়, এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ বদও চালিয়া দিতে হয়। তার পর এক শুদ্ধ ধানগাছ “বুজ” মধ্যে পৃষ্ঠোপরি লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতে পরিবারের সকলে “লক্ষ্মী মা আস” “লক্ষ্মী-মা আস” বলিয়া ধাত-

শুষ্ককে অভ্যর্থনা পূর্বক গৃহে লইয়া যায়, এবং উক্ত স্থানে স্থাপন করে। তৎপরে একখানি “বেলাং” এর উপর থালা কি পাতার তাক ও বলিহস্ত প্রাণীর একখানি পা ও মস্তক সালাইয়া “লন্দী-মা”র সম্মুখে তুলিয়া রাখে, পরিশেষে লম্বাগত সকলকে পরিপাটিক্রমে খাওয়ান হয় এবং এসারীতোজ্য নামাইয়া লয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, বস্ত্রপত্তর উপদ্রব হইতে কল রক্ষা করিবার নিমিত্ত জুম-ক্ষেত্রের উচ্চতম শৃঙ্গোপরি “মইন বর” প্রস্তুত করিয়া থাকে। জুমিয়াগণ এই সময়ে বৃদ্ধ বা নিতান্ত অক্ষমদিগকে মাত্র গৃহে রাখিয়া জীপুত্রাদিসহ এখানে আসিয়া বাস করে। বস্ত্র হরিণ, শূকর, কুকুর প্রভৃতির উপপাত্ত অতিশয় ভয়ানক; বিশেষতঃ ক্ষেত্রে দৌড়া-দৌড়ি করিলে শত্রু একিবারেই নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর উৎপন্ন ফসল সংগৃহীত হইলে ইহারা স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্তন করে।

বলা বাহুল্য, বাবতীর ফসল এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। প্রথমে গাউ, কুমুড় শসা, বেগুন, মাকী, চিনার, তরমুজ, ভুট্টা, ইত্যাদি বথাক্রমে দেখা যায়; পরে প্রায় আধিন মাসে ধান পাকে। কার্পাসও তিল পাইতে কার্তিক মাস আসিয়া পড়ে, এই তাহাদের শেষ ফসল।

কাণ্ডান লুইন নির্দেশ করিয়াছেন (১),—এক দম্পতি বৎসরে ময় কাণি (প্রায় এগার বিঘা) জমিতে জুম করিতে পারে। এই ভূমিতে বীজের নিমিত্ত গড়ে ৬ আড়ি (২) ধান, ৩ আড়ি কার্পাস এবং এই অল্পপাতে তিল, ভুট্টা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। তত্তির তরি-তরকারীর জন্য গাউ, কুমুড়, মাকী, শসা প্রভৃতির বীজের আবশ্যক। নিম্নে তাহার নির্দ্ধারিত আয়ব্যয়ের তালিকাখানি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।—

উপরি-নির্দিষ্ট জুম-আবাসে আনুমানিক প্রম-মূল্য,—

“জল পরিষ্কার—	একজনের ২০ দিন—	দৈনিক সুত্বী পাঁচ আনা হিসাবে	৬০
মুহুরম, কাটাখি হানাতর			
করণ ও সালাম—	“	১০	১০

(১) Appendix D (The Joom),—The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers there in.

(২) এক আড়ির ভলম সমান চৌক সের।

দক্ষাংশিষ্ট কাঠ বৃক্ষকোণ—দম্পতি	১০	"	"	"	৬।০
বীজবগন—	৭	"	"	"	৪।০
ঘাস উৎপাটন ( প্রথমবার )	২৪	"	"	"	১৫
" ( দ্বিতীয়বার )	১২	"	"	"	৭।০
" ( তৃতীয়বার )	৬	"	"	"	৩।০
ধান কাটা—	৩৬	"	"	"	২২।০
শস্ত্রাদির ও ডি কর্তন—	৩	"	"	"	১।০
কার্পাস তোলা ( প্রথমবার )	১৮	"	"	"	১১।০
" ( দ্বিতীয়বার )	২৭	"	"	"	১৬।০
" ( তৃতীয়বার )	৩	"	"	"	১।০
শস্ত্র আহরণ এবং কার্পাসের					
খোসা ছাড়ান—	১২	"	"	"	৭।০
					১০৮।০

বীজের মূল্য—৪।০

দা-প্রভৃতি—২।০

ঝড়ি প্রভৃতি—৮

১৫

...

...

সর্বমোট—১৫

১২৩।০

“এক্ষণে দেখা যাউক উল্লিখিত ক্ষেত্রের উৎপন্ন বসনের মূল্য পরিমাপ কি হইতে পারে :—

ধান—১৮০ আড়ি, টাকার ৫ আড়ি হিসাবে ... ৩৬

কার্পাস—১২০ মণ, মণপ্রতি মূল্য তিন টাকা ... ৩৬

তিল ও তরিতরকারী প্রভৃতির মূল্য— ... ৪

৭৬

এতদ্ব্যতীত বাশকাটা, নৌকাগঠন প্রভৃতি দ্বারা অতিরিক্ত উপাধানে যেন— ৩০

সর্বমোট ১০৬

“কিন্তু এক দম্পতির বৎসরের নৈমিত্তিক খরচ যথা,—

ধান ১২০ আড়ি,	...	...	মূল্য	৩৬
মৎস্য ...	...	...	"	৪
তৈল ...	...	...	"	১
লবণ-মসি প্রভৃতি	...	...	"	৬
দুপারি-ভানাক প্রভৃতি	...	...	"	১০
কাগজ ...	...	...	"	১২
পুখা প্রভৃতি	...	...	"	৫

উৎসবদিতে	...	...	৬
চিকিৎসা ব্যয়	...	...	৭
অলঙ্কার-বিবাহাদিতে ব্যয়...	...	...	১৬
জুমের দা প্রভৃতিতে	...	...	২৪
“ বীজ ”	...	...	৪১

মোট ১০৬

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহারা যাহা উপার্জন করে, তৎসমস্তই অতি আবশ্যকীয় খরচেই শূন্য হয় (১)। তন্নিম্ন জুমকর ও অপরাপর অশরিহাধ্য কার্যের নিমিত্ত ইহাদিগকে হয়ত এ সকলকে সংক্ষেপ করিতে হয়; নতুবা ঋণ নিশ্চিত। আমি রাজপুরুষের উপরোক্ত তালিকার কোনও পরিবর্তন করি নাই।

জুমিয়ার অভাব।

অথচ তিনি যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ইহাদিগের পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্য সহজেই প্রতীয়মান হয়। পরন্তু ইতিমধ্যে ইহাদিগের উপর কয়েকটি নূতন কর চাপান হইয়াছে এবং কালের কুটিল গতিতে সাংগারিক খরচের মাত্রাও বাড়িয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহাদিগের যে অমিতব্যয়িতার উদাহরণ দিয়াছি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও এই তালিকা-নির্দিষ্ট পথেও পরিবার পরিচালন চক্রবৎ ব্যাপার। অনেকেই তাদৃশ চুঃসময়ে অনশনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় এবং সামান্য অনাবৃষ্টি হইলে ছুড়িক-ব্রাকস করাল-জিহ্বা বিস্তার করিতে থাকে।

পূর্বে এদেশে হল চালনার প্রচলন ছিল না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লুইন বলিয়াছেন (২), “হলকর্ষণ দ্বারা কৃষি করে এমন একজন পাহাড়ীকেও আমি জানি না; বাস্তবিক জুম ব্যতীত অন্তবিধ উপায়ে হল।

জীবিকার্জন কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় সম্পন্ন ব্যক্তির বাসসমীপবর্তী সামান্য জুমিখণ্ড মাত্র কোন কোন সময়ে হলকর্মে হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহারা তত্ত্বজ্ঞ বাঙ্গালী চাকর নিযুক্ত করিয়া থাকে। সম্প্রতি “বন সংরক্ষণী (Forest Reserve) বিধি” প্রবর্তিত হইয়াছে। আশা করা যায়, অতঃপর তাহারা (জুমের ক্ষেত্রভাবে) লাভের চাব অবলম্বন

(১) বর্তমানে খাজ-কার্পাসাদি যেমন মহাধ হইয়াছে, সেই অংশাতে সুতার বেতনও অতিশয় চড়িয়া গিয়াছে।

(২) The Hill Tracts of Chittagong and dwellers therein—P. 13-14.

করিবে।" পরন্তু উহারই তিন বৎসর পরবর্তী মত (১),—“চাক্‌মাদিগের মধ্যে এমন এক শক্তি লক্ষিত হইতেছে যে, তাহারা হেড্‌ম্যানদের হইতে স্বকীয় স্বার্থ প্রথমে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। সুবিধামুদ্রূপ বন্দোবস্ত দ্বারা পাঁচবৎসরের মধ্যে এই জাতির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কৃষক হইতে পারিবে।”

উদ্যোগ ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। গতগণমেন্টের সহায়তা এবং স্বর্ণগত মহারাজ হরিশচন্দ্র ও নীলচন্দ্র দেওয়ান মহোদয়দ্বয়ের ঐকান্তিক উত্তোগে এনেদে যে, লাকলের চাষ প্রবর্তিত হয়, অধুনা তাহা বহুল বিস্তারিত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

চাষে সাহায্য  
যখন এসম্বন্ধে আপত্তি উঠে, সরকার বাহাদুর  
অতি ধীরভাবে তদ্বিচার যীমাংসা করিয়াছেন (২)।

তাহা ছাড়া, ১৮৯২ সালের আইন প্রণয়নকালেও ইহার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। প্রথম তিনবৎসর সম্পূর্ণ নিষ্কর ভোগদখল করা যায়। পরে একবার চোরালিয়া নিরিখে যে কর নির্দ্ধারিত হয়, তাহা দশ বৎসর যাবৎ অপরিবর্তিত থাকে। সাধারণতঃ হালচাষের প্রতি লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি মানসে করের হার খুবই কম রাখা হয়। রাজা এই প্রাপ্ত করের বোড়শাংশ মাত্র পাইলে হেড্‌ম্যান অষ্টমাংশ পাইবার ব্যবস্থা হয়। তাহাতে ইহার কারণও লিখিত রহিয়াছে। হেড্‌ম্যানগণ চাষকার্য্য বিস্তৃত করিতে অধিকতর চেষ্টা করিবেন আশায় তাঁহাদিগকে রাজা হইতে এত অধিক পরিমিত লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরবর্তী বিধিতেও চাষকরের প্রাপ্ত টাকাপ্রতি হেড্‌ম্যানের তিন আনা এবং রাজাবাহাদুরের ভাগে দুই আনা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বড়ই সুখের বিষয়, কর্তৃপক্ষের এতাদৃশী চেষ্টা ফলবতী হইতে আরম্ভ হইয়াছে (৩)। অধুনা চাক্‌মাদিগের চাষের প্রতি একটু মতিগতি কিরিয়াছে।

চাষের বিস্তার :

উপর্যুক্ত মূলধন সংগৃহীত হইলে ইহার স্বতঃই তাহাতে  
প্রবৃত্ত হয়। ফেনী ও ঢাকার তীরবর্তী সমতল ভূমি

(১) Letter No. 532—To the Commissioner of Chittagong, dated 1st. July 1872.

(২) See the offg. secretary of Bengal—Mr. A. P- Macdonall's letter No. 1985-797 L. R. dated 1-9-1881.

(৩) সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৯০৩-০৪ সালে

চাক্‌মাদিগের ১০০৫ একর ১ রোড ৩৩ পোল—

সমূহে একমাত্র হল চালনাতেই আবাদ চলিতেছে ; তথাকার জমিগুলিতে উৎপাদিকা শক্তিও সর্বাপেক্ষা অধিক । পক্ষান্তরে এই চাষবিস্তারের ফলে—ইহার যে পূর্বে নিম্নত বসতি স্থানান্তরিত করিত, তাহা বহু কমিয়াছে ; এক্ষণে অনেকই স্থায়ী বাড়ীঘর প্রস্তুত করিতেছে ।

কিন্তু ইহাদিগের ভিতর এই চাষবিস্তারের মূলে বাঙ্গালীদিগের সহায়তাও কম উল্লেখযোগ্য নহে । ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ডেপুটি কমিশনার মি:

বাঙ্গালী সাহায্য ।

পাউয়ার বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের নিকট যে (নম্বর-৪৭২) পত্র দেন, তাহাতে উল্লিখিত ছিল,

“এই জিলায় ত্রিবিধ প্রধায় ভূমির চাষ হয় । ১। কেবল মজি বাঙ্গালীদিগের চাষ, ২। বাঙ্গালী ও চাক্‌মাদিগের সম্মিলনে চাষ (রাঙামাটি ও নীলচন্দ্র দেওবানার গ্রামে) এবং ৩। পাহাড়ীগণদ্বারা কর্ষণ।” পরবর্তী কমিশনার মি: বীমসুও বাঙ্গালীসংসর্গজনিত এই উপকার স্বীকার করিয়াছেন (১)। তবে আক্ষেপের কথা এই যে, এত বৎসরের সহায়তাতেও চাক্‌মাদিগের অধিকাংশ এষাবৎ সম্পূর্ণ অনগ্রনির্ভর ভাবে লাজলের কাজ চালাইতে পারে না; বাঙ্গালী ভৃত্য রাখা অনেকেরই আবশ্যক হইয়া পড়ে। শুনিতেছি “রাজবিলাস মডেল কারমে” রাজাবাহাদুরের কোনও লাভ নাই, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাহার কারণ, একেত পরনির্ভরতা, তাহাতে আবার বিজাতীয় বিদেশীয় চাকর, তাহাদের তত সহানুভূতি থাকিবে কেন? বাহা হউক, তথাপি যে তিনি নিজের ক্ষতিস্বীকার করিয়াও প্রজাসাধারণের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্ত তিনি যথার্থ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র! পরনির্ভর হইলেও ইহারা যে চাষে পাহাড়ী আর সকলের দৃষ্টান্তস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

এই ত গেল ধানের চাষের কথা; ইন্দুর চাষও ইহাদের মধ্যে সাতিশর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সুবিধাও আছে মন্দ নহে। একবার বপন করিলে তিন বৎসর বাবৎ কসল পাওয়া যায়। পূর্বে ইহারা এতাদৃশী সুবিধার কথা অবগত ছিল না। কয়েক বৎসর হইল অত্রত্য বাঙ্গালী অফিসার (officers)

বোমাং মার্কেলে ৪১১২ একর ২ রোড ১০ পোল

মণ্ড " ৪১৭৪ " ২ " ৩২ " ভূমির আবাদ হই-

রাছে। তাহার রাজস্ব পরিমাণ ২২০০০ টাকা। কিন্তু ১৮৭৫ সনে কৃষিসংকোচ কর মাত্রই ছিল না।

বাবুরা বোধ মূলধনে রাঙামাটির পার্শ্ববর্তী মাঠে ইকুর চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন । কিন্তু পরিচালকের ক্রটিতে তাহা অকালে ধ্বংস হইলেও তদ্বারা পার্শ্বভাগেই ইকুচাষের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে । তন্নিম্ন ইহার শীতকাল আসিলে শুষ্ক নদী-

সৈকতে তাম্রকূট বীজ বপন করে । ইহাতে বিশেষ  
ইকু, তামাক ও সবিসার কোন পরিশ্রম নাই, তেমন শক্ত বেড়াও দিতে হয়  
চাষ । না । কেবল মাত্র কষ্ট এই যে, পাতার মূল দিয়া

যে সমুদয় নব-মুকুল বাহির হয়, প্রত্যহ তৎসমস্ত ভাসিয়া দেওয়ার প্রয়োজন ; নতুবা পত্রগুলি সতেজ হইতে পারে না । আর হলকষ্ট ভূমিতে সরিষাও ছড়ায় । শীতাগমে ফুল ফুটিলে ক্ষেত্রের হরিজ্রাভার দূর হইতে দর্শকের নয়নপ্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া যায় !

“রাজবিলাস মডেল ফার্মে” নবপ্রচলিত বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসৃত হয় না । কিন্তু কুমার রমণী বাবু স্বীয় “আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে” এনিমিত্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন । তিনি চট্টগ্রাম  
বৈজ্ঞানিক চাষ ।

“বিভাগীয় কৃষিসমিতি”র অন্ততম সভ্য ; সুতরাং তাহাতেও সাতিশয় সাহায্য পাইতেছেন । তা’ ছাড়া কৃষিসম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তিকা এবং মাসিকপত্র অবলম্বনে তাঁহার যাদুশী চেষ্টা দেখিতেছি, তাহাতে আশা হইতেছে,—“আদর্শ কৃষিক্ষেত্র” কালে নিশ্চিতই সফলতা প্রদান করিবে । সবুড়েপুটি বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান কৃষিবিষয়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে তদীয় রাঙামাটি বাসার অনতিবিস্তৃত প্রান্ত্রে বৎসর বৎসর শাকসবজীর চাষ করিয়া থাকেন । মুক্তিকার অনুরক্ততানিবন্ধন তাঁহার বহু চেষ্টাতেও আশাচরুপ ফল পাওয়া যায় নাই । বাবু কৃষ্ণকিশোর দেওয়ান তাঁহার বাড়ীতে আলুর চাষ করিয়াছিলেন তদুৎপাদিত এক একটা আলু ওজনে প্রায় আধপোয়া তিনছটাক হইবে ; কিন্তু আবাদে ননীতালের আলুর সমান নহে । তথাপি ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে । একান্ত তিনি অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র ! ‘কাচালঙের মুখ’ নিবাসী বাবু ইন্দ্রজয় দেওয়ানের নাম এখানে সর্কাসেপক অধিক উল্লেখযোগ্য । তিনি গতপূর্ব প্রদর্শনীতে সকলকে দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছেন যে, এই পার্শ্বভাগে মুক্তিকাগর্ভে বিস্তর বহুমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে ! প্রধানতঃ তাঁহার উৎপন্ন কলা, মূলা, সালগম, বেগুন, কুমড়া ও কচু সর্কসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়াছিল । স্বীয় অসামান্য অধ্যবসায় এবং শ্রীবুদ্ধ প্রবোধচক্র দে প্রমুখ



কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষিবিদগণের প্রচারিত গ্রন্থ সাহায্যেই তিনি সাঙ্খ্য লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় প্রদর্শনীয় উচ্চতম পুরস্কারও তাঁহার পক্ষে বঞ্চেই হয় নাই। যদি সন্মত গভর্ণমেন্ট একজ্ঞ তদীয় গোবকতা করেন, তবে তিনি আরও উন্নতি করিতে পারিবেন,—আশা করা যায়।

[ ২ ]

ধাতু—নানাজাতীয়। উদ্যমে আবার প্রত্যেক জাতি কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—বিনি দ্বাদশ প্রকার। “কবা বিনি” (১), “বানরা” বা “মুখ বিনি”, শূকরের “লৌ-বিনি”, “পেরৈংছা বিনি”, “ফোংছা বিনি”, অথবা “লবা বিনি”, “খোবা বিনি”, “উত্তরো বিনি”, “রাতা বিনি”, “কুড়ি বিনি”, “লকা বিনি”, “থোবি বিনি”, “লক্ষাপোড়া বিনি” ইত্যাদি। “তুর্কি” দুইপ্রকার, সাদা ও কাল। “বাউরা” ত্রিবিধ—“বড় বাউরা”, “ছোট বাউরা” এবং “চিকণ বাউরা”। “কাত্রা”ও তিন জাতীয়—বড়, ছোট ও চিকণ। “চুরী” দ্বিবিধ—“জৈট চুরী” এবং “এমি চুরী”। এইগুলি প্রায় ভাদ্রের শেষভাগে পাকে। আর সকলের মধ্যে “মেইলি” দুইপ্রকার—“মেইলি” ও “রঙ্গী”; কবোরক বড়বিধ—“কলা”, “রাঙা”, “খোবি”, “হেইল”, “লুম্ভ” ও “পেলাং”। এই সমুদয় এবং “গেইলং” প্রভৃতি শ্রাবণের শেষ কি ভাদ্রের প্রথমেই পরিপক হয়। এতদ্বিত “ট্যাথো”, “পর্তকি” ও মধুমালতী প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে, আশ্বিন মাসে পাকিয়া যায়; এবং “কামইন ধান” ভাদ্রমাসের মধ্যেই পাকে।

ভুট্টা।—স্থানীয় নাম মোকা, ইহা চারি জাতীয়। যথা,—“বিনিমোকা”, “চিম্মোকা”, “লালমোকা” ও “খোপমোকা”। এগুলিও ভাদ্রমাসের মধ্যে পাকিয়া যায়।

তিল—দুই প্রকার; সাদা ও কাল। কিন্তু

সরিষার—কোনও প্রকার ভেদ নাই।

কার্পাস (২)—দ্বিবিধ; “ফুলসুতা” ও “বিনিসুতা”। “ফুলসুতা” ধবলবর্ণ ও উৎকৃষ্ট। জুমে প্রধানতঃ ইহারই চাষ হয়। “বিনিসুতা” গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ—

(১) আমরা এখানে অহবিধার গড়িয়া কোটেনস চিহ্নে চাক্ষুস নাম দিতে বাধ্য হইলাম।

(২) কার্পাস এদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু এসকল কার্পাস অতি নিকৃষ্ট। বস্ত্রসূত্র পক্ষে এ সমুদয় সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইহার অধিকাংশ পশদের সহিত মিশাল দেওয়ার নিমিত্ত জন্মানিতে চালান যায়। যদি সন্যাস গভর্ণমেন্ট এদেশে উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ বিতরণ করেন, তবে বড়ই উপকার হয়।

কেহ ইচ্ছা করিয়া ইহার বীজ বপন করে না। “ফুলের” বীজের সহিত ইহার বীজ মিশ্রিত হইলে সামান্য পরিমাণে দেখা যায়।

তামাক—“কফিপাতা”, “খোলমোকরা” প্রভৃতি নানাজাতীয় আছে, তন্মধ্যে শেযোক্ত রকমই প্রধান।

আউক ও—হই তিন রকমের আছে, তন্মধ্যে “খাওগ্যা” শ্রেণীর নূতন আমদানী হইয়াছে। ইহার ছাল শক্ত বলিয়া বস্ত্র পণ্ডতে নষ্ট করিতে পারে না। ইক্ষুর স্থানীয় নাম—“কুছালু”, চট্টগ্রামে “কুস্তার” বলে।

আলু—“মোম ( লাল ) আলু”, “বীশতারা আলু”, “ছিমি আলু”, “রং আলু”, “জুরো আলু”, “কুইরাং আলু”, “লাল কেইলা আলু” এবং “নাদা ফেইলা আলু” প্রভৃতি।

কচু—“ওল কচু” ( ওজনে প্রায় ১২ মণেরও অধিক হয় ), মানকচু, “চাকমা কচু”, “কুলুপা কচু”, “বিনি কচু”, “ওকনা কচু” “কম্বুরী কচু”, “নমে কচু” “বিষ কচু”, “ছ-কচু” প্রভৃতি স্থলজাত। এবং “পাত্তা কচু”, “হেরা কচু”, “মোদ্দম কচু”, “কাল গোয়ারী কচু”, ও “নাদা গোয়ারী কচু” ইত্যাদি জলজ।

তরি-তরকারী।—বেশুগ দ্বিবিধ—“বারমাত্তা বিশুগ” ও “জৈটু বিশুগ”। এতদ্ভিন্ন “মাষারা”, “চিল্লিরা”, সশা, “কুছগুলা” ( লাউ ) (২), “ইউরীগুলা” ( কুমড় ), “কাঁরাগুলা” ( কাঁকরোল ), “তিতাগুলা” ( উচ্ছে ), “চেরস”, বিড়া, “কৈদা”, “ছমি” ( সিম ), “ছুমিছমি” ( অরহর ); শাকের মধ্যে পুঁইশাক, “ছাত্রেংশাক”, “ফুছিশাক”, “ওজোনশাক”, “মারিস শাক”, “নারিচ শাক” “গাং-কুলা শাক”, “ইয়ারং শাক”, কচুশাক, ঢেঁকি শাক এবং লেংরা শাক ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন—

লক্ষা ও—নানাজাতীয় আছে ; এবং বাধরের মধ্যে “রাইবাহর”, “জুমোরা বাহর” প্রভৃতিও পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে।

(১) ইহার বাবতীর ‘কল’ অর্থেই “গুলা” শব্দ ব্যবহার করে। এই সঙ্গে এতদ্দেশে উৎপন্ন কতিপয় বস্ত্র কলেরও তালিকা রাখিয়া গেলাম। বধ্য,—“ঘেরে আম”, “রামকলা” “কেরোলা”, “হাজা লেমু” ( পার্ভিলেমু ); “করাল” ( বাতাবি লেমু ), “তুলুলা”, “মিটালেমু”, “নারে কমলা”, “কাদালেমু”, “পুকরেং”, “ধল-কো”, “রোপ্তহ-কো” “পুৎপাতা-কো”, “আন্না” ( আমড়া ), “জলপেই”, “কাদামালা”, ( আমলকী ), “হতালু” ( হরিতকী ), “ব’চাগুলা” ( বহেরা ), “কুহবগুলা”, “ভারাগুলা”, “গিলাগুলা”, “দেমলগুলা”, “ছবেইগুলা”, বজাগুলা, “জৈংগুটগুটা”, “মবগুটগুটা”

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

( শিল্প । )

[১] বস্ত্রশিল্প—[২] বেতের বুনন—[৩] নৌকাগঠনাদি ।

শিল্পরচনার চাক্ষুশাঙ্গীতি পশ্চাৎপদ নহে । বরং তন্নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে একটি উৎকট আকাজ্জক দেখিতে পাওয়া যায় । যে সময়ে আমাদের রমণী-সমাজ নিদ্রালগ্নে কিংবা ‘নভেল’ পাঠে কাল অতিবাহিত করেন, চাক্ষুশগৃহিণী সেই সময়ে সাংসারিক অভাব পূরণে নিরত থাকে ।

শিল্পাসক্তি ।

দিনের বেলায় তাহাদের অবসর মাত্রই নাই । যদি গৃহকর্ম্ম সারিয়া যৎকিঞ্চিৎ অবকাশ লাভ হয়, তখন তাঁতখানি হইলেও লইয়া বসে । রাত্রিরও অধিকাংশ ধরিয়া সূতা কাটা বা সূতার বীজ ছাড়াইতে ব্যস্ত থাকে । ইহাদিগের এতাদৃশ অশ্রান্ত কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে নয় ও ভক্তি যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া স্বয়ংকে আগ্রত করিয়া তোলে ! আমরা এই পাহাড়ীজীবনের আলোচনাকালে তৎপ্রতি বঙ্গীয় পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । আশা আছে, ইহাদের হইতে তাঁহারা গৃহিণীপনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

বর্ত্তমান সভ্যতার সংজ্ঞামতে যে জাতি যত অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভর, তাহাদের সভ্যতা গৌরবও তত বেশী ! ইহাই শুধু সভ্যতার পরিমাপক হইলে

শিল্প পরিমাপ ।

চাক্ষুশদিগকে অসভ্য বলিয়া ক্রকুঞ্চন কখনই মুক্তিদাতক নহে । পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাদের মধ্যে সূত্রধর, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ইত্যাদিরূপে শ্রমবিভাগের দ্বৈত প্রতীবন্ধক নাই । সূত্রসাং বংশমর্যাদা-নির্কিংশেবে সকলেই শিল্পোন্নতি সাধনে সুবিধা পাইয়া থাকে । এমন কি ইহাতে ধনী নির্ধনের মধ্যেও কোন তারতম্য দেখা যায় না । ইহাও একটি গৌরবের কারণ বটে যে, চাক্ষুশগণ কর্ম্ম সাধনকালে

স্বকীয় পদগৌরব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার অপরিসরতা নিবন্ধন ইহাদিগের শিল্প সাধনায়-এবং বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা অতি সামান্য পরিমাণেই প্রবেশ করিতে পারিয়াছে।

এই পাহাড়ীদিগের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করে—অত্রত্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয়ের উদ্যোগপরায়ণতায় বিগত কয় বৎসর ধরিয়া “প্রদর্শনী” হইয়া (১) আসিতেছে। মাননীয় গভর্নমেন্ট তত্ত্বান্ত বার্ষিক ২০০ হই শত টাকা করিয়া দিয়া উদারতার পরিচয় দিতেছেন। ইহাতে স্থানীয় রাজস্ববর্গও অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

শিল্পে সাহায্য ।  
রাষ্ট্রাধীনে এই “প্রদর্শনী” অনুষ্ঠিত হয়। ইহা দুই দিন যাবৎ স্থায়ী থাকে। এ উপলক্ষে যাত্রা, সার্কাস, নোকাচালান, দড়িটানা (Tug of war), দৌড় প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেরও অভাব হয় না। পাহাড়ীরা তাহাদের প্রদর্শিত দ্রব্যের নিমিত্ত যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে। ইতিমধ্যে তাহাদের প্রতিযোগিতা যেসকল উন্নতিশীল হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, “প্রদর্শনী”র উদ্দেশ্য শীঘ্রই ফলপ্রসূ হইবে। এই পুরস্কৃত লোকদিগের অধিকাংশই চাকমা জাতীয়। গুণসাপেক্ষ বিচার হওয়াতে ইহারাই সমধিক লাভবান হইতেছে। তদ্বারাও অবশ্য বুঝিতে পারা যায় যে, অত্রত্য পাহাড়ীদিগের মধ্যে চাকমাগণই কৃষি ও শিল্পে অপেক্ষাকৃত উন্নত।

## [ ১ ]

প্রদর্শিত দ্রব্য সকলের মধ্যে ইহাদের বস্ত্রশিল্পই সাতিশয় উল্লেখ যোগ্য। বর্তমান সময়ে ভারতের সর্বত্রই এতৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, প্রত্যেক ভারতবাসীরই ইহা লইয়া ধীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। কিন্তু শত শত চাকমা মহিলার, তাহারা লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া নাই। তনু-রাহি, প্রথম বক্ষে জড়াইবার বস্ত্র (খাদী) ধানি প্রত্যেকের নিজেকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কথাটা সত্য হইলে তাহাকে শিল্প-শিক্ষার এক মনোরম শাসন বলিতে হইবে।

শিল্পশাসন।

এইরূপে প্রত্যেক চাক্ষু মহিলাই বস্ত্র বয়নে অস্বিস্তর পারদর্শিনী; বয়ন শির তাহাদের শিকার অত্যন্তম অঙ্গ। (১)

ইহাদিগের (হাতের) তাঁতে বস্ত্র বয়ন একটু সময়সাপেক্ষ সত্য, কিন্তু তাহাতে এমনি মনোহর ফুল তোলা যায় যে, দেখিতে স্বতঃই প্রশংসা করিবার ইচ্ছা জন্মে। এই সকল তাঁতে মোটা সূতার কাজই ভাল চলে। পরন্তু ইহার রেশমী বস্ত্র শিল্পেও সবিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতেছে। স্বর্গীয়া চাক্ষুসরাণী দয়াময়ীর স্বহস্ত নির্মিত ছুইখণ্ড রেশমী বস্ত্র “বোম্বাই প্রদর্শনী”তে কিরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

উন্নতি।

অপর সকলের মধ্যে ‘কাচালঙেরমুখ’ নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ান এবং তদীয় শ্বশুর চেঙ্গীতীরবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ানের পরিবারেই অপেক্ষাকৃত পটুতা দেখা যায়। সম্প্রতি শেখোল মহোদয়ের অন্যতম জামাতা চেঙ্গীবাসী বাবু শশীমোহন দেওয়ান একখানি “ফ্লাইস্যাটেলুম” আনিয়া স্বীয় বাড়ীতে কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহার কাজ যে কিরূপ চলিতেছে, এতাবৎ সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে ইহাদের হাত যখন অভ্যস্ত আছে, তখন সকলতা লাভে যে বহু বিলম্ব হইবে, বোধ হয় না। ইহারা সুরুত্ব কাটিতে জানে না। সূতরাং অধিকাংশ কাপড়ের নির্মিত বিদেশজাত সূতা আমদানী হইয়া থাকে। এ সকল সূতা সাদাই আসে। পরে ইহারা প্রয়োজন মতে বিশেষ বিশেষ বুদ্ধবস্ত্রীর নির্দীপ দ্বারা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লয়। সচরাচর “কালাগাব” বৃক্ষের বকল জলে সিদ্ধ করিয়া কাল রং, তাহাতে কাল্মা যোগে নীলরঙ, কাস্মাপাতা পঁচাইয়া চূর্ণ মিশাইলে বা হলুদি ও আমগাছের ছাল দিয়া পীত, কাল্মা ও হলুদিতে সবুজ এবং ‘রঙগাছের’ শিকড় চূর্ণ করারে জলে মিশাইয়া লোহিত রঙ করিয়া লইয়া থাকে। এই সকল রঙকে পাকা করিতেও বনজপত্র বিশেষের রস ব্যবহৃত হয়।

ইহাদিগের নির্মিত সাধারণ বস্ত্রনির্মণগুলির পরিচয় বস্ত্রপরিচয়।

নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

“পাঁখন”—স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র। পূর্বেও ইহার একরূপ পরিচয়

(১) শুনিতে পাই, পূর্বকালে ইরাজ-অর্ধাদিগণও বস্ত্র বয়নে তৎপরা ছিলেন, তন্মূলক

এংলোসারন “wifian” শব্দ হইতে ইরাজী ওয়াইফ (wife) কথাটি আসিয়াছে। তাহা হইলে এক্ষণে করজন ইরাজ-ললনা সার্বক ওয়াইফ (wife) সংজ্ঞার অধিকারী?

প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা লম্বে তিন হাত এবং প্রস্থে দুই হাত পরিমিত হইবে। বর্ণ গাঢ় নীল, মধ্যে প্রায় চারি অঙ্গুলী করিয়া বিস্তৃত লোহিত বর্ণের দুইটি সুদীর্ঘ ডোরা থাকে। ইহা প্রধানতঃ মোটা সূতাতেই প্রস্তুত হয়।

“খাদী”—বন্ধোবন্ধন বস্ত্র দৈর্ঘ্যে ২½ কি ৩ হাত, কিন্তু প্রস্থ এক ফুটের অনধিক। “খাদী” দুই জাতীয়—“রাঙা খাদী” ও “ফুল খাদী”, “রাঙা খাদীতে” লাল সূতার কাজই বেশী, “ফুল খাদী”তে ফুল রচনাতেই অধিকতর মনোযোগ থাকে। ইহাতে “বাদই চোখ”, “ত্রিপুরাউল ফুল”, “করুণা ফুল” প্রভৃতি নানা রকমের ফুল তোলা হয়।

“ধবং”—পাগড়ী। ইহার সূতা সাদা, তবে যুবতীদের “ধবং” প্রান্তে লোহিত-বর্ণ রঞ্জিত সূতার ‘ফুল’ তুলিয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাতেরও অধিক, প্রস্থ কোনরূপে এক হাত মাত্র হইতে পারে।

“কর্জাল”—‘ব্যাগ’ (Bag) বা থলি বিশেষ। ইহা স্বকোপরি হইতে উপবীত প্রায় ঝুলাইয়া লয়।

“পানের খল্যা”—ইহাকেও থলি বলা যায়; পান, সুপারী প্রভৃতি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

“গামছা খানি”—সচরাচর গা-মুছিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেও অনেক পুরুষ গরীব-দুঃখী ইহা পরিধানও করিয়া থাকে। ইহা নানা বর্ণেরই হয়। দীর্ঘ ৩ কি ৩½ হাত এবং প্রস্থ ১ কি ১½ হাত; কোন কোন “গামছা খানি”তে ফুল ও তোলা হয়।

“তৈইলা”—ইংরাজী towel শব্দের অপভ্রংশ। ইহা যে অমুকরণে আসিয়াছে, সহজে বুঝা যায়। এখনও সকলে এমন কি অধিকাংশ জীলোকে ইহা প্রস্তুত করিতে জানে না। ইচ্ছায ও রাজচক্র বাবুর বাড়ীতে যে তোয়ালে প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় বিলাতী ‘তোয়েল’রই অমুরূপ। সম্ভবতঃ সর্কাদৌ তাঁহাদের পরিবারেই এই অমুকরণ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

“আলাম্”—ইংরাজী (chart) “চার্টের”ই অমুরূপ। ইহাতে হরেক রকমের ফুল লতাদির নমুনা রক্ষিত হয়। বস্ত্র বয়নকালে ইহা আদর্শরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

“বর্গি।”—ইহা “জিলাপ” নামেও প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ বর্ণ ধবল, দুই দীর্ঘ ধারে লোহিত বর্ণের সামান্তরূপ পাইর। দৈর্ঘ্যে ১০ হাত ও প্রস্থে দুই হাতের দুই খানি কাপড় তৈয়ার করিয়া, উভয় খানিকে জোড়াইয়া চারি হস্ত পরিমাণ

বিহীন করে। অনন্তর তাহাকে দুই ভাঁজ অর্থাৎ ৫ হাতে  $\times$  ৪ হাতে করিয়া শীতের সময় গায়ে দেয়।

এতদ্বিধা চাক্ষুসমণীর প্রস্তুত “ছিলুম” (কোষ্ঠী, এর কাপড়, বালিসের কাপড়, বিছানার চাদর, টেবিলের চাদর, বিশেষতঃ ঘাণা-পাশা প্রভৃতি ‘খেলায় ঘরে’ হুম্মার কারুকার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বয়ন প্রণালী।—তাঁত অগেকাকৃত ছোট, জীলোকদিগের ঘরাই পরিচালিত হয় বলিয়া প্রায়ে কোনরূপে দুই হস্তের অধিক নহে। কারণ, ইহাতে ও



তাঁতদিগকে হেলিয়া চলিয়া যাক্ চালাইতে হয়। তাঁত খুলাইবার নিমিত্ত যতদূর কোনও ধর নাই। সচরাচর “ইজরে” বসিয়াই বস্ত্রবয়ন করিতে দেখা যায়। জুনের ঋতুকালে জুরিয়া মহিলাগণ তাঁতের কাজে হাত দিতে পারে না। পরে অবসর মতে অর্থাৎ সাংসারিক নৈবেদ্যিক কার্যাদি পারিয়া—যে সময়ে আত্মার বঙ্গমহিলাগণ নিঃসংশয়সন্তোষে কাটার, তখন ইহারা তাঁত বানি লইয়া বসে। এইরূপে “পিরনের” মত এক খানি কাপড় তৈয়ার করিতে প্রায় সাতাশকাল গত হয়। কিন্তু কাপড়ও এরূপ টেকসই হয় যে, দুই খানি “পিরনে” অবশ্যে দুই বৎসর কাটিয়া যায়।

টানাগুলির উত্তর প্রান্ত দৃঢ়-সম্মিলিত থাকে, এক প্রান্ত “তাঁষোরা বাঁশে” (১) আবদ্ধ করিয়া, বাঁশের উত্তর দিক সম্মুখস্থিত কোনও স্তম্ভে বাঁধিয়া দেয়। অপর প্রান্ত “তাগলক্ বোড়ে” (২) আটকাইয়া হু’পাশে ছইখণ্ড রজ্জু মহিষচর্কের “তাব্‌ছি” সহযোগে কটিদেশে টানাইয়া লয়। কর্ণশ রজ্জুতে মেরুমণ্ডে ব্যথা লাগে, তাই এ চৰ্ম্ম “তাব্‌ছির” প্রয়োজন। টানাগুলির কতক উপরে, ও কতক নিম্নে থাকে, সেই উর্দ্ধাধঃ অবস্থান পরিবর্তন করিতে “ব-কাঠি” (৩) ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কোঁশলের সহিত সাঁয়াত্র জোরে নাড়া দিলেই উপরের টানা নীচে এবং নীচের টানা উপরে চলিয়া আইসে। এতদ্বিত্ত কাপড়ে বত অধিক ফুল তুলিতে হয়, “ব-কাঠি”ও তত অধিক প্রয়োজন। ফুলে বা লতার প্রত্যেক রূপান্তরে এক একখানি “ব-কাঠি”র আবশ্যক হইয়া থাকে। “ব-কাঠি”র সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড “ছুচ্যাক্ বাঁশ” (৪)ও থাকে; তদ্বারা “ব-কাঠি” চাপিবার সুবিধা হয়। টানাগুলি বাহাতে ইতস্ততঃ সরিতে না পারে, তাই তৎসমুদয় “সায়্য” নামধের সৰু বংশ খণ্ডে স্ক্রকোঁশলে জড়িত থাকে। এইরূপে টানা সজ্জিত হইলে “ধুরচুঙা”র (৫) পড়েন চালাইয়া “ব্যাং” (৬) দ্বারা তাহা চাপিয়া দেয়। একটি পড়েন ফিরাইতে প্রথমতঃ “ব্যাং” দ্বারা পূৰ্ব্ব বিন্যস্ত পড়েন চাপিয়া “ছুচ্যাক্ বাঁশে”র সাহায্যে “ব-কাঠি”র উপরের টানাগুলি নীচে এবং নীচের টানাগুলিকে উপরে তুলিয়া লয়, এবং “ব্যাং”খানি সেই উন্মুক্ত পথে চালাইয়া পুনরায় চাপ দ্বারা পড়েনের স্থান অব্যাহত করে। অনন্তর “ধুরচুঙা” বিপরীতভিত্তিমুখে চালাইলেই পড়েন পড়িয়া যায়। যদি কোনরূপে টানা বা

(১) “তাঁষোরা বাঁশ”—ইহা সাধারণ বংশখণ্ড মাত্র।

(২) “তাগলক্ বোড়ে”—বাঁশের দুই ধানি বাধারী মাত্র। (৩) “ব-কাঠি”—ব-অর্থান হস্ত-কাঠি। সচরাচর এই “কাঠিতে” টানাগুলি একান্তরে জড়াইতে হয়। তবে ফুল-সজ্জাদি তুলিতে “আলাস” দেখিয়া টানা জড়াইয়া থাকে। (৪) “ছুচ্যাক্ বাঁশ”—ইহা প্রায় “তাঁষোরা বাঁশের”ই অল্পরূপ; বিশেষত্ব মাত্র এই যে, ইহার এক প্রান্ত হু’চালো। (৫) ধুরচুঙা—বংশ নির্মিত মাত্র। ইহা একটি এক প্রান্ত বদ্ধ সাধারণ চুঙা বিশেষ। গাঁইট বিশিষ্ট প্রান্ত অপেক্ষিত হু’চালো করা হয়। তা’ ছাড়া চুঙার পার্শ্বে একটি স্থল হিত্ত থাকে। যত্নবানী চুঙার মধ্যে ভরিয়া ধোলা প্রান্তে তৎকার দিলেই উক্ত হিত্ত দিয়া নলী হইতে হস্ত প্রান্ত বাহির হইয়া আসে। (৬) “ব্যাং”—একখানি সূক্ষ্ম ও ভারী বংশখণ্ড।



পড়েন সজ্জিত বা জটিল বিকিণ্ড হইয়া পড়ে, সজ্জাকণ্টকের সাহায্যে তাহার শৃঙ্খলা বিধান করা হয়। এই কাঁটার সাধারণ নাম—“কুহুক-কাদা” (১)।

বস্ত্র বয়নের প্রধান কার্য—টানা এবং “ব-কাঠি” ঠিক করিয়া লওয়া। তা’ না হয় “ব্যং” চাপন ও “থুরচুড়া” চালনে কোন ও বিশেষ পারদর্শিতা নাই। পরন্তু একবার ‘পড়েন’ ফিরাইতে ইহাতের প্রায় ৩৪ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, টানা বনাইবার পূর্বে সূতাগুলি কলপে মাখিয়া লয়, অল্পমণ্ডই ইহাদিগের একমাত্র কলপ। এইরূপে—

“কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী;

সুবর্ণ অঞ্জলিচয়

—কিন্তু কোমলতা ময়,—

নাচে তন্তু যজ্ঞে, ( নীচে গায় কমলোদিনী! )”

১০ম শ্লোক, “জুমিয়া জীবন।”

## [ ২ ]

বুনন কার্যে পুরুষ চাক্ষা মাত্রই প্রায় সিদ্ধহস্ত। তাহারা ঝুড়ি প্রভৃতি এত চিকণ ও পারদর্শিতা সহকারে প্রস্তুত করে যে দেখিয়া চোখ ফিরান কঠিন হয়। তবে এই সকল কার্যে বাঁশের চৈঁচাড়ীরই প্রচলন অধিক। শীর্ষদেশে যদিও ‘বেতের বুনন’ সংজ্ঞা দেওয়া হইল, কিন্তু বেত অল্প কাজেই ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ বাঁশ অধিকতর সহজলভ্য বলিয়া বেতের প্রতি তাদৃশ নজর পড়ে না। এই পাহাড়ে এগার জাতীয় বাঁশ পাওয়া যায়। নাম যথা,—“এগজ্যা” “কার্কেয়া” (পাইয়া), ওলা, “মিদিঙা” (মিতিরী), ডলু, “কালিছিরি”, “ভুহুম্,” “নয়ানসুক,” “লুদি” (লোথা), বারিমালা বা বাইয়া, এবং কাঁটা বাইয়া। ইহার যে কোন বাঁশ দিয়া সকল কাজ করা যায় না। মিতিরী, ডলু, ও লোথা বাঁশই ঝুড়ি নির্মাণে বিশেষ উপযোগী; তন্মধ্যে ডলু বাঁশেরই প্রচলন অধিক। এই বাঁশ বৈর্যে প্রায় ২৫ হাত এবং পরিধি ও ১৫।১৬ ইঞ্চি পরিমিত হইবে। নিম্নে এতদ্বারা প্রস্তুত ঝুড়িগুলির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) কুহুক—সজ্জাক, কাদা—কাঁটা, অর্থাৎ সজ্জাক কণ্টক। কেহ কেহ হরিণ শৃঙ্গ সূচ্যগ্র করিয়াও এমিষিত ব্যবহার করে।

“ভুল”—আমাদের কথার ভোল । ইহা এত বড়ও দেখা যায় যে, ৭৮ মণ জিনিষ অনায়াসেই রাখা যাইতে পারে । “দিংরা”—ভুল বাশের কাজ । ইহাতে সচরাচর ধাত্তাদি শস্ত রাখা হয় ; আকারে ভোল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর । “বারেং”—গঠন প্রণালী “দিংরা”ই অল্পরূপ । ইহাকে ছোট “দিংরা” বলা যাইতে পারে । খুঁটা প্রভৃতি দিয়া বিশেষ কারুকার্যের সহিত প্রস্তুত হইলে ইহা “ফুলবারেং” নামে কথিত হয় । গহনা বস্ত্রাদি বহুমূল্য সামগ্রী ইহাতে সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ “বারেং” ও “ফুলবারেং” ইহাদের সিন্ধুকের অভাব পূরণ করে । কালোয়াং—সাধারণ “বারেং” এর সহিত তারতম্য অতি সামান্য মাত্র ; কিন্তু ইহাদিগের নিত্য প্রয়োজনে আসে । খুঁটা চারিটা লাগাইয়া “পিঠাকালোয়াং” প্রস্তুত করা হয় ; বাজারাদিতে যাইবার সময় ইহা পৃষ্ঠের উপর দিয়া কপালের সঙ্গে ঝুলাইয়া লইয়া থাকে । “কালোয়াং” ভারী না হইলে, বিশেষতঃ সমতলভূমিতে চলিতে কপাল হইতে দড়িখানি স্বন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তে টানিয়া রাখে । আবার ভারী বোঝা লইয়া বেশী দূরে যাইতে হইলে “কালোয়াং” এর সহিত ছুই খানি “খিরাং” অর্থাৎ আঁকুড় বাঁধিয়া লয় ; ছুই স্বন্ধে “খিরাং” ছুইখানি দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে, স্ততরাং কপালে জোর খুব কমই পড়ে । “কুরুং”—“কালোয়াং” হইতেও অনেক ছোট এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছিন্ন । শস্ত বপন কালে ইহাতে করিয়া বীজ লওয়া হয় ।

সচ্ছিন্ন ।

তৎপরে “মিতির” বাশ” । ইহা ২০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং পরিধিও প্রায় ২১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে । আকারেও গঠনে “পাইয়া বাশ” ও প্রায় একরূপ । কিন্তু “মিতির” বাশে “পাইয়া বাশ” অপেক্ষা স্থিতি স্থাপকতা শক্তি অধিক, বেধ ও ক্রিষ্টিং বেশী হইবে । এই নিমিত্তই ছোটখাট ঝুড়ি সমুদয় “মিতির” বাশে” নির্মিত হইয়া থাকে । কয়েকটীর বিবরণ যথা ;—“পুল্যাং”—সেঁচনী বিশেষ, গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এতদতিরিক্ত “লুই” (১) এবং কুলা-চালুনি, ডুব ও নানাবিধ “চাই” (২) এই “মিতির” বাশে” প্রস্তুত হয় ।

(১) “লুইর” গঠনপ্রণালী সেঁচনীর স্থায়, কিন্তু সারা গায়ে—জল সরিয়া পড়িতে পারে অথচ মাছ যাইতে না পারে এমন সব ছিদ্র আছে । জল সেঁচিয়া ইহাতে ফেলা হয় । সিক্ত জলের সহিত যদি কোন মাছ যায়; তৎসমুদয় ইহাতে আবদ্ধ হইয়া যায় ।

(২) মৎস্য ধরবার কল বিশেষ, কোন কোন দেশে ইহাকে ঘুরী বলা হয় ।

কিন্তু বুনন কার্যের পক্ষে “লোথা বাশই” সর্বপ্রথম উৎকৃষ্ট। এই বাশ সকলের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক এবং চোঁচাড়ি গুলিও বিশেষ মন্থন হইয়া থাকে।

এই বাশের “ছাস্মো” অর্থাৎ বাক্সবিশেষ অতীব লোথা বাশের কাজ।

মনোহর। ইহার বাহিরে নানা কোণ এবং ভিতরে বিবিধ কক্ষ গঠিত করিয়া অশেষ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করা হয়। “কুম” অর্থাৎ কলসির ত্রিকোণ বিশিষ্ট ঢাকনীও “লোথা বাশে” নির্মিত হইয়া থাকে।

যেতসও এই প্রদেশে অষ্টবিধ, যথা;—“মরিজা,” “চিকণ মরিজা,” “গল্লাক,” “কেয়েং,” “কর্কজ্যা,” “বাদরী,” “ছহুং” এবং “জ্যাং”। কিন্তু ঝড়ি, ঝাঁপী

প্রভৃতি বুনন কার্যে “গল্লাক,” “বাদরী” ও “মরিজা” বেতের কাজ।

—এই তিন রকমের বেত মাত্র ব্যবহারে আসে। বেতের কাজ তত অধিক নহে, পূর্কোক্ত ঝড়ি, ঝাঁপী ও ইহাদের মধ্যে বিরল প্রচলিত। তা’ছাড়া, ঝাড়া দি শস্ত মাণিবার আড়ি, সেরী, ছেলে দোলাইবার—দোলনা, এবং মৎস্য সংগ্রহের “তুলা” মাত্র সরচাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আড়ি, সেরী, “ফুলবারেং,” “গিঠাকালোয়াং” এর খুঁটিগুলি একমাত্র “গল্লাক” বেত দ্বারাই দেওয়া হইয়া থাকে।

\* [ ৩ ]

নৌকা প্রস্তুত করাও ইহারিগের জীবিকাসংস্থানের একতম উপায়। জুমের বগন ও বাছন কার্য শেষ হইয়া গেলে, সাধারণতঃ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই ইহার নৌকা কাটিতে যার; নদীস্রোত প্রবল থাকিতে থাকিতেই নামাইয়া লইয়া আসে। এই কার্যে পুরুষেরা অগ্রগ্রহ করিয়া সহধর্মিণীগণকে ছাড়িয়া যায়! তাহার “মইন বরে” থাকিয়া জুমক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে। বস্তুতঃ যৌথ-পরিবারেই নৌকা কাটিবার বেশ সুবিধা। তন্নিমিত্ত যে পরিবারে সামর্থ্যশালী একাধিক পুরুষ নাই, অজ্ঞাতকে তন্নিমিত্ত অংশীদার করিয়া লইতে হয়। কলকথা, একজনের দ্বারা নৌকাকাটা কোনরকমেই চলে না। ইহাদের প্রস্তুত নৌকা কেবল যে চট্টগ্রামে মাত্র পথার লাভ করিয়াছে এমন নহে, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি দুই দেশেও বিস্তর সংখ্যায় রপ্তানী হইয়া থাকে। বর্তমানে অত্রত্য অজ্ঞাত সার্কেলের তুলনার বোমাসার্কলেই নৌকা প্রস্তুত করিবার উপযোগী গাছ বেশী। চাক্ষুস সার্কেলের মাইরনিতে ও যথেষ্ট গাছ আছে, কিন্তু তৎসমস্ত এতদিন “রিজার্ভ” ছিল বলিয়া পাওয়া যায় নাই।

তেলহর, চাপালিস ও জাকরা গাছের নৌকাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। বিশেষতঃ

তেলহর ও চাপালিস কাঠ ওজনে পাতলা এবং বলে বেশীদিন স্থায়ী হয় । এই দুই নৌকার কাঠ।

কাঠের শালুতিরই প্রচলন অধিক । কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি ঘেষে প্রধানতঃ শালুতিই বহুদূরী হইয়া থাকে । বহিঃ চাপালিস তেলহরের সমান স্থায়ী নহে, কিন্তু প্রধানতঃ এই শ্রেণীর গাছ হইতেই আকারে বৃহত্তর নৌকা বা শালুতি পাওয়া যায় । আকল গাছ অত্যন্ত মৃদুত, তাহার নৌকাও বৃহদায়তনে প্রস্তুত হইতে পারে, এমন কি ৩০ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ দেখা যায় । কিন্তু এই গাছের নৌকা গুরুত্বের আধিক্য নিবন্ধন বেশী চলেনা । কস্তুরী, কামদেব, ও গামার নৌকানিৰ্ম্মাণের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছ । এতদ্ভিন্ন করই, তালি, শুটুশুট্যা, পিত্তাঙ্গ, গর্জন, বোলহর, কাকড়া, ভারী প্রভৃতি গাছের ও নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে । তবে ইহাদিগের নৌকাগঠনে একটি বিশেষ ক্রটি আছে । একটি গাছ খোদিয়া ইহার একখানি মাত্র নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে । তাহাতে যে কাঠ নষ্ট হয়, সেই পরিমিত কাঠে তক্তাচিরা নৌকার তিন-চারি খানি নির্মিত হইতে পারে । এইরূপ তক্তা চিরা নৌকা প্রস্তুত করিতে জানিলে, ইহাদের কাঠও প্রায় যথেষ্ট লাভ হইত । কিন্তু কাঠশিল্পের আরও উন্নতি না হইলে সে আশা কোথায় !

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাকালে ইহাদিগের “জগল” ভিন্ন সচরাচর ব্যবহার্য্য বিশেষ কোন জন্ত ছিল না ; একমাত্র “ভাগল” ধারাই ইহার ব্যবহার্য্য কর্তৃক নির্মিত হইত । অধুনা ইহাদের মধ্যে নৌকানি

নৌকা খোদাই

গঠনের নিমিত্ত কুরুল, “বাইন্” প্রভৃতি প্রচলিত

হইয়াছে । এই দুই জন্তের সাহায্যে প্রথমে গাছের মধ্যভাগ খোদিয়া লম্ব, অনন্তর “সামাতেইজ” (১) দ্বারা ছিদ্র করিয়া কোনও নির্দিষ্ট পরিমিত কাঠের একটি সরু কাঠি ঢুকাইয়া দেয়, এবং নৌকার অভ্যন্তরীণবেদ বাদ রাখিয়া বহির্ভাগ হইতে অবশিষ্টাংশ চাছিয়া ফেলে । অর্থাৎ যেন কোন ক্ষোদিত-বন্ধ কাঠখণ্ডের তলদেশে ছিদ্র করিয়া অষ্ট অঙ্গুলী পরিমিত একটি কাঠি ঢুকাইয়া দেওয়া হইল । নৌকার বেদ রাখা হইবে—চারি অঙ্গুলী মাত্র । তাহা হইলে উক্ত কাঠখণ্ডের বহিঃপ্রদেশ একরূপ চাঁদ্বিতে হইবে, যেন উক্ত কাঠির চারি অঙ্গুলী পরিমিত নৌকার পৃষ্ঠ-বহির্ভূত থাকে । পরে কাঠিটি খুলিয়া সেই ছিদ্র ভালরূপে জাঁটির দেওয়া হয় । অনেক “সামাতেইজ” এর পরিবর্তে “খোল বাটালীও” ব্যবহার করে ।

(১) একপ্রকার ‘বুক’ বিশেষ ।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

[ ১ ] পশুপালন ; ও [ ২ ] শিকার।



[ ১ ]

পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, আদিমজাতি মাত্রেই পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্ভাহ করিত। ইহা আৰ্য্য ঋষিদিগের অতি পবিত্র কার্য্যরূপে পরিগণিত ছিল। বিশেষতঃ গো-সেবা হিন্দুদিগের এক প্রধান কর্তব্য কর্ম্ম! তাহার গাভীকে ভগবতী জ্ঞানে ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। অতাপি পালনে পোষণ।

কোন কোন বাড়ীর কর্তা গো-গৃহের কাজকর্ম্মসমূহ নিজে দেখিয়া পরে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পরিবাদের আর সকলের জ্ঞায় গৃহপালিত পশুগুলি যেমন একদিকে আমাদিগের আশ্রিত ও পোষ্য, অপর দিকে তেমনি সর্ব্বথা বস্ত্রের পাত্র। আমরা মনুষ্য বলিয়া বাদৃশ সন্মানের আকাঙ্ক্ষা করি, এক্ষেত্রে তাহারই সম্যক্ পরীক্ষা প্রকাশ পায়। কিন্তু অত্রত্য পাহাড়ীগণ যে সকল পশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে, তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহারা তৎপ্রতি এত উদাসীন থাকে যে, অনেকে হরত বাড়ীতে করটি গরু বা করটি ছাগল আছে, তাহারও খবর রাখে না। গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি জললে চরিয়া বেড়ায়, গৃহস্থ তৎসমুদয় রক্ষাতৎপর থাকিবে ঘরে থাকুক, রাত্রিতে করটি ঘরে আসিল বা আসিল না, তাহাও একবার খুজিয়া দেখে না। অনেক গরু, মহিষ সপ্তাহের মধ্যেও দুই একবার ঘরে আসে না। গৃহস্থ কোনটিকে ২৩ মাস বাবৎ বাড়ী কিরিতে না দেখিলে বাধে বা অন্য কিছুতে মারিয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। অধিকাংশ গৃহস্থেরই এই হতভাগ্য পশুগুলি থাকিবার কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। উহাদের কোন কোনটি

মকের নিয়ে আশ্রয় লয়, অথবা অনাবৃত স্থানে চুপ্চাপিষিত গৌলে একত্রে দুই তিনটা আবদ্ধ হইয়া অদৃষ্ট কল ভোগ করে। বর্ষাকালে 'দৈগ্রা' বার, এসকলের হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবিয়া আছে।

গরু, ছাগল, মহিষ, শূকর, কুকুর প্রভৃতি চাক্‌মাধিগের সাধারণ গৃহপালিত পশু । গরাল (বস্ত্র গরু বিশেষ ; ইহাদের দ্বন্দ্ব অতিশয় গাঢ় ও সুমিষ্ট। জাল দিবার পূর্বে জল মিশাইয়া লইতে হয়, নতুবা তলানি জমিয়া পুড়িয়া যায়। জন্মাণ সম্রাট গো-জাতির উন্নতির নিমিত্ত ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে দুইটা সুপুট বুঝ লইয়া বাইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন। এখান হইতে আটটি গরাল প্রেরিত হয়। গুনিয়াছি, পথে মরিতে মরিতে জন্মানিতে দুইটি মাত্র পৌছিয়াছিল।) অতি অল্প

পরিবারেই আশ্রয় পায়। কাশ্চেন লুইন বলেন, 'গরু গরু, ছাগল ও মহিষ।

ও মহিষ ফেণীতীরবর্তী প্রদেশসমূহে অধিক পরিমাণে

লক্ষিত হয়। তত্রত্য অধিবাসিবর্গ বহু গোচারণ মাঠ হইতে পশুপালনের সাহায্য পাইয়া থাকে।' কিন্তু অনেক চাক্‌মা বাড়ীতেই গরু ও ছাগল পোষিত হয়; অবশ্য তাহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক হয় সন্দেহ নাই। মহিষের মূল্য অধিক বলিয়া সকলে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাদিগের পশুপালন দ্বন্দ্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত নহে; পালিত পশুর বংশবৃদ্ধিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। ইতিপূর্বেও লিখিত হইয়াছে যে, ইহাদের ঘরে অপচ্যাপ্ত দ্বন্দ্ব থাকিতেও অনেকে খাইতে চাহে না। দ্বন্দ্ব বিক্রয় করিতেও সচরাচর দেখা যায় না; তবে সাধারণ গৃহস্থেরা দ্বন্দ্ব করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু বাজারের সুবিধা না থাকিলে তাহাও হইবার উপায় নাই। সম্পন্ন পরিবারের গরুর জন্ত "উরা" থাকে; ইহার অল্প নাম "গোহাল শাল" অর্থাৎ গোহাল। প্রত্যেকে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের অধিকার পাইলেও সেই "উরা" বাসী গরুগুলিকে অপরের তুলনায় সমধিক সৌভাগ্যশালী মনে করা যায়। কিন্তু মতিষকে গৃহে বাঁধিবার কোন পরিবারেই নিয়ম নাই। অধিকাংশ গৃহস্থই উহাদিগকে ভাবি সর্বপক্ষেই বাঁধিবার জন্ত ব্যবস্থা করে। মহিষের বিষ্ঠা সরিষার প্রধান সার।

শূকর—প্রায় সকল বাড়ীতেই আছে। ইহা দুই জাতীয়—সাদা ও কাল। তন্মধ্যে কাল শূকরই সচরাচর অধিক। বতদিন ক্ষেতে কচু থাকে, ততদিন বাবৎ মোটা মোটা গাছের বেটনে "গোরা" করিয়া, তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়; অল্প সময়ে ছাড়িয়া দেয়। কেমনা কচুর প্রতি শূকরের বড়ই লোভ; সুবিধা পাইলেই ক্ষেত্রে গিয়া সমূদ্রে খায় ও নষ্ট করে। আরও একটা কথা, শূকর ও

মোরগ ইহাদিগের বাড়ীকে অপরিষ্কৃত হইতে দেয় না; নিজেরা বাহ্য কিছু হুগু করিয়া যায়।

কুকুর—পাহাড়ী মাড়েরই প্রধান সহচর। তাহাদের ধন সম্পত্তি এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ইহাচারার রক্ষিত হয়। ইহার ভুরসাতেই পাহাড়ীগণ এই ব্যাঘ্রভক্ষকাদি ভীষণ ঋণশপরিবৃত জঙ্গলে বাস করিতে সাহস পায়। এমনও দেখা গিয়াছে, কোন কোন গৃহস্থ কুকুরের উপর গো-চরণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সারমের প্রভু গো-পালের মধ্যস্থলে বসিয়া তত্ত্ববধান করিতে থাকে; কুৎসিপাসার কাতর হইলেও পালের কাছছাড়া হয় না। যদি কোন বিপদ দেখিতে পায়, পূর্বেই বিকৃত চীৎকার দ্বারা গুরুগুলিকে সাবধান করিয়া দেয়; তাহাদের পলায়ন অসম্ভব হুঝিলে প্রাণান্তগণে পাল রক্ষার নিমিত্ত বিপদের সম্মুখীন হয়।

হরিণ—কোন কোন বাড়ীতে মাত্র কচিং পোষিতে দেখা যায়। কিন্তু সচরাচর পোষা হরিণ বড় হইলে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া থাকে। “ধনপাতা (একটি ছরা)র মুখ”-বালী ‘কান্তার বাপ’ আখ্যায় প্রসিদ্ধ জনৈক চাক্‌মা একটি হরিণী পোষিয়া ছিল। সেইটি এত পোষ মানিয়াছে যে, জঙ্গল হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় তাহার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। বনের হরিণের সঙ্গে মিশিয়া গর্তও হয়, তদ্বারা সে এবাবৎ তিনটা শাবক পাইয়াছে। তা’ছাড়া কোন কোন কামোদ্ভূত হরিণ এই পোষিতা হরিণীর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তাহাদের বাড়ী পর্যন্ত আসিয়া পড়ে। তাহাতেও সে ইতিমধ্যে দুইটি মারিয়া খাইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে একদিকে যেমন একপ্রকার চাব চলিতেছে, অপরদিকে ফাঁদও মন্দ নহে।

এই সঙ্গে চাক্‌মাদিগের প্রতিপালিত পক্ষিগুলির বিবরণ সংক্ষেপরূপে হইলেও রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি, বোধ হয় তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মোরগ ছোট বড় প্রায় সকল বাড়ীতেই আছে। মধুরাও কেহ কেহ পোষে বটে, কিন্তু বাঁচাইয়া রাখা অতিশয় কষ্টসাধ্য। হাঁসও খুব কম। এতদ্ভিন্ন সখের লাঙ্গলার পোষিত তোতা, ময়না, ধূনে প্রভৃতি পক্ষীও কোন কোন বাড়ীর গৃহ-প্রাঙ্গণে শোভা পাইয়া থাকে।

[ ২০ ]

অন্তঃপর শিকারের কথা। ইহা গণনার অতীত কাল হইতে আর্য ও অনার্য সকলেরই নিত্য কার্যের এক প্রধান অঙ্গরূপে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ

শিকারনীতি।

পৃথিবীতে সভ্য হইয়া যাঁহাদের গৌরব আছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এ মন্ত্রে দীক্ষিত। “একত কলিকা দ্রীতি

অন্তঃপ্রাণবিশুদ্ধ্যেত—এ যেমন সত্যতার নীতি, মনে করিলেও লক্ষ্য বোধ হয় । মধ্যযুগে যখন বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্মদ্বন্দ্বিতি বাজিয়া উঠিয়াছিল, “অহিংসা পরমো ধর্মঃ” মন্ত্রের গভীর নির্ঘোষে প্রাচ্য বক্ষ বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন এতদেশে শাস্তির এক বিমল প্রবাহ দেখা দিয়াছিল ; কিন্তু তাহা আর রহিল কই ? আবার সেই কুখিরপিপাসা বাজিয়া উঠিয়াছে ! শৃষ্টির প্রকৃষ্ট জীব মানব সম্প্রদায় তুচ্ছ শক্তিপ্রকাশ-ব্যপক্শে—অকিঞ্চিৎকর বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শোণিতধারার পৃথিবীকে বোর কলুবিত করিতেছে ।

পূর্বকালে পশুপক্ষিপণ মাত্র শিকারীদিগের লক্ষ্য ছিল । অধুনা সত্যতার উন্নতিতে মনুষ্যনামধারী কতিপয় দুর্বল নিরীহ জীবও ক্ষমতাদৃশ্য মহাপুরুষগণের ব্যসনপিপাসা তৃপ্ত করিতে হতভাগ্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে । সুতরাং এহেন সত্যতার যুগে (বুদ্ধ-

বিধাসী হইলেও ) চাকমাগণ যে, বস্ত্র অস্ত্র হইতে প্রাণ ও ক্ষেত্রের শস্তাদি নক্ষত্র নিমিত্ত শিকারে পরাস্থ হইবে না, তাহাতে বিচিত্র কি ? এজন্ত বাল্যকাল হইতেই ইহার শিকারে অভ্যস্ত হইয়া থাকে । ইতিপূর্বে কুমার বাহাদুরের শিকারনৈপুণ্যের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে । পুরাকালে পক্ষীশিকারে “কামঠা-গুলি” এবং পশুশিকারে ‘তীরধনু’ ব্যবহৃত হইত । পূর্বে একস্থলে বলিয়াছি, কয়েকটি বালক “কামঠা-গুলি”র সাহায্যেই-কুকিদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল । কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রচলন অতীব বিরল ; বন্দুকের আঘাতানীহ ইহার কারণ হইবে । তাহা ছাড়া “কাবুক” নামে ইহাদের অস্ত্রতম এক অস্ত্র ছিল, তদ্বারা ব্যাজাদি শিকার চলিত । ইহা সূচ্যগ্র বংশধরমাত্র । মাধার বিবাক্ত জব্য মাধির বর্ধাই পুস্তর চলাচলপথে স্থাপনপূর্বক তাহার সহিত একখণ্ড অবনমিত বাধারীর বোগ করিয়া দেওয়া হইত । তাহা কোনরূপে নাড়া পড়িলে উক্ত “কাবুক” বিদ্রাঘেগে আসিয়া আঘাতকারীকে নিহত করে এবং অচিরে প্রাণবিরোগ ঘটায় । ইহাতে সময়ে সময়ে অনভিজ্ঞ পক্ষিকেরও জীবন নাশ হইত । তাই সজদর ইংরাজ গভর্নমেন্ট বর্তমানে এই “কাবুক” স্থাপনের ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে মাত্র ফুঁরিয়া শূকর বধ করিবার নিমিত্তই “কাবুক” ব্যবহৃত হয় । সে বাহা হউক, অধুনা একমাত্র বন্দুকের সাহায্যেই শিকার চলে । পূর্বে এদেশে “লাইসেন্স” (License) ছিল না, কিন্তু ১৯০৩ ইংরাজিতে তাহাও প্রচলিত হইয়াছে ; তদ্ব্যতীত ইহাদিগকে বন্দুক প্রেতি বার্ষিক চারি আনা করিয়া কর দিতে হয় ।



শিকারের সময় ইহাদের বিশেষ সজ্জা “কর্জাল” অর্থাৎ বলিবিশেষ মাত্র।  
তন্মধ্যে ছড়া, বাকুদ, কেশ প্রভৃতি এমন কি ক্লাস্তি অপনোদক পান-তামাকেরও  
সজ্জা ও সঙ্গী।

যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণ করিয়া স্বজ্ঞোপরি বুলাইয়া  
লয়। সুতরাং তাহাতে শিকারীদিগের কোন অসুবিধা  
থাকে না। সঙ্গে থাকে প্রভুভক্ত সারমেয়। সে অধিকাংশ সময় সারথির কাজ  
করে, আগে আগে দৌড়িয়া সন্মুখীন অবস্থা পরিদর্শন করিয়া লয়। যদি কোন  
শিকারের সম্ভান পায়, নীরবে প্রভুলকাশে আসিয়া সঙ্কেত দেয়; অথবা বিপদের  
সম্ভাবনা দেখিলে বিকট চীৎকারে প্রভুকে সাবধান করিয়া রক্ষা করিতে ধাইয়া  
আসে। এতাদৃশ বিবস্ত্র শরীররক্ষক সঙ্গে থাকিলে শিকারীর আর ভয় কি।

কোন কোন জাতির নিয়ম আছে, শিকারলব্ধ পশু বা পক্ষী প্রাণবিরোধের  
পূর্বে গলদেশ ছেদন করিয়া লয়। ইহাকেই বলা যায়, “মরার উপর খাঁড়ার বা”।

শিকারের মাংস। কিন্তু চাক্‌মাদিগের তাহা নাই। বরং কেহ কেহ সেই

শিকারাহত মুমূর্ষুজীবের ব্যাকুল কাতরতার মুখে  
জল দান করে; তাহা অবশ্য মনের ভাল, সন্দেহ নাই। আবার ইহাও বিরল  
নহে যে, অনেকে তাদৃশ ছট্‌কটানিতে আমোর উপভোগ করে। সাধারণ  
রায়তেরা যে সকল পশু শিকার করে, রাজসরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হেড্  
ম্যানগণ সেই সব শিকারলব্ধ পশুর অংশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে একখানা  
করিয়া “রাণ” অর্থাৎ সমূল পদ দিতে হয়। হেড্‌ম্যানের বাড়ী দূরে হইলে  
তাহা গুকাইয়া রাখে; অতঃপর তাহাদের সত্ত্বরতম অবকাশে দিয়া আসে। এতদ্বিন্ন  
বড় পশু শিকারে তন্মাস “লুটে” অর্থাৎ আদমের প্রত্যেক স্বতন্ত্র পরিবারে বিভাগ  
করিয়া দেওয়া হয়। খাজানা দিবার সময় যে সকল পরিবার স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট  
হয়, এখানেও তাহার স্বতন্ত্র মাংসাংশ পাইয়া থাকে। এইত গেল পশুপক্ষী  
শিকারের বিবরণ, মৎস্যশিকারেও ইহারা বাঙ্গালীদিগের জাল, “চাই”, বড়শী  
প্রভৃতি ধরিয়াছে।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

## অপরাপর সাধারণ ব্যবসায় ।

সংসারে মানবের উপজীব্য নানাবিধ । অসংখ্য উপায়ে নির্ভর করিয়া পৃথিবীর লোক চলিতেছে । এমন কোনও সাধারণ পথ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই, বাহাতে সকলেই সেই পথে গিয়া উপজীব্য ।

সফল মনোরথ হইতে পারে । সুতরাং এসকলের মধ্যে কোন্ পন্থা যে এককৃষ্টতর তদবধারণও এক বিরাট সমস্যা । অধুনা অর্থকরী ব্যবসায় সমাজের সর্বত্র সম্মানিত । বাহাতে অর্থের অনটন পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক লোকই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে । তবে কি অর্থই সংসারের সারসর্বস্ব ? অর্থ ভিন্ন পৃথিবীতে সাধনার বিষয় আর কিছুই কি নাই ? তাহাইবা কিরূপে বলিতে পারি ? যখন ধর্মের ক্রিয়াগুলি অর্থের পৃষ্ঠোপরি পশাৎ রেখা আঁকিত করিয়া যায়, তদন্তরের মধ্যে তুলনা করিতেও ভরসা হয় না । ধর্মের উপর অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে যেমন সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, ধর্মহীন অর্থ তদপেক্ষা শত-সহস্রগুণে নিকৃষ্ট ও দুঃশীল । অতএব উপজীবিকার প্রধান লক্ষ্য এক্ষণ হওয়া উচিত, বাহাতে ধর্ম ও অর্থের সাধনা অব্যাহত থাকিতে পার ।

জীব মাত্রেই স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্ত । বনের পাখিটীও সুবর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া রাজ্যোপকরণ উপভোগেও অস্বচ্ছন্দ মনে করে । সুতরাং সত্যতাবৃণ্ড মানবসমাজ স্বাধীন ব্যবসায় ভাল বাসিবে, তাহাতে আর

বিস্তি । বৈচিত্র্য কি ? এই আত্ম-মর্যাদাজানটুকু সকলেরই থাকা অবশ্য কাঙ্ক্ষনীয় । “একান্ত বশবৎ ভৃত্য” জীবন কত যে দুর্কর্মবহ, তুচ্ছভোগী ভিন্ন তাহা অপরে অনুভব করিতে পারে না ; দূর হইতে পরিহার বাহুগিরি

উজ্জল দীপ্তিতে দিশাহারা হইয়া পতঙ্গ প্রায় আত্মসমর্পণ করে, আর তখন হইতে “চোখ বাধা বলকের মত, খেটে মরে অবিরত।” হার। এহেন স্থলের চাকরী লইয়া আবার তুমুল প্রতিযোগিতা! বস্তুতঃ চাকরিতে বিবেক শক্তিকে বলিদান করিতে হয়, নতুবা পদদক্ষা ছুইয়া হইয়া উঠে। তাই নীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, “সেবা ঋতুভিরাখাতা তন্মাত্রাং পরিবর্জয়েৎ।” আর হতভাগ্য বাঙ্গালী সেই চাকরী-পীড়িত ক্লীণকণ্ঠে বলিয়া থাকে,—“চাকরী শু-খোরী না করি কি করি?” সম্প্রতিমাত্র স্বাধীনতাব্রট চাকমা সমাজ এই আত্মদমনানুজ্ঞিত চাকরিকে অন্তরেক সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহার অনাহারে মরিলেও অন্তরে চাকরী করিতে চাহে না। কাপ্তেন লুইন বলিয়া গিয়াছেন (১),—“১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই পার্বত্য প্রদেশে একটি রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু চাকমাদিগকে অধিক বেতন দিতে বলাতেও তাহার মুজুরি স্বীকার করে নাই। অবশেষে গভর্ণমেন্টকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চট্টগ্রাম হইতে কুলি আনিতে হইয়াছিল।” সে পুরাণো কথা কেন, বিগত ভীষণ ছর্ভিককালে এখন ইহাদের অধিকাংশ অদৃষ্টের দারুণ নিযাতন ভোগ করিতে-ছিল, খ্রী পুত্রের অনাতার-কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্ভিক্ষ জীবন ভার কমাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও ইহাদিগের অনেকে মুজুরি খাটিতে স্বীকার করে নাই। পোড়া উন্নয়-জালায় সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে, এমন কাহাকে যদি কোন সামান্য কাজ করিতেও বলা হইত, অমনি সে অভিমানিত হইয়া কিরিয়া যাইতে চাহিত। অধিক কি, একবার স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহোদয় এই অনশনক্লিষ্ট সাহায্যপ্রার্থিগণকে অগ্রিম টাকা নিয়া দৈনিক টাকা টাকা মুজুরিতে একখানি রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন; ইহার তাহাতে সাহায্য প্রার্থনাও ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। বাহাউক, এবারে শতকরা ৮১০ জন লোকের মতি কিরিয়াছে, দেখা গেল। তাহার উপবাস কষ্ট আর সহিতে না পারিয়া প্রেত্তরোংপাটন, জঙ্গলকাটা, মোট বহন প্রভৃতি নানা কাজ করিয়াছে।

ইহাদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, ‘মাসোভ্যন্তরস্থ কণ্টক প্রায় আত্মীরের দাঁত সহ্য অসহনীয়’—কথাটা অল্প বর্ণে বর্ণে সত্য। চাকরী ও গোলাঘরী কাষ্যতঃ এক হইলেও দায়িত্বে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। দম্বোদরকে কোনরূপে প্রমোদ

দিতে পারিলে চাকরির গল্পনা হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু দাসত্ব বন্ধ হইতে রক্ষা পাওয়া পূর্বে একরূপ অসম্ভব ছিল দাসত্ব ।

সম্রাট ইংরাজ গভর্ণমেন্টের ইহা এক মহীয়সী কীর্তি,—যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অধীনতার কঠোর নিগড়মুক্ত হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছে । সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায়, এই পার্শ্বতা প্রদেশ হইতেও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখের সেই বিধিতে তিন শতাধিক অধমণ দাস উদ্ধার পাইয়াছিল । ইহাতে চাকমাদাসও যে ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই । এই প্রথা যদিও সমাজের চক্ষে নিতান্ত দূষিত জ্ঞান হইত, তথাপি অভাবের তাড়নায় এবং চট্টগ্রাম বাসীদিগের অমুদয় ইহারাও যে দাসত্ব অবলম্বন করে নাই, এমন নহে । চট্টগ্রামের শাসন কর্তা মিঃ ডব্লিউন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মাননীয় গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংশের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়,—তখন চট্টগ্রামে দাসত্ব প্রভাব বিলক্ষণ প্রবল ছিল । পিতৃমাতৃহীন এবং অপর সম্পর্কশূন্য নিয়ন্ত্রণের শোকেয়া অভাবে পড়িয়া আত্মবিক্রয়ে দাসত্ব গ্রহণ করিত । প্রভুদের আবার বিক্রয় ক্ষমতাও ছিল, ক্রেতা প্রভুদের সম্পূর্ণ অধিকার পাইতেন । পক্ষান্তরে দাসপত্নী প্রভুপত্নীর চিরন্তন সহচারিণী হইত । এইরূপে পুরুষানুক্রমে এবং বিধি অধিকার ও অধীনতা অব্যাহত থাকিত । বলিতে কি, অত্যাধি ইহার আভাব পরিদৃষ্ট হয় । আইন শাসনে যদিও দাস বিক্রয় রহিত, কিন্তু আত্মবিক্রয় এবং ভূমির কয় মুক্তিতে দাসপণা বিরল নহে । (১) চট্টগ্রামের তাদৃশী ব্যবস্থা ইহাদিগের উপরও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল । তবে এই দাসত্ব প্রথায় কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ স্থলে ঋণের দারে দাসত্ব গ্রহণ করিতে দেখা যায় । নিকৃপার অধমণ উত্তরণের নিকট আত্মসমর্পণ করে ; নির্দিষ্ট বেতন হইতে অল্প বাদ গিয়া ক্রমে মূলধন পরিশোধ হইতে থাকে । কেহ কেহ বা সম্ভান কি পরিবারের অপর কাহাকেও উত্তরণের গৃহে রাখে ; বলা বাহুল্য, ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলে ইহাদের দাসত্বদ্বার মুচিয়া যায় । বেতনভোগী চাকর অপেক্ষা ইহাদের উপর কাজকর্মের দায়িত্ব ভার কম থাকে এবং ইহারাও পরিবারস্থ লোকের দ্বার ব্যবহৃত হয় ; কোনরূপ কঠোর শাসন

(১) আইনের দ্বিত্তি দেখা যায়, পুলগান দাতারহ স্বর্ণগত হরপোশিন রাহাই চট্টগ্রামের বর্তমান "চাকরাণ" ব্যবস্থার কারণ । গোলাঙ্গেরা মুক্তিকামনার যে অভিযোগ করে, তিনি ওয়িলকে যোরকর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ।

পরিলক্ষিত হয় না। জাতীয় বিচারের অর্থদণ্ড শোধে অসমর্থ ব্যক্তিও বিচারকের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা ক্রমে পরিশোধ করিয়া দিয়া থাকে।

কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার চাকরিই আমাদের অনন্তগতি। তাই চাকমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও প্রায় বাঙ্গালীদিগেরই মত সেই পুরুষপরম্পরাগত চাকরী-

কর্মচারী।

লোলুপ হইয়াছেন। তবে কিনা তাঁহারা এভাবে রাজকর্ম ছাড়া অপর কোন সাধারণ কার্য গ্রহণ করেন নাই। মাননীয় গভর্নমেন্টও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আনুকূল্য দেখাইয়া আসিতেছেন। তাহারই ফলে—বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান উভয়েই সবডেপুটি কলেক্টরের এবং জামাতা বাবু অবিনাশ-চন্দ্র দেওয়ান স্কুল সব ইন্স্পেক্টরের পদ লাভ করিয়াছেন। এতদ্বিন্ন বাবু ত্রিজগৎ দেওয়ান স্থানীয় ট্রেজারীর খাজাঞ্চী, বাবু শশীকুমার দেওয়ান, বাবু শরচ্চন্দ্র দেওয়ান ও বাবু ভগবানচন্দ্র দেওয়ান পুলিশ সব ইন্স্পেক্টর; শ্রীমান মদনমোহন দেওয়ান—হস্পিটাল এসিঃ, শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার সুপাঃ অফিসের অগ্রতম কেরানী, বাবু লালমণি চাকমা ভেল্লিনেসন সব ইন্স্পেক্টর, শ্রীমান রাজচন্দ্র চাকমা শ্রীমান শত্ৰুঘ্ন চাকমা রাইটার কন্স্টেবলে কার্যে আছেন। শুনিতেছি, স্থানীয় বর্তমান সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয় ইহাদিগকে আরও অধিকতর পরিমাণে রাজকর্মে প্রবেশাধিকার দিতে চেষ্টা করিতেছেন। অত্য়দিকে রাজবাহাদুরের আকিসেও বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান ইংলিস ক্লার্কের কার্যে আছেন।

সমগ্র চাকমা সমাজের তুলনার এইরূপ চাকুরের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমের মাত্র। তাই বলিয়া আর আর সকলে কেবল আত্মাভিমানের মদগর্বে বসিয়া নাই। স্বাধীনতাস্পৃহা আত্মনির্ভরতাকে উত্তেজিত করে, নতুবা উন্নয়ন নামক বৃহৎ গহ্বরটির পুষ্টি চলিবে কিরূপে? পরন্তু জীবন যাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত জীপুরুষ প্রায় সমভাবে চেষ্টা করে; উভয়েই উভয়ের সহচর ও সাহায্যকারী। নিতান্ত অসমর্থ ভিন্ন কেহই অপরের গলগ্রহ হইতে চাহে না। বিশেষতঃ জীলোকেরা বাহিরের-ক্রাজে পুরুষদের সমান পরিশ্রম করিয়াও সাংসারিক বাবতীর কর্ম অনন্ত-অপেক্ষায় সম্পাদন করিয়া থাকে। তত্হুপি পতিদেবা, সন্তান পালন, অতিথি সংকার ইত্যাদি আরও কত আছে! চাকমামহিলার এই অপূর্ণ মহত্ব বার বার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, আরও শত—সহস্র বার বলিয়া গেলেও যেন বলা ফুরাইবে না। বাস্তবিক ইহা অপর সাধারণের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং বিশেষ প্রশংসান যোগ্য।

বিগত ( ১৯০১ সালের ) আদমশুমারিতে দেখা যায়, ইহাদিগের ১৪৮৭৩ জন পুরুষ এবং ১২৮৮১ জন স্ত্রীলোক নিম্নলিখিতরূপে খাটিয়া জীবিকানির্ভার করিতেছে ।

তন্মধ্যে ১৪৭৭২ জন পুরুষ ও ১২৭৮৯ জন স্ত্রীলোক

কৃষিকার্য্যে, ৮ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রীলোক শিকারান কার্য্যে এবং ২৬ জন পুরুষ শাসনস্বকীয় কর্মে লিপ্ত ; অবশিষ্ট ৯০ জন পুরুষ ও ৬৭ জন স্ত্রীলোক ছোট বড় নানা কাজ লইয়া আছে । সুতরাং সমুদয় জাতির মধ্যে আর ২১৯৬৪ জন বালবৃদ্ধবনিতা মাত্র সম্প্রতি অকর্ম্মণ্য ।

বস্তুতঃ শাসন, কৃষি, শিল্প, বজন, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিকার, চাকরী, পশু-পালন ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ই চাক্‌মাদিগের সাধারণ উপজীব্য । তবে ইহাদের সমাজে

উপরোক্ত ব্যবসায়গুলির মধ্যে বথাসমিহিত পরবর্ত্তী হইতে ক্রমে পূর্ববর্ত্তীগুলি অধিকতর সম্মানজনক । পূর্বেই জ্ঞাত হইয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়গত শ্রমবিভাগ নাই । সুতরাং বাহার যে কর্মে অভিকৃতি এবং দক্ষতা আছে, কিকিৎ চেষ্টা করিলে তাহা সে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে । কেবল শাসন-স্বকীয় কার্য্যের নির্ব্বাচনভার মাত্র অধুনা গভর্ণমেন্টের হস্তে রাখিয়াছেন, তাহাও আবার উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে । গ্রামবাসী যাহাকে উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রাভিমতও তদনুকূল হইলে গভর্ণমেন্ট তাহাকেই তৎপদ প্রদান করেন । বজন, চিকিৎসা এবং চাকরীও কথকিৎ পরিমাণে সেরূপ উপযুক্ততা-সাপেক্ষ ; অপর দিকে কৃষি, শিল্প, শিকার, পশুপালন প্রায় সকল পরিবারেই আছে । কেবল বানিজ্যে মাত্র ইহাদিগের আসক্তি আশাশূন্য নহে । হায় ! যে উপায়ে বিদেশীয়গণ আসিয়া তাহাদের বথাসমিহিত সূচন করিয়া লইয়া বাইতেছে, সপরিবারে অহিনিশি অবিশ্রান্ত খাটিয়াও বাহার করাল আক্রমণে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইতেছে, তৎপ্রতি সসুচিত দৃষ্টি-নিষ্কপে অত্মপি তাহারা উদাসীন !

এই পার্কৃত্য চট্টগ্রাম হইতে বৎসর একমাত্র চাক্‌মাদিগেরই শ্রমলব্ধ প্রায় পাঁচলক্ষ টাকার কার্পাস, তিল, অরণ্যজাত কাঠ, নোকা, বেত, হুন ও আলানী কাঠ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে । কিন্তু বলিতে কি,

বাণিজ্য ।

বিদেশীয় মহাজনেরা দানম খাটিয়া তাহা হইতেও প্রায় তৃতীয়াংশ আত্মসাৎ করে । তাহা ছাড়া এ সকল দ্রব্য চন্দ্রমোনি অর্থাৎ পার্কৃত্য চট্টগ্রামের সীমা ছাড়াইলেই প্রায় বেদভ্রম সূচ্য ধারণ করে, চট্টগ্রাম

পৌছিতে পৌছিতে আরও বেশী হয়। পরন্তু এই লভ্যাংশের সিকি পরস্যাটও ইহাদিগের ভাগ্যে ঘটে না ;—সমস্তই বিদেশীয়দিগের সিক্ককাজ হইয়াছে। কিছুকাল হইতে কুমার রমণীমোহন কার্পাস ও তিলের ব্যবসায় খুলিয়াছেন কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানাত্মক ভেদন সুবিধা হইতেছে না। সবডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দেওয়ান ও রাইখ্যাং বাজারে একখানি দোকান খুলিয়াছিলেন ; সুবিধামুদ্রক চালাইতে না পারায়, তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এতদ্বির আরও হু'চারিজন বেপারী দেখা যায় বটে, কিন্তু এই বিরাটজাতির পক্ষে এতৎসমুদয়কে নিতান্ত অগণ্য বলিলেও চলে। বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যের প্রতি আরও হু'একজনের আন্তরিক অনুরাগ দেখা যায়। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে তাঁহারা কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। যদি ধনশালী মহোদয়গণ তাঁহাদিগকে সামান্ত অংশমাত্র দিয়া হইলেও ব্যবসারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা ঘটতে পারে।

সচরাচর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকরী ইত্যাদিতে একটি সাধারণ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এ সমুদয় সবক্ষে বাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তের ব্যাপক-আলোচনা স্বরূপে বলা যাইতে পারে, জুম নিতান্ত দরিদ্রশ্রেণীরই অবলম্ব্য। সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়—মোটকথা উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে

সকলেই লাভের চাব আরম্ভ করিয়া দেয়। সাধা-  
ব্যবসারে সাধারণ সূত্র।

রণতঃ এই দল হইতেই অধিক পরিমাণে লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং চাকরীওয়ালার সংখ্যাও এই দলে অধিক। আর গরীব জমিদারগণ অভাবে পড়িয়া নানা প্রকার বেতের কাজ, নোকাগঠন প্রভৃতি দ্বারা এক বনজাত উৎকৃষ্ট কাঠ, আলানী কাঠ ও ছন ইত্যাদি কাটিয়া জীবিকা-নির্কীর্ষে বাধ্য হয়। এই সমস্ত এবং জুমোৎপন্ন অপরাপর দ্রব্যনিচয় তাহারা নিকটবর্তী বাজারে নিয়া বিক্রয় করে। ইহাই তাহাদিগের একমাত্র অন্তর্বর্ণিজ্য। সুতরাং জমিদারদিগের দ্বারাই শিল্প ও বাণিজ্যকার্য্য প্রধানতঃ চলিয়া থাকে। তাহা না হইয়াও উপায় নাই; যখন নোকাগঠনাদির সময় আসে, তখন চাষাদিগের অবকাশ হাজির থাকে না। কিন্তু বস্ত্রবরনের তার উত্তর সম্প্রদায়ের জীসমাজের উপরই ভর্তুকাধিরাছে। পশুপালন চাষাদিগেরই অন্তর্ভুক্ত কর্তব্যকর্ণের অন্তর্গত। সাধারণ—মোরগ, শূকর ইত্যাদি ভিন্ন চিরশরিবর্তনশীল জমিদারদিগের অপর পশুপালন পোষার না। তবে শিকারে চাষাগণ হইতে জমিদারদিগের অধিক প্রয়োজন হয় বটে। এতদ্বির যখন কাজও শেবোক্তরলের অধিকারে স্তম্ভিক।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] শিক্ষা (—দ্রীশিক্ষা) ;

এবং

[ ২ ] ভাষা—বর্ণাবলী—অপর্যাপ্ত ভাষার সহিত  
সাদৃশ্য বিশ্লেষণ ।



[ ১ ]

অবশ্যই ইহা স্বীকার্য যে, শিক্ষার চাক্ষুশ্যে অসুখি বহু পক্ষাৎপন্ন  
রহিয়াছে। সরকারী কাগজপত্রে (১) পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় অর্ধেক  
অধিবাসীমধ্যে ২১৫৬ জন পুরুষ এবং ৪৪ জন স্ত্রীলোক মাত্র শিক্ষিত।

৭৮৮ জন পুরুষ ও ২৪ জন স্ত্রীলোক বাল্য, আর ৫৫  
শিক্ষার পরিমাণ।

জন পুরুষ মাত্র ইংরাজী জানে। অবশিষ্ট পুরুষ ও  
স্ত্রীলোকেরা চাক্ষুশ্যে লিখিতে পড়িতে পারে। পক্ষান্তরে বাল্যশিক্ষা-  
শিক্ষিতদিগের মধ্যে ২২০ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোক চাক্ষুশ্যে লেখাপড়াতেও  
পরিণত, এবং ১২ জন পুরুষের মধ্যভাষাতে অভিজ্ঞতা আছে। এক কথায় শত-  
করা ৪১০ জন মাত্র কোনরূপে শিক্ষিত সংজ্ঞালভের যোগ্য। এখনও অনেকই  
লেখাপড়ার উপযোগিতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; তাই ইহাদের  
সমাজে জ্ঞান-জ্যোতিঃ এতই ক্ষীণ! সাধারণ সকলে স্থূল দৃষ্টিতে আলোচনা করে,  
লেখাপড়া শিখিলে বিলাসিতা আসে, সাংসারিক কাজকর্মে অভিজ্ঞতা জন্মে না,  
বিশেষতঃ তদ্বারা অর্থোপার্জনের বাহা কিছু উপায়—তাহাও অতি স্বর্গাহ। একেত  
চাকরী—তাও আবার বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া (২)! ফলে বর্তমানে বাহ্যিকের মন

(১) Census Report—1901 &c.

(২) রামকমলবাবু একবার জনৈক চাক্ষুশ্যকে বিজ্ঞার উপযোগিতা বুঝাইতে গিয়া বিশেষ  
সম্রক্ত হইয়াছিলেন। সে বলিয়াছিল, ‘মাস্টার, তুমিও ত লেখাপড়া শিখিয়াছ, তার ফলে  
তুমিই হাড্ডি এই বিদেশে বিদেশে ঘুরিতেছ। আমার হলে লেখাপড়া শিখিলে তাহার



শিক্ষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরও অনেকে পাঠশালার শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে।

অতিশয় কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, সঙ্কল্প ইংরাজগভর্নমেন্টে এপ্রমোশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া অবধি এই পার্শ্বত্যা জাতিসমূহের শিক্ষার নিমিত্ত বিস্তর অর্থগ্রহ দেখাইতেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত সরকারী

রাজস্ব হইতেই একখানি মধ্য ইংরাজী স্কুল, চারিখানি  
সুবিধা।

উচ্চ প্রাথমিক এবং ৭৭ খানি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১) সাহায্য প্রদত্ত হয়, তজ্জন্ত গভর্নমেন্টের বার্ষিক প্রায় সাড়েবার হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এ সময়ের কোন স্কুল হইতেই ছাত্রবেতন লওয়া হয় না, ফলতঃ গভর্নমেন্টের অতীত্পিত অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের সঙ্কল্প এদেশেই বহুকাল হইতে কার্য্যকরী হইতেছে। এতদ্বিধা খাল গভর্নমেন্টেরই সম্যক পরিচালনাধীনে রাঙামাটিতে এক উচ্চ ইংরাজী স্কুল (২) চলিতেছে, তাহাতে

অবস্থাও ত এইরূপ হইবে? হায়—লেখাপড়ার এই ত পরিণতি! বক্ততঃ আমাদের বর্তমান শিক্ষার পরিণাম যে চাকুরি—তাহাতে জীবনধারণ ভারস্বরূপ নহে কি?

(১) এই জেলার মোট আইয়ারী স্কুল সংখ্যা বালকের—২০, এবং বালিকার—২; তা'ছাড়া ২৬ খানি ক্যান্টনমেন্ট এবং ৪ খানি মজবুত আছে। এই শিক্ষা বিতরণের মূলে পার্শ্বত্যা-চটগ্রামের ভূতপূর্ব সিভিলসার্জন ও শিক্ষাবিভাগের অবৈতনিক সেক্রেটারী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ সাহা এবং অত্যা স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব ডেপুটি ইন্সপেক্টর পরলোকগত গগনচন্দ্র বড়ুয়া—মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টা সাতিশয় প্রশংসাহ'। সম্প্রতি প্রিয়হৃদয় শ্রীযুক্ত অমিনাচন্দ্র দেওয়ান সবইন্সপেক্টরের কার্য্যে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা বিস্তারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন, আশা করা যায়—তাহাদ্বারা দেশের অধিকতর উন্নতি হইবে।

(২) এই স্কুল প্রথমতঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রবোনার স্থাপিত হয়। তখন ইহার "চন্দ্রবোনা বোর্ডিংস্কুল"—আখ্যা ছিল। ইহাতে দুইজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন, ছাত্রগণও মাত্র দুই জেলীতে বিভক্ত ছিল। অনন্তর সমগ্র স্কুল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া একজাগের জেলীগুলির নাম হইল "বার্মিজ ক্লাস", অপর ভাগের জেলীগুলির নাম হইল "চাক্ষুশ ক্লাস"। বার্মিজ ক্লাসে—বার্মিজ, ইংরাজী ও বাঙ্গালা বা বার্মিজ ও বাঙ্গালা পড়ান হইত, এবং চাক্ষুশ ক্লাসে—বাঙ্গালা ও ইংরাজী অথবা কেবল বাঙ্গালা অধ্যাপনা চলিত। অনন্তর ১৮৬৯ অব্দের আরম্ভেই ডেপুটি কমিশনার অফিস চন্দ্রবোনা হইতে রাঙামাটিতে উঠিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এই স্কুলও চলিয়া আইসে; তখন হইতে ইহা "রাঙামাটি গভর্নমেন্ট বোর্ডিংস্কুল" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ইহাতে মধ্য ইংরাজী জেলী খোলা হয়। তাহাতে ১৯ জন মধ্য ইংরাজী, ৪ জন মধ্যবাঙ্গালা এবং ৪০ জন উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে

পাহাড়ী ছাত্রগণকে উন্নীতকরণ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যতীত পঞ্চাশ জন ছাত্রকে বৃত্তান্তরূপ আহার পর্যন্ত দেওয়া হয় ; এবং নিত্য দরিদ্রদিগের পুস্তকের লভ্যও কিছু টাকা নির্দিষ্ট আছে । সম্প্রতি আবার প্রথম চারি শ্রেণীতে অধ্যয়নপর দরিদ্র ছাত্রদিগের নিমিত্ত দুই ও তিন টাকার দুই দুইটি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত তাহাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ডাক্তারের বন্দোবস্ত আছে, এবং প্রধান শিক্ষক ও অন্ততম সহকারী শিক্ষকের উপর সুপারিন্টেন্ডেন্টের ভার ভর । বোর্ডিংএ পাচক, ভিত্তি, মেথর প্রভৃতিও বখানিয়মে আছে, এমন কি তাহাদের বজ্রাদি পরিকল্পণের নিমিত্ত সরকার হইতে একজন খোণাও নিযুক্ত রাখিয়াছে । পূর্বে ইহাদের জল খাবার এবং পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত দেওয়া হইত, কয়েক বৎসর হইতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে । পূর্বে যখন বিভাগীয় কমিশনার কি উর্দুতন রাজকর্মচারী স্কুল পরিদর্শনে আসিতেন, তখন শিক্ষার ইহাদের আসক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত খলে খুলিয়া ‘হিরিগুটের বাতাসা’র ভার টাকা ছড়াইতেন । আর বালকগণ ছড়াছড়ি করিয়া তৎসমুদয় লুটিতে দেখিলে, তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া হাততালি দিতেন !

হার ! এত সুবিধা ও প্রলোভন সত্ত্বেও ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত নাকি পূর্বতন শিক্ষকগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত । তাঁহারা এই দুর্গম পার্শ্বভা-

প্রদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাত্রাদ্বেষণ  
হাজির ।  
করিতেন । কোন কোন স্থানে তাঁহারা “ছেলেধরা”

লোক (১) বলিয়া বিপদেও পড়িতেন । এই কারণেই একবার কতিপয় চুইলোক ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহোদয়ের নোকা ডুবাইয়া দেয়, তিনি অতি কষ্টে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়াছিলেন । বলাবাহুল্য ইহাতেই তাঁহার সেই উত্তম কান্ড হয় নাই, তাঁহারই ঐকান্তিক অধ্যবসার বলে এই স্কুলের বর্তমান উন্নতি ঘটিয়াছে । অধুনা অবশ্য তেমন দ্বারে দ্বারে ছাত্রসংগ্রহ

ইহাকে উচ্চ ইংরাজীতে উন্নীত করিয়াছেন । এবাবৎ ইহাতে ১২ জন পাহাড়ী এবং ২৬ জন বাকালী ছাত্র প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে । পূর্বে ইহার কর্মচারীসংখ্যা অত্যন্ত মাত্র ছিল । বর্তমানে শিক্ষক ১১ জন, দপ্তরী ১, দারোয়ান ১, মালী ১, মেথর ১ হইয়াছে । ১৯০৮—০৯ সালে গভর্ণমেণ্টের স্কুলের জন্য ১১৭৫ এবং বোর্ডিংএর জন্য ২৭২২ টাকা ব্যয় সিদ্ধ হইয়াছে ; তদ্ব্যতীত ৪২৯ টাকা মাত্র ছাত্রবেতন আদায় হইয়াছে ।

(১) পূর্বে পূর্বগীত দহাগণ কাহাকেও সুবিধা মত পাইলে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের হস্তদ্বারা করিত, তাহারা “ছেলেধরা” বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

করিতে যাইতে হয় না বটে, কিন্তু গভর্ণমেন্টের আগ্রহানুরূপ ছাত্র পাওয়া যাইতেছে না। ফলতঃ শিক্ষার উন্নতি যাদৃশ মন, তাহাতে মনে হয়—  
আরও বহুদিন ধরিয়া গভর্ণমেন্টকে এই বোর্ডিং ব্যয় বহন করিতে হইবে।

এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে খৃষ্টিয়ান মিশনারীগণের চেষ্টাও অবশ্য উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারাও স্থানে স্থানে বোর্ডিং পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, এবং রাঙামাটিতেই বোর্ডিংযুক্ত এক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় রাখিয়াছেন। উপসংহারভাগে তাঁহাদের অধ্যবসায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সে যাহা হউক, তাঁহাদিগের সেই উৎকট ধর্মবিস্তার চেষ্টাও এতদেশে শিক্ষাবিস্তারের কম অনুরূপ নহে। ফলতঃ পার্শ্বাত্য যুবকদিগের শিক্ষানুরাগবর্দ্ধনের জন্ত এই সমুদয়ই যথেষ্ট নহে। সহস্র গভর্ণমেন্ট এই জেলার মধ্য পরীক্ষার ১টা, উচ্চপ্রাথমিক ২টা ও নিম্ন প্রাথমিক ৮টা বৃত্তি প্রদান করিতেছেন এবং কেবল এই রাঙামাটি জুলেরই নিমিত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার দশ টাকার এক বৃত্তি রাখিয়াছেন এবং উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়নার্থিকে বিশেষ বৃত্তি দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কুমার রমণী

পুরস্কার।

বাবু প্রতিবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম পাহাড়ী ছাত্রকে “সৈরিক্সী মেডেল” নামে এক রৌপ্যপদক দিতেছিলেন, সম্ভ্রুতি তৎপরিবর্তে প্রবেশিকার উক্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত চাকমা ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার সাহায্যার্থে দুই বৎসর স্থায়ী মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এবং ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯১৭ ইংরাজীর মধ্যে যে চাকমাছাত্র সর্বপ্রথমে বি, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তিনি তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দান করিবেন।

এতসব চেষ্টার ফল নিতান্ত সামান্য হইলেও এবং মণ, কুকি, মুকং, ত্রিপুরা, বনজুগী প্রভৃতি সকলের প্রতি গভর্ণমেন্টের তুল্যদৃষ্টি থাকিলেও পাহাড়ীদিগের মধ্যে চাকমাগণই শিক্ষার সমধিক আগ্রসর হইয়াছে। কি পাঠাশালায়—কি জুলে অধিকাংশই চাকমা ছাত্র। অপরাপর পাহাড়ী

কল।

ছাত্রের তুলনায় চাকমাছাত্র অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই শিক্ষারম্ভ করে। বর্তমানে কেবল চাকমা পল্লিতে দুইখানি উচ্চপ্রাথমিক এবং ৩২ খানি নিম্নপ্রাইমারী বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ৫২৬ জন চাকমাছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে। এতদ্বিন্ন অধুনা অজ্ঞাত স্থানে অধ্যয়ন নিরত চাকমা ছাত্র সংখ্যাও প্রায় শত সংখ্যক হইবে। অপরদিকে দেখা যায়, রাঙামাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গত দশ বৎসরের মধ্যে মাত্র ২৪ জন চাকমা ছাত্র ভর্তি

হইয়াছে; সুতরাং বার্ষিক দশ জনও নহে। পার্শ্বত্যাগ অপরাপর জাতির তুলনায় ইহাদিগের শিক্ষা শক্তি বহিঃ ন্যূন নয়, কিন্তু বিরাট সমাজের গণনার উহা নিতান্ত সামান্ত বলিতে হইবে। পরীক্ষা ফলও তাদৃশ সন্তোষপ্রদ নহে। এবাং ইহাদের হইতে নিম্ন প্রাইমারীতে ৬৮ জন, উচ্চ প্রাইমারীতে ৮ জন, এবং মধ্য পরীক্ষায় ৩ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। উচ্চশিক্ষার ফল ততোধিক শোচনীয়। মাত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ানই বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তিনি ছাড়া বর্তমান রাজা ও কুমার—দ্রাঘ্যুগল, শ্রীযুক্ত অরিনাশচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেওয়ান ও শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার, ফাট্ট আর্ট পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, নবকুমার দেওয়ান নামে আর একটি ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশের সংবাদ বাহির না হইতেই করালকাল হতভাগ্যকে ইহলোক হইতে সরাইয়া নিয়াছে। তাহারই সমপাঠী শ্রীমান্ মদনমোহন দেওয়ান প্রবেশিকা পাশের পর কেবল স্কুল হইতে হস্পিটাল এমিষ্ট্যান্টসিপ্ পাশ করিয়া আসিয়াছেন। অবশিষ্ট শ্রীমান্ যামিনীকুমার দেওয়ান ও শ্রীমান্ মতিলাল চাকমা এই বৎসরে উত্তীর্ণ। এতাদৃশী উন্নতি কোন জাতীয়-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয় সত্য, তবে সুখের ও আশার কথা এই, ক্রমেই ইহা বিস্তৃত হইতেছে। বিশেষতঃ গত কয়েকবৎসর ধরিয়া ইহা যেরূপ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে কালে ইহার প্রকৃত উন্নতি আশা করা যায়।

এস্থলে একবার জ্ঞানীশিক্ষার আলোচনাটুকু করিয়া রাখা মন্দ নহে। এই সভ্যতাদৃষ্ট বিংশ শতাব্দীতে ইহার উপযোগিতা প্রায় সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নিতান্ত অসুবিধা বিশেষ না থাকিলে

জ্ঞানী-শিক্ষা।

অধুনা জ্ঞানীশিক্ষার উৎসাহদানে কাহাকেও বিমুখ দেখা

যায় না। বস্তুতঃ অর্দ্ধদশ লইয়া সমাজ কত আর অগ্রসর হইতে পারে? গৃহীণীকে দিয়া যদি পারিবারিক নিত্যনৈমিত্তিক বর্ষাগুলিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা না যায়, তবে আর সে পরিবারে সুখ কোথায়। শিক্ষা না পাইলে বাহ্য জ্ঞান লাভেরও সুবিধা পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহাদের দ্বারা শিক্ষাদীপ প্রজ্জ্বলিত নহে, তাহাদিগের দ্বারা পারিবারিক সুখের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। বর্তমানে অবরোধ পালিতা বঙ্গীয় ললনাগণ শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন।

সজ্জাত চাকমাগণও তদনুকরণে নিজের পরিবার গঠনে চেষ্টা করিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিগত আদমশুমারিতে ৪৪ জন শিক্ষিতা চাকমা রমণীর খবর পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ২৪ জন বালালা এবং ২০ জন চাকমা লেখা গড়ায়

অভিজ্ঞ। ইহাদের মধ্যে চারিজনের উত্তরবিধ লেখা পড়াতেই পরিপক্বতা আছে। যতদূর দেখা যায়, এতদ্ব্যসাহদাতৃগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ানই সর্বপ্রধান। তাঁহার দুইটা কন্যাই শিক্ষিতা। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরযুবালা দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বোড়শীবালা প্রথম বিভাগে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাশের পর উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য শেষ করিয়াছেন। ইহারা ছাড়া শ্রীযুক্ত পূর্ণ দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য পর্যন্ত পড়িয়াছেন। অপর শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী ইন্দ্রানী ও শ্রীমতী সুরবালা, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী এবং সব ডেপুটিকালেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী যশোদা নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। তদীয় দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পদ্মগন্ধা পরীক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু নিম্নপ্রাইমারীর পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা নব্যাসম্প্রদায়ের তালিকা। প্রাচীনাদের মধ্যেও সামান্য রকমের বিহুযী মহিলা হুপ্রাপ্য হইলেও অপ্রাপ্য নহে। বাহা হউক বর্তমান এ উন্নতিতে দ্বী-শিক্ষা যে ভবিষ্যতে সুফলপ্রদ হইতে পারিবে, বেশ সূচিত হইতেছে। এক্ষণে বাহাতে ইহা সাধারণ পরিবারেও প্রসারিত হয়, সমাজ-হিতৈষী বৃন্দের নিকট তজ্জনা যথোচিত চেষ্টা প্রার্থনীয়।

দেশভেদে ভাষার বিভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ। যদি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া একমাত্র ভাষার ভাবেই আদানপ্রদান চলিত, তবে কত যে সুখের ও সুবিধার আশা ছিল, তাহা পরিমাণ করা যায় না; কেন না, প্রত্যেক দেশের সুধীসম্প্রদায় বহুপ্রমার্জিত ভাষাশি শব্দ বৈশিষ্ট্য ভাষার লিপিবদ্ধ করিতেছেন; সে সমুদয় আয়ত্ত করিতে হইলে তত্ত্বভাষার পারদর্শী হওয়া সর্বাগ্রে আবশ্যক। সুতরাং পৃথিবীর

সার্বভৌমিক ভাষা।

যাবতীর ভাষার অধিকার না থাকিলে সমস্ত বহুভাষা উদ্ভাটিত করা দুঃসহ। কিন্তু তাদৃশ সার্বভৌমিক শিক্ষা সামান্য মানজীবনে লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম, সমগ্র পৃথিবীর এক সাধারণ ভাষা হইলে উপকারের পরিসীমা ছিল না। পূর্বে এক সময়ে এ ভারতের প্রায় সর্বত্রই হিন্দিতে কথোপকথন চলিত; কালক্রমে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় বর্ষীয় কৃতবিদ্য বাঙ্গালাভাষাকে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলে—দেশের এক গুরুতর অভাব নিরাকৃত হইবে।

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখা যায়, দেশের অবস্থানের উপরই ভাষার

প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে । ইহা আবার বিবিধ কারণে ঘটয়া থাকে ।

ভাষাতত্ত্ব ।

প্রথম—দেশবাসীর কর্মতৎপরতা, দ্বিতীয়—প্রতি-

বেশী অগরাপন্ন ভাষার সংঘর্ষণ এবং তৃতীয়তঃ—

দেশের অবস্থানুসারে আবহাওয়ার প্রকৃতি । যে দেশের লোক সাতিশয় কর্মতৎপর (যেমন বন্দরাদিতে), এমন কি ভালরূপে কথাটি বলিবারও অবকাশ পায় না, তৎকালকার ভাষা সংক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক—অনেকস্থলে সঙ্কেতমাত্র অবলম্বনে কার্য্য চালাইতে বাধ্য হয় । পার্শ্বতঃদেশের পক্ষেও এই ব্যবস্থা কতকপরিমাণে খাটে ; কারণ এখানকার জীবনকেও পরিশ্রমের কঠোর শাসনে পরিচালিত করিতে প্রকৃতিই বাধ্য করে । আবার বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে আসিলে, তাহাতেও একটা খিচড়ী না হইয়া যায় না । অতএব আমরা অনেকগুলি ইংরাজী শব্দ একেবারে ধাসদখলে আনিয়া ফেলিয়াছি । এই যে ‘ধাসদখল’ শব্দটি প্রয়োগ করিলাম, তাহাও নিজস্ব নহে । এস্থলে তৎপরিবর্তে ‘নিজ অধিকার’ বসাইলে ঠিক উপযুক্ত (idiomatic) প্রয়োগ হইলনা । সত্যি সত্যি সম্ভবতঃ অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন । এইরূপে সকল ভাষাই কিছু না কিছু পরিমাণে বিভিন্নভাষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে । এতদ্ব্যতীত দেশের জলবায়ু এবং শীতাতপের বিভিন্নতাও ভাষাবিচ্ছেদ ঘটাইবার পক্ষে সামান্য কারণ নহে । কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, কোন কোন দেশের আবহাওয়ায় জিহ্বার এত জড়তা জন্মে যে, উচ্চারণে নিতান্ত বিকৃত ঘটে । কোথাও বা কেবল অনুনাসিক উচ্চারণই ভাষার প্রকাশক । দেশ ভেদে এইরূপ নানা উচ্চারণ-বৈষম্যে ক্রমে পরস্পরের অবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

চাক্‌মাদিগের মূলভাষা বাঙ্গালা ; তবে ইহা প্রাণিত বাঙ্গালার তুলনায় নিতান্ত বিকৃত, এবং সংক্ষিপ্তও কম নহে । ইংরাজ রাজপুরুষেরা ইহাকে

“চাক্‌মা-বাঙ্গালা” (The language is Chakma Bengali) নামে অভিহিত করিয়াছেন (১) ।

বস্তুতঃ বঙ্গভাষা ক্রমেই পূর্বদিকে বিকৃত হইয়া আসিয়াছে । এতৎসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি কারণ অনুমান করা যায় । প্রথমতঃ এ সকল দেশে পূর্বে

(১) Vide—Appendix VII ; part of A (Bengal code of census procedure.)

অধের বসতি ছিল। পরে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বাঙ্গালিগণ এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে আসেন, তখন তাঁহাদের সেই প্রাচীন অর্ধপ্রাকৃতবহুল বাঙ্গালামাত্র সম্বল ছিল (১)। পরবর্তী যুগে নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার কেন্দ্রস্থল হওয়াতে তৎপার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের ভাষার বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে বাঙ্গালার যে অংশ যত অধিক দূরে অবস্থিত, তথাকার বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দের পসার তত অল্প। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ভাষার সংঘর্ষেও যেকোন ভাষা বিকৃত এবং নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। চাক্‌মাভাষার মূল বাঙ্গালা হইলেও ময়, ত্রিপুরা এবং মুসলমানী ভাষার সহিত সংমিশ্রণ অতিশয় বিস্তৃত। ফলকথা, ইহারা বিজাতীয় সমাজ হইতে যাহা যাহা অনুকরণ করিয়াছে, ভাষা তন্মধ্যে সাধারণ মোটামুটি বলা যাইতে পারে, চাক্‌মাগণ হিন্দুদের হইতে ভাষা ও দেবদেবী; মঘদিগের ধর্ম, ব্যবহার, ভাষা, এমন কি অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত; ত্রিপুরাদের ভাষা, পূজাপদ্ধতি ও আচার ব্যবহার; এবং মুসলমানদিগের ভাষা ও ঠাঁ প্রভৃতি উপাধি ইত্যাদি—পার্শ্ববর্তী প্রায় সমুদয় জাতি হইতেই কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ইহাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত সাতিশয় জটিল, এবং ভাষাও এত দুর্লভ হইয়াছে যে, অপর কোন জাতিরই সহজবোধ্য নহে। পরন্তু ধীরে ধীরে বলিলে সাধারণ চাক্‌মাও সরল বাঙ্গালা বুঝিতে পারে, এবং প্রায় বোধযোগ্য করিয়া উত্তর প্রদান করে। আবার ইহাদের মধ্যে “গোছা” বিশেষেরও কথার পার্শ্বক্য রহিয়াছে। যেমন “লান্মা”, “খেয়ংচেগে”, ও “কুরাকুট্যা” গে’ছার লোকে “যাঙল্” ( যাঙর ), “এজঙল্” ( এজঙর ) ইত্যাদি রূপে “র” স্থলে “ল” বলে। আবার কোন কোন “গোছার” কথার টানও বিভিন্ন।

ইহারা কতিপয় সংস্কৃত শব্দ এমনি অবিকৃতরূপে গ্রহণ করিয়াছে যে,

সংস্কৃত শব্দ।

ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তন্মধ্যে—দয়া, ধর্ম, শক্তি, ভক্তি, দান, মান, কৃপা, পীড়া, চিং, অমৃত, সুখ, গুণ, উপকার, সম্পত্তি, বন্ধু, মন, বিপদ, আপদ, ধন,

(১) দৃষ্টান্তস্বরূপ—চট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক কথা ‘চৈতন্যভাগবত’, ‘চৈতন্যমঙ্গল’ ও ‘প্রাচীন পদাবলী’ প্রকৃতি হইতে তুলিয়া দেখাইতে পারা যায়। তা’ছাড়া এখানে এমতও অনেক কথা আছে, যা পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অপর কোথায়ও ব্যবহৃত নাই। এ সকল এবং আরও অন্যান্য কারণে বর্তমান চট্টগ্রামবাসী অধিকাংশ হিন্দুই যে দক্ষিণ রাঢ়জ, তাহা সন্দুতরূপে প্রমাণিত হয়।

ধনী, মিত্র, বিচার, অন্তর, অকুল, শাক, গৃহ প্রভৃতি শব্দগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত।  
এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সংস্কৃতশব্দ সামান্ত বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত। যথা :—

মূল সংস্কৃত	চাক্ষুণ্যভাষায় ;	মূল সংস্কৃত	চাক্ষুণ্যভাষায় ;
অভুক্ত	আত্মক্কা ;	বট্টিতি	ঝাতি ;
আর্য্য	আঃ ;	দ্রুঃ	দ্রুঃ ;
উনানশাল ;	উনান শাল ;	পিশুণ	পিশুন্ ;
কণ্ঠ	কল্গক ;	প্রত্যয়	পাত্যায় ;
কৃত	কুধু ;	পিচ্ছিল	পিচ্ছোল ;
কৃত্যৎ (কর্য্যৎ) কুরৎ ;		বাস (গন্ধ)	বাচ ;
কর্ম্ম	কাম।	মে দেহি	মে দে ,
গোশালা	গোমাল ;	শবশালা	চবাশালা ;
গুচ্ছ	গোছা ;	সন্ধেহভাষা	ছন্দভাচ ;
ছায়া	ছাষা ;	হৃদয়ে	হৃদং : ইত্যাদি।
জঙ্ঘ	জুর ;		

ধর্ম্ম ভিন্ন প্রচলিত কথায় প্রাকৃত-প্রভাব তাদৃশ অধিক নহে। সচরাচর  
কথোপকথনে—“উজ্জু” ( উজ্জু ), “এজ্জা” ( অজ্জ ) ; “লতি” ( লট্টি ),  
পালিশব্দ। “পাথর” ( পথর ), “দুয়ার”, “ঘর”, “খাম”  
( খস্ত ), “দুদু” ( দুধ ), “দৈদ”, ( দহী ), “শিয়াল”  
( শিষা ), “জিহু” ( জেট্টা ), বাবন ( বক্রণ ), “দত্”, “আজ্জন” ( অজ্জ )  
“হুনা” ( হুণা ), “বুরা” ( বুড্ ), “তেল”, “মু” ( মহ ), “ক্রপা” ( ক্রমা ),  
“মাছি” ( মছি ), “হোলদু” ( হলদা ), “পুখি” ( পোখি ) প্রভৃতি মূল এবং  
ঈষদ্বিকৃত পালি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

আর অবিকৃত বাঙ্গালা শব্দও কম নহে। তন্মধ্যে ফুল, ভাল, মন্দ,  
ঢাক, গরীব, বৈজ্ঞ, ভাজা, নিজ, চোখ, ওঝা, পরাণ ইত্যাদি শব্দগুলি সাধারণ।  
বাঙ্গালা শব্দ। আবার উচ্চারণ-বিকৃতি দোষে কতকগুলি বাঙ্গালা  
শব্দ সামান্ত রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে।

যেমন,—“দুষ” ( দোষ ), “বিচ্ছাচ্” ( বিশ্বাস ), “ভাপ” ( ভাব ), “কদা”  
( কথা ), “বিগুণ” ( বেগুন ), “বালোস্” ( বালিস ), “বিবম্ লাগা” ( বিবম্  
লাগা ), “বিহ্ লাগা” ( বিবলাগা ) ইত্যাদি। এ ছাড়া, কোন কোন শব্দ  
বিশেষ পরিবর্তিত এবং কোনটী বা অর্ধান্তরিত হইয়া পিয়াছে।  
কয়েকটী উদাহরণ যথা,—“অবুজ” ( অবোধ ), “অমগদ” ( সোমার ),



“শেতখানা” (পায়খানা), “পুর” (ম্যাদ), “দৌ-ল্” (সুন্দর), “বারিজা” (বর্ষা), “কমলে” (কোন সময়ে) এবং “কাণা” শব্দে অন্ধকে বুঝায়। পাঠক মহোদয়েরা দেখিলেন, ইহার। সংস্কৃত কি বাঙ্গালার এমন অনেক শব্দ বিকৃত বা অবিকৃতভাবে ব্যবহার করে যে সমুদয় পূর্ব কি উত্তরবঙ্গেও প্রচলিত নাই। তাহা ছাড়াও “মুজুং” (মৌসুম), “মাড়া” প্রভৃতি কতিপয় শব্দ পশ্চিম বঙ্গেরই অমুকরণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

পরন্তু আত্মীয় আত্মানেও বাঙ্গালীদিগের বিশেষতঃ হিন্দুগণের যথেষ্ট অমুকরণ পরিলক্ষিত হয়; কোন কোন স্থলে সামান্য বিকৃতি ঘটিয়াছে মাত্র।

আত্মীয় আত্মান।

যথা—পিতা বা স্বশুর—“ধা”; মাতা বা শাশুড়ী—  
“মা”; পিতৃব্য—“জিধু” (জ্যেষ্ঠতাত), “খুরা”,  
“কাকা”; পিতৃব্যানী—“জৈধেই” (জ্যেষ্ঠতাতপত্নী), “খুরী”, “কাকী”;  
জ্যেষ্ঠভ্রাতা—“দাদা”; জ্যেষ্ঠাভগ্নী—“বেই”; কনিষ্ঠ ভাইভগ্নী—(স্নেহ-  
সূচক) “লক্ষ”; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ—“ভুজি” (১); মায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী—  
“মুকি”; মায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী—“জৈধেই”; “মুকি”-পতি—“মইঝা” এবং  
“জৈধেই”-পতি “জিধু; পিসী—“পিঝেই; পিসা—“পিঝা”; মামা—“মামু”;  
—মামী—“মামী”; পিতামহ বা মাতামহ—“আহু”, “না”; পিতামহী  
বা মাতামহী—“বেই”, “নামু”; ভগ্নীপতি—“বোনই” (২)।

সর্বোপরি ইহাদিগের সংখ্যাগণনা এক অদ্বুত ব্যাপার! মোট কুড়িটা  
রাশি আছে কিন্তু প্রত্যেকটিরই অভিধা বিভিন্ন। ততোধিক গণনার

সংখ্যা গণনার।

আবশ্যক হইলে, ‘এককুড়ি এত’ বা ‘দুই কুড়ি  
এত’ বলিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ পাঁচচার

কুড়ি কুড়ি গণনার পর তবে এক শতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলিতে কি,  
এতাদৃশ প্রথা অতাপি চট্টগ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে সম্ভবতঃ  
ইহা তাহারই সংক্রমণ ফল। কিন্তু এই সংখ্যাগুলির নাম প্রায় বাঙ্গালা-  
গ্রন্থত হইলেও কোন অর্থে স্থিতিকৃত হইয়াছে, নির্ণয় করা দুঃস্বপ্ন। যথা:—১  
একধ, ২ দিধ, ৩ তিতিরি, ৪ তিধ, ৫ কাচ, ৬ কতম, ৭ বোলাই, ৮ নিল, ৯  
রাজা, ১০ বিন, ১১ হাত, ১২ গাং, ১৩ ব্রাহ্মণ, ১৪ ছকি, ১৫ ধল্য, ১৬ ভাং,

(১) চট্টগ্রামের হিন্দুগণ “ভইল” এবং মুসলমানেরা “ভাউল” সম্বোধনে “ভাজি” বলিয়া থাকে।

(২) চট্টগ্রামের বিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বলে—“বোনই”।

১৭ গন্দা, ১৮ গন্ধি, ১৯ উনিশ, ২০ কুড়ি। কিন্তু তু্যমানে এবংবিধ আখ্যায় গণনা এত বিরল যে, অশিক্ষিত সমাজেও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়; প্রায় সকলেই এক ভূই করিয়াই গুণে।

ক্রিয়াপদের রূপ সংস্কৃত-অনুসরণে হইলেও নিত্যান্ত সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তৎসমুদায় অধিকতর ছৰ্শোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন,

ক্রিয়া বিভক্তি।

প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালায় উপ-নীত হইবার কালে একটা মহাবিপ্লব ঘটয়া গিয়াছে। একবচন ও বহুবচন লইয়া ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। কাল, পুরুষ ও বচনভেদে বিভক্তি সকল অষ্টাদশবিধ। ক্রিয়াবিভক্তি যথা :—

		একবচন	বহুবচন
বর্তমানকাল	উত্তম পুরুষ	আং	এই
	মধ্যম পুরুষ	এইচ্	অ
	প্রথম পুরুষ	য়	ন্
ভবিষ্যৎকাল	উত্তম পুরুষ	এইম্	এষ
	মধ্যম পুরুষ	এষে	এষা
	প্রথম পুরুষ	এষ	এষাক্
অতীতকাল	উত্তম পুরুষ	এইয়ং	ইয়েই
	মধ্যম পুরুষ	ইয়চ্	ইয়
	প্রথম পুরুষ	ইয়ে	ইয়ন্

বাঙ্গালা পদ্যের “মুই”, “তুই” সৰ্জনাম চাক্‌মাতাষায় যথাক্রমে উত্তম ও মধ্যমপুরুষের একবচনে তুচ্ছার্থে এবং অতুচ্ছার্থে প্রচলিত; কিন্তু আশ্চর্য্য রূপান্তর এই, ইহারা “আমি” এবং “তুমি” শব্দে সৰ্জনাম।

বহুবচনার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্ততঃ প্রথম পুরুষের একবচনে—সংস্কৃত “তে” এবং বহুবচনে বাঙ্গালা পদ্যের “তারা” সৰ্জনাম পদ ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় সৰ্জনামের সম্মুখার্থে কোন বিশেষ রূপ নাই বটে, কিন্তু তাদৃশ সম্মানিত স্থলে সংস্কৃতের অনুসরণে একের প্রতিও বহুবচনের রূপ ব্যবহারের ব্যৱস্থা আছে। আমাদের বক্তব্য কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর করিতে এস্থলে একটা ক্রিয়ারূপ উপযুক্ত সৰ্জনাম সহযোগে প্রদর্শিত হইল।

গমনার্থ-বোধক ক্রিয়ারূপ যথা :—

বর্তমান কাল।

বাঙ্গালা কথা।

আমি যাই

চাক্‌মাতা কথা।

মুই য়াং

বাঙ্গালা কথা।

আমরা যাই

তুই বা তুমি যাও

তোরা বা তোমরা যাও,

অথবা আপনি যান }

সে যায়

তাহারা যায় বা তিনি যান

চাক্ষুণ্য কথা।

আমি যেই

তুই যেইচ্

তুমি য

তে যায়

তারা যান

## ভবিষ্যৎ কাল।

আমি যাব

আমরা যাব

তুই যাবি বা তুমি যাবে

তোরা যাবি বা তোমরা যাবে }

অথবা আপনি যাবেন

সে যাবে

তাহারা যাবে বা তিনি যাবেন

মুই যেইম্

আমি যিম্

তুই যেষ

তুমি যেষা

তে যেষ

তারা যেষাক্

## অতীত কাল।

আমি গিয়াছিলাম

আমরা গিয়াছিলাম

তুই গিয়াছিলি বা তুমি গিয়াছিলে

তোরা গিয়াছিলি বা তোমরা }

গিয়াছিলে অথবা আপনি

গিয়াছিলেন

সে গিয়াছিল

তাহারা গিয়াছিল বা তিনি গিয়াছিলেন

মুই যেইয়ং

আমি যিয়েই

তুই যিম্

তুমি যিম

তে যিয়ে

তারা যিয়ন্

পূর্বে বলিয়াছি, ইহারা মতভাষা হইতে বর্ণগুলি অনুকরণ করিয়াছে।  
 কেননা ইহাদিগের বর্ণমালা এবং বর্ণসংযোগে ব্রহ্মবাসীদের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য  
 দৃষ্ট যায়। ফলতঃ ব্রহ্মা এবং বঙ্গীয় বর্ণাবলীর  
 বর্ণাবলী।

উৎপত্তিস্থলও বিভিন্ন নহে; একই ব্রহ্মের কাণ্ড  
 হইতে নানা শাখা নানা আকারে গঠিত হইয়া ভাষার অন্তর্গত ব্রহ্ম  
 করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"  
 প্রদর্শিত "অশোকের সময় (২৫০ পূঃ খ্রষ্টাব্দ) হইতে বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রম-  
 বিকাশের সহিত ব্রহ্মা ও চাক্ষুণ্য বর্ণসমূহের সাদৃশ্য দেখাইয়া পরবর্তী পৃষ্ঠায়  
 এক তালিকা প্রদত্ত হইল।



প্রাচীন বাঙ্গালা, ব্রহ্মা  
এবং চাক্ষুস।

এবং ল প্রভৃতি বর্ণ যৎসামান্য রূপান্তরিত মাত্র।  
এতদতিরিক্ত যে বর্ণাবলী রহিল, তাহাদের মধ্যেও  
যে আকৃতিগত একটা সম্পর্ক না রহিয়াছে, এমত  
নহে। সময়সাগরের কত তরঙ্গাভিঘাত চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এত  
পরবর্তীকালের জীব আমরা যে প্রাচীন নিদর্শনের এতটা সাদৃশ্যেরও অভিজ্ঞ  
পাইতেছি, তাহাও পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মার  
সহিত চাক্ষুসবর্ণমালার সাদৃশ্য এবং সঙ্কল্প অধিকতর ঘনিষ্ঠযুক্ত। সম্ভবতঃ  
ত্রিপুরাদিগের তায় চাক্ষুসদিগেরও লিখন প্রথা বা বর্ণমালা ছিল না।  
অনন্তর ব্রহ্মদেশে অবস্থিতিকালে নানা অশুবিধায় পড়িয়া তথাকার বর্ণাবলী  
গ্রহণ করিয়া থাকিবে। পূর্বপৃষ্ঠায়বিন্যস্ত আদর্শেই পরিলক্ষিত হইবে,

স্বরবর্ণ গুলির মধ্যে 'উ'টা সম্পূর্ণ অবিকৃত :  
ব্রহ্মা ও চাক্ষুস।

‘অ’ ঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে ; এবং অপর দুইটা  
— ই, এ বর্ণে তারতম্য কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলেও ব্রহ্মার দ্বিতীয় পর্যায়ের  
সহিত তাদৃশ অনৈক্য নহে। ব্যঞ্জনবর্ণে—ক, খ, গ, ঘ, ত, থ, প, ফ, ব, ম, য,  
ব (ওয়া), স ব্রহ্মবর্ণের সহিত অভিন্নপ্রায় ; উ, চ, ছ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, দ,  
ধ, ভ, ল, হ ইত্যাদি বর্ণেও অতিসামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে ; অধিকন্তু তৎ  
ক্রমপরিবর্তন সুস্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট জ, ঝ, ন, র এবং ফলা তে  
সামঞ্জস্য উদ্ধার কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে  
মূলতঃ সৌসাদৃশ্য সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যায়। চাক্ষুস-সমাজের এ  
অনুকরণ অল্পদিনের কথা নয় ইহার উপর দিয়া কত কত রাজামহারাজার  
প্রভুত্ব—জগতের কত অনন্ত পরিবর্তন চলিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় বর্ণ-  
মালার এ সামান্য পরিবর্তন ধর্তব্যই নহে। বিশেষতঃ অনুকরণে প্রায়ই  
খাটি জিনিষ থাকে না, অনুকারী হয়তঃ স্বীয় বিভ্রাবুদ্ধির সংযোগে একটা  
অভিনব পদার্থ গড়িয়া তোলে, অথবা তাহা যতদূর পারা যায়—সংক্ষিপ্ত  
সংস্করণে প্রকাশ করিয়া থাকে।

এ ক্ষেত্রে কেবল আকৃতিগত সামান্য পরিবর্তন করিয়াই অনুকরণ-কর্তা  
সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, বর্ণসংখ্যাও যথাসাধ্য সংক্ষেপের চেষ্টা হইয়াছে।  
সংস্কৃতমাতৃক বলিয়া এই বর্ণগুলিও স্বর এবং ব্যঞ্জনভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

স্বরবর্ণ।

ব্রহ্মাদিগের মূল স্বরবর্ণ দশটা—ঋ এবং ৯ ইহাদের  
নাই। কিন্তু চাক্ষুসগণ তাহা হইতে অ-ই-উ-এ

বর্ণচতুষ্টয়মাত্র গ্রহণ করিয়াছে । ই-ঈ এবং উ-ঊ পরস্পরে কোন প্রভেদ নাই । ‘অ’ এর উচ্চারণ—আ ; তত্‌পরি ( ৫ ) মাধা তুলিয়া দিলে অর্থাৎ রেফাক্রান্ত করিলে ‘অ’ উচ্চারিত হয় । ‘ঐ’ ছাড়া ‘অ’ এর উপর ( ১ ) বায়বুখী আর একখানি শিখা তুলিয়া দিলে ‘ঐ’ এবং ‘অ’ এর নীচে ‘উ’ দিলে ‘ও’ উচ্চারিত হইয়া থাকে । যেমন,—

অ উচ্চারণে—

অ

ও উচ্চারণে—

ও

এ উচ্চারণে—

এ

ঐ উচ্চারণে—

ঐ

ইহাদের মধ্যে নাই ।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ব্রহ্মভাষারই অমুরূপ ব্রহ্মশতী । তৎমধ্যে বর্ণীয়বর্ণগুলি ঠিকই আছে ; অস্তস্ব বর্ণের য—‘য়া’ এবং ব—‘ওয়া’ ( ১ ) সংজ্ঞার প্রথিত । পালির জায় তালব্য ‘শ’ ও মূর্দ্ধন্ত ‘ষ’ এর শাসন ইহাদের মধ্যে নাই । উন্নবর্ণে অবশিষ্ট ‘স’ ও ‘হ’ ব্যতীত ব্রহ্মবর্ণাবলীর অমুরূপে ( লাজিয়ে ) ‘ছল’ নামে আর একটা বর্ণ আছে, তাহার

ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বিরল । এতদ্ব্যতিরিক্ত অমুখার এবং বিসর্গের প্রচলনও ইহারা অজ্ঞাত নহে ; তবে চন্দ্রবিন্দুর কাজ নু হারা সারিয়া যার । পরন্তু পালির জায় ব্যঞ্জনবর্ণ সকল কা—খা—গা—ঘা ইত্যাদি ক্রমে আকারান্ত করিয়া উচ্চারিত হয় ; বিশেষ পরিচয়স্থলে—তৎসঙ্গে আকৃতিন্যূচক বিশেষণযোগে পাঠ হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য—তৎসমুদয় বিশেষণ “আঁকুড়ে ক” “বকা ঠোঁটে খ” প্রভৃতি রূপান্তর মাত্র । তাহা দেখাইবার পূর্বে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ইহারা সচ-রাচর ‘স’কে ‘হ’ এর জায় উচ্চারণ করে এবং ট, ঠ, ড, ঢ, এর উচ্চারণ স্বাভাবিক্রমে ত, থ, দ, ধ, এর সহিত বিনিময় করিয়া থাকে । যথা, ক—“চুচ্যাক্যা কা”, খ—“গুজাক্যা খা”, গ—“চান্দ্যা গা”, ঘ—“তিনঠাল্যা বা”, ঙ—“ছিলামুঙা ঙা”, চ—“ছিডাচ্যা চা”, ছ—“মজছ্যা ছা”, জ—“দ্বিপদলা জা”, ঝ—“উরাউরি ঝা”, ঞ—“তিলচ্যা ঞা”, ট—“দ্বিয়াদা তা”, ঠা—“কোডাদিয়া থা”, ড—“আঁড়-ভাঙা দা”, ঢ—“লেজভরা ধা”, ণ—“পেটোরা পা”, ত—“গঙদা টা”, থ—“জয়দা ঠা”, দ—“ছলনি ডা”, ধ—“তলমো চা”, ন—“কার্বাণ্যা না”, প—“পাল্যা পা”, ফ—“উন্নববোঝা কা”, ব—“উন্নবু বা”, ভ—“চেরেদা ভা”, ঝ—“বুগদ্-পদলা মা”, য—“ছিমুছ্যা য্যা”, র—“বিদাক্যা রা”, ল—“তলমুলা লা”,

(১) এই ‘ওয়া’ উচ্চারণ উত্তর-পশ্চিমাকলেও শুনিতে পাওয়া যায় । যথা—যোয়ারী (যারী), ঈশোয়ার (ঈশ্বর) ইত্যাদি ।

ব—“বাজ্জা ওয়া”, স—“ভূতিবক্যা ছা”, হ—“উয়রমুরা ছা” এবং হল—  
“লাজিরে ছা”।

এই সমস্তর বাজ্জনবর্ণকে অকারান্ত উচ্চারণের উপযোগী করিতে পূর্বোক্ত-  
রূপে মন্তকোপরি (৫) রেফস্থাপন প্রয়োজন। ই-ঈকার (০) শূন্য  
বিশেষ মাত্র, বাজ্জনের দক্ষিণপার্শ্বোপরি বসে। এবং

স্বরসংযোগ।

উ-উকার (১ বা Δ) একটান বা ছইটান নিমে,

একার (৬)—ঠিক বাদলার স্থায় পূর্বভাগে স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন পূর্ববর্ণিত  
পদ্ধতিতে ঐকার যোগ করিতে হইলে, মন্তকে রেফ এবং বামযুখী শিখা উত্তোলন,  
একারে মন্তকে রেফ এবং পাদদেশে ‘উ’ সংযুক্ত করা গিয়া থাকে। উদাহরণ যথা,—  
ক কা কি কু কু কে কৈ কো



ক ক কা কি কু কু কে কৈ কো

অম্মস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু—পৃথক্ বর্ণ নহে, হলস্ত বর্ণেরই রূপান্তর মাত্র।  
বলিতে কি, ইহাদের মধ্যেও তাদৃশ বিধি লজ্জিত হয় নাই। পূর্বেই বলা  
হইয়াছে, চাক্‌মালেখায় হলস্ত ‘ন’ দ্বারা চন্দ্রবিন্দুর  
হসন্তবিধান।

উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। অপর অম্মস্বার এবং বিসর্গের

নিমিত্ত সংস্কৃতাত্মকরণে যথাক্রমে (•) একটা এবং (••) দুইটা বিন্দু ব্যবহৃত  
হইয়া থাকে। পরন্তু এই বিন্দুগুলি সংযোক্তবা বর্ণের মন্তকোপরি স্থান পায়।  
হসন্তচিহ্নও (—) মাত্রার স্থায়, তবে বর্ণের দ্বয়ত্বপরি স্থাপিত হয়। ইহা-  
দিগের ভাষায় ক, ঙ, চ, ঞ, ত, ন, প, ম, য়, র এবং ল এই কয়েকটা বর্ণে মাত্র  
হসন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে হসন্তযোগে ভিন্ন ভিন্ন  
উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা,—ক্ (কাক্), ঙ্ (কাঙ্), চ্ (কাচ্), ঞ্ (ঞেই),  
ত্ (কাৎ), ন্ (কোন্), প্ (কোপ্), ম্ (কাম্), য়্ (কেই), র্ (কার্), ল্ (কাল্)  
ইত্যাদি। কিন্তু অপর কোন স্বরান্ত বাজ্জনের সহযোগে উচ্চারণের উক্ত ‘ক’ ইং  
বাঁয়। হলস্ত ‘ওয়া’র উচ্চারণ—য়। বর্ণবিজ্ঞানের এই অংশ অত্যন্ত হ্রস্ব। তবে  
সংযুক্তবর্ণ লিখিবার একটা বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহা নামান্তরূপ জটিল  
হইলেও অপরাপর নিয়মের তুলনায় বর্ণবিজ্ঞানের সরল সঙ্কেত বলিতে হইবে।  
উপরেই যেখান হইয়াছে, বর্ণীর বর্ণের প্রথম ও পঞ্চমবর্ণে মাত্র হসন্তযোগ করিতে  
পারা যায়। সংযুক্ত বর্ণের যে বর্ণটা নিঃস্বর, তাহা যদি বর্ণের প্রথম বা পঞ্চম বর্ণ  
না হয়, তবে সেইটা যে বর্ণের—সে বর্ণের প্রথমবর্ণোপরি হসন্ত চিহ্ন দিয়া, পরে

উক্ত বর্ণ অকারান্ত করিয়া বসাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন ‘গয়’ ; চাক্ষু-  
লেখায়—‘লক্ষণ’। অজ্ঞাতঃ ‘স’ তে হসন্তচিহ্ন প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা নাই।  
যেখানে ‘স’ কে হসন্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তথায় ‘চ’—‘স’ এর অধিকার  
পায়। যেমন পুরচ্কার ( পুরস্কার ), বাচ্প ( বাপ ) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য,  
ইহাদের মধ্যে রেফের কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নাই ; রেফ যুক্ত করিতে হইলে পূর্ব-  
ভাগে ‘ব’ স্থাপন করিয়া তৎপার্শ্বে বর্ণটী লিখিতে হয়। উচ্চারণের পক্ষে ইহাদের  
আরও একটী সরলবিধি এই যে, শব্দের অন্ত্য যে বাঞ্জন হসন্ত করিয়া উচ্চারিত  
হয়, লিখিবার সময়ও তাহাতে হসন্তচিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে।

য ( য ), র এবং ব ( ওয়া ) এই কতিপয় বর্ণ মাত্র ‘ফলা’রূপে অপর বাঞ্জনের  
সহিত সংযুক্ত হয়। ‘য ফলা’টী (  ) প্রায় বাঙ্গলারই স্বরূপ—বর্ণের পশ্চাতে  
বসে। ‘র ফলা’টী (  ) একটু অধিক বক্র বটে, কিন্তু

ফলা।

দেখিলেই বাঙ্গলাভাব আসে এবং তদনুরূপ পাদমূলে বসিয়া  
থাকে। প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, ইহাদের স্বতন্ত্র কোন স্বকার নাই। কিন্তু এত-  
ক্ষণ যাবৎ তাহার কার্য বুঝাইবার সুবিধা পাইয়াছিলাম না। কোন বর্ণে স্বকার  
যোগের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে ‘র ফলা’ ও ইকার যোগ করিলেই উদ্দেশ্য সম্পা-  
দিত হয়। যথা,—ক্রিত ( কৃত )। এতদ্বির ‘ব’ অর্থাৎ ‘ওয়ারফলা’ ও (০) একটী শূন্য  
মাত্র—বর্ণের পদপ্রান্তে স্থান পায় ; উচ্চারণ সেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেরই মত ‘ওয়া’  
অর্থাৎ ঘোয়ারী ( ঘারী ), ঘোয়ারিকা ( ঘারিকা ) ইত্যাদিক্রমে হইয়া থাকে।  
নিম্নোক্ত প্রতিলিপি হইতে আশা করি, মদীয় বক্তব্য সহজেই স্বদয়ঙ্গম হইবে।—

স    ৎ    পু    ত্র    বং    স    উ    চ্    জ    ল    ক    রে

সকলভূত ভূত্বং সৃষ্টম্ নশ্বং

গ্রি চ্ ম কা লে    র বি র    কি র ণ    তি ক্ ণ হ

সৃষ্টম্ নশ্বং    সৃষ্টম্    সৃষ্টম্    সৃষ্টম্

ভাষার মূল এবং গঠনপ্রণালী যথাসম্ভবরূপে প্রদর্শিত হইল। পরিশেষে  
বাঙ্গলা, পালি এবং সংস্কৃত ভিন্ন অপভ্রংশের ভাবা হইতে যে যে শব্দ ইহাদিগের  
মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়াই বর্তমান  
অপভ্রংশ ভাষার শব্দ।  
পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি। তবে ইহা দ্বারা



বিজাতীয় সংশ্লেষের গভীরতা পরিমাপ করিতে গেলে, প্রমাদে পতিত হইতে হইবে মাত্র। কারণ, মধ্যপ্রিয়াদি ভাষার, যাহাদের সহিত ইহাঙ্গের বহুকাল ধরিতা একত্র বসবাস চলিতেছে, অতি অল্পসংখ্যক শব্দই চাক্‌মা সমাজে অধিকার পাইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত শব্দসংখ্যা লইয়া জাতীয় নৈকট্য পরিমাপ নির্ণীত হইলে বিপরীত ফলই লাভ হইবে। মধ্যভাষার শব্দ যথা :—খবং (গধং), খিসা (কিজা), গুয়াম্ (গুয়াবা অর্থাৎ পেরারা), খিরা (দংখেরাখী. অর্থাৎ ক্রিরা), লোতা (লোরা অর্থাৎ ঘটা)। ইত্যাদি ; ত্রিপুরাভাষার শব্দ যথা :—তাগল (তাকুয়াল অর্থাৎ দা) ইত্যাদি ; আরবীভাষার শব্দ যথা :—হাগিম, হুগুম, মুলবী (মোলবী), মেজবান্, চাবি, চালাগ, জিব ইত্যাদি ; পারসীভাষার শব্দ যথা :—ফোজদারী, কাছারী, লো, জোয়ানবন্দী (জবানবন্দী), ফর্যাতি (ফরিয়ারী) ইত্যাদি ; হিন্দিভাষার শব্দ যথা :—মামী, জার (জারা অর্থাৎ শীত), আন্দাজ, চেয়ারা (চেহারা), জঁয়ল (জল) ইত্যাদি ; চীনভাষার শব্দ যথা :—ছাটিন্ (শাটিন) লেছু (নিছু), চিনি ইত্যাদি ; মালয়ভাষার শব্দ যথা :—ছাউ (শাউ) ইত্যাদি ; হিব্রুভাষার শব্দ যথা :—সেতান্ (সন্নতান) ইত্যাদি ; ইংরাজীভাষার শব্দ যথা :—গভর্নমেন্ট (গভর্নমেন্ট), কমিছনার (কমিশনার), জজ, মাজিষ্টার (ম্যাজিষ্ট্রেট), আশিল, হুটিস (নোটস), গলস (গ্লাস), রেকার (রফার) ইত্যাদি ; ফরাসীভাষার শব্দ যথা :—ফেঁরঁই (কিরিজি), জিন, বিছকুট (বিসকিট) ইত্যাদি ; পটুগীজভাষার শব্দ যথা :—বারান্দা (বারেন্দা), ফিতা, বেলা (বেহালা), গির্জা (ইগ্রিজা—আমাদের কথার গির্জা), পাদারী (পাদ্রী), কাদিরা (কেদেরা), ছাবন (সাবান), আলমারী (আলমিরা) ইত্যাদি ; স্পেনীয় ভাষার শব্দ যথা :—সেরি ইত্যাদি ; দেনমার্ক-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা :—বারান্দা (ব্রাণ্ডা), ডেক ইত্যাদি ; ইতালী-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা :—সোদা (সোডা), কুস্পেনী (কোম্পানী), পিতল, লিভি (লিট), বুক্‌ছ্ (ক্রু), কাপ্তান, ইত্যাদি নানা বিজাতীয় শব্দের দ্বারা চাক্‌মাক্‌ভাষা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে এবং কদর্যা বাঙ্গলা শব্দগুলিও ক্রমে সংকুচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মূল শব্দের সন্ধান পাওয়া গেলে অপ-ভ্রষ্টতার নির্কীর্ণন স্বাভাবিক। অধুনা ইহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত কথোপকথনে তাদৃশ কোন শব্দবিকৃতি সহজে ধরিতে পারা যায় না। আশা করা যায়—শিক্ষার প্রভুত বিস্তার হইলে, বাঙ্গলা ও চাক্‌মাক্‌ভাষার উপলব্ধি করিবার উপযোগী কোন বিশেষ ভারতম্য থাকিবে না।

# উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:—

[ ১ ] কবি ও কবিতা ;

[ ২ ] বারমাস—[ ৩ ] ছড়া—[ ৪ ] হৈয়ালী ।

—:—

[ ১ ]

কবিতা সঙ্গীত শাস্ত্রের সুশোভন পরিণাম । ভগবদন্ত মধুর কণ্ঠ না পাইয়াও  
কবি ভাবের নীরব ঝঞ্ঝারে ছন্দের মোহিনী ক্রিয়ায় জগৎ মাতাইয়া তোলেন ;  
কবিতা ও সঙ্গীত ।

সেতার, এস্রাজ, পাখোঁরাজ, তবলা প্রভৃতি নানা রাগ-  
রাগিনী আলাপী মনোহর যন্ত্রনিচয় তাঁহাদের প্রয়োজনে  
আসেন। সঙ্গীতের পদ জানা থাকিলে ও তদ্বারা কণ্ঠস্থিমানসে সুগায়কের আশ্রয়  
আবশ্যক ; কিন্তু কবি সেরূপ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন । উভয়ের রচনা  
প্রণালীতেও প্রভেদ বিস্তর । কবিতায় ভাষা ও ব্যাকরণের প্রভাব যত অধিক,  
সঙ্গীতে তেমন নয় । সঙ্গীতে পদ্য-গৌরব যেন অতি সামান্য, তাহাতে কেবল  
মাত্রা লইয়া গণনা ; শেষভাগে স্বর বা ব্যঞ্জনের ঈষৎ সাদৃশ্য থাকিলেই যথেষ্ট ।  
পরন্তু কবিতা অমিত্রাকরে চলিলেও চরণ পূরণ কঠিনতর—প্রত্যেক স্বরবর্ণ  
লইয়া অক্ষর গণনা করা হয় । তদুপরি আবার যতির কড়া শাসন রহিয়াছে ।

ফলতঃ এস্থলে আমার এতাদৃশী ভূমিকা নিতান্ত নিরর্থক । চাক্‌মাদিগের  
কবিতাগুলি এযাবৎ সঙ্গীতের পাশমুক্ত হইতে পারে নাই । প্রায় কবিতাই  
প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত গানের অমুরূপ অল্প এক উপবাক্যের সহিত অতি  
নির্কষ্ট মিলনে সহবাস করিতেছে । এমন কি, এ সকল তান-লয় সমন্বয়ে গীত  
হইয়াও থাকে । তথাপি ভাহাদিগকে যে কবিতা আখ্যা দিলাম, সে কেবল ভাব-  
প্রবণতা এবং ঐতিহাসিকতার সনির্বন্ধ অমুরোধে, নানা রাগ-রাগিনীতে উদ্দীপ্ত  
হইলে ও রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকাগুলিকে যেমন  
কবিতার কথকতা ।

কবিতাসমষ্টি ধরা হয়, এইগুলিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ।  
উৎসব-আমোদে চাক্‌মাগণ কথকদিগের সাহায্যে সেই পৌরাণিক কাহিনী সমূহ  
তুনিবার ব্যবস্থা করে । প্রশস্ত স্থানে ‘সভাঙ্গল’ সজ্জিত হইয়া থাকে । পরে  
যথাসময়ে নিমজ্জিতগণ সমবেত হইলে, “গেনকুলী” মহাশয় কোকিল-বিনিমিত

রাগিণীতে সভাজনকে বিমুগ্ধ করিয়া বক্তব্য আরম্ভ করে। নান্দীপাঠ তাহার প্রথম কার্য্য,—‘সভাবন্দন’ দ্বিতীয়। আধ্যাত্মিক উপসংহার হইলে গৃহস্থও উপস্থিত সাধারণের মঙ্গল প্রার্থনা এবং স্বকীয় বিনীত নিবেদন ইত্যাদি করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত সকলেই “গেনকুলীকে” পুরস্কৃত করে, বলা বাহুল্য, অপর সাধারণ অপেক্ষা গৃহস্থের পারিতোষিকের পরিমাণ অধিক থাকে।

কথকতা শিক্ষা সাপেক্ষ। এই তানলয়বদ্ধ কাহিনী এবং তদ্ব্যাখ্যা প্রভৃতিও শিখিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ চাক্‌মাদিগের এ সকল কথকগণকেও কবি বলা যাইতে পারে। যদিও তাহাদের বর্ণিত আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণ কবি বা কথক।

নিজস্ব নহে, তথাপি মধ্যে মধ্যে লোকরঞ্জন মানলে তাহাদের স্বীয় যোজনা যথেষ্ট দেখা যায়। সমগ্র চাক্‌মা সমাজে বর্তমানে প্রায় ১৫। ২০ জন প্রথিতনামা কথক আছে; তন্মধ্যে ‘আকুকাগা’ নামক অল্পই সর্ব-প্রধান। ইহার বাড়ী চেন্দ্রীরকুলে, সাকিন তৈচাক্‌মা—“কাক্‌সা গোছা”, “বালকাগোষ্ঠী” সম্বৃত। জন্মদিন লিপিবদ্ধ নাই, বয়স অনুমান ৫৬, ৫৭ বৎসর। এ বৃদ্ধ বয়সেও তাহার স্মমধুর কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, পরমপিতা তাহাকে দৃষ্টিশক্তিহীন করিয়া কোন সজ্জদেহ সাধন করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তজ্জন্ম ক্ষতি অনুভব করিতেছি।

আধ্যাত্মিকগুলির মধ্যে “ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান”, “চাটগা ছাড়া” “স্বপ্নপত্নী”, “স্বর্গপালা” এবং “লক্ষ্মীচরিত্রের” নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথমোক্ত আধ্যাত্মিকগ্রন্থের স্থূলমর্মে প্রথম পরিচ্ছেদেও বিবৃত করিয়াছি; এস্থলে সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হইল। যে যে স্থানে বর্ণনা-বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট করিয়াছেন।

হইয়াছে, তত্তৎস্থল মাত্র অবিকৃত রাখিয়া পাঠকসাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে অপর আধ্যাত্মিক ভাগ গদ্যে রূপান্তরিত করিয়া দিলাম।—

### ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যান।

সাধ্বীগিরি রাজ্যের একমাত্র কন্ডা, নাম কপতি। কপতি অয়ংবরা-হইয়া জয়মঙ্গলকে বিবাহ করে। তাহাদের সংসার বড়ই সুখে চলিতেছিল; কিছুকাল পরে কপতি এক কন্ডা প্রসব করিল; তাহার নাম হইল “ধনপতি”।

চম্পক নগরে সাধ্বীগিরি রাজা ছাড়া হরিশ্চন্দ্র নামে অপর এক রাজা ছিলেন। তাহার পাটরাণীর নাম—মেনকা। রাধামোহন ইহাদের পুত্র এবং

কপতি ও মেনকা।

নিম্নপতি কন্ডা। বাল্যকাল হইতেই কপতি ও মেনকার মধ্যে বড় বেশী ভাব জন্মিয়াছিল। বয়সাবধিকার সহিত

তারা অধিকতর পরিগুটি লাভ করিতে লাগিল । একে অপরকে প্রাণান্তপণে সাহায্য করিত ; একে কোন স্থানে কার্যোপলক্ষে ঘাইতে হইলে আপন পুত্র কস্তাকে অস্ত্রের হেণাকতে রাখিয়া ঘাইত । একবার মেনকা রাধামোহনকে কপতির নিকট রাখিয়া যায় । রাজা সাক্ষিবংগিরি তখন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন । বৃদ্ধ বাৎসল্যাকর্ষণে ধনপতি ও রাধামোহনকে একই দোলনায় রাখিয়া নিজেই দোলাইতে লাগিলেন এবং গাহিতেছিলেন,—

“সোমা-দোলনং রূপার দড়ি

দাদাটল বেবেই ঘুম যাদন্ সমারে পড়ি ।

অলিরে অলি ধি—ধি—ধি ॥”

অন্তর্ভাঃ—“সোমার দোলনার রূপার দড়ি ; নাতনী আমার নাতীর সঙ্গে পড়িয়া ঘুম ঘাইতেছে । ( অলিরে ইত্যাদি দোলনায় তান । )”

বৃদ্ধ যেন লোকাভীত প্রতিভাবলে ভবিষ্যতের মনোমুগ্ধকর চিত্র দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন । তাঁহার দোলনার অপর গান যথা :—

“হাদং লয়ে বাদোল বাশ কুর্জাং লয়ে গুলি ;

আমা-দাদা মারি আনি দিব গৈ বনর পাখী ।

অলিরে অলি ধি—ধি—ধি ॥”

অন্তর্ভাঃ—“হাতে ‘কামঠা’ ও কোচরে ‘গুলি’ লইরা ( রাধামোহন ) দাদা আমার বনের পাখী মারিয়া আনিয়া দিবে । অলিরে ইত্যাদি ।”

ইহাতেও বৃদ্ধের দূর্বদর্শিতা পরিবাস্ত হইতেছে ।

ক্রমে ধনপতি ও রাধামোহন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে, উভয়ের মধ্যে অলঙ্কিত ভাবে প্রণয় সংস্থাপিত হয় । অবশেষে একদা রজনীভাগে উভয়ে অরণ্যে পলাইয়া যায় । এদিকে তাঁহাদের ধনপতি ও রাধামোহন ।

খোজ আরম্ভ হইল । অনেক অমুসন্ধানের পর তাঁহারা এক নদীকূলে ধৃত হন । প্রত্যাবর্তনের পর বিশেষ আড়ম্বর সহকারে যথাবিধি তাঁহাদের পরিণয় কার্য্য সুসম্পাদিত হইল ।

চম্পকনগরের প্রধান রাজার নাম উদয়গিরি, সাক্ষিবংগিরি ও হরিশ্চন্দ্র তাঁহারই সামন্ত রাজা । উদয়গিরি রাজার দুই পুত্র ; বিজয়গিরি জ্যেষ্ঠ এবং সমরগিরি কনিষ্ঠ । রাজা বার্ষিক্যদশায় উপনীত ; উপযুক্ত পুত্র বিজয়গিরির হস্তে রাজ্য ভায় সমর্পণ করিবার করুণা করিতেছিলেন । কিন্তু বিজয়গিরি ইতিমধ্যে দিগিজয় ব্যাপদেশে দক্ষিণাতিমুখে অভিযান করিতে সমুদ্র রাধামোহনকে সৈন্যপত্যে বরণ ।

করিলেন । সর্বসম্মতিক্রমে রাধামোহনকেই সেনাপতিপদে বরণ স্থিরীকৃত হইল । তজ্জন্ত রাধামোহনের নিকট লোক প্রেরণ

করিলেন। ধনপতি পূর্বরাত্রে ভীষ্মরাজ নারক পক্ষীবিশেষের জন্মনন্দনিনী  
তিনিয়াছিলেন। সেই কারণে অনিষ্টপাত ভয়ে ধনপতি রাধামোহনকে রাজ্যল  
গমনে প্রথমতঃ বারণ করেন, কিন্তু রাধামোহন রাজ্যদেশের প্রতি অসহ্য  
প্রদর্শন করিতে সাহস করিলেন না। বিজয়গিরি সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি  
রাধামোহনকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া প্রতিক্ষা করিলেন যে, যদি যুদ্ধে  
জয়ী হইয়া ফিরিতে পারেন, তবে তাঁহাকে বিজিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সমর্পণ  
করিবেন। ইহাতে রাধামোহন অধিকতর উৎসাহিত হইয়া অবিলম্বে মধুসূতা  
চৈত্রের দশম দিবসে চম্পকনগর হইতে যাত্রা করিলেন। পথে আসিতে মনে  
হইল, এ সময়ে একবার ধনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া কর্তব্য। সৈন্ত  
সামন্ত সমভিষাহারে স্বীয় প্রাণেশ্বরকে বরণসজ্জায় বিভূষিত দেখিয়া ধনপতি  
পূর্বোক্ত অমঙ্গলশঙ্কায় অধীরা হইলেন। রাধামোহন নানাবিধ প্রবোধবাক্যেও  
তাঁহাকে সাস্থনা করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাধামোহন—

(“সুরে এতন্ পিপীরা,”) (১)

এরজি তগাগৈগে তিবিরা।”

অতিনিধি দিবার জন্ত ‘ত্রিপুরা’ অবরণ করিতে লাগিলেন।

“(কুচি রাগ্যা কাদাবন,)

জয়নারায়ণ রোয়াজা-ইছ্ গেল্ রাধামন।”

রাধামোহন (ত্রিপুরাদিগের জনৈক সর্দার) জয়নারায়ণ রোয়াজার নিকটে গেলেন।

“(ছরা আগারে জুনি যায়,)

তুমি রাধামন কুনি যায়।”

(তাপিত ভাঙি পিপাতা,)

জয় নারায়ণ রোয়াজা পুথার লয় এই কথা।”

রাধামোহন আপনি কোথায় বাইতেছেন, জয়নারায়ণ রোয়াজা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

“(চৈদে বৈশাখে শৈল্ বিজু,)

এরজি তগেহুং এছ্যং তব্ ইছ্।”

(রাধামোহন বলিলেন) তোমার এখানে (যুদ্ধের) অতিনিধি খুঁজিতে আসিয়াছি।

“(আলু কুরি কামাতুন,)

এরজি পোম্মে তমা-পাড়াতুন।”

তোমার পাড়া হইতে অতিনিধি পাইব কি?

(১) এই বাক্যবদ্ধ পংক্তিগুলি কেবল পদবিন্যাসের জন্ত ব্যবহৃত; বাক্য বিধরের সহিত  
তাঁহাদের অর্থগত কোনও সঙ্গন্ধ নাই।

“( বেইনে বুনি কর তারাম্, )

পাড়াপড়সী ডাকিল জয়নারায়ণ ।”

জয়নারায়ণ ( রোজা এই কথার ) প্রতিবাসীগণকে ডাকিলেন ।

“( ধারেরা ভাগলৈ কাং বন, )

এরজি আগনে কোন জন ?”

( জিজ্ঞাসা করিলেন ) তোমরা কেহ ( সেনাপতি রাধামোহনের ) প্রতিনিধিরূপে অগ্রসর হইতে পার ?

“( শুলা খেলুং কুম্বে, )

ছয় কুড়ি টেঙা দিদ কর মুজুঙে ।”

( এসজ ) আগামীতে ১২০ টাকা দিতে বলিতেছে ।

ইহাতে তাহারা বলিল :—

“( চৈল্ কারি ঝারিদং নয়, )

ছয়কুড়ি টেঙা কা—দ্বিশত টেঙা দিলেও আমি পার্ত্তং নয় ।”

১২০ টাকা কেন—দুইশত টাকা দিলেও আমরা পারিব না ।

অনন্তর—

“মুপারী কিনি আধাপণ )

তিবিরি ন পোই কিরি এগ ঘরং রাধামন ।”

রাধামোহন ত্রিপুরা ( প্রতিনিধি ) না পাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

“( উড়েল বয়াংর রণগতি, )

এরজি পেলৈ কি নপেলৈ পুঝার লয় ধনপতি ।”

ধনপতি ( রাধামোহনকে ) প্রতিনিধি পাইলেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলেন ।

রাধামোহন বলিলেন :—

“( ইজরং নিগলি চান্ ন-চান, )

দ্বিশত টেঙা দিলেও তিবিরি খাম্ ন-খান্ ।”

দুইশত টাকা দিলেও কোন ত্রিপুরা সাহস করে না ।

পরিশেষে রাধামোহন ধনপতিকে অনেক বুঝাইয়া চৈত্রের ১৫ই তারিখে রণবাজা করিলেন । আর এদিকে পতিবিরহ বিধুরা ধনপতি বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

“লইয়ে পরাণে বিড়বিড়ি

খেলুং মাথা তর রাজা বিজয়গিরি ।”

‘পর্যণ হটকট করিতেছে, ( সুব্রাজ অর্থে ) রাজা বিজয়গিরি তোর মাথা খাই ।’

বলিয়া মাথা ভাল এ সময়ে ধনপতির গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়াছিল ।

ইতি ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যান ভাগ সমাপ্ত ।

## চাটিগাঁ ছাড়া ।

এই আখ্যায়িকাখানি উপরি উক্ত উপাখ্যানের দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র । তবে ইহার বর্ণনীয় কথা যে দ্বিখন্ড, তাহার প্রথম উভাগ হইতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে । বখা ;—

যখন যুবরাজ বিজয়গিরি দক্ষিণাভিমুখে দ্বিখন্ডের গমনে সক্ষম করিতেছিলেন, সেই সময়ে—

“(রাঙা কালা সূইং ছিনে),

নানান কুসপন দেগে রোয়াং রাজা দগিনে ।”

দক্ষিণে রোয়াং রাজা (১) অর্থাৎ আরাকান রাজ নানা কুৎস দেখিতেছিলেন ।

কেবল স্বপ্ন :নেহে, দিনে শৃগালের ডাক, অহর্নিশ শকুনি প্রভৃতি উড়িতেছে ; বেড়াইতে বাহির হইলে শব্দদর্শন ইত্যাদি নানা অমঙ্গল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল । একদা তাঁহার জলপূর্ণ ঘটা হইতে কুকুর আসিয়া জল খাইয়া গেল । এইরূপে নানা অন্তত চিত্র দর্শনে মম্বরাজা ব্যাকুল হইলেন এবং কারণ জানিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ ডাকিলেন ! দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিলেন :—

“(বজ লগে বুধবারে )

জগ্নেয়ে শতুর উত্তরে ।”

‘উত্তরদিকে শত্রু জয়গ্রহণ করিয়াছে ।’

ইহা শুনিয়া মম্বরাজ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং গোপনে শত্রু-বিনাশের জন্ত জনৈক পারদর্শী নৃত পাঠাইলেন । কিন্তু সে শত্রুর কোনও সন্ধান পাইল না, অধিকন্তু রাজাকে আসিয়া নিরাশ্রয় আশ্বাস দিল । রাজাও তাহাতে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন ।

এদিকে যুবরাজ বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামোহনকে অগ্রে পাঠাইয়া অবিলম্বে তিনি বরংও আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন । কালাবাহা প্রদেশে ভদ্রীর শিবির সংস্থাপিত হইল । যুবরাজকে তথায় রাখিয়া রাধামোহন সৈন্ত সামন্তগণসহ বুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন । সৈন্তগণ যুদ্ধে বাইতে বাইতে বলিতেছে:—

“(গেলুং ছরার নে উজানি,)

মম্বদেশে কুহু আছে কি জানি ?”

ইহার উত্তরাভিধ্ব্যি বাইতেছি, কিন্তু সীমা পাওয়া বাইতেছেন, —মম্বদেশ যে কোথায় আছে, কে জানে ?

“( মানেক বেগানী কল্কলি ),

কত সৈন্ত কতন কল্কলি ।”

কতকগুলি সৈন্ত কোলাহল করিতেছে ।

“( তোমা পিদোল কেচ্ছন দে, ),

কত সৈন্তগণ এতন দে ।”

কত যে অর্বাং অগণিত সৈন্ত আসিতেছে ।

“( তোনে রাগিনি ভাত খেলাক )

সমুদ্র সাগর নি লাগ পেলাক ।”

( অবশেষে ) সমুদ্রতীরে আসিয়া সকলে উপনীত হইল ।

সেনাপতি বলিতেছেন :—

“( আশুগং দিলে ঘি গলে, )

সমুদ্র পার হবং গম দোলে ।”

‘সুবিধা মতই সমুদ্র পার হইব ।’

কবি দেখিলেন :—

“নাভের উল্লাসে রাধামন

কৈগাং পলাকি সৈন্তগণ ।”

সৈন্তগণ কৈগাং নদীতীরে উপস্থিত হইলে রাধা মোহন আনন্দে নাচিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মঘরাজ-সমীপে দূত প্রেরণ করা হইল । সংবাদ শাইয়া মঘরাজা অস্থির হইলেন এবং কিংকর্তব্য পরামর্শের নিমিত্ত মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিলেন ।  
যুদ্ধ করাই মন্ত্রণা স্থির হইল । দূত আসিয়া উত্তর জ্ঞাপন করিলে সেনাপতির আদেশক্রমে—

“( জাদি পূজাং দিলুং ঘি, )

মঘদেশ কুলে সৈন্তগণ পলাকি ।”

‘সৈন্তগণ মঘদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

“( পাজারি দোকানং কিটকিদি, )

জাগা নদে মঘরাজা এককিদি ।”

‘মঘরাজা তাহাদিগকে একটুকু হানও দিলেন না ।

“( বকিৎ বাজের ধলবাজা, )

মঘরাজা ক’ন্তে কু হুন এল কন রাজা ?”

মঘরাজা বলেন, কোথা হইতে কোন্ রাজা আসিল ।

অন্তঃপর রাধামোহনের সঙ্গে মঘরাজার যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কবির ভাষায়

“রাধামনর সা’স ডাঙর,

আতে আতে চাকুরাজা রাজ্য যারি লয় ।”



রাধামোহনের সাহস খুব বেশী ; তবলে চাক্‌মারাজা ধীরে ধীরে বেশ জয় করিতে লাগিলেন।

ক্রমে—

“লৈইজার সমারে সৈন্তগণ,

রোয়াংকূলে লুণ্ঠে রাধামন।”

রাধামোহন সৈন্তগণ সমভিব্যাহারে রোয়াং কূলে অর্থাৎ বর্তমান আরাকানে উপস্থিত হইলেন।

ইহাতে অতিশয় কুপিত হইয়া

“( ছরাছরিং নে গাধিব, )

মঘরাজা ক’তে চাক্‌মারাজাকে কাবিব।”

মঘরাজা বলিলেন, ‘চাক্‌মারাজাকে কাটিব।’

কিন্তু—

“( বজ্জিবেইজার আধারে, )

রোয়াং রাজা লারেই ন-গরে ;

লারেই গরে পান্তরে।”

‘রোয়াংরাজা নিজে যুদ্ধ করিলেন না, তদীয় পাত্র অর্থাৎ সেনাপতি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।’

( অথ যুদ্ধ বর্ণনা। )

কবি বলিতেছেন :—

“ডাকের তুলি ঘনে ঘন,

মার মার হুকুম দিল দাদা রাধামন।”

দাদা রাধামোহন ভীষণ শব্দে ঘন ঘন চীৎকার তুলিয়া ‘মার মার’ আদেশ দিলেন।

“গন্তন মঘে লিক্‌লিকি,

মঘ-ইলি সৈন্ত পন্তনরে কমি কি ?”

মঘেরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল ; তাহাদের পক্ষে কি কম অর্থাৎ অগণিত সৈন্ত পড়িতেছে।

“মঘে গন্তন হাহাকার,

রাজ্য গন্তন চাক্‌মার মঘের অল্যাচার।”

চাক্‌মার মঘের রাজ্যে অত্যাচার করিতেছে ; মঘেরা হাহাকার করিতে লাগিল।

‘পিলে মঘরাজা হমিল,

রাধামন সমারে ন জিন্‌ল।”

অবশেষে মঘরাজা পরাস্ত হইলেন ; রাধামোহনের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলেন না।

“( বজ্জিৎ বাজের ধলবাজা, )

তুদি গরি ডাংগর মঘরাজা।”

স্বরাজা ( রাধামোহনকে ) সবিনয়ে আহ্বান করিলেন ।

“কহে স্বরাজা রাধারে,

রেজা গব্বুং তুমারে ।”

স্বরাজা রাধামোহন কে কহিলেন, তোমাকে রাজ্য বুঝাইয়া দিতেছি ।

“গয়া গজা কলুং দান,

চাংগে তত্তুন পরাণ দান ।”

গয়া গজা অর্থাৎ সর্ব্ববই তোমাকে দান করিলাম; তোমার নিকট ( মাত ) প্রাণ তিক্রা চাহিতেছি ।

তদনন্তর রাধামোহন রোমাংকুল হইতে স্বয়ং দেশজয় করিতে ছুটিলেন ।  
প্রায় পাঁচদিনে—

“জালি পাগর্যা লুমে লাগ,

ছিহু সৈজগণ জিরে লাগ ।”

( খারং দেশের ) জালিপাগর্যা নামক স্থানে উপনীত হইয়া তথায় সৈজগণ বিজয় করিল ।

তখন—

“জাদি পুজাং নে বি দিল,

বিজয়গিরি রাজা দ্বিরাজা জিদিল ।”

( যুব ) রাজ বিজয়গিরি হই রাজ্য জয় করতে ধর্ম্ম-কামে বজ্রাঘাতন করিলেন ।

“রণং জিনি বার্লী তেজ,

সিতুন গেলাক্ বিলে (১) অক্সাদেশ ।”

যুদ্ধে জয়লাভে ( রাধামোহনের ) তেজ বাড়িল,—অনন্তর তথা হইতে অক্সাদেশ ( উক্তরাজ )  
যাত্রা করিলেন ।

এখানে অক্সাগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধে । তাহাতে রাধামোহন  
মুর্ছাগত হইয়াছিলেন । কথিত আছে, নারায়ণ স্বয়ং বৈজ্ঞবেশে আসিয়া  
তাঁহার চৈতন্ত্য সম্পাদন করেন । সেনাপতির মুর্ছা-  
রাধামোহনের মুর্ছা ।

সংবাদ লইয়া তদীয় সারথি কুঞ্জধন কালাবাঘা প্রদেশে  
স্বরাজ বিজয়গিরির নিকট যায় । তজ্জ্ববে বিজয়গিরি বিলাপ করিতে লাগি-  
লেন :—

“ওরে পাত্রগণ কি হব ?

লারেই সক্ষর লারেং পোল্ কি হব ?”

ওহে অমাত্য সকল, যুদ্ধের সেনাপতি পড়িয়া গেলেন; উপায় কি হইবে ?

অবশেষে স্বরাজ রাধামোহনের উদ্ধারার্থ কুঞ্জধনের সহিত আরও অধিকতর

(১) বিলে—পদপূরণে ।

সৈন্ত পাঠাইলেন । এদিকে সেনাপতি সংজ্ঞালভ করিরাছিলেন । অনন্তর তিনি নবাগত সৈন্তসমূহকে লইয়া একুশ বিক্রমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন যে, অবিলম্বে—

“( পিতা হুবি সিতেল, )

রাধামন তিন রাজ্য জিহিল ।”

রাধামোহন ( মধ্যদেশ, খাঃ রাজ্য এবং অস্ত্রাদেশের ) রাজত্বকে জয় করিলেন ।

অনন্তর রাধামোহন অস্ত্রাদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্বদেশ আক্রমণ করিলেন । ইহার বর্তমান নাম কাঞ্চনপুর ।

“কাঞ্চন রাজ্য লারেই ক্ষেমা দিল,

রাধামনে কাঞ্চন নগর জিহিল ।”

কাঞ্চনপুররাজ বৃদ্ধ করিলেন না, হুতরাং রাধামোহন অনায়াসেই কাঞ্চননগর জয় করিলেন তখন বলিলেন :—

“এবে জিহিলুং কাঞ্চন দেশ,

ফিরি উল্লা বেড়ংবৈ পুগর দেশ ।”

‘এখন কাঞ্চন দেশ জয় করিলাম, আবার পূর্বদেশ বেড়াইতে বাহির হইব ।’

“পুগে আগে রেজ্য কালঞ্জর,

সে মুখ্যা রাধামন দিল লড় ।”

পূর্বদিকে কালঞ্জর অর্থাৎ কুকিদেশ আছে, রাধামোহন তদভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

এই সংবাদ পাইয়া—

“কালঞ্জর রাজ্য কিগল,

পাখরী কিল্লা জুগাল ।”

কুকিরাজ কি করিলেন ? প্রস্তর নির্মিত দুর্গে প্রস্তুত করিলেন ।

পনের দিন ধরিয়া কুকিরাজার সহিত রাধামোহনের যুদ্ধ হয় ; অবশেষে কুকিরাজ পরাজিত হন । দিগ্বিজয় ব্যাপার শেষ করিয়া, রাধামোহন যুবরাজ-সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন । তখন—

“সে সংবাদ শুনি কি গল,

সিতুল বিজয়গিরি রাজ্য লড় দিল”

রাজা বিজয়গিরি সেই সংবাদ শুনিয়া ( কালাধাষ প্রদেশ হইতে ) ছুটিলেন ।

“( জাদি পুজাং দিলুং যি, )

মগল দেশং পলাকি ।”

মগল দেশে অর্থাৎ চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

চাক্ষুশরাজ আলিতেছেন শুনিয়া মধ্যরাজা শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ।

“( রাজ-আগাং তদেগ্গুংল, )

লুম্যেগৈ রাজা সাগ্নেরায় কুল ।”

“( যুবরাজ বিজয়গিরি একিবারে ) সাগ্নেরায়কূলে ( ব্রহ্মদেশে ) উপনীত হইলেন ।

রাধামোহন সাগ্নেরায়কূলে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বদেশপ্রত্যা-  
যর্জনের প্রার্থনা জানাইলেন । বিজয়গিরি কষ্টান্তঃকরণে সেমাপত্তিকে বিদায়  
দিলেন । প্রায় বার বৎসরের পর রাধামোহন স্বীয়  
রাধামোহনের স্বদেশবাত্রা ।

ভবনে উপস্থিত । ধনপতির গর্ভজাত পুত্র সারাদশ  
ষাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে । পুত্রকে বন্ধে করিতে পাইয়া রাধামোহন  
আনন্দসাগরে ভাসিলেন । ধনপতিও বহুকাল পরে ক্রদয়ের ধন ক্রদয়ে পাইয়া  
ক্রদয় জুড়াইয়া লইলেন ।

বিজয় গিরির দিগ্বিজয় যাত্রার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ রাজা উদয়গিরি কালক্রমে  
পতিত হন । সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিলে পাছে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, এই ভয়ে  
কনিষ্ঠ সমরগিরি সিংহাসনাক্রুত হইয়াছিলেন । রাধা-  
রাজা সমরগিরি ।

মোহন প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া রাজা  
সমরগিরি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । রাধামোহন রাজসকালে সমাগত  
হইলে সমরগিরি তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রথমেই জ্যেষ্ঠ  
সহোদরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । রাধামোহন তত্ত্বত্তরে বিজয়গিরির উপ-  
দেশানুসারে বলিলেন :—“তিনি আগামী অগ্রহায়ণ মাসে নিশ্চরই করিবেন ।”  
অনন্তর যুদ্ধের বিবরণ আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে বিজিত রাজ্যের বর্ণনা  
শেষ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন ।

এদিকে বিজয়গিরি বিজিতরাজ্যের সুশৃঙ্খলাবিধান করিয়া কথিত অগ্রহায়ণ  
মাসে স্বদেশাভিযুগে বাত্রা করিলেন । কালবাধা প্রদেশে আসিয়া গুনিলেন  
বিজয়গিরির খেব ।

যে, অনেকদিন গত হইল, বৃদ্ধরাজা লোকান্তর গমন  
করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ সহোদর সমরগিরি সিংহাসনে  
সমাসীন হইয়াছেন । তখন তিনি খেদ সহকারে বলিতে লাগিলেন :—

“( শুলা খোই নাই কুম্মে, )

কি’দোলে জানেইজুং গুরা তেইয়রে সালামে ।

কিন্নপে গিরা কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্মান জানাইব ।

“পর্যোয়া পত্তিত নেই যে দেশং

যেদং নয় সৈন্তগণ সেই দেশং ।”

যে দেশে শিক্ত পত্তিত নাই, যে সৈন্তগণ আর সেই দেশে বাইব না ।

“যেই যেই সৈন্তগণ যেই যেই,

কিরি যেই সাপ্পেরোর কূলে কিরি যেই ।

‘চল সৈন্তগণ চল, সাপ্পেরোর কূলে কিরিয়া যাই ।’

এইরূপে বহু আক্ষেপ করিয়া বিজয়গিরি সাপ্পেরোর কূলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তথায় সৈন্তগণকে বিজিতদেশবাসীদের হইতে পত্নীগ্রহণে অমুমতি দিলেন এবং তিনি নিজেও অপেক্ষাকৃত উচ্চবংশ-সম্ভূতা রূপে গুণে বরনীরা এক মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম ও আচারপদ্ধতি অবলম্বনে বসবাস আরম্ভ করিলেন ।

ইতি চাটিগাঁছাড়া সমাপ্ত ।

অবশিষ্ট “সৃষ্টিপত্তন”, “স্বর্ণপালা” এবং “লক্ষ্মীচরিত্র” পালাও এই ভাবের কবিতাপুঞ্জ মাত্র । করন্যার তাদৃশ পারিপাট্য না থাকায় এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করিলাম না । এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে নানা উপকথাও শুনা যায়, তৎসমুদয়ের “কিন্তুত কিমাক্রান্তিতে” আরব্য-পারম্প্রাপজ্ঞাসও হার মানে অধিকাংশই রাজা বা রাজকন্তার রহস্য লইয়া অমুহ্যাত, তাহার সহিত “রাক্ষসখোক্ষসের” বিবরণও বিরল নহে । দুঃখের বিষয় আলোচনার অভাবে ঐ সকল কোতুহলোদ্দীপক কাহিনী ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে ! অমরলেখক বক্ষিমচন্দ্র বঙ্গীর উপজ্ঞাসপ্রবাহে যে হিলোল তুলিরাগিয়াছেন, সমাজ তাহারই আন্দোলনে আত্মহার ! বিচার-বিবেচনাহীন বালকের দল যুবক-যুবতীর সেই সব প্রেমগাথা পড়িতে পড়িতে মকালপক হইয়া উঠিতেছে এখন আর ঠাকুরমার মুখের অনাবিল “আষাঢ়ে গল্পে” মনোযোগ বাইবে কেন ? সেই কারণে হতাশা হইয়া এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এখানে “জামাই মারনী” এবং “গোমতী নদী”র বিবরণ গর্ভ ছইটা মাত্র ঐতিহাসিক কাহিনী প্রদান করিতেছি, জানি না ইহারা পাঠকবর্গের কতদূর অনুরাগ লাভ করিবে ।

“আক্ষরি (১) এক রাজা এইল (২) তাঘুন (৩) এককোরা (৪) খুব দোল, (৫) বি এইল : তার দোল, স্বাদ্দ দেজে (৬) দেজে রাঠি হোল, আমাত্যসকল লগর (৭) গাভুর (৮) গাভুর পোরা-লগে (৯) তারে লভারডাই (১০) ছটুকদি লাগিলাক্, পরে রাজা ঠিক-গরি দিলদে (১১), একখান জামাই মারশীর গর ।  
টারেঙ (১২) মাদান্তুন (১৩) যে আম্ দিনলাই (১৪) —

(১) প্রাচীনকালে, (২) ছিল, (৩) তাহার নিকট, (৪) একটা, (৫) হুম্বর, (৬) দেপে, (৭) আমাত্য সকলের (৮) যুবক, (৯) পুত্রের সঙ্গে, (১০) লইবার অর্থাৎ বিবাহ করিবার জন্য, (১১) দিল যে, (১২) পর্য্যন্ত শব্দ : ইহা “জামাই মারনী” আখ্যায় কর্ণকুলী উত্তরতীরে সীতাপাহাড় ভরৈটরিয়ার্ডের অন্তর্গত চিংবক নামক স্থানে উপরি উক্ত ঘটনা নাকীখরুপে অবস্থিত । বহুকাল

বড় গাঙও পড়ি নাই (১), সাজুরি নাই (২) উকুলে পার হই পারিব, তারে তা-ঝিরোয়ে দিব । কথকনে (৩) বাম্ দি দি যলাগ্ (৪) ; পিজে (৫) এক দিচ্চা এক রাজা-পোয়া এই নাই (৬), রাজা-ঝিরে পেবাড়াই (৭), বাম্ দিদি চেল (৮), রাজা তারে ছি'চ্চা (৯) বাম্ দিবাধ্ নমিল ; তার্ পর দিচ্চা বাম্ দিবার কদা (১০) হল্ । রেবোৎ (১১) রাজা সগনে দে'ল দে, একোরা বুড়ী এই নাই, রাজারে বুদ্ধি নিগেই (১২) দিলদে, বুগৎ-পিনৎ ও দিহাদৎ (১৩) দিবা বালোজ্ বানি (১৪) পিজ্, আন্ হাদৎ একোরা ছাদি (১৫) ধরিনাই মিলি দিদ কোচ্ (১৬) । এই কই' নাই সেই বুড়া মিলাবোরা (১৭) অদেগা (১৮) হোল্ । বেইচ্চা (১৯) বুমতুন উদিনাই (২০) রাজা পোয়াবোরা (২১) রাজা-কদা-দগে (২২) বালোজ্ বানি নাই বাম্ দিল । বাম্ দি' নাই সাজুরি নাই বড়গাং পার হই নাই এইল্ । রাজা খুজী (২৩) হই নাই, সেই রাজাপোয়াবোরায়ে তা' ঝিরোয়ে দিল ।'

এই উত্তরশ্লোক কালক্রিতে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন এই কাহিনী চুটিকা দাঁড়ায় নয় । তাহাতে আবার বন্ধুর লুপ্ত কবিতা জীবন্ত কুমার দত্ত মহোদয় কবির ভাষায় যে এই অপূর্ণ "প্রেমের সাধনা" বহুভাষার দপ্তরে খতিয়া রাখিয়া ( আলোচনা নামক মাসিক ২য় সংখ্যা, ১৩১৪ খ্রষ্টাব্দ তাহার স্বাক্ষর আরও দৃষ্ট করিয়াছেন । আমরা তাহা হইতে অন্ততঃ শেষ লোকটি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সঞ্চরণ করিতে পারিলাম না । যথা,—

“নাজানি এ কবের কথা কে কহিবে হার,—

‘জামাই মারা’ পাঁহাড় ঘেরে

তেমনি ভাবে বিরাজ করে

নদী কিনারায় ।

জাগেগো কত ব্যাকুলতা

আজো দেখে তার ।”

“এটৈ (২৪) এক বুৰ্ঘা । তে এদগ (২৫) আলুজি (২৬) যে, কলা তারৎ (২৭) এরৈই (২৮) ন খায় । তাতুন (২৯) দিবা (৩০) ঝি এলাগ (৩১) । বুৰ্ঘা তারাবায় (৩২) একখান্ জুর কবি দিনাই (৩৩) কিছ ন গন্ত (৩৪) । একদিন কালবৈশাখী

(১৩) শীর্ষ হইতে, (১৪) ঝাঁপ দিয়া, (১৫) পড়িয়া, (১৬) সঁতারিয়া, (১৭) কত জনে, (১৮) মরিলেন, (১৯) শেষে, (২০) আসিয়া, (২১) পাণ্ডার নিমিত্ত, (২২) ঝাঁপ দিতে চাহিল, (২৩) সেইদিন, (২৪) কথা, (২৫) রাখিতে, (২৬) শিখাইয়া, (২৭) বুক পিঠে ও হই হাতে, (২৮) দুইটি বাঁদল বাঁধিয়া, (২৯) ছাতি, (৩০) কহিও, (৩১) বুড়া গ্রীলোকটী, (৩২) অল্প (৩৩) এলাতে, (৩৪) যম হইতে উঠিয়া, (৩৫) রাজপুত্রী, (৩৬) রাজার কথামতে, (৩৭) বুসি ।

(২৪) অর্ধ, (২৫) এত যে, (২৬) অলস, (২৭) পর্বাভ, (২৮) বাকল ছাড়াইয়া, (২৯) তাহার (৩০) নিকট দুইটি (৩১) কড়া ছিল, (৩২) তাহারের অন্ত, (৩৩) দিয়া, (৩৪) আর কিছুই করিত না,

বিসং বগন জা' বিয়া বি জুং ধান জুজিগাং (১) জেইরন্ (২), বেগ্ (৩) কদু  
জেইনাই (৪) দেবা (৫) জাঁবাধ্যা দুকালা পলগৈ (৬),  
গোমতী নদীর কথা।

চের-চেইজাতুন (৭), ব (৮) বেগ (৯) লাগিল।  
তারা থেবা (১০) জাগা নেই দেই নাই (১১) কপাল বিনেই বিনেই (১২) কানাগ্  
লাগিলাগ্। ঝাঙবোঁরা (১৩) কচবের (১৪), সাব্ (১৫) হোগ্ বেঙ্ হোগ্, জ (১৬)  
হোগ্, দেবতা হোগ্, ভুত-হোগ্ পেরেং হোগ্ রাজা হোগ্, রেইরং হোগ্, নে  
আমারে ইথো (১৭) একথান্ ঘর তুলি বিব, মুইতার লোম্ (১৮)। সিরাগ (১৯) গুনি  
নাই এককোরা বড় সাবে রাজ ভাং (২০) বোই নাই (২১) তারা জায় একথান্ ঘর  
তুলি দিল। তারা বি বোনতুন (২২) ঝাঙব বোন্ নোরাই (২৩) সে সাঝোয়ারে  
লল (২৪)। তারা-বাবে (২৫)—বুয়্যার সেই কদা (২৬) গুনি নাই সেই সাঝোয়ারে  
কাবি ফেল। তা-ঝি রে (২৭) কান্দে কান্দে চোগ-পাণিরে (২৮) ঘরা জেই চাই  
(২৯) সেই ছরা-পানিং ডুবিনাই মর্যো। সেই ছরান নাং (৩০) গোমেদ্ গাং।  
তিবিরি রাজা পোরায়ই (৩১) সাব বেজ্ (৩২) ধরিনাই তারান্তার বিলে ঘর  
তুলি জে-গৈ (৩৩)।” [ ২ ]

প্রাচীন সাহিত্যভাণ্ডারে “বারমাস” একটি আদরের সামগ্রী। কবির  
কবিত্ব ইহাতে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিবার সুবিধা ছিল। বারমাসের  
ব্যবহারও সুদীর্ঘ, এই অবসরে কবি মনের যাবতীয়  
বারমাস।

পিপাসা মিটাইয়া লইতেন। সচরাচর নায়িকার মনোবাণী  
লইয়াই ইং প্রথিত হইত, বঙ্গীয় ললনাগণ বারমাসের উপর্যুপরি লাহুনার  
ঝালাপালা হইয়া মনের উচ্ছ্বাসে “বারমাস” জুড়িয়া দিতেন। এই সকল হিন্দু  
অবলার ‘বারমাস’ও চাক্কা-সমাজে যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের নিজস্বও  
কম নহে। “কিরীবি’র বারমাস,” “শেখোয়া কস্তার বারমাস,” “ভাত্তাবির  
বারমাস,” “রজনমালা’র বারমাস,” “কালিকীরণীর বারমাস” ইত্যাদি কতই  
আছে। শুধু প্রথমোক্তখানি আমরা নিয়ে তুলিয়া বিলাম। পাঠক  
দেখিবেন, ইহার ভাষা যদিও বিস্তৃত বাঙলা নহে, কিন্তু তজ্জন্ত বেন প্রভূত চেষ্টা  
হইয়াছে। মূল চাক্কা ভাষার তুলনার ইহার ভাষা বহুপরিমাণে স্বাক্ষিত। কথাঃ—

(১) রোপন করিতে, (২) গিয়াছিল, ৩) বেলা, (৪) কদুইর গলে, (৫) দেবতা এখানে আকাশ, (৬)  
কাল অর্থাৎবোর পক্ষকার করিল, (৭) চারিদিক হইতে, (৮) ভাতাস, (৯) বহিতে, (১০) থাকিবার,  
(১১) দেখিয়া, (১২) করাবত করিতে করিতে, (১৩) মড়ক, (১৪) কহিল যে, (১৫) সর্প, (১৬)  
বেগ (১৭) এখন, (১৮) আমি তাহাকে লইব অর্থাৎ বিবাহ করিব, (১৯) সেই কথা, (২০) বাঁশের  
জায়, (২১) বহিষ্ণ, (২২) দুই ভগ্নী হইতে, (২৩) জমিটাই, (২৪) লইল অর্থাৎ বিবাহ করিল,  
(২৫) জাহাঙ্গীর-সিক্তার (২৬) কথা, (২৭) তাহার কস্তা, (২৮) চকের জলে, (২৯) ছরা বহির।  
ঘাইয়া, (৩০) ছরাটির নাম, (৩১) ত্রিশুরা রাজপুত্রই, (৩২) সর্পের বেশ, (৩৩) দিয়াছিল।

## কির্সাবি' (রূপাবিবি)র বারমাস ।

কার্তিক মাসেতে কির্সা বৃক্ষপত্র ধরে ।  
 ধর্মকলে অঙ্গ হৈল সুন্দরী-বাপের (১) ধরে ॥  
 পুত্রের সমান করি মাঝে বাশে পালে ।  
 হেন হুঃখ দিল কির্সা শরীর-অন্তরে ॥  
 হেন মতে পালে যেন কল্যা রত্নমালা ।  
 দিনে দিনে বাড়ে যেন পূর্ণ চন্দ্রকলা ॥ ১ ।  
 আগ্রণ মাসেতে কির্সা কুরঙ্গ নয়ানী ।  
 কান ছুঁটা বরণ তার কীণ মাজাখানি ॥

\* \* \*

চন্দ্রের সমান মুখ নাসিকা তিল ফুল ।  
 দেখিতে সুন্দর ( অঙ্গ ) কল্যা রতনের মূল ॥  
 খঞ্জন গমনে হাঁটে কির্সা চন্দ্রমুখী ।  
 গৃধ্রিনী সাবাশে কর্ণ কীণামাজাখানি ॥ ২ ।  
 পৌষ মাসেতে কির্সা শীতে পরে ধারে ।  
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দিনে দিনে বাড়ে ॥  
 “আতুরা” (২) অগ্নিল যদি লাক্ষ্মনের ধর ।  
 কির্সাবি'র মিলন কথা শুন সূর্য নর ॥  
 খারি কাবা নদী ছিল পূর্বে আর উত্তরে ।  
 দৈবযোগে গেল কির্সা সেই নদীকূলে ॥  
 সেই দিন আতুরার সঙ্গে দরশন ।  
 ছই জনে যুক্তি করি প্রবেশিল বন ॥ ৩ ।  
 মাঘ মাসেতে কির্সা মনে করি সার ।

\* \* \*

\* কৌতুক করি দিল আলিঙ্গন ।  
 ছইজনে যুক্তি করি প্রবেশিল বন ॥  
 কত দিন ব্রহ্মদা কল্যা অঙ্গল মাঝার ।  
 ঘরেতে আসিল কল্যা লোকেতে প্রচার ॥



আমুলুকে মিলি কৰি (৩) যুক্তি কৰি সার।  
 বাড়াইয়া দিল কত্ৰা ঘৰে আগনার ॥ ৪।  
 কান্ধন মাসেতে কিৰ্কা ফাট (৪) খেলে দোলে।  
 ত্ৰিপুরাছৰী ছয়াৰে নিল সালিশ কৰিবারে ॥  
 সভাতে বসিয়া কত্ৰা উঠিল দড় (৫) হইয়া।  
 জয় খিসা (৬) হুকুম দিল কত্ৰা দেগৈ বিয়া ॥  
 সৰ্বলোকে মিলি যদি বিয়া দেগৈ কোইল (৭)।  
 জয়চক্ৰ খিসা উঠি কিছু না বলিল ॥  
 বহুমূল্য ধন দিয়া তুলি নিল বাপে।  
 রহিতে নপারে কিৰ্কা মনের অমুতাপে ॥ ৫।  
 চৈত্র মাসেতে কিৰ্কা রোদ্ৰেতে হরণ (৮)।  
 বুঝাইতে নাহি পারে কত্ৰাৰ পরণ ॥  
 ভীম-মৃত গলে দিয়া জলেতে গমন।  
 তবে সে পাইব আমি শ্ৰদ্ধ দৰশন ॥  
 রামেরে হারাইল যদি সীতা মহাদেবী।  
 সেই মতে হারাইল কিৰ্কা গুণনিধি ॥ ৬।  
 বৈশাখ মাসেতে কিৰ্কা বৈসে তরুতলে।  
 ছাড়িবারে না পাইলুম শ্ৰদ্ধ মায়াজালে ॥  
 রহিবারে না পাইলুম ভাইবন্ধু ঘরে।

\* \* \* \*

নিভ্য নিভ্য কৃষ্ণমূতে দহে রাজিদিনে।

কেমনে ছাড়িয়া গেল কত্ৰা সুবদনে ॥

( ত্ৰিগদী )

অষ্টসীতা বলে পুনি, কোথা বাব সুবদনী

তত্ত্বকথা (৯) কহি শুন সার।

কত্ৰা বলে সুবদনী নিবেদন কৰি আমি

সত্য কথা কহি শুন আর ॥

জ্ঞাতিবন্ধু ঘৰে বৈলুম বহুঃখ মনে পাইলুম

শুন শ্ৰদ্ধ কৰি নিবেদন।

(৩) মিলিত হইয়া; (৪) হোলিৰ উপকরণ—আবির নামে খ্যাত; (৫) শজ;

(৬) ব্যক্তিবিশেষৰ নাম; (৭) কহিল; (৮) পরিত্যক্ত; (৯) বিষয়বাক্য।

অগ্নিকুণ্ড লাজাইরা                      অনলেতে প্রবেশিয়া  
 তবে প্রভু পাব দরশন ॥  
 আদিচন্দ্র নিজচন্দ্র                      উলমস্ চন্দ্র \*  
 পৌরচন্দ্র রোহিনী চন্দ্র করিমু যে পান ।  
 কৃষ্ণহুতে সহিল .                      উত্তর না দিয়া গেল  
 তবে পাইব প্রভুর উদ্দেশ \*  
 এত দুঃখ না সদ্য শরীরে  
 বালিস্থিতে জরজর                      কাঁদি আমি নিরন্তর  
 কোন মতে পাইমু প্রভু দরশনি ।  
 অষ্ট সীতা বসাইল                      নানা যুক্তি দেখাইল  
 সে অঞ্চলে কত্যা সুবদনী ॥  
 কত্যা বলে অষ্টসীতা                      অষ্টশিব মোর পিতা  
 ন কহিও কতু আশ্র \*  
 কত্যা কথা না কহিও                      অঙ্গে অনল জলিও,  
 তবে ( মোর ) পিতা হবে বধভাগী ॥

( পরার । )

আঙু পারজ্যা আর সীতা চরণে যত্নর ।  
 বাড়াইয়া দিল কত্যা আর কতদূর ॥  
 হেন মতে না কহিও তবু কথা সার ।  
 অবশ্য হইবে জান লোকেতে প্রচার ॥ ৭ ।  
 জ্যৈষ্ঠ মাসেতে কিৰ্কা পূরে মনোরথ ।  
 অষ্ট সীতা দেখাই দিল সেই নিজপথ ।  
 সেই দিন গেল জান সেলচ্ছরী-থুমে (১০)  
 কতদিন রাখিল কন্যা তত্কাপারা লোকে ॥  
 'পাজাচথা' নদী ছিল রাখন নন্দিনী ।  
 তার ঘরে গুপ্তবেশে রৈল (কত্যা) সুবদনী ॥  
 কত দিনে তার পিতার করিল উদ্দেশ ।  
 উদ্দেশ না পাইয়া আইল আপনার দেশ ॥৮।  
 আবার মাসেতে কিৰ্কা যনে নাহি স্থখ ।  
 কত্যা হইয়া পিতার এত দিল দুখ ॥

পুনর্বারে সেই কন্ঠা আতুরার পাইল।

বিচিত্র তনয় যেন \* ভূমিল ॥

আতুরার বলে তুন (প্রিয়া) এখান কেনে আইলা ।

ব্যাধি ভয়ে আর তুমি কেন মা ডরাইলা ॥

কিছার বলে ভক্তি আছে মোর মনে ।

লাচারী প্রবন্ধে মুই দুঃখ বিবরণে ॥

(जिपरी ।)

একেশ্বরী চলিঙ্গম

বহু হুঃখ পাইলুম

তারে কহিলুম বাণী \*

মোরে দুঃখ ডাকিছিল

নানা যুক্তি তবে দিল

তবে চলে সেই নিজ পথে ॥

ଜଞ୍ଜଳ କାନନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।

ছাড়ি আইলুম নিজ'পরি বহিরা

সঙ্গে নাই কোন জন মোর ।

## দিন প্রভু আনিজন

সঙ্গে (১১) ছিল মোর মন

জুড়াই গেল অঙ্গ শরীর ॥

पूरुवफलेन जन्म इहेत्युम

ধর্মক্ষেত্রে তোরে পাঠনুম

তবে যোর পূর্ণ হইল মনে ।

তোমাতে ছাড়িয়া আমি

ब्राह्मि दिन कौन्दि ष्यादि

নিজ্জাকালে দেখিলুম স্বপনে ।

তুমি মোর নিজ বন্ধু

তরাইবে ভবসিদ্ধ

তবে তুমি হইওনিজ পতি ।

## ଆତ୍ମବାସ ବଜେ

• • •

শুণনিষি বিধাতার মিলাইল আনি ।

বাঁপে ভোঁরে তুলি নিল

विधाता विमुक्ति

তোমার লাগি অহা নাহি জানি ।

ਸੀਤਾ ਹਾਰਾਇਨ ਰਾਮ

नमो भद्राय मनःकाम

उदाहरण। निम्नलिखित।

সেই মতে তোরে পাইল

कामानन्द महिम्न

রাত্রিদিনে করি রাজকলি ।

সদায় আনন্দময়ে কুঙ্কমুভে নিশি ।

किर्यान् बने अष्टेनान्

न भृगुहोत्रात् भृगुहोत्रात्.

शत्रुहिंसेना नाहिब •

( পরায় )

এই মতে আতুরায় নিজ কজা ? পাইল ।  
 শিশু পাইরা ইত্র যেন আনন্দ হইল ॥ ১১ ।  
 শ্রাবণ মাসেতে কিরী খালে নালে পানি । ১২ ।  
 পূর্ক কলে বিধাতার মিলাল যে আনি ॥  
 দুই চাঁদ ধরা পাইল যেন সকল সরস্বতী ।  
 হেন মতে পাইল আতুরায় কিরী গুণনিধি ॥  
 বিতীষণে পাইল লজা রাবণার শেবে ।  
 কজা লইয়া আতুরায় বাইব কোন দেশে ॥  
 মুনি বাপ বুদ্ধি পাব তত্ব কর্তব্য কীণ ।  
 ঠাণ্ডর জ্ঞান ঘরে আনি রাখে কতদিন ॥ ১০ ।  
 এই ভাত্রমাসে কিরী রূপে গুণে ধজা ।  
 'বগাছরী থুমে' নিয়া রাখিলেক কজা ॥  
 পুরুষের বেশ ধরি চলে কজা খালি ।  
 হাঁটিতে লা নড়ে পা ধজনের সুখী ॥  
 নিল দশ প্রিয়া লাগি আছে অঙ্গে ।  
 ছুই জনে চলি গেল বুড়াবুড়ী সঙ্গে ॥  
 সুন্দর ধজন কজা ছুই চক্ষু লাল ।  
 পূজবদ্ধ ঘরে রাখিতে পাইল অঞ্জলি ॥ ১১ ।  
 আখিল মাসেতে কিরী পুষ্পরসে মেলা ।  
 আতুরায় পাইল যেন চিকনিয়া কালা ॥  
 বেবা গার বেবা শুনে কিরী-বারমাস ।  
 পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥ ১২ ॥ সমাপ্ত ।

এই বার মাসের একখানি রাজ প্রাচীন হস্তলিপি আমি বহু বড় লাভ  
 করিয়াছিলাম, তাহা হইতে যথাসাধ্য পাঠোদ্ধার করিয়া উপরে প্রকাশিত  
 হইল । উহার স্থানে স্থানে আমার রক্তকুট হয় নাই, বহু প্রাচীন ব্যক্তিও  
 হার মানিয়াছেন । সহন্য পাঠকবর্গকে অধিক আর কি কৈফিয়ৎ দিব ! অপর  
 কথা মূল 'বারমাস'খানি বার্ষিকভাবে প্রস্তুত, তাহাতে পাঠকবর্গের অধোপলব্ধি  
 করিবার যথেষ্ট ব্যাঘাত হইত । তাই আমি উদ্ধৃত করিবার কালে অধিকাংশ

স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া লইয়াছি। তথাপি স্থানে স্থানে অর্থভেদ ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় লিপিকরের অনভিজ্ঞতার ফল। 'বারমাস'খানির ভাষা ও রচনাচর্চা বস্তুতই প্রাচীন যোগ্য। ইহা যে অপরাপর বাংলা বারমাসের অনুকরণে লিখিত ও আধুনিক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। হুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধান ও বর্তমানেরই অদূরবর্তী এই কিস্কীর সুন্দরী, আতুরা, অষ্টসীতা বা জয়চন্দ্র খিসা ইত্যাদি কাহারও পরিচয় পাওয়া গেল না। 'বারমাস'খানির প্রতি পণ্ডিতের চাক্ষুস্কাতিগের জাতীয় কাহিনী নিহিত রহিয়াছে। কিরিবা বিবি ও আতুরার প্রেমোভিনয় চাক্ষুস্কা সমাজে অত্মপি প্রায়শঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। পরিশেষে কবি তদীয় কাহিনীর গৌরব বাড়াইতেন—

‘যেবা গায় যেবা শুনে কিস্কীর বারমাস।

পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ি বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥”

কথায় উপসংহার করিয়াছেন। বারমাস রচনায় ইহা এক নূতন আশ্বাস বটে।

[ ৩ ]

যখন আমাদের জ্ঞান নিতান্ত নগণ্য থাকে, সঙ্গীতের বিশ্ববিমোহিনী ক্রীড়া ছড়া। (১) উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য জন্মে না, ততদিন যাবৎ এই ছড়া মাত্র সঞ্চল লইয়া আমরা প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ পরিব্যক্ত করি। হায়! সেই ছড়া গাইতে গাইতে বা শুনিতে শুনিতে যে কি উদার আনন্দে আত্মহার্য হইতাম, আর তাহা স্মরণ করিতেও প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে! সেই অতীত ও বর্তমানে যেন—যুগযুগান্তর। আর, সেই ‘অতীত সুখের দিনে—পুনঃ আর ডেকে এনে’ কি হইবে? ঐ দেখুন, বিমল কোমল তলে দাঁড়াইয়া চাক্ষুস্কা ননী সুকোমল হস্ত প্রসারণে ক্রোড়স্থ শিশুকে আকাশের চাঁদ আনিয়া দিতেছে, এবং সুর-লয় সহযোগে চন্দের আবাহন করিতেছে;

‘আর চান এলাদে—সেলা দে,

ভাঙা কুলা নোয়ান (১) দে।

গরুরে বিয়াইয়ে ধল ডেগা (২);

(১) শিক্ষিত সম্ভ্রান্তের ঔদাসীন্তপ্রযুক্ত বঙ্গভাবার মূল্যবান ছড়াসমূহ কালের কুক্ষিতে লয় পাইতেছে। প্রচুর শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রনাথ সরকার ‘বৃক্ষমণির ছড়া’ প্রকাশ করিয়া তৎসমূহের রক্ষার এক আদর্শ বুদ্ধি উন্মুক্ত করি দেখাইয়াছেন। তৎপ্রতি সাহিত্যসেবক মাত্রেই কৃপাচুরি প্রার্থনীয়। ‘পরিবাদের ক্ষতভঙ্গ রিতৈবী ‘চট্টগ্রামী’ হলে ভুলান ছড়া’র সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত জীবনলাল করিম মহোদয় ও এজন্য ধন্যবাদের পাত্র।

(১) লয়বান; (২) সর্বা বাছুর;

বল ডেগাবোরা ম ঝার হুধ ।

লক্ষর মাথাৎ (১) সোণার টুপ ৪”

আবার কোথায়ও বা জননী সন্তানকে দোলাইয়া দোলাইয়া ‘ঘুম পাড়ানিরা’  
গাইতেছে ;—

“অলি—অলি—অলি,

বাঁশপাতার অলি (২) ;

বুয়া (৩) বাবা ঘুম যায় (৪) সোনা-ধুলনৎ (৫) পড়ি”

“সোনা-ধুলনৎ রূপার দড়ি,

বুয়া বাবা ঘুম যায় সোনা-ধুলনৎ পড়ি ।” ২ ।

“হানৎ লয়ে বাদোল বাঁশ (৬),

কুয়াৎ (৭) লয়ে জলি,

বুয়া বাবা মারি আনি দিবগৈ বনর পাখী ।” ৩ ।

( খেলা দেওয়ার ছলে,— )

“উন্দুরে গন্তন কজমজ (৮),

বিলেই (৯) আগে বই—

বুয়া বাবা ঘুম যায় সোনার ধুলন লই ।” ৪ ।

“আলু পাতা তালু রে

কুছ্যাল পাতা লং (১০) ;

ববুনালৈ ববুনি ন ঐচ্ছালং ।

ম্যাকাক্ ছ-ঙপে (১১) ঘুঁৎ ঘাঁৎ গম্বতন্দে,

নমন ঘর ভিদিয়ে (১২) তালুক বেশ,

এসয়ে বাপমা চলয়ে দেশ ” ৫ ।

( আবার ক্রন্দনের সাঙুনায়— )

“এ কূলে কলাগাছ, ওকূলে জরা ;

পরগ্যা বাবা (৩) ন কানিজ্ (১৪) ভাঙিব গলা ।” ৬ ।

বাবা বুয়া ন কানিজ্ তুট,

বাঙালে (১৫) কলা মলা আননে

লৈ দিষ্টে (১৬) মুই ।” ৭ ।

(১) লক্ষ বাবার মাথা ; (২) বেড়া ; (৩) বুড়া (গ্রেটস্টক্ অল্ডার) (৪) বাইতেছে ; (৫) হুধ  
দোলনার (৬) কাষ্টা ; (৭) কোচড়ে ; (৮) উন্দুরে কিচিরিচি করিতেছে ; (৯) বিড়াল ;  
(১০) ইচ্ছা পাতা লম্বা ; (১১) লাবক সতলে ; (১২) ভেব করিয়া ; (১৩) প্রাণের বাছাবন ;  
(১৪) কাঁদিলে ; (১৫) বাঙালী (বাবসারীরা) ; (১৬) লইয়া (ক্রয় করিয়া) বিধি ;

“দার (১) তুলি জারীফুল (২) ;

ন কানিজ্ বাবুধন

রেঙ্গুন স'রখুন (৩) ত-বাবে (৪) আনি দিব

নারিকুল (৫) ।” ৮।

‘হাদৎ লরে বাদোল বাঁশ

কুশৎ লরে মাং (৬),

বুধ্যা বাবা ন কানিজ্ অলি ডাগি ছং (৭) ।” ৯।

( ক্রন্দন থামিতেছে না দেখিয়া ভীতিমিশ্রিত স্নেহে— )

“জাহ ঘুম যারে তুই,

পুরাণ কালা (৮) হস্তী এচ্ছে (৯)

মাতাই আইয়ন্ (১০) মুই,

জাহ ঘুম যারে তুই ।” ১০।

“ঘরর পিছে (১১) লাল খাগারা (১২)

মাথায় মুখুয় করে ;

হালা ঘরের (১৩) কালা কুর্ভা (১৪),

কেমন কেমন করে ।

জাহ ঘুম যারে তুই ।” ১১। ইত্যাদি ।

আবার কোথায়ও বা চাকমা-ছেলের দল ‘বৃষ্টি প্রার্থনা’ করিতেছে :-

“দেরে দেবা (১৫) দেরে ঝড় (১৬),

গাজর আগার আগায় (১৭) পানি গর (১৮) ।

কলা কাবি (১৯) গর দে,

মামু (২০) দেবার ঝড় দে ॥”

এ সব ছাড়া ছেলে-মেয়েদের অর্থহীন “বিহতি কথা” ও যথেষ্ট । নমুন  
যথা :-

“পদ্মাবতী চরণে,

আমা-বুধ্যা ময়ূগে,

ধান তলইবা (২১) রাখইয়া (২২) নেই ;

(১) উষা ; (২) বৈদ্যকজ্য ; (৩) সহর হইতে ; (৪) তোরবাগরে ; (৫) নারিকেল ; (৬) তুলি ;  
(৭) ডাকিয়া দিতেছি ; (৮) প্রাচীন কালের ; (৯) আনিয়াছে ; (১০) সাক্ষাৎ করিয়া আসি ।  
(১১) ঘূহের পক্ষান্তে ; (১২) জল তৃণ বিশেষ ; (১৩) চাবার ঘরের ; (১৪) কালা কুহুর ; (১৫)  
কেবলা (এখানে আকাশ) ; (১৬) বৃষ্টি ; (১৭) বুকের অগ্রভাগ পর্যন্ত ; (১৮) জল কর ; (১৯)  
কাটরা ; (২০) মাতুল ; (২১) ধান শুক করিবার ট্যাং বিশেষ ; (২২) রক্ষা করিবার ।

জোগরা (১) কুমোয়া (২) খেইরা নেই ;

রাজা-শোয়া (৩) মরীন্ দে (৪)

কানাইরা (৫) নেই ;

শগফুল ফুটান্দে (৬) ভোলইরা (৭) নেই ।” ১ ।

“চল্ খুৎ খুৎ চল খুঝি (৮),

চল্ কুলা লৈ (৯) বেড়ালৈ (১০) মুঝি ;

কাপড় চোপড় ভুড়ি (১১) বান (১২),

ঔমানিক চান, ধুহুগ (১৩) আন ।” ২ ।

“দিম্ দিম্ (১৪) বিরালে (১৫),

নাকোয়া (১৬) নিল শিয়ালে (১৭),

সে নাকোয়া কদক দুর (১৮),

বড় গাং কুলর (১৯) দগিন কুল (২০) ;

দগিন কুলং ‘অরা’ বাশ,

ঘর তুলি’ (২১) দিম্ আগন মাস (২২) ;

আগন মাসর ‘কনকডি’ বেঙ,

বাবনা (২৩) নিল গুরর ঠেং ।” ৩ ।

( তেং তেয়রীঃ “গান” :—

“তেং তেয়রি তেং তেয়রি (২৪),

বাঙ্কা বান (২৫) ;

কার্বা চোলর (২৬) ভাত দিবা (২৭) রান (২৮) ।

রাছে রাছে (২৯) চাম্পাকুল,

চাম্পা মত পড়ে ;

দাদা ভুজি (৩০) বরৎ(৩১) নেই

সোনার নাথেন্ডা (৩২) অলে ।

(১) মদবিশেষ, (২) মদের কলসী ; (৩) রাজপুত্র ; (৪) মরিয়াছে যে ; (৫) কাঁদিবার লোক ; (৬) ফুটিয়াছে ; (৭) তুলিবার লোক ; (৮) মাথের কনিষ্ঠাঙ্গরী ; (৯) (চাউলামি ঝাড়িবার) কুলা লইয়া ; (১০) বেড়াই গিয়া ; (১১) পুটলী ; (১২) বাঁশ ; (১৩) বাঘা বস্ত্রবিশেষ ; (১৪) দিম্ব ; (১৫) বৈকালে ; (১৬) নাকটী ; (১৭) শৃগালে ; (১৮) কতদূর ; (১৯) নদীতীরের ; (২০) দক্ষিণ পাড় ; (২১) ঘর উঠাইয়া ; (২২) অগ্রহারণ মাস ; (২৩) ব্রাহ্মণ ; (২৪) তেংতেয়রী—কীট বিশেষ, (২৫) ধানভান ; (২৬) ছাটা চাউলের ; (২৭) ছইটী ; (২৮) রন্ধন কর ; (২৯) রাঁধিতে রাঁধিতে ; (৩০) মোট ভাড়াবন্ ; (৩১) ধরে ; (৩২) কর্ণাভরণ বিশেষ ।



ভূজি ঘিরে (১) ভাত চরা (২),  
 দাদা ঘিরে মঘপাড়া ;  
 দাদার মোগর (৩) দীঘল চুল,  
 বান্ধে বান্ধে চাম্পাফুল ;  
 চাম্পাফুল তলে,  
 দিবা (৪) হরিণ লড়ে ;  
 হরিণ নয় চোঙরা (৫),  
 চোখের পাতা (৬) ভোমরা।” ৪।

এই গেল শিশু বা বালককালের কৌতুকলহরী। ইহার সঙ্গে কৰ্ম্মদিগের একটি কৰ্ম্মসঙ্গীতের নমুনাও প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই ছড়াটি পাহাড়ী জুমিয়াদের বিশেষতঃ বাহারা “কাটিন” করে “কাটিনের ডাক।” অর্থাৎ কাঠ বা নোকা কাটে, তাহাদিগের প্রায় নিত্য প্রয়োজনে আইসে। গাছ টানিতে ও তুলিতে সুরলয়যোগে ইহার আবৃত্তিতে বড়ই জোর পাওয়া যায়। ইহা একদিকে যেমন উৎসাহ বৃদ্ধি করে, অপর দিকে তেমনই সুরলয়ে সকলেরই বল যুগপৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই ছড়ার সহজেই অল্পবলে অধিক কাজ আদায় করা চলে। ইহাতে দলপতি দলের সকলকে সাবধানপূর্বক উত্তেজিত করিয়া “ডাক” বলিতে থাকে ; আর তাহারা একযোগে প্রত্যেক ডাকের সঙ্গে সঙ্গে “হেইয়া” হেইয়া” বলিতে বলিতে বল প্রয়োগ করে। যথা ;—

দলপতি—“ধরুরে ধর, বাবা সকল, ভাইয়া সকল,

ধরুরে ধর—জোর করিয়া সমান করিয়া”

দলপতি—“মারে মা !”

দলের অপরেরা—“হেইয়া” ;

“	তোর পুতে ডাকে শুনু না ?	“	“
“	শুনিয়া পুত করিম্ কি ?	“	“
“	ধীরে ধীরে চলেছি !	“	“
“	চল সুনন্দরী হাতের তাড় (১),	“	“
“	জাঙাল বাইরা (২) বজ্রা বার ;	“	“
“	বঁধুয়া দেখি লাজে মরি !	“	“
“	লাজপায়লি (৩) বাজারং (৪) ঘর,	“	“

(১) দিরাছে ; (২) ভাত চড়াইতে ; (৩) প্রীর ; (৪) ছইচী ; (৫) বজ্র হরিণ ; (৬) চোখের পাতা।

(১) হস্তাভরণ বিশেষ ; (২) রাক্ষস বাহিয়া ; (৩) লজ্জাকর্তী ; (৪) বাজারং

দলপতি	দলের	হেইরা
	অপরের	
" একদিন গম থা'ই (১) দু'দিন জর ;	"	"
" চল সুন্দরী করি মন,	"	"
" আমরা থাইতাম সাউথের (২) ঘন ;	"	"
" আন্নার বরে নবির বরে,	"	"
" সাতালি পর্বত ডাকুং লড়ে ।	"	"
" ডাক শুনাইতে আনলাম্ গাভুর,	"	"
* * *		
" আনলাম্ গাভুর বাছি বাছি,	"	"
" ছি'ড়ি ফেলিলে লোহার কাছি (৩) ।	"	"
" লোহার কাছি ন ধরে টান,	"	"
" আলঙর কাছি (৪) পাকইয়া আন ।	"	"
" জোরের জঙ্গী (৫)	"	"
" মাথায় ভঙ্গী (৬) ;	"	"
" ভঙ্গীর লাঞ্জে,	"	"
" ঘুম না আইসে ফাউকা বাসে (৭) ।	"	"
" বীর হনুমান !	"	"
" হনুর বেটা (৮) ভাহুর নাম ।	"	"
" থাক (৯) গড়াইলে (১০) নাইয়ের (১১) বাম্ "	"	"
" থাক বেচি (১২) লাড়ু বাম্,	"	"
" লাড়ু লইয়া সহায় (১৩) বাম্ ।	"	"
" জোরের কাম ;	"	"
" পড়ের (১৪) বাম্ ;	"	"
" ঘাসের ঘুম ;	"	"
" সুন্দরীর মুখে কে দিল চুম ?	"	"
" রসায়ার মুখে কে দিল চুম ?	"	"

(১) সুস্থ থাকিয়া ; (২) সদাগরীর , (৩) রজু ; (৪) মোটা গড়ী ; (৫) সিপাহী ; (৬) পাগড়ী । (৭) দুর্গকে । (৮) বেটা অর্থ পুত্র ; কিন্তু ইহাতে ভাহুকে হনুর বেটা বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই নিমিত্ত 'ডাক' রচয়িতাকে দোষী করা আমরা সমীচীন বোধ করি না । সম্ভবতঃ বিয়াকর শাস্ত্রানুযায়ী 'ডাক' কথকেরা ভাহুর বেটা হনুকে হনুর বেটা ভাহু করিয়া কেলিয়াছে । (৯) গহনা (১০) গড়িয়া দাও ; (১১) বেড়াইতে ; (১২) বিক্রয় করিয়া ; (১৩) সহরে ; (১৪) পড়িতেছে ।

দলপতি	দলের	হেইয়া।
	অপরেয়া।	
" হায়রে হায় !	"	"
" হায় বোলায় !!	"	"
" গা ঢুলাইয়া হায় বোলায় !!!	"	"
	"	ইত্যাদি।

[ ৪ ]

এ সকল ছড়ায় কৌতুক আছে, উদার আনন্দ আছে, অধিকন্তু ললিত শব্দ বিভাসে কতকগুলি খাপছাড়া ভাবও প্রথিত আছে। ইহাতে ভাবুক বা 'হৈয়ালী' চাক্‌মা সংজ্ঞায় 'বানা'। বুদ্ধিমান পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন কি না, বলা যায় না। যাহা জলের মত গেলা যায়, বুদ্ধিমান সমাজে তাহার আদর কোথায়? বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়াও বৃষ্টি না, বৃষ্টিত বৃষাইতে পারি না,—এরূপ না হইলে কি আর ভাব বলা যায়? বস্তুতঃ ভাব হৃদয়ে অনুভব করিবার বিষয়; ভাবায় প্রকাশিত হইতে পারিলে তাহার গৌরব কমিয়াই যার বটে। তাই বলিতেছিলাম, ছড়া—বুদ্ধিমানের জ্ঞান নহে, উহা নেহাৎ "ছেলে ভুলানো।" তবে যে "কাটিলের ডাক"কেও ছড়ার কোটার রাখিয়াছি, সে কেবল কবিত্বের অভাবে! আর যখন বালক-বালিকাদের মস্তিষ্ক পরিচালনার ক্ষমতা জন্মে, খেলা ও কৌতুকের ভিতর দিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ করিতে এক প্রকারের কবিতা আছে, সে গুলিকে আমরা 'হৈয়ালী' বলি। চাক্‌মা-দিগের প্রচলিত সংজ্ঞা "বা-না।" এই হৈয়ালী বা "বা-না"তে শব্দ লালিত্য এবং সরল আনন্দোচ্ছ্বাসও আছে, অথচ বুদ্ধির জটিলতা ও ভাবের বাধুনিও রহিয়াছে। কিন্তু হায়! এ গুলি সংরক্ষণের প্রতি শিক্ষিতসমাজের আসক্তি এত সামান্য যে, নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। বস্তুতঃ নগণ্য হইলেও এই সমৃদ্ধ প্রাচীন টোটকা টুটকা উপেক্ষার জিনিস নহে। চট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক হৈয়ালী ইহাদিগের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। সেগুলি বাছিয়া ফেলিলেও মূল চাক্‌মা 'বানা'র সংখ্যা কম নহে। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে এখানে চাক্‌মা-সমাজে প্রচলিত ৩০টি মাত্র "বানা" রক্ষা করা গেল। জাতীয় প্রত্যেক জন্মের পরিচয় প্রদানই আমার বিশেষ লক্ষ্য।—

"উয়রে মালা তলে মালা,  
খগুদি খগুদি হাঁদে ডালা।" ১  
উপরেও মালা, নীচেও মালা অর্থাৎ  
ছইদিকেই শব্দ খোলা; থাকিয়া থাকিয়া।

"ফেলুং কালা জীরা,  
উদিল ছদরক্-পা,  
উত্তর—কছপ।  
হাঁটিতে বেশ—ভাল দেখার।

ফুদিল মালতি ফুল,  
ধরল্য করঙা” । ২ ।  
“গাংকুলে কুলে বড়ই গাছ,  
লড়ে চড়ে ন পড়ে ।” ৩ ।  
“দশ ভাইয়ে লড়াই ধরে,  
হুই ভাইয়ে মারে” । ৪ ।  
“পাঁচ ভাইয়ে তুলে,  
বজ্রিশ ভাইয়ে ভিড়ে ;  
এক ভাইয়ে ঠেলা মারলে,  
দৈর্য্যামুরং পড়ে” । ৫ ।  
“বাবু সান্যা বজ্জে ;  
চলা সান্যা বাজ্জে ;  
বাঘ সান্যা লাফ মাঝে ;  
পাত্র সাত্তা ডুবে” । ৬ ।  
“ইজর-মানাং খের-কুর  
মেলি চেলে চাম্পাফুল” । ৭ ।  
“আগজে ঝিলমিলি

পাতালে লেজ ;  
কন্ খদায় বানাই দিবে,  
কালিকল জ্যায় কেজ্” । ৮ ।  
“কাজালকে ভেঙেভেঙা ,  
পাগিলে সিন্দুর ;  
যে ভাঙিৎ ন পারে,  
তে গুতি হুদা উদ্দুর” । ৯ ।  
“মাথাং খড়্গা, টিকিনিং চুল ;  
দশ ঠেং আগে—  
তিন লেঙুর” । ১০ ।  
“এক্লে ধুম্ধাম  
ওকুলে বিয়া ;  
ভাঙা নারিকুল জোড়া দিয়া” । ১১  
“আট হাত বোল আঁছ,  
মাচমারা বিয়ে সাধু ;  
চুতুনা খালং কেলুং জাল,

২ । কৃষ্ণজীরা ফেলিলাম, গাঁদা ফুলের  
গাছ টটিল, মালতীফুল ফুটিল, কামরাঙা ধরিল ।

উত্তর—তিল ।

৩ । নদীর তীরে তীরে কুল গাছ, নড়েচড়ে  
পড়ে না ।

উত্তর—পদ্ম অর্থাৎ চকুলোম ।

৪ । দশভাইয়ে দৌড়াইয়া ধরে, হুই  
ভাইতে মিলিয়া মারে ।

উত্তর—উকুন অর্থাৎ ও মারা ।

৫ । পাঁচভাই তুলিয়া ধরে, বজ্রিশ ভাই  
মিলিয়া কবে ; অন্ত এক ভাই ঠেলা মারিলে  
সমুদ্রপর্বে পড়ে ॥

উত্তর—ভাত খাওয়া ।

৬ । বাবুর মত বসে ; কাঠবিড়ালের স্থায়  
ডাকে ; বাঘের মত লাফ দেয় ; পাত্র অর্থাৎ  
আধারের স্থায় ডুবে ।

উত্তর—ভেড় ।

৭ । “ইজরের” মাথাং খড়্গের গাঁদা  
খুলিয়া দেখিলে চাঁপা ফুল ।

উত্তর—কাঁঠাল ।

৮ । আকাশে ঝিলমিল করে, পাতালে  
জে ; কোন দ্বয়ের হৃদপিণ্ডে কেশ করিয়া  
দিয়াছে ।

উত্তর—আম ।

৯ । কাঁচা সময়ে নয়ম, পাকিলে সিন্দুর ;  
যে ইহা কি বলিতে না পারে, তাহার সঙ্গোষ্ঠি  
ই হুর ।

উত্তর—মেটে পাতিল ।

১০ । মাথাং খড়্গ, টিকিতে চুল ; দশ  
পা এবং তিন খানি লেজ আছে ।

উত্তর—চিংড়ি মাছ ।

১১ । ভাঙা নারিকেল জোড়া দিয়া—  
এই কুলে ধুম ধাম এক্লে বিয়াই ।

উত্তর—বন্দুক ।

মাচ স্বাস্থ্যে পরাণ দান” । ১২ ।

“হেম নর ঘোরাও নর,

কিরে পাকে পাকে ;

সুন্দর পুরুষ নর,

ধায়ে ছি-লগে ।” ১৩ ।

“লোহারে লোহা,

লোহারে ধরলা ঘুণে ;

স্বর্গপুরে আগুন লাগে

মারি দিব কনে ?” ১৪ ।

“হলদা ফুল, চন্দনর মালা ;

ধরিৎ নপারে, বেতাগী কাঁদা” ১৫ ।

“হিলৎ বিলৎ পানি নেই

গাছর আগাৎ কুয়া” ১৬ ।

“এক হাত গাছোরা,

ফুল ফুদে পাঁচোরা” ১৭ ।

১২। আট হাত, বোল হাঁটু সাধু মাছ  
স্বাস্থ্যেগিয়াছে; শুক্না খালে জাল ফেলি  
লাম, মাছ মারিতে প্রাণ বাহিরার।

উত্তর—মাকড়সা।

১৩। হাতীও নর, ঘোড়াও নর, ঘুরিয়া  
ঘুরিয়া কিরে; সুন্দর পুরুষও নহে, অথচ জ্বর  
মলে বাস করে।

উত্তর—চরকা।

১৪। লোহরে লোহ, লোহকে ঘুণে ধরিল  
স্বর্গপুরিতে আগুন লাগিয়াছে, কে নিতাইয়া  
দিবে ?

উত্তর—রোজ।

১৫। হলদে ফুল, চন্দনের মালা; বেতস  
কাটা প্রযুক্ত ধরিতে পাইবার না।

উত্তর—মোচাক।

১৬। খাল বিল ( কোথায়ও ) জল নাই,  
মাছের আগায় কুণ।

উত্তর—নুরিকল।

১৭। এক হাত লম্বা গাছ, পাঁচটা ফুল  
ফুটে।

উত্তর—হুত।

“এক পাতায় বুড়া হয় ।” ১৮ ।

“বড় কলংৎ সূতা ফুদে” । ১৯ ।

“ধারদে গুলার বড় নেই” । ২০ ।

“হুই ভাইয়ে লড়াই” ২১ ।

“আগা কাবিলে গরা করে ।” ২২ ।

“তগায়, শেলে ন আনে” । ২৩ ।

“পরাণ নেই, মানুষ গিলে ।” ২৪ ।

“চাল আগে; তলা নেই;

পঁখা খবার আগা নেই” । ২৫ ।

“চালর উরর শিয়াল ছা,

কিজাক্ কিজাক্ করে রা” । ২৬ ।

১৮। এক পাতাতেই ( গাছ ) বুড়া হইয়া  
থাকে।

উত্তর—গুল।

১৯। বৃহৎ পর্বতগাত্রে সূতা ফুটে।

উত্তর—তার।

২০। এমন কোন গুলার, বার বোটা  
নাই।

উত্তর—ডিম।

২১। হুই ভাই মিলিয়া বুঝাঝুঝি করে।

উত্তর—মানুষের গাটা।

২২। অগ্রভাগ কাটিলে বা বাঁধিয়া রাখিলে

গোঁড়াও মরিয়া য’র।

উত্তর—খাল।

২৩। তালাস করে, পাইলে আনেনা।

উত্তর—পথ।

২৪। প্রাণ নাই ( অথচ ) মানুষ খাশ  
করে।

উত্তর—কোঠা।

২৫। চাল আগে, তলা নাই বোঝা রাখি-  
বার জায়গাও নাই।

উত্তর—হাতি।

২৬। চালের উপর শিয়াল খাবক, কিরকম  
কিরকম শব্দ করে।

উত্তর—বেগুনজল।

## বিংশ পরিচ্ছেদ ।

[ ১ ] ক্রীড়া,—[ ২ ] কৌতুক (—নাচ, বাজীপোড়ান প্রভৃতি )

[ ৩ ] বাগ ও [ ৪ ] সঙ্গীত ।

[ ১ ]

আধুনিক সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় ক্রীড়াগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে । তৎপরিবর্তে কেবল যে বিলাসিতার প্রস্রব দেওয়া যাইতেছে এমন নহে, উদ্ধারা জাতীয় বলবীৰ্য্যও বখেটক্লে রক্ষা পাইতেছে না । কারণ, প্রাকৃতিক শক্তির অল্পকূলে গতি পরিচালিত করিতে পারিলে যেমন সকলকাম হওয়া যায়, প্রতিকূলাচরণে তেমতি অনিষ্টের সম্ভাবনা ! শীত প্রধান দেশোচিত ক্রীড়াসেবার আমাদের উপকারের আশা যত, অপকারভীতি ততোধিক । আর দেশীয় ক্রীড়াগুলিতে কাণাকড়িটাও খরচ নাই, অথচ প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করা চলে ; কিন্তু সভ্যতার চাক্চিক্য নাই বলিয়া তৎসমুদায় অধুনা অবজ্ঞাত হইতেছে ! “চট্টগ্রামবি সভ্যতাবিরল দেশে” অস্তাপি পল্লীগ্রামের নিভৃত অন্তরালে সেই সৰ্বপ্রাচীন ক্রীড়া রাজত্ব করিতেছে দেখিয়া, দূর হইতে সেই ‘সভ্যতা’কে নমস্কার করিতে ইচ্ছা যায় ! কিন্তু সমাজ কি আর আমাদের নিষেধে কর্ণপাত করিবে ? অহুচাকিৰু যে আমরা, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য কোথায় ? জানি না, ভগবান্ এই হতভাগ্যদিগের প্রতি কবে কৃপাকটাক পাত করিবেন !

যাহাহউক এই পার্শ্বতীরদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্রীড়াগুলির বখেট সম্মান আছে । রাঙামাটিবাসী ছাত্রগণ ব্যতিরেকে কেহই তথাকথিত ‘সভ্য খেলা’গুলির আশ্রয় পায় না । সুতরাং অনন্তোপায়েই হউক, তাহাদের পুরাতনের আদর ।

উদ্ভেদ প্রাশংসনীয় । চাক্মাদের ক্রীড়াগুলির মধ্যে কয়টি আমাদের অল্পকৃত, কোনটিবা সাধারণ রূপান্তরিত এবং কোন কোন “বারা” আবার এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । ক্রীড়াগুলিকে ঘোড়াসুতি তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ শিশুক্রীড়া,—ইহাতে মন ও শরীরের বিশেষ কোন চালনা থাকে না, কেবল অনাবিল আনন্দ

রাজ লাভ হয়। বলাধানের সহিত ক্ষুণ্ণের নিমিত্ত ঝালক এবং কিশোরগণ  
বিভিন্ন প্রকারের ক্রীড়াগুলি গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, এইগুলি কিছু শক্তি-  
সাপেক্ষ। পূর্বকালে এসকল “থারা”র যুবক এবং প্রৌঢ়ের দলও বোগদান  
করিত; এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। তাহার বিশেষ কারণ,—সেকালে  
জীবনব্যয়্য এক দুর্বল ছিল না; কঠোর সাংসারিক চিন্তার এক্ষণে তাহাদের  
সে মুখ উৎসর্গ গিয়াছে। ৮।৯ বৎসরের শিশুসন্তানগুলিতে পর্য্যন্ত আর সেরূপ  
বালমূলত মাধুরিমা খেলিতে দেখা যায় না, যেন সকলেই “অপ্রচিন্তাচমৎকার”।  
দারুণ ভবিষ্যৎভয়ে কাতর ও সন্ত্রস্ত! তৃতীয় শ্রেণীতে যে সমুদয় ক্রীড়াকে  
ভুক্ত করা যায়, তাহাতে বুদ্ধি-বুদ্ধিই মার্জিত হইয়া থাকে; শরীরের কোন  
ব্যায়াম হয় না।

শিশুক্রীড়া বহু বধ, তন্মধ্যে কেবল দুইটীমাত্র এখানে উল্লেখিত হইতেছে।  
বধা :—

(ক) “ইজিবিজি থারা”র কতিপয় শিশু মণ্ডলাকারে বসে এবং  
তাহাদের হাতগুলি সম্মুখে বিস্তৃত করে। দলের সেরাটা শিশু—

“ইজি—বিজি—কার্‌মা—বিজি—

মইচ—চরে—খোড়া চরে—

সাধু—বইরে—কহু—রান—

বার্গি—উত্তান—মনোরাম—

এর্গী—রের্গী—রাভা—বাবু—

কৈরেনে—ভুখা—হাতান—সেজা”—

বলিতে বলিতে প্রত্যেক শব্দের সহিত বধাক্রমে এক এক জনের হাত স্পর্শ  
করিতে থাকে। এইরূপে চক্রাকারে হাত ঘুরাইয়া বিস্তৃত হস্ত সমুদয় স্পর্শ  
করিতে করিতে যে হাতে শেষোক্ত “নেজা” শব্দটা উচ্চারিত হয়, সেই হাত  
তখনই উঠাইয়া লওয়া হয়। অনন্তর পুনরায় এবং বিধ প্রক্রিয়ার আবৃত্তি চলিতে  
থাকে। সর্বশেষে বাহার হাতখানি অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই পরাজিত সাব্যস্ত  
করা হয়।

(খ) “কভাজাং থারা”র দুই বা ততোধিক শিশু পরস্পরের হস্তপৃষ্ঠ-  
চর্চাকর্ষণে ধীরে ধীরে আন্দোলন করিতে করিতে—

“কভাজাং—কভাজাং

মইবর—উর, বা—বা

একোয়া কলা খোলা পয়ি থার”

বলিয়া হঠাৎ প্রত্যেকে বা বা হস্ত সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া করতালুতে আশনাপন

মুখ নির্গত শব্দে বাধা দিতে দিতে “আবা” “আবা” করিতে থাকে । ইহাতে কোন অসুখপত্রের প্রতিক্রিয়াগিতা নাই ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কীড়া সমুদয়কে আবার বিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় । তাহার প্রথম পর্যায়ে কেবল সরল অপোগণ্ড বালকগণ মাত্র থাকে ; দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহাদিগ হইতে বয়োবৃদ্ধ দল অর্থাৎ কিশোর-যুবকগণই অধিকাংশরূপে বোণদান করে । বালকের খেলা যেমন :—

( ক ) “পলাপলি খারা”—ইহা লুকোচুরি কীড়ারই নামান্তর মাত্র । বালকগণ সমান হই তাগে বিভক্ত হইয়া একদল কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেজামুরূপ সুবিধায় লুকাইয়া থাকে । অপর দলপতি জিজ্ঞাসা করে,—“তোমরা সকলে পলাইয়াছ ; এখন আমরা খুঁজিতে পারি ?” ইহাতে কোনও উত্তর পাওয়া না গেলে, বুঝিতে হইবে—“মোনে সম্ভতি লক্ষণ” । তখন তাহারা সোৎসাহে বিকল্পদলকে খুঁজিতে আরম্ভ করে । যদি কাহাকেও তালাস করিয়া না পাওয়া যায়, খুঁজ সকলে অবেশ্যকারিদলকে তাহার সম্মান বলিয়া দিলে “কি হারাইবে” বীকার করাইয়া তবে বলিয়া দেয় । পক্ষান্তরে তাহারা এক “শির” হারিয়া যায় ।

( খ ) “পুৎপুৎ খারা” । ইহা জলকীড়া বিশেষ । আনাতি জলে সকলে দাঁড়াইয়া, তাহাদের মধ্যে একজনে সকলেরই সম্মুখে কোন ভাসমান বস্তু খণ্ড ডুবাইয়া আচম্বিতে ছাড়িয়া দেয় । আর সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সকলে জল-পৃষ্ঠোপরি ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে । ইতিমধ্যে যে ঐ ভাসমান বস্তু হস্তগত করিয়া বস্তুকটী জলে ডুবাইতে পারে, সেই জয়ী হয় ! কিন্তু সে ডুব দিবার পূর্বে যদি অপরেরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের লক্ষ্য পদার্থ উহার হস্তগত হইয়াছে, তখন তাহারা শারীরিক বলের প্রতিক্রিয়াগিতা দেখায় । বাহার সামর্থ্য অধিক, সে অপর সকল হইতে বস্তুটী বলে গ্রহণপূর্ব্বক মৃত্তক জলে ডুবাইয়া জয়লাভ করে ।

( গ ) “বুদ্ধিমান খারা” । ইহাতে একজনকে রাজা করিয়া অপরেরা দুই ভাগ হইয়া যায় । রাজা মধ্যস্থলে এবং তাহারা দুই দুই থাকে । পরে একদল হইতে একটী বালক আসিয়া রাজার নিকট অতি পোশনে অপরদলের কোন বালকের নমস্কারের মাত্র করিয়া যায় । ইহাতে বিকল্পদলের সকলে বিবেচনা করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজার কাছে পাঠায় । তাহাতে যদি সেই নমস্কারিণী বালকই আসে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ‘মৃত’ ঠিক করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেয় ; অন্যথা সে বালক প্রতিক্রিয়াগিতা দলের কাহারও নাম বলিয়া যায়, তখন সেই দল হইতে বালক আসে । এইরূপে কোন দলের সকলেই হারিয়া গেলে “এক পিদ্দ” পরাভ হয় ।



(ঘ) “ঘর চাক বাহির চাক খারা”। সমতল ভূমিতে একটি স্তম্ভ বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া সমবিভক্ত বালকগণের একদল পরিধিমধ্যে এবং অপর দল বাহিরে থাকে। অনন্তর “ঘর চাক না বা’র চাক,” “বা’র চাক না ঘর চাক” বলিতে বলিতে ‘ঘরের’ দল ‘বাহিরের’ দলকে এবং ‘বাহিরের’ দল ‘ঘরের’ দলকে বলাগাথা বলপ্রয়োগে টানিয়া আনিয়া স্ব স্ব দলপুষ্টির চেষ্টা করে। যদি কোন দলের সকলকেই সীমাক্রম করাইতে পারা যায়, তখন অপর দলের বালকেরা সানন্দে বলিয়া উঠে,—“এক পির”।

(ঙ) “পত্তি খারা”। ইহাতেও স্তম্ভ বৃত্তের ভিতরে এবং বাহিরে বালকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। পরে ‘ডু ডু খেলা’র জ্ঞান হই পক্ষ হইতে পর্যায়ক্রমে এক একজন “পত্তি ....” রবে নিখাস লইয়া সীমার বহির্ভূত অপর দলকে আহ্বান করিয়া আসে। যদি বিপক্ষীয়েরা আহ্বানকারীকে আবদ্ধ করিতে পারে, কিংবা তাহার নিখাস ফুরাইয়া গেলে মাত্র ছুঁইয়া দিতে সন্মত হয়, তবে সে মরিয়া যায়। অপর দলে এইরূপে কেহ যখন ‘মরে’, তখন তাহার বিপক্ষদলের ‘মৃত’ ব্যক্ত ‘বাঁচিয়া’ খেলার অধিকার পায়। এইরূপে কোন দলের সকলে ‘মরিয়া’ গেলে ‘এক পির’ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে।

শেবোক্ত ক্রীড়াধরে শারীরিক বলের প্রয়োজনীয়তাই অধিক। স্তম্ভাং এই দুই খেলার অধিকতর বলবান্ বালকের আবশ্যক। এতদ্বির ছোট ছোট বালকদিগের উপযোগী “ঘিলাখারা”, “নাদে ( লাটিম ) খারা”, “মাছখারা”, “পোকখারা”, “কুমীর খারা”, “শায়ুক খারা” প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের অনেক ক্রীড়া আছে। শারীরিক ব্যায়ামপ্রধান আর দুইটি খেলা আছে, তাহাতে বালক—কিশোর—যুবক ত্রিবিধ সম্ভ্রম্যদের লোকই যোগদান করিয়া থাকে। সেই দুইটি কথা :—

(ক) “গুছু খারা”। ইহা ‘ডুডু খেলা’রই নামান্তর মাত্র। স্তম্ভাং তাহার বর্ণনা দেওয়া নিম্নপ্রয়োজন। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কথা এই, উভয় দলের মধ্যে বাহাতে সীমা নির্দেশ করা হয়, তাহার আখ্যা—“গাং” অর্থাৎ নদী। স্তম্ভাং অপর পারে বাইতে হইলে পূর্জাহে পারের পক্তি বৃদ্ধিতে হয়।

(খ) “পোর খারা”। ইহা চটগ্রামে ‘পড়খেলা’ নামে প্রথিত। বাবতীর শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে এই ব্যয়পূক্ত ক্রীড়াই যে সর্বোৎকর্ষী নিরাপদ এবং সর্বোৎকর্ষী, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শারীরিক ক্রীড়ার বাহা সুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাতে তাহা অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষী ও নিরবিরতরূপে

রক্ত সঞ্চালিত হয়। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, এখন আধুনিক সমাজে ইহার আদর ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। এই খেলার নিয়ম বর্ণনা :-

ক্রীড়কগণ দুই সমানভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেকবারে একদল পলাইতে চায়, অপর দল বাধা দান করে। বাধাদানকারীদের পক্ষে একজনের উপর প্রাধান্ত অর্পিত হয়, তাহার উপাধি—“মোইল্লা”। তাহার দলের প্রত্যেকের লজ্জা সমতল ভূমিতে এক একটা সমান্তরাল স্থলরেখা ক্রীড়াভূমিতে অঙ্কিত থাকে। তাহারা স্ব স্ব রেখায় দাঁড়াইয়া অপর দলের বাহাকে পাত্তয়া যায়—বাধা দিতে প্রস্তুত হইলে ‘মোইল্লা’ বিশক্ষদলকে আহ্বান করে—“পোর” অর্থাৎ পড়। তাহাদিগকে ‘পড়িতে’ বা পলাইতে এই রেখাগুলিতে অবস্থিত বাধাদাতা ও ‘মোইল্লা’ হাত হইতে নিরাপদে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। যদি কেহ পলাইবার সময় তাহার বাধাদাতা তাহাকে কোনরূপে স্পর্শ করিতে পারে, অথবা ‘মোইল্লা’ রেখাগুলির দুই পার্শ্ব ও মধ্য দিয়া পরিভ্রমণকালে যদি বিরুদ্ধদলের কাহাকেও কোন প্রকারে স্পর্শ করে, তবে পলায়নকারিদল পরাজিত হয়। অন্যথা কোনরূপে এই সমুদয় বাধাবিগ্রহ অতিক্রম করিয়া দলের একজনও যদি এই রেখাগুলি পার হইতে এবং পুনঃ প্রত্যাগমন করিতে পারে, তবে তাহাদেরই জয় হয়। কিরে বার খেলিতে পরাজিত দলের উপরই বাধাদান করিবার ভার পড়ে।

তৃতীয় শ্রেণীর—তাস, পাশা, “প্যোক ( পাখী ) খারা” (১) প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালক ক্রীড়ারও অভাব নাই বটে, কিন্তু অতিশয় অল্প। এই সকল দ্বারা মস্তিষ্কচালনা বাতীত অপর কোনও উপকার হয় না। সুতরাং শরীর-রক্ষাকার্য্যে এই গুলিতে উপকার হইতে অপকার অধিকতর। হুক্রহ সংসারকষ্ট-বিমোচনের নিমিত্ত আমাদের যেরূপ অহর্নিশ খাটিবার প্রয়োজন আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, এই শ্রেণীর ক্রীড়াসকল যে উন্নতির একান্ত পরিপন্থী—তাহা অচিরে সর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, দম্ভাতার রূপান্তর—সত্য কি অসত্যের উপযুক্ত কার্য্য বলিতে চাহি না, কোন প্রকারের “জুয়াখেলা” ইহাদের মধ্যে এবাবৎ প্রবেশ করে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত অভাবব্লিষ্ট হইলেও ইহারা স্বীয় ব্যবহার অনেকটা সন্তুষ্ট থাকিতে জানে। সুতরাং তাদৃশী চর্চনীতি অবলম্বনে অর্ধোপার্জন ইহাদের নিকট অতাপি স্থগার সহিত উপেক্ষিত হয়।

\* “প্যোকখারা” আমাদের সমাজে ‘বাগবন্দী’ খেলা নামে পরিচিত। ইহা কতকপরিমাণে ‘দাধা খেলা’রই অনুরূপ। ‘হুক’ বা ঘরে একজন বাঘ এবং অন্ততঃ দুই পাখী পরিচালিত করে

কিন্তু বাহুরবিগের “ভুখুরী খান্না” ইহাবিগের মধ্যেও বেশ পশারলাত করিয়াছে। মন্ত্রণের অভ্যুত রহস্যসমূহ উৎসব-আমোদে বিশেষরূপে কর্তৃক প্রদর্শিত হয়। তৎকাল তাহার উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকে।

[ ২ ]

কৌতুক নানাবিধ। মনুষ্যজীবনও কৌতুকময়! বাক্যে যেরূপ যতি, কর্মজীবনেও তেমনি মধ্যে মধ্যে কৌতুকের প্রয়োজন। ইহাতে মন প্রফুল্ল থাকে, কার্যোও নিত্য নূতন বল পাওয়া যায়। কিন্তু

কৌতুক। ইহা বধাসম্ভব নির্দোষ হওয়া উচিত। কৌতুকলীলা একাগ্রবর্তী পরিবারেই যেন সমধিক। পরস্পর পরস্পরে হাসিয়া খেলিয়া থাকিতে অবশ্য সকলেই ইচ্ছা করে। আর কেবল বাস্পাত্ম্য অর্থাৎ পৃথগীভূত পরিবারে যে কৌতুক, তাহা নিত্যই এক ঘেঁয়ে। তাই একাগ্রবর্তিতার অভাবে চাক্‌সামাজ্যে কৌতুকের অবসর বড়ই ছন্নভ; সাময়িক পর্ব বা উৎসব বিশেষে মাত্র বাহা কিছু সামান্য প্রচলিত আছে। অথচ বিলাত প্রভৃতি দেশে একাগ্রবর্তিতা বিরল হইলেও ইহার প্রাধান্য বিস্তর। তাহার কারণ, সেসব দেশে সর্ববিধ স্বাধীনতা বিদ্যমান এবং দেশও তত্প্রবোদী অর্থশালী। আমাদের জায় ‘অন্ন-চিন্তা-বিষধর-বংশন-কাতর’ পরিবারে কত আর কৌতুকের আকাজকা করা যাইতে পারে?

মন্ত্র সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তর বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, অতিরিক্ত সুরাস্কর ইহাবিগের উৎসবের প্রধান লক্ষ্য। বাবতীয়

অল্পটানের পূর্বাঙ্কেই ইহাবিগকে সুরার আমোজন

করিতে হয়। রাজা বা হেডম্যানগণের ক্রিয়াকর্ম্মা-  
নিত্যেও প্রজাসাধারণের বখানিয়মে মন্ত্র উপঢৌকন দিবার প্রথা আছে, অতথা তাহাবিগকে দণ্ডিত হইতে হয়। তন্নিম্ন ধর্ম্মকার্য্যমাজেই সুরাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ইহাও দেখাইয়া আসিয়াছি যে, সুরাব্যস্তিরেকে ইহাদের ‘তত্ত্ব’ দেওয়াও চলে না। বিশেষতঃ বিবাহের প্রস্তাবনা উপস্থিতকালে উহার একান্ত প্রয়োজন। উৎসবদিতে অহর্নিশ সুরাসম্রা খোলা থাকে; বাহার বত ইচ্ছা পান করুক,—কোনও বাধা পাইবে না! আর তৎপরিণামে বখন সমস্তাৎ বীভৎস রহস্যসমূহ প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহাতে পরিবারের সকলে ও সমাগত আবালবৃদ্ধবলিতা লক্ষ লক্ষ আনন্দ অন্বেষণ করিতে থাকে।

অগ্নিগণের জাতিতে যেমন নৃত্যাদি দ্বারা আমোদ-প্রমোদের রীতি আছে,

ইহাদিগের ভেদন কিছুই নাই। বস্তুতঃ স্তম্ভা জাতিসমূহের পক্ষে ইহা একটি কলঙ্কবিশেষ। ইজিরত্বটির এহেন নিকট নাচ।

আয়োজন—কেবল পবিত্রতার বিরোধী নহে, শিষ্টাচারের পক্ষেও নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হয়। কতকগুলি নীচশ্রেণীর ভাড়াটে মেয়ে বা নির্দিষ্ট করেক রাত্রির নিমিত্ত ধারকরা নর্ত্তকী স্বল্প অলভঙ্গী করে, আর শিতা, পুত্র, গুরু, শিবা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া হা করিয়া তাহাদের প্রতি তাকাইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে ‘বাহবা বাহবা’ ধ্বনিতে পাপ-স্মৃতি জ্ঞাপন করে! কি বীভৎস দৃশ্য! যাহারা ইচ্ছা করিয়া এক্ষণে মনকে কলুষিত করিতে প্রয়াসী, তাহাদের কর্তব্যবুদ্ধির কখনও প্রশংসা করা যায় না। চাক্ষুসাদিগের বাহা কিছু নৃত্য “মহারুনি” মেলায় দেখাইয়া আসিয়াছি; সেই অবিবাহিত যুবকযুবতীদিগের উদ্ভ্রান্ত নৃত্য দেখিলেও লজ্জায় চক্ষু নিম্নীলিত হইয়া আসে। পরস্পরে বাহুলতা বেঠেনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন প্রকারে যে নর্ত্তনলীলা প্রকটিত করে, তাৎশ ক্রটিপূর্ণ দৃশ্য আর চিত্রিত করিতে চাহি না।

ইজিরস্বত্ব চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বাজী পোড়াইবার ব্যবস্থাটি মন্দ নহে। টহা একদিকে যেমন বিপ্লব, পক্ষান্তরে তেমনি শিরকলা-প্রদর্শক! আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতাজীবনে কামানের নাম শুনিলেই ভয় বাজীপোড়ান। পাই; ধোমের আওয়াজটা মাত্র অতি কষ্টে সহিয়া লইতে পারি! এতদ্বির আশ্রয় বস্তু বাহা কিছু সমস্তই আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। কেহ কেহ বা বাজীতে কতকগুলি টাকা ভস্মসাৎ করিয়া নিরর্থক অপব্যয়ে স্বীকৃত নহেন। তাহাদের এইরূপ সদ্ব্যক্তিতে অবশ্য আমাদেরও সহানুভূতি রহিয়াছে; কিন্তু সেই ব্যয়িত টাকাগুলি বস্তুতঃ সম্পূর্ণরূপে তস্মীভূত হয় না, তৎসমুদয় অনেকেরই জীবনযাত্রার সাহায্য করে। তবে বাজীর খরচটা অপর কোন সংকল্পে ব্যয় করাই শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা। সাধারণ বিবাহাদিতে চাক্ষুসগণ বাজীর অল্প ব্যয় তত উপযোগী মনে করে না; কিন্তু অন্ত্যেষ্টিকালে ইহার বিরাট আয়োজন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অল্পমিত হয়, ঈদৃশী প্রথা মন-দিগের সাহচর্য্যেই সংক্রামিত হইয়া থাকিবে।

[ ৩ ]

সুবিধা পাইলে ইহার বিবাহ এবং অপরাপর উৎসবসমূহে অধুনা বিদেশীয় বাদকদল আনয়ন করে, স্বকীয় বাজ যন্ত্রাদির ব্যবহারে তাহাদিগকে প্রায়ই উদাসীন দেখা যায়। জুমমকে বা যুবকসম্প্রদায়ের লীলাসিকতনে মাত্র বাজী, মুরলী, শিতা, “জাম্বা”

এবং “ধুঙ্গ” প্রভৃতি বস্তু প্রচলিত। এসকল ব্যতীত বেহেলা, সানাই, সারঙ্গ প্রভৃতিরও আমদানী হইয়া থাকে। পূর্বে সাধারণ উৎসবাবসিতেও আমোদ-প্রমোদের অঙ্গস্বরূপ এ সমুদ্রের ‘সঙ্গত’ চলিত; এক্ষণে তাহা কদাচিৎ মাত্র পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু যখন হয়, তৎসঙ্গে “চুল” (ঢোল), “খেংগরং” প্রভৃতিও থাকে। এহলে শিঙা, ধুঙ্ক, জান্দুরা, খেংগরং ইত্যাদি যন্ত্রনিচয়ের পারি-ভাবিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন হইতেছে। প্রথমে তৎপরিচয় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব-প্রক্রিয়াও বিবৃত করিতেছি :—

“শিঙা”—মহিষশৃঙ্গেরই প্রশস্ত। তদভাবে শৃঙ্গগর্ভ পাতলা অথচ মোটা বাঁশের মুখে ‘বিঙুলের’ জায় অপর এক সরু বাঁশের মুখ লাগাইয়া লয়, তাহাতেই ধীরগভীর ফুৎকার দিয়া বাজাইয়া থাকে। বস্ত্র পশুপক্ষী তাড়াইতে জুমক্কেত্রে ইহা প্রায়ই নিনাদিত হয়।

“ধুঙ্গ”—ছই প্রান্তে ‘গিরে’ থাকে, এমন বাঁশের পর্কখণ্ড লইয়া মধ্যভাগ হইতে সামান্য একখানি বাখারি পরিত্যাগে প্রস্তুত হয়। ইহা উদর পাখে লাগাইয়া কাঠিধারা বাজ করে। তখন সেইরূপ আর একটা ভূমিতে রাখিয়া ছই কাঠিতে ধুঙ্গের তাল রক্ষা করিয়া থাকে; তাহার আখ্যা হয় “দগর”।

“জান্দুরা”—বাঁশের জায় উদ্ভিদবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত। দীর্ঘ প্রস্থ—প্রায় এক হাত করিয়া হইবে। কাঠিগুলি পাশাপাশি করে সাজান মাত্র। তাহার এক পৃষ্ঠে ধরিয়া অন্ত্রপৃষ্ঠে করতলাঘাতে বাজ করে।

“খেংগরং”—লৌহনির্মিত চক্রাকৃতি পদার্থ। একদিকে লৌহশলাকার প্রান্তদ্বয় বাহির হইয়া থাকে; মধ্যভাগে একটি ‘জিহ্বা’ও দেওয়া হয়। কেহ কেহ বাখারিখণ্ড দিয়াও ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। খেংগরং বাজাইবার সময় মিলিত প্রান্তদ্বয়ে একখানি স্ততা বাঁধিয়া লয়। উক্ত জিহ্বার মুখ লাগাইয়া থাকিয়া থাকিয়া স্ততাখানি টানিতে টানিতে মৃদলতানে নানা রাগ রাগিনীর স্বাক্ষর দেয়।

“চুল”—আমাদের দেশীয় ঢোলই এখানে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃত নামে পরিচিত। অস্ত্রান্ত্র সময়ে ত আছেই, মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্নানাদির সময় এবং অন্ত্যেষ্টিকালেও ইহার বাজ একান্ত আবশ্যক। একত্র প্রায় প্রতি গ্রামেই ‘চুল’ রক্ষিত হয়। তাহা না হইলে গ্রামান্তর হইতে হাওলাত লওয়াও চলে।

বাঁশী ও সুরলীর গঠনপ্রণালী প্রায় সমান। ভারতম্য মাত্র এট, বাঁশীর একপ্রান্তে ধূপের মধ্যে দিয়া বাজাইবার নিমিত্ত চেটানো আছে, সুরলীর তাহা

নাই। কেননা, সুরলী আঁড় করিয়া ফুৎকারমাত্র প্রয়োগে ধ্বনি তুলিতে হয়। ইহার বাঁদী এবং সুরলী বাঁদীতে সান্ত্বিত্য পটু। এতদ্ব্যতীত সাহায্যে অবিকাংশ যুবক ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া থাকে।

[ ৪ ]

অধুনা ইহাদিগকে যাত্রা, কবির গান প্রভৃতিতে বধাসাধ্য উৎসাহ দান করিতে দেখা যায়। সম্পন্ন পরিবার মাতেই উৎসবাদি উপলক্ষে এই সমুদয়ের বাবস্থা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সঙ্গীতকে বাহার্য্য ভালবাসিতে সঙ্গীত।

জানেন না, এ সংসারে তাহাদের জীবন সান্ত্বিত্য নীরস। ইহা যে কেবল ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিরা’ যায় তাহা নহে, স্বয়ংকে এমন অনির্বচনীয় শক্তিতে উত্তেজিত করে, বাহাতে বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। পাপকোলাহলপূর্ণ ভগবতের জটিলতা—কুটিলতা ও কামিনীকাকনের চিত্তা ছাড়িয়া প্রাণ যে উধাও ভাবে কোথায় সেই সচ্চিদানন্দে গিয়া (১) মগ্ন হয়, সঙ্গীতের সুললিত রাগরাগিণীপূর্ণ স্বর্য্য ততদূর পৌছিতে না পারিলেও গায়ক কি শ্রোতা তাহার প্রতি আর লক্ষ্য করে না, অথবা ফিরিয়া দেখিবারও আবশ্যক মনে করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ‘প্রসাদী মাল’সী’ পদলালিত্যের জন্ত প্রসিদ্ধ নহে, যখন তাহা কর্ণ অপেক্ষা অন্তঃকরণকে অধিকতর পরিতৃপ্ত করে।

ইহাদিগের সঙ্গীত সমুদয়কে রসভেদে বিভক্ত করা দুঃসাধ্য, এমন কি অনেক স্থলে অসাধ্যই বটে। কেননা, প্রায় সঙ্গীতেই দুই বা ততোধিক রসের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এস্থলে তাবাহুসারেই ভাবচতুষ্টয়।

শ্রেণীভেদ করা হইল। ভাবচতুষ্টয়, যথা :—ভক্তি, উদাস, বিরহ এবং প্রেম। নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণীতে—ক্রমপরবর্তী অপেক্ষা ক্রমপূর্ব্ববর্তী ভাবের সমান অধিকতর; সুতরাং সমাজ অনুরক্ত বলিয়া ক্রম-পূর্ব্ববর্তী অপেক্ষা ক্রমে পরবর্তী ভাবের সঙ্গীতই ইহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত।

পূর্ব্বেরই বলিয়াছি, উৎসবসময়ে ইহার “গেন্‌কুলী” আনিয়া কথকতা শ্রবণ করে। বলিতে কি, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহাতে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে। রঙ-খেরাল বা কাহিনীর ভিতর দিয়া গভীর ভোত্রগান।

ধর্ম্মভাব এবং উজ্জল দৃষ্টান্ত সহযোগে সুনীতি-গর্ভ উপদেশ সমূহ যখন নানাবিধ সুর সংযোগে প্রকটিত হয়, তখন শ্রোতৃকণ্ঠেই মনোরঞ্জন

( ১ ) কিন্তু মহাকবি মিটন “Paradise lost” এর একস্থলে লিখিয়াছেন,—“Music charms the sense, eloquence the soul” কথাটা নিতান্তই একদেশ দর্শিতাসূচক বটে; তবে তাঁহার জীবনের বাস্তব কবিতাগুলির আলোচনায় বুঝা যায় যে, পারিবারিক বিষয়ে সম্রিষ্ট উপলব্ধি হইয়া তিনি এইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হইবার কথা। বস্তুতঃ এতাদৃশ নির্মল আমোদ সকল সম্প্রদায়েরই প্রাণের সামগ্রী। পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী যে আমোদপ্রমোদ একত্র মিলায় উপভোগ করিতে পারে, তাহা কেনই বা আদরের না হইবে? 'গেন্-কুলি'গণ সচরাচর যে সকল 'পালা' গান করে, তন্মধ্যে "গোজেনের লামা" অর্থাৎ গোসাইর (পরমেশ্বরের) স্তোত্র সর্বাপেক্ষা হৃদয়াকর্ষক! ইহার আগা-গোড়া উদাসিন্তের মরম কথায় পরিপূর্ণ। উহার রচয়িতা শিবচরণ সংসার-

সক্তিবিরহিত ছিলেন। "কাস্তীগোছা"র তাঁহার জন্ম হয়।  
উদাসী শিবচরণ।

বাল্যকাল হইতেই একমাত্র পুত্রের উদাসভাব দেখিয়া, তদীয় পিতামাতা অতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছিলেন; তজ্জন্তু বিবাহ করাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সেই প্রলোভনে কেলিতে পারা যায় নাই। অনন্তর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা হয়,—তথাপি তিনি আপন ইচ্ছায় চলিয়া যাইতেন। আহারের সময় মাতা পুত্রকে না পাইয়া তাঁহার নিমিত্ত "ভাতমোচা" (১) "ফুলবারেঙে"র মধ্যে রাখিয়া দিতেন। আশ্চর্যের কথা, ২১৩ মাস পরে শিবচরণ আসিলেও নাকি সেই ভাত গরম পাওয়া যাইত; এমন কি কোন কোন বারে সেই পয়ুসিত ভাত হইতে বাষ্পও উঠিত! অবশেষে তিনি সন্ন্যাসত্রয় গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। তারপর তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তৎকৃত "গোজেনের লামা" সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ; প্রায় সকলেই উহার প্রতি ভক্তিমান। শুনা যায়, তাঁহার প্রণীত সাতটি 'লামা' আছে, কিন্তু আমি বহু অনুসন্ধানেও ছয়টির অধিক পাই নাই। যাহা পাইয়াছি, নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

## গোজেনের লামা।

(প্রথম।)

উজানি ছরা লামনি ধার,

ন আছিল হৃষ্টি জলংকার।

জল-উপরে গর্যো (২) স্থল,

বানেল (৩) গোজেনে জীব সকল।

আরেয়ে (৪) বানেয়ে ধার জনম,

আগে ছালাম্ তং (৫) তার চরণ।

চানে হৃয্যো স(হো)দর ভেই (৬),

ছালাম্ তং উদ্দেশে ভূমিং থেই (৭)।

(১) ভাতের পুটলী। (২) গড়িয়াছে; (৩) বানাইল (তৈয়ার করিল)।  
(৪) পকে; (৫) সান্নাৎ দিতেছি; (৬) ভাই; (৭) ভজিতে থাকিয়া।

সমুখে ছালাম্ভাং পুগেদি (১)  
 পছিমে ছালাম্ভাং পিজেদি (২) ।  
 উত্তরে ছালাম্ভাং বাঙেদি,  
 দক্ষিণে ছালাম্ভাং দেনেদি (৩) ।  
 মোরে বিধিয়ে দয়া হোক ;  
 তিন দেব-চরণে ছালাম্ভাং (৪) ।  
 ন বুকে তিন দেবে যেই সকল,  
 সেই সকল বড় কমল, কুল কমল ।  
 মা সরস্বতী ছালাম্ভাং,  
 যোগাই দিত গাই গীতপদ ।  
 ছালাম্ভাং মানেই তপসী,  
 ধর্মশীলা সন্ন্যাসী ।  
 একা মনে ভজুঙ (৫) ;  
 ছালাম্ভাং জানেলুম্ভাং দেব কমল ।  
 পূজার গুরু মানেলুম্ভাং,  
 হাজার ছালাম্ভাং জানেলুম্ভাং ।  
 মর্ত্যে পড়ি জনম যার ;  
 তার চরণে নমস্কার ।  
 দশমাস দশদিন হুথ পিয়ে (৬) ;  
 জম্বু দিবং নি (৭) জন্মিয়ে ।  
 পুরি চেলুং (৮) চোখ ভরি ;  
 মা-বাপ পারা (৯) নেই দেশভরি ।  
 পড়োয়া (১০) বুঝে আখরং (১১) ;  
 এজের (১২) মানেই লোক সংসারে ।  
 মা-বাপ চরণে ভজিলেই (১৩) ;  
 সকল তিথ্য (১৪) ফল পাই ভেই ।  
 জ্ঞানী ধ্যানী ছালাম্ভাং ;  
 পড়োয়া পণ্ডিত বুঝিলং ।

(১) পূর্বদিকে ; (২) পশ্চিম দিকে ; (৩) ডান দিকে ; (৪) ষাঁকুক ; (৫) ভজনা  
 করিতেছি । (৬) পাইয়া ; (৭) জম্বুদ্বীপে কি ; (৮) চাহিলুম্ভাং ( দেখিলাম ) ; (৯) অপেক্ষা ;  
 (১০) শিক্ষিত ; (১১) অক্ষর ; (১২) আসিবে ; (১৩) ভজনা করিলেই ; (১৪) তীর্থ ।



সবার ছালাম বৃহৎ দিলুং ;

গীত সাধনান সাধিলুং ।

গীত একলামা পুরে (১) ;

বুঝিল বুঝিব মানেরে (২) ॥

( দ্বিতীয় । )

ওঁদাং (৩) বেয়েই ধোপ ( ৪ ) কাপড় ;

গোজেন-চরণং ভজন্তর ।

আগে ছালাম দেব শিবচরণ,

মাগং (৫) গোজেনর তুন (৬) ছই চরণ ।

ছেয়ার (৭) তলে রাখে-দ (৮),

একালে ওকালে তরে-দ (৯) ;

জন্মে জন্মে দেখা হক,

চিন্তে মনে একা হক ।

দেবাংশি গোজেনে ন দোষি,

অবুঝা মানেরে ন বুঝি ।

শুন শুনরে পড়োয়া ভেই ;

দ্বি-বা অক্ষরে তরি যেই ।

গুরু সাধি না পেয়ে (১০) ;

অনা গুরুয়ে (১১) পার হয়ে ?

সাধি আনং (১২) আর জনম,

সকল দান করন্তর (১৩) এই জনম ।

জুরি-ন পাঙ্গে (১৪) কুরং পের (১৫) ?

ভজিলে চরণে কুল পের ?

ন-র'লে (১৬) ধন মান সাধনে,

তরিব মানেরেই লোক কুল দানে ।

গুরুচরণ সার করে ;

বংশ ধন কি পার করে ?

একামনে ভজিলে ;

সকল ভীষ্য কল পারি বেলে (১৭)

(১) পূর্ণ হইরাছে ; (২) মহুর্য ; (৩) গলায় ; (৪) গুজ অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন ; (৫) মাগিতেছি ; (৬) ছইতে ; (৭) হামার ; (৮) রাখিত ; (৯) তরহিত । (১০) পাইয়া ; (১১) গুরুভাতিয়কে ; (১২) আনি ; (১৩) করিতেছি ; (১৪) জুটাত না পারিলে ; (১৫) কোথায় পাইব ; (১৬) না থাকিলে ; (১৭) বলিয়া ।

দয়া বে-লে (১) সার করে ;  
সাধিলে দজ্ঞপৎ (২) পার করে ।  
অপার পানি (৩) সাগরে ;  
ত্রিশ তিন জাতি (৪) ভাজ (৫) পড়তুম-  
গই (৬) আগরে (৭) ।

ভঞ্জে মানেই লোক এই কালে ;  
যমে ন ধরিব ঐ কালে ।  
যে বর মাগে সে বর পায়,  
গোজেনে বর দিলে ন ফুরায় ।  
গোজেন-মেইয়া (৮) উদ'নেই (৯) ;  
বুঝি পারি কে ভাই সেই ।  
পরম বৃক্ষে ভর দিয়া ;  
বুঝি পারে কে তোর মেইয়া ?  
সকল জীবে বেদায় (১০) হোক ;  
চিন্তে মনে একা হোক ।  
পরম গোজেন কিয়ৎ (১১) থায় (১২) ?  
সাতবার সাধিলে সেই ন পায় !  
তঁদা (১৩) সাধি আনিব ;  
পরম গোজেনে ভুজিব ।  
চরণে ছালামে ভুজিলে ;  
ধর্ম সাধনান পাই বেলে ।  
ছালাম দিবার কাঁছেল যে (১৪),  
গীত দ্বি-লামা কুরেল যে (১৫) ।  
দ্বি-লামা ছিরেলে (১৬) ন য়েবং (১৭) ;  
গোজেন-সম্মুখে বর লবং (১৮) ।

( তৃতীয় । )

তঁদাৎ বেয়েই কাপড়ে,  
আরাধন করঙর হাত ঝোড়ে ।

( ১ ) দেখিলে ; ( ২ ) মূলমাত্রী শব্দ—নরক হইতে ; ( ৩ ) জল ; ( ৪ ) তেজিল জাতি ; ( ৫ ) ভাষা ; ( ৬ ) পড়িতাম গিরে ; ( ৭ ) অন্ধত্বে ; ( ৮ ) ইন্দের মায়া ; ( ৯ ) অন্তনাই ; ( ১০ ) বেধা ; ( ১১ ) কিনে ; ( ১২ ) থাকে ; ( ১৩ ) এখানে প্রকট ; ( ১৪ ) কাছাইল অর্থাৎ ফুরাইয়া আসিল যে ; ( ১৫ ) ফুরাইল যে ; ( ১৬ ) শেষ হইলে ; ( ১৭ ) বাইব না ( ১৮ ) লইব ।

দ্রথাকুলে যার জনম,  
 তঁদা সাধুগুর পায় জনম ।  
 হীন কুলে ন-যিহুং ( ১ ),  
 দ্রথাকুলে ন-হুহুং ( ২ ) ।  
 হাদে ( ৩ ) ন-করতুম্ ( ৪ ) জীববধ,  
 যুগে যুগে ন পড়তুম্ ( ৫ ) দজগৎ ।  
 পরম বৃক্ষি যোর ন-হদ ( ৬ ) ।  
 চিদা-চজ্জা ( ৭ ) ন-থেন্দ ( ৮ ) ।  
 কথা ন-কদ ( ৯ ) তলেদি ( ১০ ),  
 লোকে ন-কন্ত ( ১১ ) কলক্ষী ।  
 রোগে বেদে ( ১২ ) ন ধন্ত ( ১৩ ),  
 অজল ( ১৪ ) নীজ দাং ন-হদ ( ১৫ ) ।  
 পোড়া ন-পিহুং ( ১৬ ) ধানদি,  
 উনা ( ১৭ ) ন-হুহুংগোই ( ১৮ ) জনেদি ।  
 অবুয়া ( ১৯ ) জন্ম ন-হুহুং,  
 তিতা কথা ( ২০ ) ন-শুন্দুং ( ২১ ) ।  
 কানে ন-শুন্দুং কুকথা,  
 পরে ন-কথ কুকথা ।  
 পড়োয়া পণ্ডিত যেই দেশে,  
 জন্ম হুহুং-গৈ ( ২২ ) সেই দেশে ।  
 আরনি ( ২৩ ) রাজার দেশ লাক্-ন-পাং ( ২৪ );  
 অগাধে অপথে যে-ন-পাং ( ২৫ ) ।  
 যেদক্ ( ২৬ ) চিদা থায় ন-জান্দুং ( ২৭ ),  
 যেদক্ পোড়াধোয়া ( ২৮ ) ন-পেহুং ।  
 গীত তিন লামা ফুরেলুং ( ২৯ ),  
 সভায় হুজুর জানেলুং ( ৩০ ) ।

( ১ ) না যাইতাম ( ২ ) না হইতাম অর্থাৎ না জন্মিতাম ; ( ৩ ) হাতে ; ( ৪ ) না করিতাম ; ( ৫ )  
 পড়িতাম না ; ( ৬ ) না হইত, না হইতাম ; ( ৭ ) চিন্তাতাবনাগি ; ( ৮ ) না থাকিত ; ( ৯ ) না  
 কহিত ; ( ১০ ) নীচ অর্থাৎ তোষামুদী ( ১১ ) না করিত ; ( ১২ ) ব্যাধিতে, ( ১৩ ) না  
 ধারিত ; ( ১৪ ) উচ্চ ; ( ১৫ ) না হইত ; ( ১৬ ) পাইতাম ( ১৭ ) কম ; ( ১৮ ) না হইতাম  
 গিরে ; ( ১৯ ) মূর্খ ; ( ২০ ) কর্কশবাক্য ; ( ২১ ) না শুনিতাম ; ( ২২ ) হইতাম গিরে ;  
 ( ২৩ ) আরও ( ২৪ ) দেখা না পাই ; ( ২৫ ) যাইতে না পারি ; ( ২৬ ) যত ; ( ২৭ ) না  
 জানিতাম ; ( ২৮ ) লাঞ্ছনাগি ; ( ২৯ ) ফুরাইলাম ; ( ৩০ ) জানাইলাম ।

## ( চতুর্থ । )

তঁদাং বেয়েই কাপড়ন,  
 ভজিলুং গোন্ধেন-চরণান ।  
 গীতে রঙে উল্লাসে  
 সাধুগর ( ১ ) সাধনান ( ২ ) খোলাসে ( ৩ ) ।  
 হুখ্যা অন্য ন-হুং,  
 অখ্যা অন্য হুং-গোই,  
 বাবে ( ৪ ) এ-দ ( ৫ ) গম্ ( ৬ ) দিনে,  
 অন্য দিত স্নেহে ( ৭ ) ;  
 সাদি ( ৮ ) ঘরং উবশ্-তুম্ ( ৯ ) ,  
 মন খোলাসে খেলহুং ( ১০ ) ;  
 জাতে কুলে হুং গোই,  
 থানে ঠমগে ( ১১ ) হুংগোই ।  
 ধর্মী মা-বাপ লাগ-পিহুং ( ১২ ),  
 চিদ-স্নেহে মন-স্নেহে হুধ খেহুং ( ১৩ ) ;  
 সাত ভেই সাত ভোন ( ১৪ ) লাগ-পিহুং,  
 ননেয়া ( ১৫ ) থুলা বো'য়া ( ১৬ ) মুই হুং ;  
 সোনা-ধুলনং ধুলে দাক্ ( ১৭ ),  
 দা'র ( ১৮ ) ভঙানি ( ১৯ ) ভঙেদাক্ ;  
 জেস্তা ( ২০ ) সমারে জেমেঙা ( ২১ ) ;  
 থুস্তা ( ২২ ) সমারে থুড়াভা ( ২৩ ) ;  
 কালী কুশারী বের বাড়ক্ ( ২৪ ),  
 গুস্তিগুদরি ( ২৫ ) ডেল ( ২৬ ) বাড়ক্ ।  
 ধনে জনে হদ ( ২৭ ) মোর,  
 পান থুজি ( ২৮ ) হুধ থুজি ছবাবের ।  
 সমারি ( ২৯ ) বন্ধু পাংপারা ( ৩০ ),  
 লোকে কুহুমে ( ৩১ ) সব পুরা ।

(১) সাধিতেছি ; ( ২ ) সাধনা ; ( ৩ ) খোলাসা করিয়া অর্থাৎ সরলচিত্তে ; ( ৪ ) বাপে  
 ( ৫ ) আসিত ; ( ৬ ) ভাল ; ( ৭ ) হুক্ষেণ বা শুভক্ষেণে , ( ৮ ) ভাল ; ( ৯ ) উপস্থিত হইতাম ; ( ১০ )  
 খেলিতাম ; ( ১১ ) সম্ভ্রান্তঘরে ; ( ১২ ) দেখা পাইতাম ; ( ১৩ ) খাইতাম ; ( ১৪ ) ভগ্নী ;  
 ( ১৫ ) মেহপাত্র ( ১৬ ) কনিষ্ঠবউটি ; ( ১৭ ) দোলাহিত ; ( ১৮ ) দেখতার ; ( ১৯ ) ঘুমানি ;  
 ( ২০ ) জেঠা ; ( ২১ ) জেঠী ; ( ২২ ) খুড়া ; ( ২৩ ) খুড়ী ; ( ২৪ ) কালীকুশারী নাম  
 বিশেষের গাছের স্তায় বাড়িতে থাকুক ; ( ২৫ ) গোষ্ঠী প্রকৃতিতে ; ( ২৬ ) ভাল ; ( ২৭ )  
 হইত ; ( ২৮ ) বাহা করি ; ( ২৯ ) সঙ্গীর ; ( ৩০ ) পাইবত ; ( ৩১ ) হুইবে ।

কথা'নি (১) হলো মু-মিনা (২),  
 গীতে রঙে গম্ গলা।  
 মাদা জগা (৩) চুল ধরোক্ (৪),  
 মজুরগা হ'দ দিবা চোখ।  
 বেঙা (৫) হ'দ চোখ-ভং (৬),  
 মুজুঙ (৭) দাততুন (৮) হ'দ সং (৯)।  
 চেবার (১০) গম্ হ'দ উত্তানি (১১),  
 গোজনে বানেন (১২) হাতানি (১৩)।  
 তাঁদা পেজং দেবগড়ন (১৪),  
 বারা অজার (১৫) বুকভন্নগ (১৬)।  
 ছানে শিকায় (১৭) গড়নে,  
 রূপে রঙে পিছুং সবথানে।  
 রাজা বাদার (১৮) পান থেজং (১৯),  
 গুরু সাধি নাং (২০) পেজং।  
 সাদি ঘরং উবুস্তুম,  
 পড়োয়া পণ্ডিত মুই হজং।  
 দর্যা (২১) করলি (২২) পাই গগং (২৩),  
 আকাঙ্ক চান্ (২৪) তারা হাদে (২৫) গগং।  
 সাধি পেজং মুই বিয়া (২৬),  
 লোকে মাদেন (২৭) হাজিয়া (২৮)  
 সর্কলোকে পুজিতাক্ (২৯),  
 দে'লে (৩০) শতুরে (৩১) ভজদাক্ (৩২)।  
 হাদে পেজং লেখাবর (৩৩);  
 কেইয়াং (৩৪) পেজং রূপ-বর (৩৫)।  
 গীত চারিলামা ফুরেই যার;  
 তাঁদা সাধুর আর বার।

(১) কথাগুলি; (২) মুখমিষ্ট; (৩) মাথা জুড়িয়া; (৪) ধনক্; (৫) বক্;  
 (৬) জ; (৭) সমুখে; (৮) হাতগুলি; (৯) সমান; (১০) দেখিবার; (১১) গুট  
 অর্থাৎ গুটখানি; (১২) নির্মাণ করিত; (১৩) হাত খানি; (১৪) দেবতার গঠন;  
 (১৫) বাহ ওনার অর্থাৎ বিহৃত; (১৬) বুক হাসল; (১৭) সৌন্দর্য্যে; (১৮) বাটার;  
 (১৯) খাইতাম; (২০) নাম; (২১) দরিদ্র অর্থাৎ সমুদ্র; (২২) কড়র; (২৩)  
 দখিতে পারিতাম; (২৪) চজ; (২৫) হাতে; (২৬) বিবাহ এখানে ব্রীজর্থে  
 ব্যবহৃত; (২৭) স্নাতাইত অর্থাৎ কথা বলিত (২৮) হাসিয়া; (২৯) পূজা করিত; (৩০)  
 দেখিলে; (৩১) শত্রুতে; (৩২) ভজনা করিত; (৩৩) স্নানাবর; (৩৪) কায়ার (৩৫) রূপেরর।

( পঞ্চম । )

উদাৎ বেরেই কাপড়ান,  
ভজিলুং গোজেনর, চরণান ;  
চরণে ছালামে ভজিলে,  
সকল তিথা ফল পাই বেলে ।  
পাচফুল দান-ফল পেছুংগোই,  
রথে বলে (১) হুংগোই ।  
গোজেন-সম্মুখে কর পাদং (২),  
সাত পুত চাই যদি বর মাগং (৩) ।  
ডেনে (৪) মাগং ধনবর ;  
বাঙে (৫) মাগং জনবর ;  
ধনে সম্পদে সব পুরা (৬),  
জুরি-পাতুংগোই (৭) হেং (৮) বোড়া ।  
যে বর মাগঙর (৯) মনের সাধ ;  
সেই বর পেছুংগোই হাদে হাদ ।  
হালা (১০) উবুজিলে (১১) লেই সাধি (১২),  
জুম্মোয়া উবুজিলে তং সাধি (১৩),  
দেওয়ান উবুজিলে বীর সাধি,  
রাজা উবুজিলে সেখাভুয়া সাধি (১৪) ।  
কেইয়াং পেছুং সাজানা (১৫),  
ত্রিশ তিন জাতিখুন্ পেছুংগোই সাজানা ;  
খাদে (১৬) পালঙে (১৭) ব-খেছুং (১৮),  
ত্রিশ তিন জাতি-ভাজ্ (১৯) মুই পাতুং ( ২০ ) ;  
যে বর মাগঙর মনের সাধ,  
সে বর পেছুং হাদে হাদ ।  
গীত পাঁচলামা ফুরেই যার,  
তঁদা সাধঙর আরবার ।

(১) গতরে, (২) হাত পাতি; (৩) মাগি; (৪) ডাইনে; (৫) বামে; (৬) পূর্ণ (৭) জুটাইতে পারিতার গিরে; (৮) হাতী; (৯) মাগিতেছি; (১০) কৃষক, (১১) জম্বিলে; (১২) যেন 'লেই' অর্থাৎ বুড়ি বিশেষ পাই; (১৩) যেন জুনের টংবর পাই, (১৪) উট্টিগা যাইতে; (১৫) মাজসজ্জা, (১৬) খাটে; (১৭) পালকে; (১৮) বাতাস ঝাইতান অর্থাৎ বাতাসেবনকরিতাম; (১৯) ভাষা; (২০) আমি যেন পারি।

( ষষ্ঠ । )

ঊষাৎ বেরা কাণড় লই,  
 গোজেন ভজন্তব গুজি হই (১) ।  
 মাথা পাতি বস্তা লং (২),  
 গাত ভেই সাত ভোন (৩) বর মাগং ।  
 ভাদে চালি (৪) পানিয়ে (৫) ;  
 দিব মা বঝমতী (৬) সাক্ষিয়ে ।  
 এগার হাজার চোরালী সন,  
 ফলনা (৭) বারে সাধন্তর একামন ।  
 চরণে ছালামে ভজন্তর,  
 ঘেবার ছালামি (৮) মেলন্তর (৯) ;  
 গীত হয় লামা কুরেয়ে,  
 বুঝিলে বুঝিব মানিয়ে ।  
 দেবর কুলে (১০) দেব মানাই,  
 মানাই কুলে লোক মানাই ;  
 কুনি (১১) গেলা সঙ্গী ভেই,  
 সাধি সমারি (১২) চলি ঘেই (১৩) । ইতি

গোজেনের লামা এই সমাপ্ত হইল । পাঠক দেখিলেন, লেখকের ভক্তির  
 গভীরতা কত! স্তোত্রের মধ্যে যে “এগার হাজার চোরালী সন” এর উল্লেখ আছে,  
 তাহা বোধ হয় রচনার সময় । তবে হাজার কথাটা সম্ভবতঃ ঠিক নয় । আমা-  
 দের নিশ্চিত বিশ্বাস—এখানে শতকেই হাজার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এবং  
 ইহা সখ্যাক । ‘লামা’র ভাষায় জাতীয়তা পরিষ্কৃত,—যদিও কথঞ্চিৎ সংস্কৃত বটে  
 শিবচরণের লেখা পড়া কতদূর ছিল, জানি না ; তবে তিনি যে পূর্ব জন্ম হইতে  
 কতকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এ সম্বন্ধে আমাদের  
 আর বিশেষ বক্তব্য নাই । সমালোচনার ভার পাঠকগণের উপর হস্ত রহিল ।

বলিয়া রাখা উচিত যে, এই ‘লামা’গুলি বস্তুত সঙ্গীত নহে । যে হিসাবে  
 বেদকে গান বলা হয়, আমরা সেই হিসাবে—তান-লয় সহকারে গীত হ’য় বলিয়া  
 ইহাদিগকেও সঙ্গীত শ্রেণীভুক্ত করিলাম । অত্যাধা ইহাদের সঙ্গীত সমূহ

(১) নত হইয়া বসিয়া ; (২) আশীর্বাদ লই ; (৩) ভ্রমী ; (৪) চালিতেছি ; (৫) জলকে, (৬)  
 বঝমতী ; (৭) অধিক ; (৮) যাইবার অর্থাৎ বিদায়ের, সালাম ; (৯) মাগিতেছি ; (১০)  
 দেবকুলে ; (১১) কোথায় ; (১২) সমাপ্ত করিয়া একমুখে ; (১৩) চলিয়া যাই ।

উভগীত ।

“উভগীত” (১) আখ্যায় প্রসিদ্ধ । প্রাণের আকুল

পিয়ালা মিটাইতে প্রায় সকলেই “উভগীতের”

আশ্রয় লইয়া থাকে । ইহাতে সাধকের হৃদয়োচ্ছ্বাস, উদাসীনের ময়মকাহিনী বিরহীর প্রাণের আলা, প্রেমিকের সরস বিশ্রুতলাপ অতি সংক্ষেপে, অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় । এ সকল “উভগীতে” প্রায়ই ছুঁ চরণের অধিক থাকে না । তাহাতেও আবার প্রথম চরণটি মাত্র পদমিলনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে । সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব ও উত্তরচরণে অর্থগত সম্বন্ধ দেখা যায় না । এবং “উভগীত” নিত্যই ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয়, গায়কেরা উপসংহারে একটি সুদীর্ঘ ‘কুই’ (উ-উ-উ-উ) ধ্বনি দিয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিয়া লয় । নিম্নে কয়টি প্রধান ভাবের গান সমুদয়ের নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

ভক্তিভাব ।—

১। ফুলে তুলি আলামং (১)

সকল দেবতা ছালামং (৩)—উ-উ-উ-উ...

২। ভাগল ধারেই (৪) খোছিলং (৫),

বচ্ছি (৬) সরস্বতী মজ্জিলং (৭)—উ-উ-উ-উ...

৩। খাড়ি (৮) লামেই কালাম্ (৯) ঞ্জং (১০),

পঞ্চ সভা লক (১১) ছালাম ঞ্জং-উ-উ-উ-উ...

৪। আরেরে (১২) বানেল (১৩) যার জনম,

আগে ছালাম ঞ্জং তার চরণ—উ-উ-উ-উ...

৫। উদাস বেয়েই কাপড়ান,

ভজ্ঞগর গোঞ্জনর চরণান—উ-উ-উ-উ...

উদাস ভাব ।—

১। সুপারি কাবি (১৩) খানে খান,

উদে (১৫) মনখুন (১৬) নানা গান—উ-উ-উ উ...

২। ছরমা (১৭) কুরারে (১৮) কি খুদ্ দিম্ (১৯),

উদাসী মনরে কি বুদ্ দিম্—উ-উ-উ উ

(১) “উভগীত” শব্দটিই ব্যাপ্তিগত অর্থ নির্ণয় দ্রুত । সম্ভবতঃ এ সকল সম্বন্ধিত পুরাকালে দম্পত্য কৰ্ত্তৃক উল্লীত হইত ! উত্তরের গীত এই অর্থে “উভগীত” সংজ্ঞা হইয়া থাকিবে ।

(২) আদর্শ সূচক পটে (আলাম শব্দের পরিচয় ২৯৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে); (৩) সালাম নিতেছি । (৪) ধারে ধার দিতেছি; (৫) খরশিলে—খারালশিলায়; (৬) বস অর্থে; (৭) মোর স্নিগ্ধ—আমার স্নিগ্ধ; (৮) কাঠখণ্ড; (৯) গাছের গড়া; (১০) দিতেছি; (১১) লোক; (১২) অতিপূর্ব; (১৩) প্রস্তুত করিল; (১৪) কাটি; (১৫) উঠে; (১৬) মন হইতে; (১৭) লাভুক; (১৮) মোরগকে; (১৯) দিব



৩। ছরমা কুরা ন খায় খুদ

উদানী মনে ন পার বুঝ—উ-উ-উ-উ...

৪। দনা (১) উজানি জুনি গেল

পূরাণি ভালো (২) দিন উদি (৩) গেল—উ-উ-উ-উ...

৫। মাষারা (৪) খেইয়া (৫) ছাগল্যা ;

দযাং (৬) ন ভাজের পাগল্যা (৭)—উ-উ-উ-উ...

বিরহ ভাব।—

১। মদনা তদেগর ঠুট জলে (৮),

রাঙা খাদিয়ে বুক জলে—উ-উ-উ-উ...

২। কিঞ্জিং ছিনি (৯) পক্ষী গেল,

ভরনি বাজারং (১০) লক্ষ্মী গেল—উ-উ-উ-উ...

৩। চিগন (১১) মরিচা (১২) টান্ডর (১৩) ;

দে'লে স্বপ্ননে (১৪) কান্ডর (১৫)—উ-উ-উ-উ...

৪। দগরের (১৬) বেঙুওয়া কর্করি (১৭) ;

লইয়ে পরাণে ধরফরি—উ-উ-উ-উ...

৫। তোতেক (১৮) উড়ে ঝাকবলি (১৯)

রাখিৎ (২০) ন পারম্ (২১) থাক বলি—উ-উ-উ-উ...

প্রেমভাবাক্ষক—গীতে অশ্লীল কথাগুলি অতি সাবধানে বিজ্ঞান হইলেও

‘আদমের’ মধ্যে কিংবা অনতিদূরে গান করা বয়োবৃদ্ধগণ পছন্দ করে না।

‘কারণ ইহাতে যুবতীগণের চরিত্রভঙ্গী হওয়ার আশঙ্কা আছে।’ প্রেমোত্তাপ যুবকগণ জুমক্ষেত্রে বা বিজ্ঞান অরণ্যে মনের আকুল আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন কর্তে পরিব্যক্ত করে। এসময়ে প্রণয়িনী ভিন্ন অপর কেহ সঙ্গে থাকে না,—অথবা প্রেমিক সম্পূর্ণ একাকীই থাকে। তাহারা কখনও বা পাইয়া বেড়ায়—

১। মাছে খেলো শিল-কেই (২২),

ন-দেলে তোর, মোর চিগন বেই (২৩), ন-পারং খেই—উ-উ-উ-উ...

(১) প্রায় তিনদিকে পর্কিত-বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র ; (২) বঙ্গদেশ ; (৩) উট্টিয়া ; (৪) ফল বিশেষ ; (৫) খাদক ; (৬) সমুদ্রে ; (৭) এক পর্কপরিমিত বাঁশ—ভানি-তেছে না ; (৮) মদনা তোতার ঠোট বন্ধ করি ; (৯) উপত্যাকাজুনি ছাড়িয়া ; (১০) পূর্ণ বাজারে ; (১১) ছোট ; (১২) বেত ; (১৩) টানিতেছি ; (১৪) স্বপ্নে বেথিয়া ; (১৫) কাঁদি-তেছি ; (১৬) ডাকিতেছে ; (১৭) কর্করি নামক বেঙটি ; (১৮) তোতা ; (১৯) ঝাঁকে ঝাঁকে ; (২০) রাখিতে ; (২১) পারিতেছি না ; (২২) শিলের কলক ; (২৩) যুবতীরমণিকে মনস সাধোদন।

২। বনং দগরে হরিণ-ছ ;

ন-দেলে তোরে মরিব—উ-উ-উ...

৩। উড়ের পক্ষী তল্ চেইয়া ;

ছাড়ি-নপারিম্ তন্ম-মেইয়া—উ-উ-উ-উ...

৪। ডিঙি কুলেছি (১), ত-খাঁদং (২),

মোর আসল পরাঙ্গান (৩) ত-হাতং—উ-উ-উ-উ...

৫। এক পণ সুপারি ছাঞ্জিব (৪),

তরে-মরেনি (৫) ছাঞ্জিব (৬)—উ-উ-উ-উ... ইত্যাদি ।

এভাবে আর কতকগুলি সঙ্গীত আছে, তৎসমুদয় কেবল যুবতীদিগের চিত্ত-বিজয়ের নিমিত্ত সন্ধান করা হয়। যুবতীগণ তাদৃশ সম্মোহনবাণে বিমুগ্ধ হইলে, যখন মরমের চঞ্চলতায় সরমের কপাট খুলিয়া যায়, পালটাগানে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করে। ঐদৃশ সঙ্গীতালাপ অবশ্য যথোচিত সাবধানেই হইয়া থাকে। আবার তাহার ভাষাও কিরূপ সংযত এবং সতর্ক, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে।—

যুবক ।—( চিগন ছরা, চিগন চেই (৭),

খুঁজি ডাগঙর (৮) চিগন বেই !

( ছরাছরি বিল হব ; )

তোর হাতর পান-খিলি হিল (৯) হব ?

যুবতী।—ইঁজরর মাদাং বই (১০) চান-চাট্টে (১১),

খাদী মেলি-দিয়ম্ (১২) পান খাট্টে (১৩) ।

যুবক ।—ধুন্দা (১৪) বাঞ্জেই (১৫) ত-দি (১৬) ;

এতক মাগিলুম ন-দিলি !

যুবতী ।—শিলর কাঙারা (১৭) কলে ধর ;

পরানে মাগিলে বলে ধর ।

যুবক !—শিলর কাঙারা ডর গবে (১৮) ;

বলে ধরুন লাভ গবে ।

(১) ধরিব অর্থাৎ বাধিব ; (২) তোমার ঘাটে ; (৩) প্রাণ পানি ; (৪) হারান যাইবে ; (৫) তোমার ও আমার মিলন কি ; (৬) সাজিবে অর্থাৎ শোভা পাইবে ; (৭) মাচ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ (৮) আপনা হইতে আহ্বান করিতেছি ; (৯) আশ্বাদবিশিষ্ট ; (১০) মাধার অর্থাৎ প্রান্তে বসিয়া ; (১১) চল দেখ গিয়ে ; (১২) খুলিয়া দিব ; (১৩) খাও গিয়ে । (১৪) তামাক ; (১৫) সাজাই ; (১৬) ত—তামাক সাজাইতে তরিয়ে যে কতর দেওয়া হয় ; (১৭) শিলাবাসী কাঁকড়া ; (১৮) ভয় করে ।

যুবতী।—(মইন ঘরং থের (১) ঝাড়ি; )

মুঠ থেইম্ (২) বেরা-ঝাজি (৩)।

যুবক।—বেলা নিগলো (৪) তিতি পেইক্ (৫),

থবাক্ (৬) বাজোমবই (৭) নিছিরোইং (৮)।

টত্যাদি টত্যাদি। বলা বাহুল্য, ভদ্র পরিপারে এতাদৃশী স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ব-  
কালেও ছিল না, এবং এখনও নাই। বর্তমানে সাধারণ চাক্ষুসজ্ঞানের মধ্যেও  
কচিং মাত্র দেখা যায়।

প্রধান কয়তাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। এতস্তিন্ন কতিপয় গীতকে বিমিশ্র  
শ্রেণীভুক্ত করা যায়, তাহাতে বিমিশ্র ভাবের সমাবেশ থাকে। এগুলি  
বিশ লম্বা লম্বা; তবে এক বাক্যের সহিত অল্প বাক্যের  
বিমিশ্র সমীত।

অর্থগত সম্বন্ধ খুব বিরল—কেবল ছড়ার জায় কতকগুলি  
এলোমেলো কথায় গ্রথিত মাত্র। যথা :—

১। দীঘলি বাগৎ (৯) চরের মৈছ্ (১০).

সমারে (১১) বেড়াদন্ (১২) ননন্-ভৈজ্ (১৩)।

দগরের কুড়গী (১৪) ছন-বনৎ (১৫);

বত কুট্যারি (১৬) তার মনং (১৭)।

পানি থেই জাই (১৮) পনথুন (১৯);

তথ ন তুলিঙ্ (২০) মনথুন (২১)।

২। বর্ছি (২২) বিয়া (২৩) পলগে (২৪),

নোয়া জুয়ান্ (২৫) কাবি কলগে (২৬);

কলগৎ উদিল্ পদনা (২৭);

তদেগ্ পুবি মদনা,

মদনা তদেগে কদা কয়,

খাদৎ (২৮) উজেল্লি (২৯) সদাগর;

মুজুনা (৩০) মাদি পিচ্ছোলে (৩১);

ইথুননেচ (৩২) ভালা করিবো ঈশ্বরে।

(১) ঝড়; (২) ঝাকিব; (৩) বেড়া বেসিয়া; (৪) অপরাহ্নে বা রাত্রিতে বাহির  
হইলে; (৫) চাতক পক্ষী; (৬) মকের ঠেস বিশেষ; (৭) ষা দিব গিরে; (৮) নিশীথ  
রাত্রি; (৯) (খালের) দীর্ঘ বঁকে; (১০) মহিব; (১১) হুসঙ্গে; (১২) বেড়াইতেছে; (১৩)  
ঠাকুর কি ও জোঠ ভাতৃষণ্; (১৪) স্রীসজ্জার; (১৫) \*জনবনে; (১৬) কুটবৃদ্ধি; (১৭)  
ভাহার মনে; (১৮) পাইয়া; (১৯) পরিষ্কার থেকে; (২০) হৃৎক তুলিও না; (২১) মন  
হইতে; (২২) বড়লী; (২৩) বাহিয়া; (২৪) লোকাইয়া; (২৫) নুতন জুনাখানি; (২৬) গিরিগহ্বরে  
(২৭) জুয়ের পোড়ার পর নবোলপতে বাঁশ; (২৮) ঘাটে; (২৯) উপস্থিত হইল; (৩০) এঁটেল;  
(৩১) মাটি পিছলায়; (৩২) ইহা হইতে বেশী।

- ৩। অজল (১) পাগরী নীলবুপ্ (২);  
 দিন দিন পরেলি (৩) কোলিগ (৪),  
 কোলিগ সত্য নেই,  
 বুগ্‌চিবি দেগেসে (৫) পত্তা (৬) নেই ।
- ৪। ছরা উজানি তুতুং মাছ (৭);  
 শুজুরি (৮) পরেলি (৯) বৈশাখ মাস;  
 বৈশাখ মাসেনি ধান্ কজা (১০);  
 উত্তর ধাকদ্ (১১) পানকদা ( ২ );  
 কুজি কুজি (১৩) ছিনং (১৪) পান;  
 উথো পুগেদি (১৫) পুনং চান (১৬) ।  
 পুনং চানে সাজ ধলা (১৭);  
 হাজেতুং (১৮) মাজেতুং (১৯) লাজ গলা (২০) ।
- ৫। কুকুর পুছি হাদ্ দবা (২১),  
 হাদ্ দবা-ছ (২২) নাক্ দবা;  
 নাক্ দবা-ছ ভোমরা;  
 লড়াই নিল (২৩) চোঙরা (২৪);  
 ধেল (২৫) চোঙরা গাং পার হোই (২৬);  
 সারেন্দ (২৭) কুনাদন্ (২৮) রং-বারোই (২৯);  
 একোয়া সারেন্দ তিমোয়া খিল (৩০);  
 তিমোয়া খিলং তিন্নান্ জিল (৩১);  
 কানাই গাঙর (৩২) দোছরি (৩৩);  
 ইচা (৩৪) লামে সুর ধরি (৩৫);  
 বাচ্চুন (৩৬) কাবি নয় কুড়ি,  
 নয়কুড়ি বাশর তুলং কাং (৩৭);

(১) উচ্চ; (২) গাছবিশেষ, ঝোঁপ নীচ; (৩) আসিয়া পড়িতেছে; (৪) কলিগ; (৫) বক্ চিরিয়া দেখাইলে; (৬) প্রত্যয়; (৭) দীর্ঘ ঠোটবিশিষ্ট মাছ; (৮) পর্জন করিয়া; (৯) আসিয়া পড়িতেছে; (১০) ধান্‌বপন; (১১) উত্তর পার্শ্বে; (১২) পানের বর; (১৩) কঁচি; (১৪) ছিন্ন করি (বহুবচনে); (১৫) পূর্বদিকে উঠিয়াছে; (১৬) পূর্বচন্দ্র; (১৭) সাজ ধরিল অর্থাৎ আঁধার হইল; (১৮) হাসিতে; (১৯) কথা বলিতে, (২০) লজ্জা করিল; (২১) শ্বেতহস্তবিশিষ্ট; (২২) হাতধলার বাচ্চা; (২৩) তাড়াইয়া নিল; (২৪) বড়ছুরি; (২৫) পলাইল; (২৬) নদীপার হইয়া; (২৭) সারিন্দা, (২৮) কুনাইতেছে; (২৯) সূতার; (৩০) কীলক; (৩১) তার; (৩২) কানাই নদীর; (৩৩) দুই নদীর সমন্বয়; (৩৪) চিংড়ি; (৩৫) সারি ধরিয়া; (৩৬) বাশগুলি; (৩৭) মঠ:

ক্যাঙে দিলুম্ চেরাগে (১) ;  
 দেবায় কল্য পেরাগে (২) ;  
 চেরাগর ধূমা (৩) লংকানি (৪) ;  
 উঠো বাজারং (৫) অংবালি (৬) ।  
 অংবালি বাজারং কি উঠো ?

চিগন্ চিগন্ তোবালে (৭) উঠো । ইত্যাদি ।

এই যে সকল সঙ্গীতের বিবরণ প্রদত্ত হইল, বলা বাহুল্য, তাহাদের সহিত কোনও বাগ্গযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না ।

প্রথমেই বলিয়াছি, ইহার বাত্রা, কবির গান প্রভৃতিতে যথাসাধ্য উৎসাহ দান করে। বিদেশীয় গায়কদল আসিয়া বৎসর বৎসর এই সুযোগে প্রভূত অর্থ লইয়া যায়, অথচ নিজেদের মধ্যে তাহা রক্ষা করিবার কাহারও তাদৃশী চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয় না। কেবল তরগীসেন নামক “লান্দা” সঙ্গীতে অনুরাগ।

গোছা”র জনৈক দেওয়াননন্দন কয়েকবৎসর ধরিয়া এক যাত্রার দল চালাইয়াছিলেন। তিনি তেমন উন্নতি দেখাইতে না পারিলেও, তদীয় উৎসাহ ও অধাবসায় প্রশংসারযোগ্য, সন্দেহ নাই। ইহাতে শিক্ষিত সাধারণের যোগ থাকিলে, আশাহুৰূপ উন্নতির আশা করা যাইতে পারিত। সম্প্রতি কামাখ্যা নামে অপর এক চাক্ষু যুবক এপক্ষে মনোযোগ দিয়াছে। তাহার শক্তি সামান্য হইলেও, আমরা হৃদয়ের সহিত তাহার সাফল্য কামনা করি। নিকট বলিয়া অগ্রাহ করা অতি সহজ, তাহাকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতেই যাহা কিছু কষ্ট। উপযুক্ত উৎসাহ ও সহায়তা পাইলে, ইহা সমাজের বহু অর্থ রক্ষা করিতে পারিবে। তাই আমি সর্বশেষে এতৎপ্রতি সমগ্র চাক্ষু সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্তমান ইতিবৃত্ত সমাপ্ত করিলাম।

(১) প্রদীপ; (২) দেবতার পূজাপাত করিল; (৩) ধূম; (৪) চুয়াইয়া মদ্য পড়িবারপাত্রের মুখে যে নেকড়া মুড়িয়া দেওয়া হয়; (৫) বাজারে; (৬) কর্ণাতরণ; (৭) তোয়ালে।

# উপসংহার ।

( ১ ) বাঙ্গালী-সংস্রব—( ২ ) মিশনারী-চেষ্টা

এবং

( ৩ ) ইংরাজাধিকারের ফল ।

—:~:—

[ ১ ]

আমি নিজেও বাঙ্গালী ; সুতরাং আমার মুখে বাঙ্গালী-চরিত্রের সমালোচনা তেমন শোভন না হওয়ারই কথা। কেননা, বাঙ্গালীমূলত দোষগুণ ত আমার আমাকে ছাড়িয়া নহে ! তবে যদি সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া, আমার দ্বারা স্বীয় সমাজের কোন কলঙ্ককথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আশা করি—বঙ্গবাসিসমাজ সেই আত্মনিন্দার নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। কতিপয় নীচমনা লেখক বাঙ্গালী জাতিকে বাদৃশ কুৎসিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন ; বাঙ্গালী-চরিত্র যে তাহা হইতে বহু পরিমাণে উন্নত, একথা অস্বকোচে বলা যায়। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্পটুতার কি কর্ণতৎপরতার জগতে বাঙ্গালীর তুলনা মেলা কঠিন এবং তাহাদের শক্তিও অসামান্য। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর ষষ্ঠতা এবং বিশ্বাসবাতকতার উদাহরণেরও অভাব নাই। বাঙ্গালীর দুর্বলতাও সর্বত্র প্রসিক্ত বটে, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে, তাহারা আপন দৌর্বল্য পরিহার করিয়া স্বীয় সামর্থ্য প্রকাশে সক্ষম। বর্তমান দেশব্যাপী আন্দোলন হইতে মদীর অন্তর্ব্যবহার সত্যাসত্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ জন বিম্সের কথায়\* বলিতে গেলে—

“চাকমাগণ অর্দ্ধবাঙ্গালী।” বস্তুতঃ ইহাদের পোষাক \* Letter No. 227H.

পরিচ্ছদ এবং আচার ব্যবহারে বাঙ্গালীর অনুরণন Dated 5-9-1879.

যথেষ্টরূপে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এবং ইহাদের ভাষাও যে বাঙ্গলা ভাষার বিকৃত অবস্থা মাত্র, তাহাও যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্বিধ চাকমা-

দিগের (উপাধি ব্যতিরিক্ত) নামগুলিও এমন বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন যে, তদ্বারা তাহাদিগকে বাঙ্গালী হইতে পৃথক্ করা একরূপ অসম্ভব।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইহাদের এই বাঙ্গালী অনুকরণ কতদূর সফলপ্রসূ হইয়াছে। ১৮৭২ ইংরাজীর ১লা জুলাই কাপ্তেন লুইন বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন • “চাক্‌মাগণ বাঙ্গলা বলে।

\* Letter No. 532.

বহু বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গালী কৃষকদিগের সহিত অবাধ সম্মিলনে আমাদের রাজ্যের মধ্যে তাহারাই অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের কোন জাতির মধ্যে কাহাকেও শাসনকর্তার কার্যের বাধা ঘটাইতে দেখি নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত, তাহারা আর মনঃ-প্রাণে চাক্‌মা জাতিতে থাকিতে চাহে না। . . . . . পক্ষান্তরে প্রায় সমুদয় চাক্‌মা দেওয়ান নুনানিধিক পরিমাণে বাঙ্গালীদিগের সহিত বসবাস করিতে-ছেন। ইহাতে দ্বিবিধ ফল আছে। দেওয়ান ও হেড্‌ম্যানগণ তাঁহাদের প্রজা-গণকে চাপিরা রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা অধিক লাভভাগী হন; এবং তাহাদিগকে অধিকতর শাসনেও রাখা যায়। অপরদিকে চাক্‌মাদিগের মধ্যে এমন এক তেজস্কর ভাব জন্মিতেছে যে, তাহারা দেওয়ানগণ হইতে স্বকীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে প্রথমে চেষ্টা করিবে।” অনন্তর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন মিঃ পাউয়ার কমিশনার মহোদয়কে যে পত্র\* লেখেন, তাহাতেও “বাঙ্গালী ও চাক্‌মাদিগের সম্মিলনে চাষের

\* Letter No. 472.

উল্লেখ আছে। ১৮৭৯ ইংরাজিতে কমিশনার বাহাদুর বজীর গভর্ণমেন্টে যে পত্র (Letter No. 227H) লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি বলিয়াছেন,—“আমরা আশা করি, চাক্‌মাগণ হাল চাষে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। কেননা তাহারা অর্দ্ধবাঙ্গালী; তাই মঘদের অপেক্ষা হাল-চাষে অধিকতর কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছে।” সুতরাং চাক্‌মাদিগের হালচাষের এই উন্নতিকে বাঙ্গালী সংসর্গের উৎকৃষ্ট ফল বই আর কিছুই বলা যায় না।

কেবল ইহা নয়, একরূপ শত শত প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে, যাহাতে দেখা যাইবে যে,—বাঙ্গালীর সাহচর্য্যই চাক্‌মাদিগের বর্তমান উন্নতির মূল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভাগীয় কমিশনারগণ রাজমাটি গভর্ণমেন্ট উচ্চ ইংরাজী বোর্ডিং স্কুলে বাঙ্গালীছাত্রের গবেষাধিকার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলতঃ তাহাদের সমুদ্বোধে অনিষ্টেরই আশঙ্কা ছিল। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রতিযোগিতা না পাইলে চাক্‌মাছাত্রদিগের বর্তমান উন্নতিও যে বহু-

পশ্চাত্তে পড়িয়া থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইহা বুঝিতে পারিয়াই শিক্ষিত সম্প্রদায় গভর্ণমেন্টের তাদৃশ প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিতেছিলেন। আশা করা যায়, বর্তমান বৌদ্ধাধিকার প্রবল থাকিলেও চাক্ষুণ্যসমাজ বাঙ্গালী অম্লকরণে অচিরে চট্টগ্রামী বড়ুয়া সম্প্রদায়ের জ্ঞান জ্ঞানোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

গ্রন্থাংশে আমরা দেখাইয়াছি, “কালিন্দী রাণী বাঙ্গালী মন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত” “রাজা হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গালী পদ্ধতির লোক” “বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার এত ঝোঁক যে, তিনি হিন্দুপুর্ক এবং ভোজাদিও পালন করিয়া থাকেন”, “রাজা আপনাকে হিন্দু বাঙ্গাল। প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ প্রয়াস” ইত্যাদি ইত্যাদি নানাকথা দ্বারা কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালী সংস্রবের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এতৎসঙ্গে কমিশনার মিঃ জন, বিম্‌সের আরও

\*Letter No. 21 H, 11-2-1879.

কিঞ্চিৎ অভিমত \* দেখাইয়া রাখি।—“(ডিপুটি কমিশনার) কাপ্তেন গর্ডনের রিপোর্টে দেখা যায়, পাহাড়ীদিগের মধ্যে সম্প্রতি এমন এক ভাব জন্মিয়াছে যে, তাহারা দীর্ঘতর সময় ধরিয়া একস্থানে তাহাদের চিফ বা হেডম্যানের কর্তৃত্বাধীন থাকিতে চাহে না। এই ভাব সম্ভবতঃ বাঙ্গালীদিগের প্রাধাত্তে ঘটিয়াছে। এই বাঙ্গালীদিগের পরিচয় তাঁহার নিজের কথায় “Who are striving to impress the simple hillmen with that spirit of referring everything to law courts and questioning the validity of every order of an executive officer, which is so strong among themselves. অর্থাৎ বাহারা এই সরল স্বভাব পাহাড়ীদিগের মনে প্রত্যেক বিষয়েই আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ এবং শাসন-কর্তৃগণের আদেশের বৈধতা বিচার করিবার ভাব—যাহা তাহাদিগের নিজদের মনেও খুব প্রবল, উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। আমরা যোয়াজা (অর্থাৎ হেডম্যান) প্রথা প্রবর্তিত না করিলে ইহারা অধিকতররূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।” ইত্যাদি।

প্রাপ্তকৃত মন্তব্যে কেবল ঈর্ষাপ্রকাশ ছাড়া অপর কোন যুক্তি আছে বলিয়া ত মনে হয় না। যে বাঙ্গালীদের সংমিশ্রণে চাক্ষুণ্যদিগের এতাদৃশী উন্নতি, বাহাদের অম্লকরণে মুমূর্ষু জাতি নবজীবন লাভ করিয়া সভ্যতার দাবি কারতে অগ্রসর হইতেছে, সেই বাঙ্গালী সংস্রবের প্রতি দোষারোপ করা আদৌ সঙ্গত বোধ হয় না। মিঃ বিম্‌সের অন্তান্ত উক্তির সহিতও একমত হওয়া যায় না। বাঙ্গালী প্রাধাত্ত কি তাহাদের বাসস্থান স্থায়ী রাখিবার সাহায্য করিয়াছে,



অথবা তাহাদিগকে উদাসীন প্রায় ঘুরাইয়াছে ও ঘুরাইতেছে? পাঠকবর্গ দেখিয়া আসিয়াছেন, ইহারা ক্রমের জন্ত কেমন প্রধানে ওখানে ঘুরিতেছিল। এখনও যাহারা লাজল ধরে নাই, তাহাদের সেই দুর্দশা;—ছুই বৎসর একস্থানে স্থায়িরূপে থাকিবার উপায় নাই। বাঙ্গালীই ইহাদিগকে প্রথমে চাষ শিক্ষা দেয়। অত্ৰাপি অনেকে বাঙ্গালীর সহায়তা ভিন্ন নিজের স্বাধীনভাবে চাষ চালাইতে পারে নাই। যাহারা চাষ ধরিয়াছে, তাহারা স্থায়ী বসতিও স্থাপন করিয়াছে। যদিও চাষী পাহাড়ীর মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও জুমিয়ার ভ্রায় বাসস্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যায়, তাহা সম্ভবতঃ ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাবে। সুতরাং বাঙ্গালীর সংস্রবে ইহাদিগের স্থিতিশীলতার ক্ষতি হইয়াছে, এ কথা নিতান্তই ভিত্তিহীন।

মহুয়াতালুকের স্রষ্টিতে অবশ্য রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। ইহা যদি বাঙ্গালী-পরামর্শগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রণাধিতার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় নী। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত অজ্ঞতা লইয়া কোন এক জাতির উপর দোষারোপ করা কদাপি ভ্রায়সঙ্গত নহে। এতদ্বির বাঙ্গালী সমাজের অপর এক দুর্দশা অর্থপিশাচ মোক্তার ও মহাজনদিগের গহিত উৎপীড়ন। উপযুক্ত পানে জলোকাও তৃপ্ত হয়, কিন্তু ইহাদিগের আকর্ষণ পেট ফাটিয়া গেলেও, ছাড়িবার নহে! যাহাকে একবার পথে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়া পরিত্যক্ত হইলেও, হতভাগার পূর্বজন্মের স্মৃতির ফল বলিতে হয়।

কাপ্তেন লুইন “ফ্রাই অন্ দি :ছইলে” লিখিয়াছেন \* “আমি নীচ বাঙ্গালী মোক্তারদিগের দ্বারা অতিশয় তাক্ত-বিরক্ত হইয়া-

\* Page 284.

ছিলাম। তাহারা পাহাড়ীদিগের অজ্ঞতা ও সারল্যের

প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছিল। ঘরে ঘরে ঝগড়া বাধাইয়া, তাহারা ইহাদিগকে মোকদ্দমা দায়ের করিতে উত্তেজিত করিত।” “ধৃত বাঙ্গালী মোক্তার ও টর্নিগণ এই পার্শ্বপ্রদেশের

Page 336-337.

গরলস্বরূপ। তাহাদিগকে এখান হইতে তাড়াইতে

আমি কদাপি শৈথিল্য প্রকাশ করি নাই। ( সম্ভবতঃ মহামুনি ) মেলার পরে আমি এমন এক উপযুক্ত কারণ পাইয়াছিলাম, যদ্বারা তাহাদের অবশিষ্ট ভিন্নজনেকেই শ্রমায়োগে এদেশ হইতে তাড়াইবার সুবিধা হইয়াছিল। সাধা-রণতঃ যেমন হয়, তাহারাও তজ্জপ কমিশনার ও গভর্ণমেন্ট সমীপে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল। তাহাতে আমার নিকট হইতে যে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যেও আমি তাহাদিগকে ছাড়ি নাই। পাহাড়ীদিগের

অজ্ঞতা এবং দুর্বলতার মধ্যে কলহ বাধাইয়া ও মোকদ্দমা তুলিয়া কিরূপে তাহার জীবিকানির্ভাহ করিত এবং আমার বিচারের বিরুদ্ধে আইনের কূটতর্ক ও বিপরীত বর্ণনার আশ্রয় করিয়া কিরূপে গভর্ণমেন্টের শাসন শক্তিকে দুর্বল করিবার চেষ্টা পাইত, আমি তৎসমস্তই দেখাইয়াছিলাম। ... চতুর বাক্সালিগণ পাহাড়ীদিগের প্রতি অত্যাচার পূর্বক টাকা বাহির করিবার জন্ত আমাদের আইনকে বস্ত্রবস্ত্রণ ব্যবহার করিত।”

সত্য কথা বলিতে কি, এই বর্ণনার কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। ভুক্তভোগী অনেক সাক্ষী অজ্ঞাপি পাওয়া যায়। অবশেষে গভর্ণমেন্ট এই পার্শ্বতা চট্টগ্রাম হইতে বাদা ও প্রতিবাদীর মধ্যবস্তী মোস্তারাদির প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাও অনেকদিন গত হইতে চলিল; তথাপি এত বৎসর পরেও সেই অত্যাচার কত আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক উত্তমর্ণদিগের স্বদের হারও শতকরা বায়িক বার টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু অধুনা সেই আবরণমাত্র প্রকাশ্যতঃ রাখিয়া মহাজনদিগের উৎপীড়ন অবাধে চলিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, মিতব্যয়িতার অভাবে পাহাড়ীরা প্রায়শঃই ক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। যত টাকা ধার করিবে, তত তাহার দেড়গুণ লিখিয়া দিতে হইবে, ইহা অজ্ঞতা চিরাগত পদ্ধতি। অতথা কোন মহাজন হইতেই সাধারণ লোকে কর্জ পায় না। সুদ অবশ্য নিয়মিতরিত্ত নহে। কেবল ইহা নহে, বৎসরাঙ্কে চক্রবৃদ্ধিক্রমে সুদ-আসল যোগ করিয়া পুনরায় তাহাদিগ হইতে উক্ত দেড় গুণের খং পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে দেয় টাকা এককালীন পরিশোধের শক্তি না থাকিলে অধমর্ণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মহাজনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন রাঙামাটা উচ্চ ইংরেজী স্কুলের হেড্-মাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহাশয় একদা তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, এমনও একদিন গিয়াছে,—যে মহাজনেরা মৃতঅধমর্ণের উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহার স্বশানোখিত ধুম বেইদিকে গিয়াছিল, সেই প্রতিবেশীদের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করিত! উঃ কি ভয়ানক ব্যবস্থা! ইহাকেই “বে-আইনী মুলুকে”র বিধি বলা যাইতে পারে বটে! এখানকার মহাজনেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান উপলক্ষ করিয়া বসিয়া আছে। প্রজ্ঞাদৃষ্টিশালী দেখিতে পান—নির্মম দস্যু ছদ্মবেশে শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে! এ সম্বন্ধে আমি নিজে আর কিছু না বলিয়া কাপ্তেন লুইনের “ফ্লাই অনূ দি হুইল” হইতে আর একটি চিত্র উঠাইয়া দিতেছি, বাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, “আমি

অবাস্তব কোনও ঘটনা জানাইব না। ইহা কাল্পনিক

Page 338.

নহে; আমি ইহা হইতে আরও শোচনীয় উদাহরণ

জানি। “জনৈক পাহাড়ী মহাজনের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিলে, মহাজন বলিল,—বন্ধু, বেশ ভালই হইল; এই দেখ—আমি তোমার খং নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।” এই বলিয়া সে উক্ত পাহাড়ীর খতের বদলে অপর এক পুরাতন কাগজ ছিঁড়িল। ঐ বেচারী লিখিতে বা পড়িতে জানে না; সুতরাং মহাজনের দায় হইতে মুক্ত হইল ভাবিয়া, আনন্দের সহিত ঘরে গেল।

“মহাজন কিছুকাল পরে উক্ত খং মূলে সেই পাহাড়ীর বিরুদ্ধে হৃদ ও আসলের চক্রবৃদ্ধি করিয়া নালিশ উপস্থিত করে। এই পাহাড়ীকে আমরা নীল চন্দ্র বলিব। উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত যথানিয়মে নীলচন্দ্রের নামে সমন জারীও করা হয়। মোকদ্দমার শুনানির দিন মহাজন তদীয় নোকার মধ্যে থাকিয়া নীলচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরে তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি অগুরুগপূর্ণ মুখ এবং স্বরে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করণাভিপ্রায়ে বলিল, ‘প্রিয়বন্ধু, সত্যই আমি দুঃখিত হইতেছি যে, আমার ভ্রমে তুমি কত কষ্ট ও পথশ্রম পাইয়াছ। তোমার আর আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। সমনখানি আমাকে দাও। আমি সাহেবকে প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিব। ততক্ষণ তুমি আমার ঘরে গিয়া থাও এবং মদ্যপান কর।’

এইরূপে সেই হতভাগ্য মাছি আহার ও পানের নিমিত্ত গেল আর সে সময়ে চতুর উর্গনাভ আদালতে চলিল। এদিকে যথাসময়ে মোকদ্দমার ডাক হইল, নীলচন্দ্রকে উপস্থিত না পাঠিয়া মহাজনের সম্পূর্ণ দাবিতে মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল। অনন্তর মহাজন স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তদীয় দায়িককে আতিথেয়তা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী পাঠাইয়া দিল। আপিলের ম্যাদ গত হওয়ার পূর্বে তাহাকে আর কোন কথা বা চিহ্ন জানাইল না। ইহাতে ডিক্রী বলবৎ হইয়া দাঁড়াইল। অনন্তর ঐ চূর্ণভাগ্য পাহাড়ীর মন্তকোপরি ঝঞ্ঝাবাত ঘুরিতে লাগিল! সে ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, অপরিমেয় ঋণে ভারাক্রান্ত হইয়াছে! এরূপ কর্জের সে আর কোন দিন পড়ে নাই এবং পরিশোধ করিবারও আশা করিতে পারে না। কাজেই সে প্রকৃত পক্ষে অবশিষ্ট জীবনের নিমিত্ত মহাজনের দাস হইয়া রহিল। যদিও এ পাহাড়ে প্রকৃত স্ত্রাস্ত্রপর উত্তমর্গও আছেন, কিন্তু তথাকথিত মহাজনের সংখ্যাই বিশেষ প্রবল। বস্তুতঃ তাহাদিগের এতাদৃশ জঘন্য ব্যবহার কখনই মার্জ্জনীয় নহে। তাহাদের কৈফিয়ত যে, আমরা ব্যক্তিশেষের সহিত এরূপ করি বটে, কিন্তু আবার অনেকেই

আমাদিগকে প্রভাবিত করে। গড়ে হিসাব করিলে, আমরা যে বেশী কিছু লাভ করি, এমনত নহে, বস্তুতঃ অনেকেই যে মহাজনের টাকা ‘বেমালুম হজম’ করিয়া ফেলে, ইহাও অসত্য নহে। শুনিয়াছি, সহদয় গভর্নমেন্ট মহাজন-দিগের উৎপীড়ন সংবাদে ব্যথিত হইয়া অধমর্ণদিগকে এক সময়ে ২৮০০০ হাজার টাকা ধার দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অর্ধেক টাকাও আদায় হয় নাই,— ‘অন্য পরে কা কথা?’ সুতরাং একপস্থলে অন্নহুদে কুসীদ ব্যবসায়ীদের পোষাইবে কেন? তাই বলিয়া তাহারা যে রামের চাপড় খাইয়া শ্রামের বুকে ছুরি বসাইবে, ইহাও সর্বতোভাবে গর্হিত ও নিন্দনীয়! রাজা ভূবনমোহন রায় মহোদয়ের ঐকান্তিকী চেষ্টায় সম্প্রতি গভর্নমেন্ট হইতে আদেশ হইয়াছে, কোনও উত্তমর্ণ অধমর্ণের সঙ্ঘৎসরোপযোগী খাত্ত সংস্থান না রাখিয়া মাল ক্রোক করিতে পারিবে না। ইহাতেও নিরুপায় পাহাড়ীদিগের অশেষ উপকার হইয়াছে। সুখের বিষয়, সহদয় গভর্নমেন্ট পাহাড়ীদিগকে স্বয়ং ঋণ দিয়া মহাজনদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন। আশা আছে, এতদ্বারা তাহাদের সর্বস্বাস্ত হওয়ার কারণ অচিরেই বিদূরিত হইবে।

কাপ্তেন লুইন বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে আর যে সব মন্তব্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন ঈর্ষ্যা প্রসূত। বস্তুতঃ তিনি বাঙ্গালী-চরিত্রের বিকৃতি অন্ধনে সাতিশয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কোন কোন স্থানে তিনি বাঙ্গালীদের অকর্মণ্যতা প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টা পাইয়াছেন। বোধ হয়, বাঙ্গালী কর্মচারিগণ তদীয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া অভিযোগাদি করিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনি “ফ্লাই অন্ দি হইলে” লিখিয়াছেন \* “বাঙ্গালী বাবুরা যখন

\* Page 361.

দেখিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে আবেদন ও অভিযোগ সমুদয় পণ্ড হইয়া গেল, তখন তাঁহারা একযোগে কর্ম পরিত্যাগ করেন।” ... “সুতরাং আমি বাব্বিস ক্লার্ক আনাইয়াছিলাম।” কিন্তু আমরা তদানীন্তন রাজকর্মচারী (বর্তমান সব ডেপুটী কালেক্টর) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের মুখে শুনিতে পাই,—‘মিঃ লুইন বাঙ্গালিগণকে তাড়াইয়া তাহাদের পদে (আরাকানী) মঘ কেরানী নিযুক্ত করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অবশেষে তাহাদিগের দ্বারা, কাজ চলেনা দেখিয়া, বাঙ্গালীদিগকে পুনরায় আহ্বান করেন এবং তাহাদের পদোন্নতি করিয়া দিয়া মনোমালিন্য দূর করেন। হয়, তথাপি তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েন নাই। অপর এক স্থলে \* লিখিয়াছেন,— “আমি একজন ভিন্ন অপর সকল বাঙ্গালী বাবু হইতে পৃথক্ ছিলাম। ধর্ম্মাদিকরণে মদীয় উপযোগিতা

Page 363.

লোকে তখন বুঝিল ! বস্তুতঃ তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা সমর্থনকল্পে যাহাই লিখুন না কেন, তাহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ করিবার স্থান ইহা নহে। তিনি বাঙ্গালী বাবুগণের সম্পর্ক কিরূপে ছাড়িয়াছিলেন, তাহা তখনকার বাঙ্গালীসমাজ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তদানীন্তন কণ্ঠচ্যারিগণ হইতে অধুনা একরূপ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়।

যাক্‌, বাঙ্গালী চরিত্রের সাক্ষ্যই গাইতে গিয়া অনেক বাজে কথা বকিলাম। মোটকথা, বাঙ্গালী-সংস্রবে চাক্‌মাদিগের চেষ্টানিষ্ট ছই ঘটয়াছে। বাঙ্গালীদের হইতে তাহারা ভাষা, শিক্ষা, চাষ ও বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল জলভরয় লাভ করিয়া আজ সভ্য সমাজে পরিচিত হইতেছে, তজ্জন্য তাহারা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী-জীবনের স্বভাবগত যে দোষ, তাহাও তাহাদিগেতে সংক্রামিত না হইয়া যায় নাই। আমরা পাশ্চাত্যজাতির কাছে যে পরিমাণে বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়াছি, চাক্‌মাগণও আমাদের সঙ্গকলে প্রায় তৎসমস্তই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। অবশ্য ইহাতে ইংরেজাধিকারও মুখ্যভাবে কম সাহায্য করে নাই। আর একটি চুটাইকরণ—চাকরী। কিন্তু ইহাকে প্রচলিত শিক্ষারই ফল বলিতে হইবে। ফলতঃ বাঙ্গালীর সংসর্গে যা কিছু সামান্য অনিষ্ট ঘটিলেও, তাহাদের দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ হইয়াছে। নতুবা তাহাদের বর্তমান অভ্যুদয় কদাপি সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রমাণ পার্শ্বতীর অপরাপর জাতি এযাবৎ বহুদূরে পড়িয়া আছে।

এই চাক্‌মা ও বাঙ্গালীর সংস্রব আরম্ভ হইয়াছে, আজ কালের কথা নহে। “দেজ্যাওয়ারি আরে দফুং” এখুঁটির দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও এতৎ সম্বন্ধে পরিচয় পাইয়াছি। তখন তাহাদিগের মধ্যে যে একতার তাবদেখা গিয়াছিল, আরও বহুকাল পূর্বে যে তথাকথিত সংস্রব আরম্ভ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ক্রমে পরস্পরের সম্বন্ধে এত ঘনিষ্ট হয় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগেও বাঙ্গালিগণ চাক্‌মা রাজার মন্ত্রী ছিলেন। যাহা হউক বড়ই সুখের কথা যে, বর্তমানে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্যে, কর্ম্যে, ভাষায়, কথায় শিক্ষাদাতা বাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার উপযুক্ত হইয়াছে। কোন কোন বাঙ্গালী তাহাদের “বাঙাল” আখ্যায়—বাঙ্গালীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন মনে করিয়া চুঃখিত হয়। কিন্তু আমরা তাহা সরল প্রাণের মধুর সন্তোষণ বোধে আমনের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও পূর্ববঙ্গবাসিগণকে ‘বাঙাল ডাকেন এবং উড়িয়াবাসীদিগকে আমরা ‘উড়ে’ বা ‘উড়িয়া’ বলি, তজ্জন্য কাহারও মনে কষ্টগ্রহণ করা কঠব্য নহে।

( ২ )

মহুয়াসমাজের অধুষিত ভূমণ্ডলের এমন কোনও স্থান আছে কিনা জানিনা, যথায় খৃষ্টিয়ান মিশনারী মহোদয়গণের ধর্ম্মালোকরশ্মি বিকীর্ণ হয় নাই। পথে—ঘাটে—বনে—জঙ্গলে—সর্বত্রই তাঁহাদের গতিবিধি। অবিচলিত উৎসাহে—অক্লান্ত অধ্যবসারে বাবতীয় বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-বিস্তার চেষ্টায় তৎপর দেখা যায়। বস্তুতঃ বাহারা ঈদৃশী সাধনার নিয়ত, তাঁহারা এবং তাঁহাদের সাহায্যকারিগণ মহামতি যৌগুর প্রকৃত আশীর্বাদভাজন ও সমাজের প্রশংসার পাত্র।

সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন যে, এই মিশনারীসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে “লণ্ডন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি” সর্বপ্রথম ১৮১২ খৃষ্টাব্দে আসিয়া চট্টগ্রাম ও এই পার্শ্বতা প্রদেশের দক্ষিণাংশে কার্যারম্ভ করেন। এই প্রথম উদ্যোক্তার নাম রেভঃ, ডি, ক্রইন। কিন্তু তিনি অতি অল্পদিন পরে তাঁহারই কর্তৃক দীক্ষিত জনৈক মধ্য-বালকহস্তে নিহত হন। তৎপরবর্ত্তী মিশনারী রেভঃ পিককও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অররোগে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর রেভঃ ফিল্ড আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন। তদীয় চেষ্টায় দুই বৎসরের মধ্যেই কল্লাবাজার ও তৎসমীপবর্ত্তী কয়েকটা গির্জায় ১৬৩ জন ধর্ম্মান্তরিত পাণ্ডাড়া যোগদান করিতেছিল, কিন্তু প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে তাহারা চারিদিকে হুড়াইয়া পড়ে এবং অধিকাংশ অর ও যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে রেভঃ ফিল্ডের চেষ্টা ও অধ্যবসায় সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়। অতঃপর ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে এই সম্প্রদায়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কেবল “ফ্লাই অন দি হইলে” দেখিতে পাই, কাপ্তেন

Page 379.

লুইন লিখিয়াছেন,—এখানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ জনৈক মিশনারীকে পাইবার জন্য, আমি কলিকাতাবাসী মিশনারীদের সহিত চিঠি লেখালেখি করিয়াছিলাম। আমি যখন বুঝিলাম যে, এ সকল সরল জড়োপাসক-দিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমার নিজ হইতে উক্ত মিশনারীর অর্দ্ধেক বেতন দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। পরন্তু এ বিষয়ে আমি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সম্মতি প্রদান করি নাই।” ইতি—ইহা ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ের কথা হইলেও, চেষ্টা বা সঙ্কল্পমাত্র কলে কিছুই হয় নাই। অধিকন্তু আমরা এই শেষ কর পংক্তি হইতে তদীয় অন্তঃকরণ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম।—তিনি স্বধর্ম্মপ্রণেমে এমনি মাতোয়ারা ছিলেন যে, ভিক্ষুগণকে তাহাদের ভাষা অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

বাহা হউক, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রেভ: ডি, জুন্, চট্টগ্রামের কার্যভার গ্রহণ পূর্বক দ্বিতীয়বার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি বৎসরে একবার মাত্র এই পার্শ্বভ্যপ্রদেশে প্রচারার্থ পর্যটন করিতেন, তাহাতেও নাকি তিনি জ্বরে একরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন যে, অবশেষে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর রেভ: ম্যাকলিন তদীয় স্থলাভিষিক্ত হন। তখন হইতে এই সম্প্রদায় প্রকৃত ফলপ্রসূ হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৫ অব্দে ম্যাকলিন দীর্ঘ বিদায় লইয়া স্বদেশে যান; প্রত্যাবর্তন পথে ‘পোটসেইডে’ নিউমোনিয়া (Pneumonia) পক্ষ প্রাপ্ত হন। তাহার পর রেভ: ডোনেল্ড কর্মভার গ্রহণ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি নিয়মিতরূপে কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৯ অব্দে অবসর গ্রহণ কালে তিনখানি ‘আউট্‌ স্টেশন’ এবং ৭৫ জন মেম্বরবিশিষ্ট এক-খানি গির্জা রাখিয়া যান।

বলা বাহুল্য, মিশনারিগণের প্রাপ্তকৃত বাবতীয় চেষ্টা প্রধানতঃ চট্টগ্রামেই চলিয়াছিল। ইহাতে চাকমা সম্প্রদায়ের দূরের কথা, এই পার্শ্বভ্যপ্রদেশের সহিতও সঘন্য অতি সামান্য ছিল। অনন্তর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রেভ: জর্জ হিউজ এবং তদীয় পত্নী আসিয়া উক্ত কার্যভার গ্রহণ করেন। ইহারা এই মিশন কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্বে উভয়েই ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে বহুকাল ধরিয়া শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বর্তমান কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, এই পার্শ্বভ্যপ্রদেশের কার্য্যে, চট্টগ্রামে থাকিয়া সাময়িক পরিদর্শন অপেক্ষা নিকটে থাকিতে পারিলেই অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত তাঁহার রাঙাঘাটিতে অত্রতা হেড্‌ কোয়ার্টার স্থাপন করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন এখানে বর্তমান সুরম্য ‘বাংলা’ নির্মিত হয়, তখন হইতেই তাঁহাদের কার্যালয় এখানে স্থায়িরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃই তাঁহাদের আশা সফলতা লাভ করিয়াছে, সেই বৎসরেরই শেষভাগে তাঁহানিগের সম্প্রদায়-সংখ্যা ৬০০ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্যভার বৃদ্ধি পাওয়ার তিনি একজন ইউরোপীয় সহকারীও পাইলেন। তাঁহারা এখানে শিক্ষা-সাহায্যেও মনোযোগ অর্পণ করেন। চৌদ্দখানি গ্রামে পাঠশালা খোলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন-খানিতে ‘বোর্ডিং’ও ছিল। কিন্তু হুঃখের বিষয়, এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র পাওয়া দুর্বট হইল। প্রচারের সুবিধার্থ অনন্তর তাঁহার ‘চিকিৎসা-সাহায্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। তজ্জন্ত লণ্ডনের সুশিক্ষিত ডাক্তার জি, ও, টেইলর এম, বি, ; এক, আর, পি, এম্, সত্ৰীক আসিয়া যোগদান করেন। তদীয় পত্নীও একজন তত্ত্বা সুশিক্ষিতা ধাত্রী, ইতোপূর্বে লণ্ডন নগরের কোন সুপ্রসিদ্ধ

চিকিৎসাগারে "সিষ্টার" ( Sister ) স্বরূপে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন ।

১৯০৬ অব্দে তাঁহারা চন্দ্রঘোনায় দ্বিতীয় কার্য্যক্ষেত্র খোলেন। তথায় সুপ্রসিদ্ধ "লুইনের পাহাড়ে"র উপর অপর এক রমণীয় 'বাংলা' বিনির্মিত হয়। এই ষ্টেশনের ভার ডাঃ টেইলার এবং তদীয় পত্নীর উপর স্তব্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের চিকিৎসা-সাহায্য কেবল পার্শ্বভাগে নহে, প্রতিবেশী হিন্দুমুসলমান অধিবাসিগণও প্রভূত উপকার লাভ করিতেছে। পরবর্তী বৎসর তাঁহারা এক 'আউট ডোর ডিস্পেন্সারী' খুলিয়াছেন, গত সনে এক সুবৃহৎ ইষ্টকনির্মিত ( Arthington ) 'হস্পিটাল' প্রস্তুত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই নূতন ষ্টেশনের নিমিত্ত যদিও তাঁহাদের অর্দ্ধলক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু তদ্বারা ইতোমধ্যেই বহুসংখ্য পীড়িত ব্যক্তি অশেষ উপকার লাভ করিয়াছে।

মিশন সম্প্রদায়ের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী একরূপ প্রস্তুত হইল, এক্ষণে তাঁহাদের বর্তমান পরিচালকগণের একটি স্থূল পরিচয় দিয়াই মদীয় বক্তব্য শেষ করিতেছি। এই সম্প্রদায় পরিচালনে অধুনা—

মিশনারী :—রেভঃ জি, এবং মিসেস্ হিউজ্ তাঁহাদের সহকারী—রেভঃ পি, এইচ্, জোন্স এবং রেভঃ প্রিন্সনাথ সাঁৎ ।

ডাক্তার—জি, ও, এবং মিসেস্ টেইলার তাঁহাদের সহকারী—শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস (এসিঃ) এবং শ্রামাচরণ চাক্‌মা ( কম্পাউণ্ডার ) । এতদ্ব্যতীত নয়জন পাহাড়ী প্রচারক, এবং তেরজন বাঙ্গালী ও পাহাড়ী শিক্ষক আছেন।

আশা করি এতদ্বারা প্রিয় পাঠকমণ্ডলী তাঁহাদের চেষ্ঠার উগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বলিব কি, এত প্রাণপণ যত্ন চাক্‌মাসমাজে অতি অল্পই ফলপ্রসব করিয়াছে। পূর্বে যে শিক্ষা সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তৎকালে তাঁহারা এই চাক্‌মাপ্রধান চাক্‌মা সার্কেলে কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক স্কুল রাখিয়াছিলেন। যদিও সেই সকল কোনও স্থলে খুষ্টিয়ান শিক্ষক ছিলেন না এবং খুষ্টিয়ান উপদেশও দেওয়া হইত না, তথাপি চাক্‌মাগণ তাঁহাদের প্রতি এত অবিখ্যাতী যে, অপর শিক্ষা-সাহায্য অভাবে তাহারা সন্তানগণকে অশিক্ষিত রাখিত, তবুও এই সব বিঘ্নালায়ে পড়িতে দিত না; অধিকন্তু সামান্ত সামান্ত বাধাও উপস্থিত করিত। ইহাতে তাঁহারা সেই সকল স্কুল বন্ধ করিয়া দেন। এখানে কেবল খুষ্টিয়ান বালকবিগের আবশ্যকোপযোগী ২১৩ খানি স্কুল মাত্র রাখিয়া তাঁহাদের অবশিষ্ট শিক্ষা-সাহায্য বোমাং সার্কেলে স্থানান্তরিত করিয়াছেন; তথায় কাণ্ডাই উপত্যাকাবাসী বহুসংখ্যক যুব তাঁহাদের অনুব্রাহ্মী



হইয়াছে। আশ্চর্যের কথা,—এই স্থল সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতেও চাক্‌মা-সমাজ দুঃখিত নহে, বরং যেন তাহারা বলিতেছে—“ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি !”

এইরূপে, মিশনারী-চেষ্ঠা খুব প্রবল হইলেও, বিরাট চাক্‌মা সম্প্রদায় হইতে তাঁহারা অতি সামান্ত সহায়তাই পাইয়াছেন। এযাবৎ সোনারাম, শ্রামা-চরণ, রঘুমণি প্রভৃতি ৩৪ জন মাত্র তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভদ্রপরিবারসমূহ যে একজন ছিলেন, তিনি আবার বৌদ্ধধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত তিনজনই তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে একান্ত বাধ্য। কেননা, এই সোনারাম অতি দরিদ্র চাক্‌মার সন্তান ছিল। প্রথমে বাসার চাকরী মাত্র অবলম্বন করিয়া চট্টগ্রাম যায়, তাহাতেই মিশনারী আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু তাঁহারাও তাহার জন্ত যথেষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজে পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে সে তাঁহাদের সহকারিরূপে প্রচারের কার্যে আছে। শ্রামাচরণও দরিদ্র-সন্তান, শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া জটনৈক ত্রিপুরার অগ্রে প্রতিপালিত হয়। অধুনা তাঁহাদের সাহায্য লাভ করিয়া কম্পাউণ্ডারী কার্যে অগ্রসর হইয়াছে। অপর রঘুমণি এক দীন হীন বৃদ্ধ, তাহার জীবিকা নির্বাহের দ্বিতীয় উপায়ই নাই। বস্তুতঃ এই ধর্মোন্মত্ত মিশনারী সম্প্রদায় বাড়ী ঘর আত্মীয় বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় এই সুদূর দুর্গম প্রদেশে হুস্তর-প্রচার ত্রুটে জীবন সমর্পণ করিয়া আছেন! তাঁহাদের এত অর্থব্যয়, এত ক্লেশ স্বীকারেও আশাহুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া মনে দুঃখ হয়। তবে আশ্বাসের কথা এই যে, রেভঃ হিউজ্‌ মহোদয় আমাদের লিখিয়াছেন,—“The results therefore from among the Chakmas has not been great. The number of baptised Chakmas in membership with the Christian church is small, but the number of enquirers, and of those who believe in the ‘Lord Jesus Christ’ as their saviour is by no means inconsiderable.” অর্থাৎ ‘তাই চাক্‌মাসম্প্রদায়ের মধ্যে ফল তত বেশী নহে। গির্জাভুক্ত চাক্‌মা খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং প্রভু বীণ্ড খ্রীষ্টকে পরিজ্ঞাত স্বরূপে বিশ্বাস-কারীর সংখ্যা কোনরূপে মন্দ নহে।’ তিনি আরও বলেন,—“The missionaries are inspired with the hope, that when the sense of fear of consequences which now animates so many of the people passes away, the number of additions to the church will be large; and that this timidity will pass, nay, is passing they feel absolutely confident.” অর্থাৎ ‘মিশনারিগণ আশায় উৎফুল্ল আছেন

যে, এই অসংখ্য লোক স্বাধার পরিণামফলের ভয়ে এক্ষণে কাতর রহিয়াছে, যখন তাহাদের সেই ভয় চলিয়া যাইবে, তখন গির্জায় দীক্ষিতের সংখ্যা ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইবে এবং এই ভীকৃত্য দূর হইবে, না—চলিয়া যাইতেছে, তাহার সম্পূর্ণ-রূপে ( খৃষ্টিয়ানদের পরিণাম ফলে ) বিশ্বাস উপলব্ধি করিতেছে।’

( ৩ )

সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন মঙ্গল কি অমঙ্গলের নিমিত্ত হইয়াছে, তাহার বিচার বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। আর তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ মন্তব্য ইংরেজ বা আমাদের কাহারও হইতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষই স্বার্থসংপৃক্ত। তবে ইহা নিশ্চিত যে, সেই বৈদিক যুগ হইতে বিচার করিলে এ জগতে আমাদের স্থান বহু উচ্চে অবস্থিত ; আর তাহা ছাড়িয়া দিলে বর্তমান যুগে আমরা ইংরেজ হইতে অনেক শিখিয়াছি, এবং এখনও আমাদের সেই শিক্ষা পূর্ণ হয় নাই। স্বাধার এককালে সহোদর ভ্রাতাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাহাতে বিজ্ঞাতিকে আনিয়া বসাইয়াছিল এবং তাহাদের সহিতও মনোমালিন্য হওয়ার, অপর এক বৈদেশিক শক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল, আর এক্ষণে সেই ভারতবাসী আসমুদ্র-হিমালয় ব্যাপিয়া রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলন পরিয়াছে—ইহাও ইংরেজ-শাসনের অন্ততম শুভময় ফল নহে কি ? সে স্বাধা হউক, এই প্রবন্ধ তাদৃশ রাজনৈতিক গবেষণার নিমিত্ত নহে। ইংরেজাধিকারে কেবল চাকমাজাতির ইষ্টানিষ্ট পর্যালোচনা মানসেই ইহার অবতারণা।

একটি কথা প্রথমে এস্থলে উল্লেখ করিতেই হইতেছে। সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য, রাজপুরুষগণও মনুষ্য বটেন, সুতরাং রাজশক্তি ব্যতিরিক্ত মানব-স্বলভ দুর্বলতাও তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে। তবে কাহারও কাহারও তাদৃশ দুর্বলতা রাজশক্তির রত্নমূর্ত্তি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। এই গ্রন্থে তাদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব নাই সত্য, কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত তৎসমুদায় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বলিতে কি, অনেক কথা আমরা চাপিয়া যাইতে ক্রটি করি নাই। কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থচেষ্টা অতি নীচতারই পরিচায়ক ; পবিত্র রাজশক্তির ভিতর দিয়া তাহা দেখাইতে গেলে, রাজারই অবমাননা করা হয়। তথাপি যে কয়েক কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি, ভ্রাতৃ ধর্মের মর্যাদানুরোধে মাত্র। তাঁহাদের তথাকথিত কার্যকে কেহ রাজবিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করিলে, মহাভ্রমে পতিত হইবেন।

মির মহম্মদ কাসিম বন্ধের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপত্রক ইংরেজ-

কোম্পানীকে চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের সর্বাধিকারিত্ব দানে পুরস্কৃত করেন। তদবধি চট্টগ্রামের ভাগাচক্রের সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌মাদিগের অদৃষ্ট-নেমিও ইংরেজ-হস্তে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। তবে তদানীন্তন চাক্‌মারাজগণ করদ ও মিত্ররাজপ্রায় ব্যবহৃত হইতেন। রাণী কালিন্দীর শাসনকাল হইতেই মিত্রতাবন্ধন ক্রমে অধীনতাশৃঙ্খলে দৃঢ়তর করিবার উদ্ভোগ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজাধিকারে চাক্‌মাদ্বিধে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে যেমন আঘাত পড়িয়াছে, সাধারণের সুখ-সুবিধা তেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথাই কেহ কেহ আশঙ্কি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বর্তমান সভ্যতাদীপ্তবুগে ব্রিটিশ শাসন না আসিলেও তাদৃশ সুযোগ পাওয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা অপরাপর স্বাধীন ও মিত্ররাজ্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারি না। কারণ পৃথিবীর বক্ষে লব্ধ প্রতিষ্ঠ এতাদৃশ পরাক্রম-শালী জাতির অধীন না হইলে, তাহাদের বর্তমান উন্নতি অন্ততঃ সর্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সংঘটিত হইত কি না, গভীর সন্দেহ আছে। ইতিপূর্বে যে মুসলমানাবীনে ছিল, তাৎকালিক ইতিবৃত্তও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলময়, এবং অশাস্তিতে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ রাজা প্রবল প্রতাপশালী না হইলে দেশের শাস্তিরক্ষা একরূপ অসম্ভব। তখন দক্ষিণে মঘ, পূর্বে কুকি, এবং উত্তরে ত্রিপুরারাজের ক্ষমতাও কম ছিল না, মুসলমানরাজ একমাত্র পশ্চিমে থাকিয়া আশ্রিতরাজ্যের কত আর শাস্তিবিধান করিতে পারেন! ইংরেজ এদেশের একচ্ছত্র সম্রাট, সুতরাং তাঁহাদের হইতে ষথার্থ আশা করা যাইতে পারে।

গ্রন্থভাগেও প্রদর্শিত হইয়াছে, ইংরেজাধিকারের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত এতদংশে নির্দ্বন্দ্ব কুকিদিগের শোচনীয় অত্যাচার অব্যাহতপ্রায় চলিতেছিল। তাহাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখিয়া অনন্তর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে গভর্ণমেন্ট দেশ-প্ৰশাসনকল্পে যেই প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপদ্রবও কমিতে লাগিল। হায়, তখন ধনী-নির্ধন কাহারও ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ ছিল না! সকলেই সপরিবারে সতত সশস্ত্রিত থাকিত। তাহাদের ভয়ে স্বামী—স্ত্রীকে, মাতা—সন্তানকে, গুরু—করাজীর্ণ পিতামাতাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে, এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অধিক কি, সুদূরবাসী আমরাও শিশুকালে “লেংটা কুকি”দিগের তাদৃশ পাশবিক অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া শুনিয়া ভয়-বাকুল হইতাম। আর এক্ষণে আসিয়া বাহা দেখিতেছি, তদ্বারা তাহারা যে কোন কালে তেমন হিংস্র-চরিত্রের ছিল—

কিছুতেই ধারণা হয় না। “বাবু” দেখিলে, কাছে আসিতেও ভয় পায়, এবং একজন “বাবুর” সমভিব্যাহারে চারিজন কুকি চলিতেও প্রাণভয়ে কাতর হয়। যজ্ঞ ইংরেজ-প্রভুত্ব !

ইহা হইতেই এতদেশে শাস্তিরক্ষার গভর্ণমেন্টের যোগ্যতা অক্লেশে অনুমিত হইতে পারে, তবে এই সঙ্গে একটি আনুষঙ্গিক কথা না বলিলে প্রত্যাবায়ভাগী হইতে হয়। বিপ্লব আদমহুমারী মতেও দেখা যায়, এতদঞ্চলে সর্বসাকল্যে ২১৪১০ ঘর লোকের বসতি আছে অথচ দেশের ক্ষেত্রফল ৫১৩৮ বর্গমাইল। সুতরাং গড়ে প্রায় ২ বর্গমাইলে এক ঘর লোকের বসতি পড়ে। ঘর-হিসাবে জনসংখ্যাও গড়ে ৫৯ মাত্র। অতএব এই স্বাধীনসকুল দেশে একরূপ বিরলবসতি কত যে বিপজ্জনক—সামান্য অনুধাবনেই বুঝিতে পারা যায়। বর্তমানে দস্যু বা ততোধিক ভয়ানক কুকি-উপদ্রব দমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু হিংস্রজন্তুর অত্যাচার যথেষ্ট চলিতেছে। উৎপন্ন শস্তের অর্দ্ধাংশও কৃষকেরা গৃহে আনিতে পায় না, তত্পরি প্রাণের ভয়ে ত নিয়তই উৎকণ্ঠায় থাকিতে হয়। এতদবস্থায় আশ্রয়ক্ষার একমাত্র সম্বল—বন্দুকের সংখ্যা সমগ্র পার্শ্বতা চট্টগ্রামে দুই হাজারও নহে, অর্থাৎ প্রায় ২ বর্গমাইল অন্তর একটি করিয়া বন্দুক আছে। তাই আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার প্রধান সহায় বন্দুকের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা কর্তব্য। পূর্বে ইহাদিগের হইতে বন্দুকের টেক্স লওয়া হইত না, আজ কয়েকবৎসর হইতে বন্দুক প্রতি ১০ চারি আনা করিয়া কর বসিয়াছে। বস্ত্তঃ ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমাদের দেশে আমোদ তথা শিকার-প্রয়াসে মাত্র বন্দুক রাখা হইয়া থাকে, আর ইহারা তাহা শস্ত এবং ততোধিক জীবনরক্ষার নিমিত্ত রাখিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইহাদিগকে এই জন্ত যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া বিধেয়। আর সমস্ত পার্শ্বতা চট্টগ্রামে বারুদাদি বিক্রয়ের দুইটি মাত্র ডিপো আছে। অথচ একবারে তিনমাসের জন্ত ১০ আধসেরের অধিক বারুদ বিক্রয় নিষিদ্ধ। ইহাতে এক দিকে যেমন তাহাদিগকে বহুদূর হইতে দুর্গম পার্শ্বতাপথ অতিক্রম করিয়া অশেষ কষ্ট পাইতে হয়, পক্ষান্তরে তিনমাসে আধসের বারুদ দ্বারা কিছুতেই চলে না। অর্ধ সের বারুদে কোনরূপে শতক বার পর্য্যন্ত গুলি ছোড়া যায়। কিন্তু হিংস্র জন্তুর উপদ্রব বৃদ্ধি পাইলে, বিশেষতঃ ফসলের পক্ষী ও বস্ত্র পণ্ড হইতে শস্য রক্ষা করিতে ঐ বারুদে তিনদিনও চলে না। তাই প্রার্থনা, কর্তৃপক্ষ এজন্ত অধিক-তর কুপাদ্ধি করিবেন।

অবশ্য বর্তমানে দেশের নানাহানে যেরূপ গণ্ডগোল চলিতেছে, তাহাতে আমাদের এই প্রস্তাবে গভর্ণমেন্ট কর্ণপাত না করিতে পারেন, তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, এখানে তেমন কোন গোলযোগের লক্ষণও নাই, এবং এই নিরীহ সরল প্রাণ পাহাড়ীদের মধ্যে ভাদৃশ ভাব আসা সম্ভবও নহে। তবে যে মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলচাচারের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্ক বিকৃতিমাত্র। তথাপি সন্দেহ হইলে কর্তৃপক্ষ সার্কুলেচিফের মত গ্রহণ করিয়া সংস্কারাপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রার্থিত বিশেষ সুবিধা দিতে পারেন।

পথের দুর্গমতা ও আপদসঙ্কুলতা নিবন্ধন এবং সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধা অভাবে পূর্বে এদেশের আমদানী রপ্তানি প্রায় চলিত না। ইংরেজের প্রবল ক্ষমতাবলে এক্ষণে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, যাতায়াতের এবং সংবাদ প্রেরণের সুবিধাও দিন দিন অতি দ্রুতভাবে বর্ধিত হইতেছে। অবশ্য ডাক ও টেলিগ্রাম সম্বন্ধে এখানে ভারতের অন্তর্গত স্থানের সহিত সমানই ব্যবস্থা, কিন্তু রাস্তাঘাটাদির নিমিত্ত কোন পথকর নাই। এইরূপে অসুবিধা সমূহ দূরীকৃত হওয়াতে অধুনা বাণিজ্যের অশেষ ত্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ তাহাদের প্রবর্তিত অবাধবাণিজ্যের কল্যাণে ইহাদের অশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। নতুবা একদিকে আমদানী অভাবে যেমন জীবন যাত্রা দুর্লভ হইত, পক্ষান্তরে রপ্তানী না থাকিলেও ততোধিক অসুবিধা ঘটত। অধুনা এদেশবাসিগণ বাণিজ্যের সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রমেই অধিকতরভাবে তাহাতে লিপ্ত হইতেছে। এই সঙ্গে ইংরেজরাজের অন্ততম সহায়তার কথা পুনরায় বলিয়া রাখা প্রয়োজন। কতিপয় বাঙ্গালী মহাজন এই নিরীহ পার্শ্বত্যদিগকে প্রতারিত করিতে যেরূপ অহনিশ যত্নশীল, তাহাকে গভর্ণমেন্টের সাধুচেষ্টা সবিশেষ ধন্যবাদার্থ। সুদের হার হ্রাস, ততোধিক নূন সুদে ঋণদান এবং সংবৎসরোপযোগী আবাহ্যের ক্রোক প্রতিবেদন ব্যবস্থা প্রভৃতি ইংরেজরাজেরই মহতী কীর্তি।

গ্রন্থভাগেই দেখিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ঐকান্তিক উৎসাহেই চাক্ষুস-গণ লাঙ্গলের চাষ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই অমুরাগ বর্তমান রাজা বাহাদুরের উপাধি প্রদানকালেও ভূতপূর্ব লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর সার জন উড্‌বগনের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। বন-সংরক্ষণী ব্যবস্থাও তাহারই অন্ততম কারণবিশেষ। মাইয়সী রিজার্ভ ছাড়িয়া দিতেও মাননীয় গভর্ণমেন্ট বলিয়াছেন, চাঁদের ভূমির বিস্তারের নিমিত্তই ইহা করা হইল। অপরতঃ রাজা অপেক্ষা হেড্‌ম্যানদিগের দ্বারাই চাঁদের প্রতি লোক অধিকতর প্ররোচিত হইতে পারে, তজ্জন্ত কৃষিলব্ধ রাজস্ব রাজা হইতে হেড্‌ম্যানের কমিশন ভাগ অধিক রাখা হইয়াছে।

এতদ্বির ক্রমিতে প্রথম তিন বৎসর নিষ্কর-সুবিধা দিয়া তাহা আরও লোভনীয় করিয়াছেন। তবে চাষবিস্তারের পক্ষে আর হই অস্তরার আছে। প্রথমতঃ—বন্দোবস্তগুলি সাধারণ ‘আমল নামা’ মাত্র; গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে যখন তখন সেই জমি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ—ইহাতে অধীনস্থ প্রদানের অধিকার নাই; এমন কি কেহ গোপনে অধীনস্থ দিয়াছে প্রমাণিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার ‘আমল নামা’ খারিজ করিতে পারেন। অথচ গভর্ণ-মেন্টের এই বিধি কার্য্যতঃ রক্ষাও হইতেছে না; শুনিতে পাই, বুদ্ধিমানগণ বিনামার যথেষ্ট ইজারা চালাইতেছেন, কিন্তু রাজস্বজির ভয়ে সকলে সাহস না পাওয়ার চাষবিস্তারে ব্যাঘাত ঘটতেছে। তাই আমরা এস্থলে মাননীয় গভর্ণ-মেন্টসমীপে উক্ত অভাবদূর নিরাকরণার্থ সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতেছি। ‘আমল নামা’র পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের রীতি থাকিলে, এতদ্বিনে খুব সম্ভব এদেশের আবাদযোগ্য প্রায় সমুদয় ভূমিতেই চাষ চলিত এবং ইহাদের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের যে একটা উচ্ছৃঙ্খল বাসনা অত্যাশি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও প্রায় থাকিত না। আর এই জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি লাঙ্গল চালনার উপযুক্ত করা সমধিক ব্যয়সাপেক্ষ। এক একর ভূমি আবাদের উপযোগী করিতে, অন্ততঃ ৫০ পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়ে; এবং চাষের জন্য অনূন একশত টাকার এক ঘোড়া মহিষ প্রয়োজন। গরীব পাহাড়ীদের অনেকেই এই মূলধন অভাবে চাষে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, এবং হুঃসাহস করিয়া করিলেও অনেকে মহাজনদিগের কুসীদদায়ে ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য এনিমিত্ত সহায় গভর্ণমেন্ট সামান্য হুদে কৃষকদিগকে ঋণদান করিতেছেন। সেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও যখন এদেশে সর্বপ্রথম লাঙ্গলের চাষ প্রবর্তিত হয়, ইংরেজরাজ প্রজাসাধারণকে ৮০০০ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইতে কোনরূপে মাত্র ৫০০০ টাকা আদায় হইয়াছিল। তথাপি গভর্ণমেন্ট আবশ্যকস্থলে ঋণদানে কুণ্ঠিত নহেন, গত বৎসরও প্রায় ২৫০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। কিন্তু তবুও সকলের প্রয়োজনীয় অভাব মোচিত হইতেছে না। কেননা উপযুক্ত জামিন বা স্বস্থলের অভাবে অনেকেই ঋণ পায় না, সুতরাং অন্ততঃ সমর্থব্যক্তিগণকে ইজারা প্রদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাঁহারা অধিক পরিমাণে ভূমি আবাদ করিয়া আবশ্যকীয় মহিষাদি সহ সাধারণ্যে বিলি করিতে পারেন। চাষদ্বারা যে ইহাদের উন্নতি হইতেছে, তাহা সহায় গভর্ণমেন্ট স্বয়ংক্রম করিতে পারিয়াছেন দেখিয়াই, আমরা এই হই প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। বর্তমান সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ আর, এইচ, স্টেইড্, হাচিন্সন্ মহোদয়ের এতৎপ্রতি

সবিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাই, তিনি চাষ বিস্তারের দিকে যেরূপ যত্ন লইতেছেন, আশা করি, এই আলোচনার প্রতি সকরণ দৃষ্টিপাত করিবেন।

এই সঙ্গেই আলোচনা যোগ্য, এই হতভাগ্য পাহাড়ীদিগকে গত উপযুগপরি দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে ইংরেজরাজের দয়াল হস্ত অব্যাহতভাবে অভয় প্রদান করিয়াছে। অগ্রাশ্রয়বাদের কথা নাই বা ধরিলাম, গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে এখানকার অবস্থা যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সহৃদয় গভর্ণমেন্টের আনুকূল্য লাভ না করিলে ইহাদের অর্দ্ধেকেরও অধিক নিশ্চিতই কালসদনে গমনে বাধ্য হইত। তাদৃশ এককালীন দান ছাড়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণকে ইংরেজগভর্ণমেন্ট ৬০০০০ হাজার টাকা বিনামূল্যে ঋণ দিয়াছিলেন, এবং আবশ্যক হইলে আরও দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি সতর্কদৃষ্টি ইংরেজরাজের প্রধান খ্যাতি। ইহাদিগের পূর্ব-বর্তিগণ রাজ্য হইতে এরূপ যত্ন পাইয়াছে কিনা, বিশেষ সন্দেহ আছে। ব্রিটিশাধিকার আসার পর এ অঞ্চলে ক্রমে (রাঙামাটি, বান্দরবন, বড়কল, লামা, মানিকছুরী, রামগড় ও তিনটিলায়) সাতটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বসন্তের আক্রমণ নিবারণকল্পে টীকাদানের ব্যবস্থাও কম সহৃদয়তা-পরিচায়ক নহে। তবে কিনা দেশীয় লোকের বিখ্যাত গো-বীজের টীকা বসন্তের প্রকৃষ্ট অন্তরায় নহে। তাই অধিকাংশ লোকই টীকাদানের প্রাচীন প্রথার প্রতি অধিকতর আস্থাবান। এ সম্বন্ধে বিলাতেও আলোচন চলিতেছে, শুনা যায়। সে যাহা হউক এই টীকার নিমিত্তও গভর্ণমেন্টের বার্ষিক প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয়িত হয়।

স্বাস্থ্যের পরেই শিক্ষার কথা আইসে। কিন্তু বলিতে কি, প্রজাপুঞ্জের শিক্ষাবিধানের নিমিত্তও প্রাচীন চাক্‌মা-রাজগণ কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হয় না। মহীরসী কালিন্দী রাণীর উন্নত শাসন খুঁজিয়াও তৎসম্বন্ধে কোন প্রয়াসচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইংরেজরাজ প্রত্যক্ষভাবে এদেশ শাসনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—অত্য়াপি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হয় নাই, এই স্বল্পকালমধ্যে নিরক্ষর প্রায় চাক্‌মাসমাজ যে কি পরিমাণে শিক্ষাগ্রস্তি লাভ করিয়াছে, তাহা গ্রন্থভাগেই বিস্তারিত দেখাইয়া আসিয়াছি। এই নিমিত্ত গভর্ণমেন্টের বার্ষিক প্রায় বিশ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় হয়। বস্তুতঃ শিক্ষার বিস্তার ইংরেজ রাজত্বের সর্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্মল। জাতিধর্মনির্বিশেষে জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা ভারতে ইংরেজের জায় আর কেহই করেন নাই। এই শিক্ষা-

বিস্তারের ফলে চাকমাসমাজে এক সম্পূর্ণ নূতন উদীপনা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার এক্ষণে নৈতিক ও সামাজিক বহুবিধ সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছে। এমন কি, অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনীতিক সমস্তা লইয়াও চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এইরূপে ইংরেজশাসন ইহাদের জীবন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ যত্ন লইতেছেন যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল, অনন্তর শাসন পরিচালন লইয়া জুই চারিটা কথা মাত্র পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইব। পূর্কপেক্ষা যে অধুনা সাধারণের সুবিচার লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহাতে আবার অধিকতর সুবিধা এই যে, এখানকার বিচারকার্যে স্ট্যাম্পের আবশ্যকতা নাই এবং ব্যবহারজীবীদিগেরও উৎপীড়ন নাই। সামান্য সাদা এক খণ্ড কাগজেই আবেদন গ্রাহ্য হয়, এবং বাদী প্রতিবাদিগণ ইচ্ছা করিলে নিজেরাই পরস্পর ও সাক্ষীকে প্রয়োজন মত প্রশ্ন করিতে পারে। এক কথায়, ইংরেজরাজ এখানে সহজে ও সরলভাবে ছুষ্টির দমন এবং শিষ্টের পালন-ব্যবস্থা কারিয়াছেন। ধর্ম্ম ও জাতীয়তায় আঘাত লাগিবে আশঙ্কায় তৎসংক্রান্ত বিচারাদি সমাজের প্রধানগণের উপর হস্ত রাখিয়াছেন। আরও সুখের কথা, ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে রাজকর্ম্মচারীপদে গ্রহণ করিয়াও গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট সহায়তার পরিচয় দিতেছেন।

পরিশেষে আমরা সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী কাপ্তেন টমাস হার্কট লুইন মহোদয়ের কয়টা কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছি। তাঁহারই দ্বারা এদেশে ব্রিটিশ রাজ্য বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয়, এবং তিনি বহু বৎসর ধরিয়া এখানকার শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন। সুতরাং ইংরেজশাসনের সমালোচনা তিনি বেক্রপ নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, আমাদেরিগের হাতে ততটা হওয়ার আশা নাই। তিনি পূর্কোল্লিখিত “পার্কতা চটগ্রাম এবং তত্রতা অধিবাসিবৃন্দ” নামক পুস্তকের উপসংহার শেষে লিখিয়াছেন ;—

“এক্ষণে আমি বলি, আমরা এই পার্কতাপ্রদেশ নিজেদের নিমিত্ত শাসন করিব না, ইহার অধিবাসিবৃন্দের মঙ্গল এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত মাত্র শাসন দণ্ড চালাইব। তাহা সত্যতাবিস্তারের জন্ত নহে, পরন্তু সভ্যতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। এখানে কেবল একজন লোক ব্যতীত আর কিছুই প্রয়োজন দেখা যায় না। শাসন ক্রমতা দ্বিয়া তাহাদের উপর একজন কর্ম্মচারী দেওয়া হউক ; তিনি যেন গভর্ণমেন্টের বিরাট কপিচক্রের মধ্যে কেবল দড়ির ভায় না চলেন ; পরন্তু তাহাদের অপারগতায় সহিষ্ণু, সহায়তার সহিত পর্য্যবেক্ষণপর,



এবং সমগ্র বসুধায় কুটুম্বজ্ঞানরূপ তাহাদের স্বাভাবিক অল্পভূতিতে উপলব্ধ হন। এই নূতন ভাব সমূহ হৃদয়জন্ম ও তাহাদের ধারণাকে মার্জিত করিয়া লইতে উপযুক্ততা থাকে, কিন্তু কোন জাতীয় সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বেন সাবধান রহেন। এইরূপ পরিচালনাধীনে তাহাদের নিজেকেই শনৈঃ শনৈঃ সভ্যতা লাভ করিতে দেওয়া হউক। শিক্ষাব্যবস্থা তাহাদের সম্মুখে, উন্মুক্ত থাকুক, তাহারা তাহা স্বকীয় বিধি ব্যবস্থা মতে চালাইয়া—বিনষ্ট ও বিকৃত ইংরেজী আদর্শে নহে, পরমেশ্বরের সৃষ্টপ্রাণীর নূতন ও মহান্ স্বরূপে বাহির হইয়া আসিবে।” (১১৮ পৃষ্ঠা।)

আমরাও ভদীয় উদার উপদেশের সহিত একমত হইয়া—ভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি, প্রজার সর্বস্বাধীন মঙ্গলবিধান রাজা ও রাজশক্তির চিরকামনীয় হউক।

---

সমাপ্ত ।

ପରିଶିଷ୍ଟ ।

( আদ্যভাগ ) শাসন কর্তাদিগের তালিকা ।

( মধ্যভাগ ) ১৯০০ অব্দের বিধানের বঙ্গানুবাদ ;

তদধীন নিয়মাবলী সমেত ।

( অন্ত্যভাগ ) মৌজা-পরিচয় ।

# ( আদ্যভাগ । )

পার্কতা চট্টগ্রামের

শাসনকর্তাদিগের তালিকা ।

খৃষ্টাব্দ ।	সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ডেপুটি কমিশনারগণ ।	এসি: এবং এক্সট্রা এসি: কমিশনারগণ ।
১৮৩৪	জি, ম্যাকগিল ; জি, সি, কিলবি ।	
১৮৩৫	জি, সি, কিলবি ।	
১৮৩৬	জি, সি, কিলবি ; লেপ্টে: টি, এইচ, লুইন ।	
১৮৩৭	কাপ্তেন টি, এইচ, লুইন ।	আর, এইচ, রেইনী ।
১৮৩৮		আর, এইচ, রেইনী; এ, রেটে ।
১৮৩৯	কাপ্তেন টি, এইচ, লুইন ; এ, রেটে ; মেজর জে, এম, গ্রাহাম ।	এ, রেটে ।
১৮৭০	কাপ্তেন টি, এইচ, লুইন (ছুটিতে) ; এ রেটে ; মেজর জে, এম, গ্রাহাম ।	
১৮৭১	কাপ্তেন টি, এইচ, লুইন মেজর জে, এম, গ্রাহাম ; এ, ডব্লিউ, কোক্রাম ।	
১৮৭২	কাপ্তেন টি, এইচ, লুইন; এ, ডব্লিউ, কোক্রাম ।	এ, রেটে (ছুটিতে) : লেপ্টে: এ, ই, গর্ডন ।
১৮৭৩	কাপ্তেন টি, এইচ, লুইন ।	"
১৮৭৪	কাপ্তেন টি, এইচ, লুইন; এ, ডব্লিউ, বি, পাউয়ার ।	লেপ্টে: এ, ই, গর্ডন; এক, এ, চিচেষ্টার; এ, রেটে ।
১৮৭৫	এ, ডব্লিউ, বি, পাউয়ার ।	এক, এ, চিচেষ্টার: লেপ্টে, এ, ই, গর্ডন ।
১৮৭৬	এ, ডব্লিউ, বি, পাউয়ার ; জে, এণ্ডার্সন ।	লেপ্টে: এ, ই, গর্ডন ।
১৮৭৭	জে, এণ্ডার্সন ; ই, এইচ, রডোক ।	এ, রেটে ।
১৮৭৮	জে, এণ্ডার্সন (ছুটিতে) ; ই, এইচ, রডোক ; কাপ্তেন এ, ই, গর্ডন ।	লেপ্টে: জে, এক, রিভেট-চার্জক ।
১৮৭৯	কাপ্তেন এ, ই, গর্ডন ; কাপ্তেন ই, জি, লিলিংটন; সি, এ, এস, বেডফোর্ড ।	সি, এ, এস, বেডফোর্ড ; লেপ্টে: জে, এক, রিভেট-চার্জক ।
১৮৮০	কাপ্তেন এ, ই, গর্ডন ; সি, এ, এস, বেডফোর্ড ; আর, এইচ, রেইনী ।	সি, এ, এস, বেডফোর্ড ।
১৮৮১	কাপ্তেন এ, ই, গর্ডন ; এল, আর, কোরস ; জে, কেনেডি ।	আর, আর, পোপ ।
১৮৮২	এল, আর, কোর্বস ।	
১৮৮৩	"	
১৮৮৪	এল, আর, কোর্বস ; সি, এ, এস, বেডফোর্ড ।	
১৮৮৫	সি, এ, এস, বেডফোর্ড ; এস, জে, ডাংলস ।	জে, এল, হেরন্ড ।

\* শুনিতে পাই, ইতিপূর্বে ১৮৬০ হইতে ১৮৬৩ খৃ: অব-বি: ম্যাকগিলের পূর্ব পর্যন্ত, কাপ্তেন ম্যাকবেথ, কাপ্তেন গ্রাহাম, এবং এন টুরেডিক প্রভৃতি ছিলেন ; তৎপরে কিছুদিনের অন্ত কমিশনারের পার্থনে এসি: অন্তরাচরণ দাস মহোদয়ও অস্থায়িতাবে এই কার্য করেন ।

ডেপুটি কমিশনারগণ	শাসনকাল।	ডে. ম্যাজিঃগণ	শাসনকাল।
সি. এ. এন্স. বেডফোর্ড	১-১-১৮৮৬-১৮-১-১৮৮৭	ডব্. লিউ. এক্. সি.	১৮৮৬-৮৭
সি. ওয়েন।	১৭-১-১৮৮৭-২৩-১-১৮৮৭	মাল্ট্রাস	
এন্স. আর. কোর্বস্।	২৪-১-১৮৮৭-৩১-৩-১৮৮১		
সি. এ. এন্স. বেডফোর্ড।	১-৪-১৮৮১-১৭-৪-১৮৮১	সি. ওয়েন,	১৮৮৭
সি. এন্স. মারে সি. আই. ই.	১৮-৪-১৮৮১-১৪-১১-১৮৮১	এ. ডব্. লিউ,	
		কোজারেট	১৮৮৭-৮৮
<b>এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারগণ</b>			
সি. এন্স. মারে, সি. আই. ই.	১৬-১১-১৮৮১-২৫-১২-১৮৮১		
এক্. সি. ডেলি।	২৬-১২-১৮৮১-১২-১-১৮৮২		
সি. এন্স. মারে সি. আই. ই.	১৩-১-১৮৮২-৩০-৬-১৮৮৩	এইচ. এইচ. হার্ড	১৮৮৭-৮৮
জে. এ. কেইড্. ব্রাউন।	১-৭-১৮৮২-৭-১১-১৮৮৩		
সি. এন্স. মারে সি. আই. ই.	৮-১১-১৮৮৩-১৪-৬-১৮৮৪		
আর্. এইচ. মেইড্. হাচিসন	১৫-৬-১৮৮৪-১৫-১২-১৮৮৪	সি. এক্. মেলন	১৮৮২
সি. এন্স. মারে সি. আই. ই.	১৬-১২-১৮৮৪-২০-৩-১৮৮৬		
জে. এ. কেইড্. ব্রাউন।	২১-৩-১৮৮৬-১২-৪-১৮৮৭		
ডব্. লিউ. এন্স. ডেলিভিন।	২০-৪-১৮৮৭-১-৩-১৮৮৮		
এক্. সি. ডিল্লস্।	১০-৮-১৮৮৭-৩১-৮-৮৮৭		
জে. এ. কেইড্. ব্রাউন।	২-৩-১৮৮৮-১-৫-১৮৮০	জে. টি. জার্বো	১-৪-১৮৮১- ১৫-২-১৮৮৩ ২১-৩-৮৮- ৩১-৮-৮৮ ৩-১১-৮৮- ১-৮-৮৮ ১০-১০-৮৮- ১৮-৫-৮৮ ১৮-৭-৮৮- ৬-৭-৮৮
<b>জুগারিটেণ্টগণ।</b>			
আর্. এইচ. মেইড্. হাচিসন।	১-৫-১৮৮০-১-৮-১৮৮১	আর্. এ. স্টিকেন	৭-৭-৮৮- ২২-৮-৮৮
আর্. এ. স্টিকেন।	২-৮-১৮৮১-২-১০-১৮৮১		
আর্. এইচ. মেইড্. হাচিসন।	১০-১০-১৮৮১-১৮-৫-১৮৮২		
আর্. এ. স্টিকেন।	১৮-৫-১৮৮২-১৭-৭-১৮৮২	ওয়ার্ড. জোন	
আর্. এইচ. মেইড্. হাচিসন।	১৮-৭-১৮৮২-১৮-৬-১৮৮৪		
আর্. কব্. ডন রাস্।	১৮-৬-১৮৮৪-১৭-১১-১৮৮৪	এইচ. এন্স. ফেল	৩০-৮-৮৮- ২৩-৮-৮৮
আর্. এইচ. মেইড্. হাচিসন।	১৮-১১-১৮৮৪-১৬-২-১৮৮৬	আর্. এ. স্টিকেন	১৫-৮-৮৮- ১৬-২-৮৮ ২২-৮-৮৮- ১২-১১-৮৮
আর্. এ. স্টিকেন	১৭-২-১৮৮৬-২১-২-১৮৮৬		
আর্. এইচ. মেইড্. হাচিসন।	২২-২-১৮৮৬-১৬-৮-১৮৮৮	এইচ. এন্স. ফেল	১২-১০-১৮৮৬-
এইচ. এন্স. ফেল।	২৪-৮-১৮৮৮-১১-১০-১৮৮৮		
আর্. এইচ. মেইড্. হাচিসন।	১২-১০-১৮৮৮-		

## মধ্যভাগ ।

সকৌশিল গভর্ণর বে

দিয় কর্তৃক বিধিবদ্ধ ।

পার্কৃত্য চট্টগ্রামের ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বিধান ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

( উপক্রম । )

১ ।

(১) এই বিধান পার্কৃত্য চট্টগ্রামের ১৯০০ সালের বিধান নামে অভিহিত হইতে পারে । (২) ইহা পার্কৃত্য চট্টগ্রামের সর্বাপেক্ষে চলিবে । এবং (৩) স্থানীয় গভর্ণমেন্টের কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত তারিখ হইতে এই বিধান কার্য্যকরী হইবেক ।

২ ।

(১) এই বিধানে—

(ক) “পার্কৃত্যচট্টগ্রাম” শব্দে এই ধারার দ্বিতীয় অংশানুসারে বিজ্ঞাপিত স্থান-সমূহকে বুঝায় ; এবং (খ) “কমিশনার” শব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার বুঝানো যাইতেছে ।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেন্ট পূর্বে সকৌশিল গভর্ণর জেনেরেলের সম্মতি লইয়া কলিকাতা গেজেটে \* বিজ্ঞাপন দ্বারা পার্কৃত্য চট্টগ্রামের সীমা নির্দেশ করিতে পারেন, এবং ইরূপে উক্ত সীমা পরিবর্তন করিতে পারেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

( আইন । )

৩ ।

এই বিধানের অধীন থাকিরা অষ্টাদশ ধারার ব্যবস্থানুসারে যে সময়ে যে নিয়ম প্রচলিত হইবে, সেই নত পার্কৃত্য চট্টগ্রামের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে ।

৪ ।

(১) সিডিউলে † আইনসমূহের বেপর্য়াস্ত নির্ধারণ ও পরিবর্তন করা হইয়াছে, তৎসমুদায় এই বিধানের বাধা না জন্মাইলে পার্কৃত্য চট্টগ্রামে চলিতে পারিবেক ।

---

\* ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ইহাও বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া “পূর্ববঙ্গ আসাম” প্রদেশগঠনে স্বতন্ত্র লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণরের অধীনে যাওয়ার, এক্ষণে এতৎসংক্রীয় বাবতীয় তহাদি উক্ত “কলিকাতা গেজেটের” পরিবর্তে স্থানীয় ( পূর্ববঙ্গ ও আসামের ) “গভর্ণমেন্ট গেজেটে” প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

† সিডিউল বধা :—গভর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের ১৮৪৩ সালের ভারতের দাসত্ববিষয়ক আইন ( The Indian Slavery Act, 1843 ), ১৮৫০ সালের জিচারকদের রক্ষা বিষয়ক আইন ( The Judicial officer's Protection Act, 1850 ), ঐ সালের রাজকীয় বন্দী-বিষয়ক আইন ( The State Prisoners Act, 1850 ), ১৮৫৭ সালের রাজকীয় অভিযোগ সম্বন্ধীয় আইন ( The State offences Act, 1857 ), ১৮৫৮ সালের রাজকীয় বন্দী-বিষয়ক

(২) যদিও হানার গভর্ণমেন্ট পূর্বে সেক্সিল গভর্ণর জেনেরেলের সম্মতি লইয়া “কলিকাতা গেজেটে” বিজ্ঞাপনী দ্বারা ঘোষণা করেন যে,

(ক) অপর কোন আইন সম্পূর্ণরূপে, বা আংশিকভাবে কিংবা কোনরূপ পরিবর্তিত হইয়া (যাহা বিজ্ঞাপনীতে বর্ণিত হইতে পারে), এই পার্কতা প্রদেশে চলিবে; অথবা (খ) সিডিউলে বিবৃত যে কোন আইন বা এই ধারার ‘ক’ অংশানুসারে বিজ্ঞাপনী দ্বারা প্রবৃত্ত হইতে ঘোষিত আইন এই পার্কতা প্রদেশে চলিবে না।

এতদ্বিধা এবাবৎ কিংবা অতঃপর বিধিবদ্ধ অপর কোন আইন পার্কতা চট্টগ্রামে প্রযুক্ত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(কয়েক অফিসের নিয়োগ ও ক্ষমতা।)

৫।

হানার গভর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপনী দ্বারা,—

(ক) যে কোন ব্যক্তিকে পার্কতা চট্টগ্রামের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করিতে পারেন; এবং তৎকালিক প্রদেশে শাসন কার্যের সাহায্যের নিমিত্ত যে করজন উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তত সংখ্যক এসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং অপর কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারেন।

৬।

হানার গভর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপনী দ্বারা এই বিধানের অন্তর্গত কিংবা ভবিষ্যতে প্রবর্তিত ব্যবস্থাদীন সুপারিন্টেন্ডেন্টের যাবতীয় বা কোন ক্ষমতা যে কোন এসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টকে অর্পণ এবং তদীয় এলাকাধীন হানার সীমা নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন।

৭।

কৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারোদ্যে এবং রাজস্ব ও সর্বসাধারণের সুবিধার্থে পার্কতা চট্টগ্রাম জিলা গঠিত হইবে; সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইবেন; এবং ৬ষ্ঠ ধারানুসারে হানার গভর্ণমেন্ট যে আদেশ করেন তদধীনে উক্ত পার্কতা প্রদেশ সমুহের দেওয়ানী, কৌজদারী, ও রাজস্ব অপরাপর কার্যসমূহের পরিচালন ক্ষমতা সুপারিন্টেন্ডেন্টের হস্তে অর্পিত হইবে।

আইন, ভারতীয় দণ্ডবিধি (The Indian Penal Code), ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৮৬৪ সালের কশাঘাত আইন, (The Whipping Act, 1864) ইহার ষষ্ঠ ধারা পরিবর্তিত হইয়া হইবে—উপরোক্ত ধারায় যে যাহা কিছু থাকি সত্ত্বেও কোন অপরাধীকে যে কোন শাস্তির পরিবর্তে বা সঙ্গে কশাঘাত দ্বারা দণ্ড দেওয়া যাইবে, ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্যবিষয়ক আইন (The Indian Evidence Act, 1872), ১৮৭৭ সালের ভারতীয় তহাবী আইন (The Indian Limitation Act, 1877), ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বন-বিষয়ক আইন (The Indian Forest Act 1878), ১৮৭৯ সালের হস্তিরক্ষণ আইন (The Elephants' Preservation Act, 1879), The General clauses Act 1897, ১৮৯৮ সালের কৌজদারী কার্যবিধি (The code of Criminal Procedure 1898) কিন্তু ১৮শ ধারানুসারে প্রবর্তিত নিয়মাবলী দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার চিহ্ন, দেওয়ান বা হেডম্যান কর্তৃক যে সকল মোকদ্দমা সীমাসিদ্ধ হয়, তাহাতে এই আইনের কোন অংশ খাটিবে না, ১৮৯৮ সালের ভারতীয় পোস্ট অফিস আইন; বঙ্গের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বাহাদুরের ১৮৯৯ সালের পুলিশবিধান, The Bengal General clauses Act, 1899; এবং বঙ্গীয় আদালতের ১৮১৮ সালের বঙ্গের রাজকীয় বন্দী-সদ্বকীয় বিধানাবলী (The Bengal State Prisoners Regulation, 1818) প্রভৃতি আইনসমূহের বতটুকু পর্যন্ত সময়ে সময়ে চট্টগ্রাম জেলার প্রবর্তিত হয়। তদ্বিধা ১৮৮১ সালের পার্কতা চট্টগ্রামের সীমান্ত পুলিশ বিধান (The Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulations, 1881) ইহার “ডেপুটি কমিশনার” হলে “সুপারিন্টেন্ডেন্ট” লفظ বসিবে।

৮।

(১) পার্কভা চট্টগ্রামে এক সেসন বিচার-পঠিত হইবে, এবং কমিশনার সেসন জন্ম হইবেন। (২) সেসন জন্ম স্বরূপে কমিশনার, যে কোন অপরাধের বিচার, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তৎসমীপে বিচারার্থ প্রেরিত বা হইলেও প্রাথমিক বিচারালয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেন, এবং তাদৃশ বিচার গ্রহণ কালে তিনি ১৮৮৮ সালের কৌজদারী কার্যবিধির নির্ধারিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক "ওয়ারেন্ট কেসের" বিচারের নীতি অনুসরণ করিবেন।

৯।

স্থানীয় গভর্ণমেন্ট ১৮৮৮ সালের কৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে প্রাপদগত অবশেষ সম্বন্ধ করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা পরিচালন করিবেন; এবং কমিশনার কথিত বিধানের অবশিষ্ট ব্যবস্থাসমূহে হাইকোর্টের ক্ষমতা চালাইবেন।

১০।

হুপারিটেণ্ডেন্ট পার্কভা চট্টগ্রামের যে কোন কর্মচারী বা আদালত সম্মুখে উপস্থাপিত কৌজদারী বা দেওয়ানী যে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন, এবং তাহা হস্ত নিজেই বিচার করিতে অথবা অপর কোন কর্মচারী কি আদালতের নিকট বিচারের জন্য দিতে পারেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(অস্ত্র, বাকদাদি, গাঁজা ও মদ্যের প্রভৃতি।)

১১।

(১) হুপারিটেণ্ডেন্ট আগেরাজের সংখ্যা এবং যে কোন গ্রামের অধিবাসীদিগের অধিকারে যে পরিমাণ ও যে রকমের বাকদাদি থাকিতে পারে, তাহা নির্ধারিত করিয়া দিতে পারেন; এবং যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন, সেই সকল অধিবাসীদিগকে একত্রিতরূপে বা তাহাদের যে কেহকে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত আগেরাজ বা বাকদাদি অধিকারে রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। (২) এই ধারার '১' অংশানুসারে যে সকল আগেরাজ রাখিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই চিহ্নিত এবং রেজিস্ট্রারীভুক্ত করা যাইবে। (৩) হুপারিটেণ্ডেন্ট এই ধারার '১' অংশানুসারে প্রদত্ত আগেরাজ ও বাকদাদি অধিকারে রাখিবার যে কোন অনুমতি তুলিয়া লইতে পারেন, এবং তদনুসারে যাবতীয় আগেরাজ ও বাকদাদি হুপারিটেণ্ডেন্ট অথবা তদীয় একজন অধ্যক্ষ কর্মচারীর নিকট প্রদান করিতে হইবে। (৪) হুপারিটেণ্ডেন্ট যে কোন ব্যক্তিকে বাকদাদি প্রদত্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে এবং তাদৃশ অনুমতি উঠাইয়া লইতে পারেন। (৫) যদি কোন ব্যক্তি হুপারিটেণ্ডেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আগেরাজ বা বাকদাদি অধিকারে রাখে অথবা পার্কভা চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী করে, কিংবা বাকদাদি প্রদত্ত করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিককাল পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়প্রকারে দণ্ডিত হইবে। (৬) পূর্বে স্থানীয় গভর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া হুপারিটেণ্ডেন্ট লিখিত হুকুম দ্বারা কোন গ্রামে এই ধারার '১', '২', '৩' ও '৪' অংশ সমূহ বা তাহাদের যে কোনটী প্রযুক্ত হইবে না, আদেশ করিতে পারেন।

১২।

(১) পূর্বে কমিশনারের সম্মতি লইয়া হুপারিটেণ্ডেন্ট লিখিত হুকুমদ্বারা দা, বাক্স, তীরবন্ধ বা এসমূহের যে কোন জন্ম লইয়া বাইতে কোন গ্রামের সমগ্র কিংবা যে কোন অধিবাসীকে বারণ করিতে পারেন, যদি শুধুমাত্র শান্তিরক্ষাকল্পে তাদৃশ নিষেধ বিধান তাহার প্রয়োজনীয় মনে হয়। (২) এই বিধানের '১' অংশানুসারে বিহিত প্রত্যেক আগেরাজ বতকাল ধরিয় বলাবৎ থাকিবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। (৩) কোন ব্যক্তি এই বিধানে '১' অংশানুসারে বিহিত আদেশ অমান্য করিলে ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়প্রকারে দণ্ডিত হইবে।



১৩।

(১) কেই হুপারিটেণ্ডেণ্টের মঞ্জুরীকৃত পাশ (License) ব্যতিরেকে আফিও, গাঁজা, চরস, অথবা এই সমূহের দ্বারা প্রস্তুত কোন দ্রব্য আমদানী, রপ্তানি, উৎপাদন কি বিক্রয় করে, অধিকারে রাখে, অথবা আফিও, গাঁজা বা চরস উৎপাদনের নিমিত্ত কোন গাছের চাষ করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিককাল পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উত্তরপ্রকারে দণ্ডিত হইবে। (২) এই ধারার '১' অংশানুসারে বিহিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি পারিবারিক ব্যবহারের নিমিত্ত হুপারিটেণ্ডেণ্টের প্রদত্ত পাশ ব্যতিরেকেও গাঁচ তোলা পর্যন্ত আফিও, গাঁজা বা চরস অথবা তদ্বারা প্রস্তুত কোন দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

১৪।

(১) কোন ব্যক্তি হুপারিটেণ্ডেণ্টের প্রদত্ত পাশ ব্যতিরেকে কোন বিদেশীয় হুসাসার কিংবা চুয়ানো মদিরা আমদানী কি বিক্রয় করিলে তিনমাসের অনধিককাল পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উত্তরপ্রকারে দণ্ডিত হইবে। (২)—(ক) কোন ব্যক্তি স্বকীয় ব্যবহারার্থে—বিক্রয়ের জন্য নহে, যে কোন বিদেশীয় হুসাসার বা চুয়ানো মদিরা—যাহার শুষ্ক প্রদত্ত হইয়াছে, আমদানী করিলে; অথবা (খ) যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বকীয় ব্যবহারার্থে বখাবিধি কাহারও দ্বারা আনত তাবুদ হুসাসার বা মদিরা তাহার স্থানত্যাগকালে বা মৃত্যুর পর বিক্রয় করে বা তাহার গন্ধে কি তাহার সম্পর্কিত প্রতিনিধির গন্ধে নিলাম করা হয়, তাহা হইলেও—এই ধারার অমলে আসিবে না।

ব্যাখ্যা। এই ধারার উদ্দেশ্যার্থে “বিদেশীয় হুসাসার বা চুয়ানো মদিরা” শব্দে বুঝাইতেছে যে, পার্কচা চট্টগ্রামে প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয় না, এমন কোন হুসাসার বা চুয়ানো মদিরা।

১৫।

কোন ব্যক্তি হুপারিটেণ্ডেণ্টের প্রদত্ত পাশ ব্যতিরেকে পার্কচা চট্টগ্রামে প্রস্তুত ও উৎপাদিত হুসাসার বা চুয়ানো মদিরা রপ্তানি কি বিক্রয় করিলে তিনমাসের অনধিককাল পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উত্তরপ্রকারে দণ্ডিত হইবে।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(বিবিধ।)

১৬।

১৮৮১ সালের পুলিশ আইন এবং ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন (বঙ্গীয় পুলিশ বলের ব্যবস্থাসংশোধক আইন) অনুসারে পার্কচা চট্টগ্রামে এক সাধারণ পুলিশ ডিষ্ট্রিক্টব্লকে বিভাজিত হইবে, এবং কমিশনার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের বাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালন করিবেন।

১৭।

(১) পার্কচা চট্টগ্রামের বাবতীয় কর্তৃত্বাধী হুপারিটেণ্ডেণ্টের অধস্তন-বল্লভে পরিণত হইবেন; কিন্তু তাবুদ যে কোন কর্তৃত্বাধী তথা ৬ষ্ঠ ধারানুসারে হুপারিটেণ্ডেণ্টের কোন ক্ষমতালব্ধ এসিষ্ট্যান্ট হুপারিটেণ্ডেণ্টের যে কোন আদেশ পরিবর্তন করিতে পারেন। (২) কমিশনার পার্কচা চট্টগ্রামের হুপারিটেণ্ডেণ্ট বা অপর কোন কর্তৃত্বাধী কর্তৃক এই বিধানানুসারে বিহিত যে কোন আদেশ পরিবর্তন করিতে পারেন। (৩) এই বিধানানুসারে বিহিত যে কোন আদেশ স্থানীয় গভর্নমেন্ট পরিবর্তন করিতে পারেন।

১৮।

(১) এই বিধানের অধিগ্রহণ ও উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকরী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গভর্নমেন্ট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন। (২) সাধারণ ভাবে উপরিদিগ্নিত ক্ষমতার কোন বাধা না জন্মাইয়া একই নিয়মাবলীদ্বারা বিশেষতঃ—

- (ক) পার্শ্ব চট্টগ্রামে দেওয়ানীবিচার পরিচালন সংক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন ।
- (খ) তথাকথিত প্রদেশের যোক্ত্যমায় আইনব্যবসায়ীদিগের উপস্থিতি নিবারণ বা নিয়মিত করিতে পারেন ।
- (গ) তথাকথিত প্রদেশে দলিলাদি রেজেষ্টারীর ব্যবস্থা করিতে পারেন ।
- (ঘ) তথাকথিত প্রদেশে ভূমির হস্তান্তর করণে বাধাপ্রদান বা তাহা নিয়মিত করিতে পারেন ।
- (ঙ) তথাকথিত প্রদেশকে সার্কেলসমূহে, সেই সকল সার্কেল নানা তালুকে এবং তৎসমূহের তালুক, আবার নানা মৌজায় বিভাগ করিতে পারেন ।
- (চ) চিক্, দেওয়ান ও হেডম্যানগণের বোণে তথাকথিত সার্কেল, তালুক ও মৌজা-সমূহের রাজস্ব নির্ধারণ বা সংগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারেন ।
- (ছ) চিক্, দেওয়ান এবং হেডম্যানগণের ক্ষমতা ও এলেকার সীমা নির্দেশ এবং তাদৃশ এলেকা ও ক্ষমতার পরিচালন নিয়মিত করিতে পারেন ।
- (জ) দেওয়ান ও হেডম্যানের নিযুক্তি ও পদচ্যুতি নিয়মিত করিতে পারেন ।
- (ঝ) চিক্, দেওয়ান, হেডম্যান ও গ্রাম্যকর্তৃচরাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাধারণতঃ ভূমির স্বত্ব বা অপর বাহা উপযুক্ত বিশ্লেষিত হয়, দিতে পারেন ।
- (ঞ) চাষী রায়তগণের এক সার্কেল হইতে সার্কেলান্তরে পলায়নে বাধা, বা তাহা নিয়মিত করিতে পারেন ।
- (ট) সাধারণের উপকারার্থে প্রয়োজনীয় ভূমি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক খাসকরণ নিয়মিত করিতে পারেন ।
- (ঠ) তথাকথিত প্রদেশে টেক্সের টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন ।
- (ড) এই বিধান বা তদনুযায়ী সময়ে সময়ে প্রযুক্তি নিয়মানুসারে কর্মচারীদিগের কার্যবিধি নিয়মিত করিতে পারেন ।
- (৩) এই ধারানুসারে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বিহিত যাবতীয় নিয়মাবলী কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইবে ; এবং তাদৃশী বিজ্ঞাপনী এই বিধানের দ্বারা কার্যকরী হইবে ।

১৯ ।

এই বিধান অথবা তৎকালে প্রচলিত কোন আইন ভিন্ন, এই বিধান বা উপরোক্ত নিয়মানুসারে বিহিত কোন মীমাংসা, কার্য বা আদেশ সম্বন্ধে অত্র কোন দেওয়ানী বা কোজদারী আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না ।

২০ ।

১৮৬০ সালের ২২ আইন (সাধারণ বিধান ও আইনানুসারে স্থাপিত আদালতের এলেকা হইতে চট্টগ্রাম জিলার পূর্ব সামাবর্তী কতিপয় প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করার আইন) ১৮৬৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ( ১৮৬০ সালের ২২ আইনের সংশোধক আইন ), ১৮৭৪ সালের সিভিল ডিক্রীক্টস্ আইনের বিতীয় সিভিলের এবং ১৮৯১ সালের রহিত ও সংশোধিত করার আইনের যে অংশে পূর্বোক্ত যে কোন আইনের কথা উল্লেখ থাকে, তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

উপরিউক্ত বিধানের অষ্টাদশ ধারানুসারে

## লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুর কৃত নিয়মাবলী।

(Dated the 1st May, 1900, Notification No. 123 P. D.)

### দেওয়ানী বিচার পরিচালন।

দেওয়ানী বিচার কার্য অতীত সরল ভাবে ও সহজতার সহিত যোগ্য ও স্তায় সমস্ত রূপে নিশ্চিতি চলিবে।

২।

বিচারক অভিযোগাদি পরিচালন কালে প্রথমত উত্তর পক্ষের মৌখিক জবানবন্দী শুনিয়া তাহাদের মধ্যে প্রকৃত বিচার নিশ্চিতি করিতে চেষ্টা করিবেন। বিচারক সাক্ষ্য বাতিরেকে মোকদ্দমার প্রকৃত বিষয়ের উপর মীমাংসা করিতে অনস্বর্থ না হইলে, সাক্ষী আহ্বান করা হইবে না।

৩।

নথিতে নিম্নোক্ত বিষয়গণ থাকিবে, যথা—অভিযোগকারীর নাম, অভিযোক্তার নাম, মোকদ্দমার দাবি ও অস্ত্র বিষয়ের প্রকৃতি, অভিযোগকারীর বর্ণনার সারাংশ, অভিযোক্তার বর্ণনার সারাংশ, (যেখানে সাক্ষ্য গৃহীত হয়) সাক্ষীর জবানবন্দীর সারাংশ, বিচার নিশ্চিতির যুক্তি এবং তারিখ ও দস্তখত যুক্ত হকুম।

৪।

কোন বিষয় বা অভিযোগে কোর্ট ফিল্‌ গৃহীত হইবে না।

৫।

পরওয়ারা জারীর রজিরা—অধিকতম নিকটবর্তী থানা হইতে যাতায়াতে ষত দিন প্রয়োজন হয়, এতদিনের দৈনিক ছয় আনা হিসাবে গৃহীত হইবে।

৬।

পরওয়ারা বা ডিক্রি জারী করিতে রাজকর্মচারিগণ যতদূর সম্ভব দেওয়ানী কার্যাবিধি অনুসারে চলিবেন। অপর জিলার আদালত হইতে প্রাপ্ত সমন বা ডিক্রি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী পরিলক্ষিত হইবে;—(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের বাহিরের দেওয়ানী আদালত সমূহ হইতে জারী করিবার নিমিত্ত পরওয়ারা বা ডিক্রি—

(ক) পরওয়ারা সম্বন্ধে মোকদ্দমার অবস্থা এবং পাঠাইবার কারণ, আর ডিক্রি সম্বন্ধে রায়ের এক খণ্ড নকল—ইংরাজিতে বিবৃত করিয়া এবং

(খ) হাইকোর্টের নির্দ্ধারিত ফিল্‌ সহ আসিলে, হুপারিটেণ্ডেন্ট সেই পরওয়ারা বা ডিক্রি জারী করাইবেন। (২) যদি কোন কার্য নৌকাভাড়া বা রসদ বহন কি তাবুশ কোন কারণে প্রাপ্ত ফিল্‌ হইতে জারীখরচ বেশী লাগিবে বোধ হয়, তাহা হইলে হুপারিটেণ্ডেন্ট সেই জারী হুসিত রাখিবেন; এবং তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালতে ব্যয়ের বিবরণ ও আবশ্যকীয় খরচের টাংকা পাঠাইবার অনুরোধ জানাইবেন। (৩) যদি কোন কারণে হুপারিটেণ্ডেন্ট পরওয়ারা বা ডিক্রি জারী করা যায় না বোধ করেন, তখন তিনি তরুণ মনে করিবার কারণ লিখিয়া অবিলম্বে তাহা তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দিবেন, এবং পরওয়ারা বা ডিক্রি বা তৎফিল্‌ হুড়াঙত আবেদন পর্দান্ত করা থাকিবে। (৪) এই '২' ও '৩' অংশের কোনটী সম্বন্ধে তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালত হুপারিটেণ্ডেন্টের আদেশ বরাবর চট্টগ্রামের কমিশনার সমীপে পাঠাইতে পারেন; এবং কমিশনার তাহার উপর হুকুম দিবেন, ও তাহা বরাবর তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালতে জানাইবেন। যদি কোন দেওয়ানী আদালত কমিশনারের হুকুমের উপরও কিছু করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহা গভর্নমেন্টের আদেশের নিমিত্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজের নামে পাঠাইবেন। (৫) হুপারিটেণ্ডেন্ট,

যাহার উপর পরওয়ানা বা ডিক্রি জারী করিতে হইবে। তাহার মধ্যমা ও অবস্থানসম্বন্ধে, তাহার নাজীর বা সার্কেল চিক কিংবা রেজেষ্টারীভুক্ত হেড্‌ম্যানদিগকে দিয়া এই সকল নিয়মে উল্লিখিত পরওয়ানা বা ডিক্রি জারী করাইবেন। মনন বা ডিক্রি জারীর নিমিত্ত নিকটস্থ এজেন্টদের নিকটে মোহরবৃত্ত আদেশ পাঠান ভিন্ন এই সব জারিতে পুলিশ নিয়োজিত নাও হইতে পারে। (৬) সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রত্যেক পরওয়ানা জারিতে তৎসম্পর্কিত দেওয়ানী আদালতে সংবাদ দিবেন এবং ডিক্রি পরিচালনা সম্বন্ধে—যতদিন পর্যন্ত তাহা নিষ্পত্তি না হয় সেই আদালতের সহিত পত্রাদি চালাইবেন।

৭।

কোন কারণে শতকরা বার্ষিক ১২ বার টাকার অধিক হ্রদ আদালতে ডিক্রি দেওয়া হইবে না।

৮।

যে সকল দলিল নিম্নোক্ত রেজেষ্টারী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অনুসারে রেজেষ্টারী প্রয়োজন, তৎসমুদয় সেইভাবে রেজেষ্টারী না হইলে কোন মোকদ্দমার গ্রাহ্য হইবে না।

৯।

যে আদানপ্রদানের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহা যদি খত দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাশ পতের রেজেষ্টারী অপরিসীম হইলে, তবে কেবল সেইরূপ রেজেষ্টারী যুক্ত পতেরই মোকদ্দমা গ্রহীত হইবে।

১০।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বাবতীর আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার স্তরীণে আপিল হইতে পারিবে। তিনি এরূপ আপিলের খরচ কাহাকে দিতে হইবে—সীমানা করিতে পারেন।

( আইন ব্যবসায়ী এবং কার্যকারক Agent )।

১১।

কোনও কার্যে আইন ব্যবসায়ীর উপস্থিতি অনুমোদিত হইবে না এবং বাবতীর বিষয়েই যেখানে চিক্‌গণ স্বয়ং সম্বন্ধযুক্ত, তাহার যথাসম্ভব নিজেরাই কাজ চালাইবেন মাত্র। যখন চিক্‌দের স্বয়ং উপস্থিতি অসম্ভব হয়, সেই সময়ে কার্যকারক গ্রাহ্য হইবেক। কিন্তু এই সকল কার্যকারক নিশ্চিতই আইন ব্যবসায়ী হইবে না।

দলিলাদির রেজেষ্টারী।

১২।

পার্শ্ব চট্টগ্রামে অবস্থিত ভূমি সম্পর্কীয় বা তথ্য সম্পাদ্য কার্য সম্বন্ধীয় নিম্নোক্ত শ্রেণীর দলিলাদি রেজেষ্টারী হইবে ;—

ক।—স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি, দান, বিভাগ, বা বন্ধক বিষয়ক দলিল। খ।—এক বৎসরের অধিককালের জন্য স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা। গ।—খত, কোম্পানির কাগজ এবং টাকা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা পত্র। ঘ।—উৎপন্ন শুল্কাদি অন্ত কোন দ্রব্য বা যে কোন কার্য সম্পাদনা করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার বা চুক্তিপত্র। ঙ।—উইল, এবং পোষা গ্রহণের ক্ষমতা পত্র। চ।—বন্ধকের মুক্তিনামা। ছ।—কোন সম্পত্তি বা জমিদারীর কার্যাব্যাহক নিয়োগ সনদ।

১৩।

উপরিলিখিত দলিল ভিন্ন অপর দলিলাদি রেজেষ্টারী না করিলেও চলে। এবং রেজেষ্টারী না করার দক্ষণ তাহা আদালতে প্রগ্রাহ্য হইবে না।

১৪।

আইন বিরুদ্ধ, নীতি বিপর্যিত, সাধারণ উদ্দেশ্যের বিপরীত অথবা স্পষ্টতঃ অসম্ভব কোন প্রতিজ্ঞা পত্র রেজেষ্টারী করা হইবে না।

১৫।

যদি রেজেষ্টারকারী কর্তৃকারীর অধোধ্য এবং ঐ জেলার সচরাচর অচলিত ভাষার কোন দলিল রেজেষ্টারীর নিমিত্ত রীতিমত উপস্থিত করা হয়, তৎসঙ্গে সচরাচর অচলিত ভাষার এক বখাবথ অনুবাদ এবং তাহার এক বখাবথ নকলও না দিলে তিনি তাদৃশ দলিল রেজেষ্টারি করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৬।

কোন দলিলে দাগ, পংক্তিধরের মধ্যে ভ্রমসংশোধক লেখা, খালি, টাচিরা তোলা বা পরিবর্তন লেখা গেলে, যদি তাদৃশ দাগ, পংক্তিধরের মধ্যে ভ্রম সংশোধক; লেখা খালি টাচিরা তোলা বা পরিবর্তনে দলিলের সাক্ষা সম্পাদক ব্যক্তির দস্তখত বা সংক্ষিপ্ত সই না থাকে, তবে তাহা রেজেষ্টারির গ্রন্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। এবং রেজেষ্টারীর সময় তাদৃশ পংক্তিধর বখাবথ সংশোধক লেখা, খালি, টাচন বা পরিবর্তনের কথা তিনি নোট করিবেন।

১৭।

হাথর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন দলিলে তাদৃশ সম্পত্তি পরিচিহ্ন করিবার পর্যাপ্ত বর্ণনা না থাকিলে, রেজেষ্টারীর নিমিত্ত পরিগৃহীত হইবে না।

১৮

উইল অথবা পোষা গ্রহণের ক্ষমতা-পত্র ব্যতীত কোন দলিল সম্পাদিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে রেজেষ্টারীর নিমিত্ত উপযুক্ত কর্তৃকারী সমীপে উপস্থাপিত না হইলে, যদি তিন মাসের মধ্যে রেজেষ্টারী না করার উপযুক্ত এবং উক্ত কর্তৃকারীর সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শিত না হয়, তবে তাহা রেজেষ্টারীর গ্রন্থ গৃহীত হইবে না। শেখোঙ্ক স্থলে চারিমাসের মধ্যে হইলে সাধারণ ফিসের চতুর্গুণ লইয়া তবে রেজেষ্টারী করা যাইতে পারিবে।

১৯।

উইল বা পোষা গ্রহণের ক্ষমতা-পত্র যে কোন সময়ে রেজেষ্টারী হইতে পারে।

২০।

রেজেষ্টারকারী কর্তৃকারীর কার্যাপারিটেণ্ডেট দ্বারা বা স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক উক্ত কার্যের গ্রন্থ নিযুক্ত কর্তৃকারী দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

২১।

রেজেষ্টারীর নিমিত্ত আনীত প্রত্যেক দলিলই তাহার দাবিদার বা নির্বাহক কর্তৃক উপস্থাপিত হইবে, কিন্তু নির্বাহক বা তাহার প্রতিনিধি কি ভরপারিত ব্যক্তি অথবা (২২শ নিয়মামুসারে অনুমোদিত) কার্যকারক রেজেষ্টারকারী কর্তৃকারীর সমুখে উপস্থিত বা তৎ সম্পাদন স্বীকার না করিলে কোন দলিল রেজেষ্টারী করা হইবে না। যখন রেজেষ্টারকারী কর্তৃকারী কর্তৃক আহৃত কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইতে অস্বীকার করে বা শপথ গ্রহণ করিতে কি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদানে কিংবা তাহার বর্ণনার দস্তখত করিতে অস্বীকার করে, অথবা রেজেষ্টারকারী কর্তৃকারী সমীপে কোন মিথ্যা বর্ণনা করে, তাহা হইলে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

২২।

সাধারণ নিয়মে—(১) পার্বত্য চিৎ ও সম্ভ্রান্ত দেশীয় ব্যক্তি, (২) ইউরোপীয় ভ্রমলোক এবং (৩) পর্দানবীন স্ত্রীলোকের পক্ষে মাত্র রেজেষ্টারীর কার্য চালাইতে কার্যকারক অনুমোদিত হইবে। কেবল সম্ভ্রান্ত অথবা বটনার দ্বিতীয় বরং পরিচিত কার্যকারকগণকেই রেজেষ্টারীর কার্য চালাইতে অনুমতি দেওয়া হইবে।



৩০।

রেজেষ্টারী স্বাক্ষর যে কোন আবৃত্তকার এবং অন্য খরচ আদায়ীকৃত কিন্তু হইতে দেওয়া হইবে। আর উক্ত বাহা কিছু উল্লেখ প্রয়োজন না হইলে, গভর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে বৈলম্ব আদেশ করেন, তদনুসারে ব্যবহৃত হইবে। রেজেষ্টারকারী কর্মচারী রসিদ ও খরচের এক পাকা হিসাব রক্ষা করিবেন; এবং ত্রৈমাসিক এক একবার তাহা কমিশনার সম্মুখে যজ্ঞী ও পুনঃ দত্তপত্রের লক্ষ উপস্থিত করিবেন।

৩১।

১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষের রেজেষ্টারী বিধায়ক আইনে “পাট্টা”, “স্বাবর সম্পত্তি”, এবং “স্বাবর সম্পত্তি”র সংজ্ঞা বেরূপ আছে, তাহা এই সকল নিয়মে এবং এই সকল নিয়মানুসারে রেজেষ্টারী কৃত দলিলাদিতে প্রযুক্ত হইবে।

৩২।

যতদূর সম্ভব পাওয়া যায়, রেজেষ্টারী, বহি কমিশনার কর্তৃক পরিবর্তিত এবং পুনঃ দত্তপত্র করা হইবে।

৩৩।

সম্পাদিত দলিলের কোন পক্ষ তাহা অস্বীকার করিবার হেতুতে রেজেষ্টারী অগ্রাহ্য হইবে, অগ্রাহ্য হওয়ার তারিখ হইতে তিনমাসের মধ্যে কোন পক্ষ তাহা রেজেষ্টারী করািবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে। এরূপ মোকদ্দমায় রেজেষ্টারকারী কর্মচারী কোন পক্ষভুক্ত হইবেন না; তদীয় অগ্রাহ্য আদেশের উপবৃত্তরূপে সহিযুক্ত একখণ্ড নকল, তাহাতে দলিল রেজেষ্টারী বা হওয়ার যে কারণ লিখিত আছে, সেই কারণের স্পষ্ট (prima facie) প্রমাণ বরূপ গৃহীত হইবে। এই সকল নিয়মে বাহাই থাকুক না কেন, যে দলিল লইয়া মোকদ্দমা রত্ব হইয়াছে, তাহা এই মোকদ্দমার সাক্ষ্য বরূপ গৃহীত হইবে।

ভূমি।

— ৩৪ — হস্তান্তর বিভাগ বা ইজারাদি প্রদান।

৩৪।

চাষের লক্ষ গভর্ণমেন্ট হইতে পাট্টার আশু ভূমি যে কোন নিয়মে প্রদত্ত হউক তাহা এই করারে প্রদত্ত হইবে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর ভিন্ন অথবা কমিশনারের সম্মতি ব্যতি-  
ক্কেক অন্ত কোনরূপে হস্তান্তর করা বা ইজারাদি দেওয়া বাইতে পারিবে না। কমিশনারের সম্মতি ছিন্ন কোন বিভাগ করা বাইবে না। গাঁড়া, আবেগাখা নাবা-কর, জমজমিত কলুপছিত বা তদ্রূপ প্রয়োজন বশতঃ কোন কিছু কালের নিমিত্ত অন্তকে তদীয় ভূমি দিলে তাহা ইজারাদি বলিয়া গণ্য হইবে না; কিন্তু তেমন হলে কোন রায়ত তাহার প্রতিনিধি বা প্রচ্ছিত ব্যক্তির (trustee) নিকট হইতে স্বকীয় দের রাজস্বের অধিক আদায় করিতে পারিবে না।

সার্কেল বিভাগ।

৩৫।

পার্কভা চটগ্রামে নিম্নলিখিত সার্কেলগুলি আছে। ইহাদের সীমা সর্বাবদিত, এবং উল্লেখ কোন গোলাযোগ বাই—

- (১) গভর্ণমেন্ট সংরক্ষিত বন্যপ্রাণ (Govt. forest reserve) সমূহ;
- (২) “সম্মত-ভিত্তিসানের খাস মহাল রূপে পরিচিত প্রদেশসহ বোমাং সার্কেল,
- (৩) “সম্মত-ভিত্তিসানের খাসমহলে” “ “ “ চাক্ষুশাভিকের।
- (৪) অন্তর্ভুক্ত সার্কেল।

## তালুক বিভাগ।

৩৬।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার নিমিত্ত ১৮৯০ অব্দে যে ১০ খণ্ড করিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মনুজ হারিবিভাগসমূহই পরিগণিত হইয়াছে এবং তাহা তালুক বলিয়া কথিত হয়। সে সকল তিন সার্কেলে নিম্নোক্তরূপে আছে;—

বোম্বাং সার্কেলে—১৮ খণ্ড, চাকমাটিকের সার্কেলে—২ খণ্ড, বাং টিকের সার্কেলে—৩ খণ্ড।

## মৌজা।

৩৭।

তালুকগুলি নানা মৌজার বিভক্ত হইয়াছে। সাধারণ এক মৌজার পাহাড়, জঙ্গল ও পতিত জমিসহ অনুন দেড়বর্গ মাইল হইতে অধিক ২০ বর্গ মাইল পর্যন্ত জমি থাকিবে। যেখানে চাষ আছে তথায় মৌজা গঠিত হইবে, এবং তাহার বহিঃ প্রান্তবর্তী সীমা মানচিত্রে দৃশ্য হইবে। আর যেখানে স্থায়ী গ্রাম আছে, চাষ না থাকিলেও তথায় মৌজা সংগঠিত হইবেক। অপরায়ণ মৌজাসমূহ অবস্থানসারে গঠিত হইবে, এবং নির্দিষ্ট না হইত্তর পর্যন্ত তৎসমূহ অণ্ডিকাইড (undivided) অর্থাৎ অনির্দিষ্ট মৌজা স্বরূপে পরিচিত হইবে।

## সার্কেল ও মৌজার শাসন।

৩৮।

চাকমাটিক, বোম্বাং ও মণ্ডিক—চিকব্রের উপর তত্ত্ব সার্কেলের শাসনভার অর্পিত। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃকারী ও তদীয় পরিবার বাজারের বেপারী ও দোকানদারগণ, সংগ্রহ ও পণ্য বিক্রয় পাট্রী এইভাগে ব্যতীত সার্কেল মধ্যে বাস বা চাকরী প্রত্যেক ব্যক্তিই এলাকাধীন চিকের প্রজা। বর্তমান হেডম্যানগণের উপর মৌজা শাসনের ভার রহিয়াছে। আর যেখানে প্রয়োজন হয়, সুপারিন্টেন্ডেন্ট চিক্ ও মৌজাবাদীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া হেডম্যান নিযুক্ত করিবেন। প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত মৌজা মধ্যে বাস বা চাকরী ব্যক্তিগণই হইবে। হেডম্যানের কর্তৃত্বাধীন হইবে।

## খাজনা আদায়।

৩৯।

প্রত্যেক মৌজার খাজনা হেডম্যানের নিকট দিতে হইবে। মৌজা মধ্যে অধিবাসী কিংবা চাষী প্রত্যেক গৃহস্থই হেডম্যানকে কর দিতে বাধ্য, এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট ব্যতীত তাহাদিগের ব্যক্তিগত মুক্তি পাওয়া যাইবে না। হেডম্যানগণ চিক্ করণে সক্ষম এবং পরিচালনাধীনে কর আদায় করিবেন। চিক্ এবং হেডম্যান কর্তৃক যে সকল ক্রম সংস্থাপন করেন, যথাক্রমে তদনুযায়ী সংগৃহীত খাজনার উপর কনিশন পাইবেন।

## চিক্ এবং হেডম্যানদিগের শাসন ক্ষমতা।

৪০।

চিক্ করণ অর্থাৎ, কতিপয় আদায়, এবং করণ করিবার ক্ষমতার সহিত এই ক্ষমতা শের ভাগে বর্ণিত অভিযোগগুলি ছাড়া তাহাদের সার্কেলের বাবদীয় ঘটনা এবং তদনুযায়ী হেডম্যানদিগের কৃত কার্যের বিচার নির্বাহ করিবেন। সেইরূপ হেডম্যান ২৫, টাকা পর্যন্ত অধিক কতিপয় আদায় এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের আদেশ প্রাপ্ত পর্যন্ত আটক রাখিবার ক্ষমতার সহিত মৌজার আভ্যন্তরীণ কার্য চালাইবেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই সকল ক্ষমতা পরিচালনার উপর পুনর্বিচার করিতে পারিবেন। তিনি পুলিশ হইতে অভিযোগ সংবর্তনের সংবাদ লইতে থাকিবেন। উপরি উল্লেখসূত্রে (চিক্দিগের) ক্ষমতা ব্যতিরিক্ত অভিযোগ—



(১) পতর্নমেট, পতর্নমেট কর্মচারী এবং পতর্নমেট কর্তৃক নিষ্পন্ন বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ। (২) সাংঘাতিক আঘাত সংঘটিত বা প্রাণ নাশক অন্তর্ভুক্ত দাঙ্গার অভিযোগ। (৩) কাহার বিরুদ্ধে খুন, অপরাধবৃত্ত নরহত্যা, ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর আঘাত, বে-আইনি আটক, বলাৎকার \* মাদ্রাস ভুলাইয়া নেওয়া, মাদ্রাস চুরি, \* এবং অনৈসর্গিক দোষের অভিযোগ। (৪) বলপূর্বক গ্রহণ, বলাৎকার, ডাকাইতি মনসিকার প্রবেশ অথবা ঘরে শিং দিয়া ৫০০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি লইয়া গেলে। (৫) জালিয়াতি। (৬) পার্কভা চট্টগ্রামের ১২০০ খুন্সীর বিধানের ৪র্থ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত দোষসমূহ। (৭) এই সবকিছু কমিশনার বাহা বিশেষ রূপে বিচারিত করেন, তত্ত্ব অভিযোগ বা অভিযোগ সমূহ।

### খাজানা।

৪১।

কর চতুর্বিধ, যথা;—

(১) প্রচলিত জুমকর ও বেগার; (২) চাষের খাজানা; (৩) কৃষি বাতীত অশ্রু (দোকানাদি) উদ্দেশ্যে যে ভূমি রাখা হয়, তাহার খাজানা; (৪) ছল এবং গর্জন খোলার খাজানা।

### জুমকর ও বেগার।

৪২।

(ক) বাহারী দেশরীতিমতে জুমকর দিতে বাধ্য এমন প্রত্যেক জুমিয়া যে চিকের সার্কলে সে বাস করে, তাহার নিকট পতর্নমেটের লজ্জ জুমকর প্রদান করিবে। বাহার মৌজামধ্যে সে বাস করে, সেই হেডম্যানকর্তৃক তাহা সংগৃহীত হইবে। যদি কোন জুমিয়া যেখানে সে বাস করে তাহা হইতে ভিন্ন সার্কলে বা মৌজার জুমকর, তাহা হইলে তাহাকে বিভিন্ন সার্কলে হুসে—নিজ সার্কলে চিক্কে বাহা দিতে হয়, তন্নিম্ন যে সার্কলে জুম করিয়াছে তাহারও পূর্ণ জুমকর দিতে হইবে; এবং একই সার্কলের অন্তর্গত বিভিন্ন মৌজাহুসে—নিজ মৌজার হেডম্যানকে বাহা দিতে হয়, তন্নিম্ন যে মৌজার জুম করিয়াছে, তাহার জুমকরের অর্ধেক দিতে হইবে। জুম করিয়া চাষও করিলে তৎকর্ত্ত জুমকর হইতে মুক্তি পাইবে না। (খ) জুমরেলেটারিতে প্রত্যেক মৌজার জুম ও জুমকর পৃথগ্ভাবে দেখাইতে হইবে।

### চাষের খাজানা।

৪৩।

যে কোন উপযুক্ত লোক চাষ করিতে চাহিলে পতর্নমেটের গেজেটের কর্মচারী, চিক্ ও হেডম্যান তাহাকে সর্ব নির্দেশ করিয়া তৎকর্ত্ত আবশ্যকীয় কমতা দিতে পারেন। চাষের খাজানা চিকের পরিচালন এবং পরিদর্শনাধীনে হেডম্যানকর্তৃক সংগৃহীত হইয়া অবস্থানবিশেষে বেগর হুবিধা হয়, একেবারে সরকারী কর্মচারীর নিকট বা চিকের হাত দিয়া প্রদান করিতে হইবে। হেডম্যান যে কোন উপযুক্ত রায়তকে, তাহার কমতার বৃত্ত অধিক ভূমি আবাদ হইতে পারে, সেই পরিমাণ ভূমির ভারপণ করিতে পারেন। প্রথম তিন বৎসরের লজ্জ ইলা কর হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে। অতঃপর হুপারিটেওট কর্তৃক কর নির্ধারিত হইবে, এবং একবার যে হার নির্দিষ্ট হয়, তৎ বৎসরের মধ্যে তাহা পরিবর্তিত হইবে না। হেডম্যান

\* পাহাড়ীদের মধ্যে যে সকল বলাৎকার, মাদ্রাস ভুলাইয়া নেওয়া, এবং মাদ্রাস চুরি প্রভৃতি দণ্ড, তৎসমূহের বিচারভারও চিকের হাতে আছে। তাহারাই এইরূপ জাতীয় সম্পত্তি আরও কোন কোন অভিযোগের মীমাংসা করিতে পারেন।

তাহার মৌজাহ্ যাবতীয় চাষের জমির এক জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন, তাহা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক পরিশোধিত হইলে দাবির মূল কাগজ বলিয়া গণ্য হইবে। এই সকল জমাবন্দী যখন সম্ভব হয়, প্রতিবৎসরই ভূমিতে গিয়া পরীক্ষিত হইবে। পাট্টা অনুসারে যে চাষ হয়, যতদিন বাজেরাপ্ত না হয়, তাহাও পাট্টার সর্বমতে জমাবন্দীভুক্ত করা যাইবে। যখন পাট্টার সর্বভঙ্গ করা হয়, তখন সেই পাট্টার দল করা হইবে, এবং যেন কোন পাট্টা দেওয়া হয় নাই, জমি এমন ভাবে প্রস্তুত চাষীর সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে।

চাষ ভিন্ন অন্য জমি ও বাজারের খাজানা।

৪৪।

অকুঠ ভূমিসমূহের খাজানা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টই নির্দিষ্ট করিবেন; এবং যখন এইরূপ নির্ধারিত হইবে, তাহা জমাবন্দীভুক্ত হইবে ও চাষের খাজানার দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু, রাজার সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহা মৌজা হইতে পৃথক করিয়া বন্দোবস্ত প্রদান করিবেন এবং হেডম্যানের দ্বারা বা স্বয়ং তিনি যেরূপ উচিত বোধ করেন, তাহা পরিচালন করিতে পারিবেন।

ছন ও গর্জনখোলার খাজানা।

৪৫।

মৌজাসকলের ( বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের ১৯০২ সালের এই ডিসেম্বরের পত্র ) সীমামধ্যে উৎপন্ন নূতন ছনখোলা ভিন্ন সমুদয় ছনখোলা এখনকার মত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক হয়তঃ বৎসর বৎসর অথবা যে কোন অবস্থাতেই দশ বৎসরের অনধিক কোন সময়ের জন্য বন্দোবস্ত প্রদত্ত হইবে, এবং যখন বন্দোবস্ত প্রদত্ত হয়—তৎসমুদয়ের খাজানা পৃথকরূপে আদায় করা হইবে, জমাবন্দীভুক্ত হইবে না বা চাষের কি অকুঠভূমির রাজস্বের দ্বারা বিভক্ত হইবে না।

জায়গীর।

৪৬।

প্রত্যেক মৌজামধ্যে ৫০ পঞ্চাশ একর সর্বোৎকৃষ্ট কৃষিযোগ্য ভূমি সীমানির্দিষ্ট ও জমি-বদ্ধ হইয়া হেডম্যান, পাটোয়ারী কি কারবারী—যদি একজন থাকে, এবং চৌকিদার—যদি এ সমুদয় নিয়োজিত হয়, প্রভৃতি গ্রাম্যকর্মচারীদিগকে বেতন স্বরূপ দেওয়ার নিমিত্ত গভর্ণমেন্টের খাসভূমিরূপে পৃথক থাকিবে; এবং তৎসমুদয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকর্তৃক তাহাদের কার্য-কাল পর্যন্ত বিনা করে প্রদত্ত হইবে। কোন হেডম্যান বেতনস্বরূপ এই ভূমির পঁচিশ একরের অধিক রাখিতে পারিবেন না; কিন্তু অবশিষ্ট ভূমি যতকাল কাহারও দখলে দেওয়া না যাইবে, ততদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন, অহারী বন্দোবস্তে হেডম্যানের হেপাজতে রাখিতে পারেন। কোন কর্মচারীই তাবুদ জমি হস্তান্তর করিবার কিংবা গভর্ণমেন্ট বা পরবর্তী কর্মচারী হইতে ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যরিত কোন ক্ষতিপূরণ লওয়ার অধঃ-নীর স্বত্ত্ব থাকিবে না; কিন্তু কমিশনার নবনিযুক্ত কর্মচারীকে জমির হারী উৎকর্ষের নিমিত্ত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ তদীর পূর্বাধিকারীকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করিতে পারেন।

চিক্‌দিগের খাসমহাল।

৪৭।

সার্কেল চিক্‌ কমিশনারের মঞ্জুরী ক্রমে তদীয় সার্কেল মধ্যে এক বা ততোধিক মৌজা তাহার খাসমৌজারূপে রাখিতে পারিবেন এবং এরূপস্থলে তিনি যতকাল পর্যন্ত হেডম্যান এবং মৌজাকর্মচারীর কার্যেও উপযুক্তরূপে চালাইতে পারেন, চিক্‌স্বরূপে বঙ্গীয় পারিগ্রামিক ভিন্নও হেডম্যানের প্রাপ্য যাবতীয় পারিশ্রমিক ভোগে অধিকারী হইবেন।

চিক্ বিপক্ষে প্রদত্ত অধিকার এবং হেড্‌ম্যানদের নিযুক্তি ও পদচ্যুতি।

৪৮।

চিক্‌দিগের অধিকার বন্দীর গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়মিত : স্থপারিটেণ্টেট চিক্‌ এবং মোজা খানীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া হেড্‌ম্যান নিযুক্ত করিবেন ; তিনি মল ব্যবহার বা অন্ত্র-মুক্ততার নিমিত্ত তৎসম্পর্কিত চিক্‌কে অবগত করাইয়া হেড্‌ম্যানকে পদচ্যুতও করিতে পারেন। স্থপারিটেণ্টেট এতদুভয়ের কোন কাণ্ডেই চিক্‌র ইচ্ছানুসারে চলিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। এই নিযুক্তি বাশানুক্রমে হইবে না, কিন্তু উপযুক্ত পূত্র হইলে তদীয় পিতার উত্তরাধিকারে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

দেশান্তরগমন ও তজ্জনিত অনুপস্থিতি এবং পলাতকগণ।

৪৯।

চাবী রায়তগণের এক সার্কেল হইতে অন্য সার্কেলে গমন যদিও একেবারে বিবিধ নহে, তৎপ্রতি অনুৎসাহ প্রদর্শিত হইবে। কোন চাবীরায়ত সে যে সার্কেল ও মোজা ছাড়িতে ইচ্ছা করে, তাহার যাবতীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত দেশান্তর গমন করিতে পারিবে না ; এবং চিক্‌ ও হেড্‌ম্যানগণ এইরূপ দেশান্তর গমনে ইচ্ছুক দারিক ও তদীয় সম্পত্তি, স্থপারিটেণ্টেটের আদেশপ্রাপ্তি পর্যন্ত আশঙ্ক রাখিতে পারিবেন। পলায়ন কালের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে, কোনও পলাতককে পূর্বপরিত্যক্ত সার্কেলে পুনর্বাসিত করিতে দেওয়া হইবে না।

সাধারণের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় ভূমি।

৫০।

কৃষিযোগ্যভূমি হেড্‌ম্যানদিগের দ্বারা একরূপে বিলি করা হইবে না, যাহাতে রাস্তা কি পথ, অথবা সাধারণের সুবিধা বা গভর্ণমেণ্টের আবশ্যিকতার ব্যাঘাত ঘটে, এবং এই অন্তরায় স্বরূপ বিহিত যে কোন বন্দোবস্ত সরাসরি মতে রদ করা যাইবে। বন্দোবস্ত প্রদত্ত কোন জমি যখন গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে আসে, তখন তাহা কতিপয় প্রদানপূর্বক পুনরায় লওয়া যাইতে পারিবে।

(SD.) J. A. Bourdillon,

Offg, Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

# অস্ত্যভাগ ।

## সৌজার চকবন্দী ।

### চাকমা সার্কেল ।

এক নম্বর তালুক কাচালং।—

১। ধামাইছুরা—পরিমাপকল ১০ বর্গমাইল, রাজা বাহাদুরের খাস। সীমা বধা,—  
উ—কাচালঙের শাখা মুবাহরী; পূ—কাচালং ও কর্ণফুলী; দ—কর্ণফুলী; প—চেনী ও  
কাচালঙের মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বতশ্রেণী ।

২। বড়কাটুলি—পরিঃ ১৭ বঃ মাঃ, হেড্‌ম্যান শ্রীনীলচন্দ্র দেওয়ান। সীমা বধা—  
উ—ডাইমর খারিকাটা হরা; পূ—কাচালংনদী; দ—মাহালহরী; প—দক্ষিণে বন্দুককণা এবং  
উত্তরে কিল্লামুড়ার মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বতশ্রেণী ।

৩। লংগদু—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা বধা,—উ—কাচালং  
রিজার্ভ; পূ—কাচালংনদী; দ—খারিকাটা ও ডাইমের খারিকাটা; প—দক্ষিণে কিল্লামুড়া ও  
উত্তরে গবমারার মধ্যবর্তী ( ১৪৩৯ ফিট উচ্চ ) পর্বতশ্রেণী ।

৪। বরুণাছুরী—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা বধা,—উ—মাহা-  
লহরী; পূ—কাচালংনদী; দ—মুবাছরী; প—চেনী ও কাচালঙের মধ্যবর্তী উচ্চপর্বতশ্রেণী ।

৫। চাল্‌স্তাতলীছুরা—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রীমৈলাধন দেওয়ান। সীমা বধা,—  
উ—নলুয়া এবং গবছরী; পূ—কুরশিড়া টাংকা পর্বতশ্রেণী; দ—বামের খাগারাহরী; পঃ—  
রাঙাপানিছুরার উৎপত্তিস্থান হইতে বামের খাগারাহরীর দিকে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী, নলুয়ার  
শাখা রাঙাপানিছুরা ।

৬। হেমলাটছুরা—পরিঃ বঃ ১২ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রী মাপেত পানজি ( কুক )। সীমা  
বধা,—উ—লংগদু বাকের উপরে এক ছোট মালা, এই মালায় উৎপত্তিস্থান হইতে পেটান্জারমার  
ছুরার শাখা উগলহরী পর্যন্ত এক সরল রেখা; পূ—উগলহরী; দ—হেমলাটছুরা, তাহার উৎ-  
পত্তিস্থান হইতে প্রান্তর উগলহরী পর্যন্ত এক সরল রেখা; প—কাচালং ।

৭। ডলুছুরী—পরিঃ ০ বঃ মাঃ হেড্‌ঃ শ্রীলেনাথিক দেওয়ান। সীমা বধা,—উ—  
রিজার্ভলাইন; পূ—মুনিমোগোছুরা এবং এই ছুরার মুখ ( বোহমা ) হইতে রিজার্ভ লাইন পর্যন্ত  
উত্তরাভিমুখে এক সরল রেখা; দ—বড়কল পর্বত শ্রেণী; প—বড়ডলুছুরী, এবং এই ছুরার মুখ  
হইতে উত্তরদিকে রিজার্ভ লাইন পর্যন্ত এক সরল রেখা ।

৮। ঘুইছুরী—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রীনবচন্দ্র দেওয়ান। সীমা বধা,—উ—রিজার্ভ  
লাইন, বর্কপুখার শাখা ঘুইছুরীর মুখ হইতে উত্তর দিকে রিজার্ভ লাইন পর্যন্ত এক সরল রেখা  
ঘুইছুরী; পূ—বড়কল পর্বতশ্রেণী; দ—কাক পুখার শাখা মুনিমোগোছুরা; প—মুনিমো-  
গোছুরা, এই ছুরার মুখ হইতে উত্তরদিকে রিজার্ভলাইন পর্যন্ত এক সরল রেখা ।

৯। মারিচাচর—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রীধৈর্যাত্মক লামা। সীমা বধা,—উ—  
পেটান্জার মার ছুরা, বামের পেটান্জার মার ছুরা, ইহার শাখা ভালহরী, বড়কল পর্বতশ্রেণী  
হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী, পূ—বাড়লহরী; দ—বাড়লহরীর মুখ হইতে  
নলুয়াছুরী; প—কাচালং ।

১০। রাঙাপানিছুরা—পরিঃ ১২ বঃ মাঃ, হেড্‌ঃ শ্রীদীর্ঘদন দেওয়ান। সীমা বধা,—  
উ—নলুয়া; পূ—নলুয়ার শাখা রাঙাপানি ছুরার উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণদিকে বামের খাগরা-  
ছুরীর দিকে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী; দ—খাগরাহরী এবং বামের খাগরাহরী; প—নলুয়া-  
ছুরার নিকট হইতে চেবাহরীর দিকে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী, এবং সেই পর্বত  
শ্রেণীর দক্ষিণপ্রান্ত হইতে খাগরাহরী পর্যন্ত দক্ষিণদিকে এক সরল রেখা ।

১১। পেটাত্তারমারছরা—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকর্ণচন্দ্র তালুকদার সীমা বধা,—  
—উ—হেড্‌লাটছরা, তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে কাচালঙের শাখা উগলছরী পর্যন্ত পূর্বদিকে এক  
সরল রেখা, তাহা হইতে ছোট উলুছরী পর্যন্ত এক সরল রেখা, মুখ পর্যন্ত ছোট উলুছরী, তাহা  
হইতে রিজার্ভ লাইন পর্যন্ত এক সরল রেখা, রিজার্ভ লাইন, বড় উলুছরী মুখ হইতে রিজার্ভ  
লাইন পর্যন্ত এক সরল রেখা; পূ—বড় উলুছরী; দ—বড়কলের উচ্চ পর্বত শ্রেণী হইতে  
পশ্চিমদিকে বিস্তৃত ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী, বামের পেটাত্তার মার ছরার যে স্থানে তলীর করদ তালছরী  
মিলিত হইয়াছে তৎপর্যন্ত তালছরী, দোছরী পর্যন্ত বামের পেটাত্তার মার ছরা;  
প—কাচালং।

১২। গবছরী—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীনীলচন্দ্র রোয়া (মঘ) সীমা বধা,—  
উ—গবছরীর মুখ হইতে উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত নলুয়া; পূ—বড়কল পর্বতশ্রেণী; দ—গবছরী;  
প—নলুয়া ও গবছরী।

১৩। নলবজ্রা—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, রাজা বাহাছরের খাস। সীমা বধা,—উ—বড়কল  
পর্বত শ্রেণী; পূ—কর্ণফুলী; দ—কর্ণফুলী; প—গর্গরিছরা।

১৪। ভাসাঁত্তা আদম—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীমহুয়া তালুকদার। সীমা বধা,—  
উ—নলুয়াছরা; পূ—নলুয়া ছরার নিকট হইতে বাহা ডেবাছরার দিকে বিস্তৃত হইয়াছে ঐ  
ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী, তাহার দক্ষিণপ্রান্ত হইতে খাগরাছরী পর্যন্ত দক্ষিণদিকে এক সরল রেখা;  
দ—খাগরাছরী; প—কাচালং।

১৫। নলুয়া—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকিনারাম তালুকদার। সীমা বধা,—  
উ—বাহাতে খাঙ্গলছরীর উৎপত্তি হইয়াছে, বড়কল পর্বতশ্রেণী হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রসারিত সেই  
জলস্রোত; পূ—বড়কল পর্বতশ্রেণী এবং নলুয়া; দ—নলুয়া; প—নলুয়ার করদ বাডুলছরী।

১৬। খাগরাছরী—পরিঃ ৬ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীমদনমোহন দেওয়ান। সীমা বধা,—  
কাচালঙের শাখা খাগরাছরী এবং বামের খাগরাছরী; পূ—কুকুরশিরা টাংগা পর্বতশ্রেণী;  
দ—ডাইনের উলটাছরী, ডাইনের জুকছরীর উৎপত্তিস্থান হইতে ডাইনের ও বামের উলটাছরীর  
সংযোগস্থল পর্যন্ত এক সরল রেখা, ডাইনের জুকছরী এবং মুখ পর্যন্ত জুকছরী; প—কাচালং।

১৭। ঘনমোহর—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীশিমোহন দেওয়ান। সীমা বধা,—  
১৬ নম্বর খাগরাছরী মৌজার দক্ষিণ সীমা; পূ—কুকুরশিরা টাঙ্গা পর্বতশ্রেণী; দ—কেরঙা  
ছরীর শাখা লেবুছরী এবং কেরঙাছরী; প—কাচালং।

১৮। কাকপর্য্য—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীবল্লভ তালুকদার। সীমা বধা,—  
উ—পূর্বে বড়কল পর্বতশ্রেণী হইতে পশ্চিমে যেখানে ডাইনের কাকপর্য্যার মুখ হইতে উদ্ভাস্তি-  
মুখে কাচালং রিজার্ভে মিলাইতে এক রেখা টানা যার, সেই বিন্দু পর্যন্ত কাচালং করেটে  
রিজার্ভ; পূ—উত্তরে যেখানে রিজার্ভ লাইন বড়কল পর্বতশ্রেণীতে মিলিত হইয়াছে, সেই  
বিন্দু হইতে দক্ষিণে ডাইনের কাকপর্য্যার দ্বিতীয় দোছরীর জলাক পর্যন্ত বড়কল পর্বতশ্রেণী;  
দ—ডাইনের কাকপর্য্যার মুখ হইতে প্রথম দোছরী পর্যন্ত, তথা হইতে দ্বিতীয় দোছরী পর্যন্ত  
বামের দোছরী, অমস্তর জলাক পর্যন্ত ডাইনের দোছরী; প—ডাইনের কাকপর্য্য এবং তাহার  
মুখ হইতে করেটে রিজার্ভ পর্যন্ত এক সরল রেখা।

১৯। বেঙ্গুরাংনের চর—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীলাইখাং রোয়াবা (পাখোয়া)। সীমা বধা,—  
উ—কর্ণফুলীর করদ রাতা কুরীশিলছরা; পূ—বড়কল পর্বতশ্রেণী; দ—গর্গরিছরী  
এবং কর্ণফুলী; প—কর্ণফুলী।

২০। বেঙ্গেনাছরী—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীভূষনচন্দ্র দেওয়ান। সীমা বধা, উ—  
হালদার পতিত ভূস্বত্বাছরা; পূ—বড়কল পর্বতশ্রেণী; দ—রাতাকুরীশিলছরা ও কর্ণফুলী,  
প—হালদা।

২১। হালদা—পরিঃ ৬ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচেংখাং রোয়াবা (পাখোয়া)। সীমা বধা,  
উ—বামের হালদার পতিত গবছরী, কুকুরশিরা পর্বতশ্রেণী, এবং বড়কল পর্বতশ্রেণী; পূ—  
বড়কল পর্বতশ্রেণী; দ—বামের হালদার করদ ভূস্বত্বা; প—বামের হালদা।

২২। ককু টাঁছরী—পরি: ১৮ ব: মাং, হেড: শ্রীলক্ষ্মী দেবদাস। সীমা বধা, উ—কেন্দ্রা ছরী ও তাহাতে পতিত লেমুছরী এবং কুচুরশিরা টাঙ্গা পর্বতশ্রেণী; পূ—বগবানছরী, দ—কর্ণফুলী; প—কাচালং।

২৩। বগাঁচতর—পরি: ১ ব: মাং, হেড: শ্রীশোলক তালুকদার। সীমা বধা, উ—রিজার্ভ লাইন; পূ—ছোটডলছরী; দ—কাচালঙে পতিত 'ঝাড়' এবং 'ভাটকা' উপনদী; প—কাচালং।

## ২ দুই নম্বর তালুক চেঙ্গী।—

১। হাজারী বাক—পরি: ৮ ব: মাং, রাজা বাহাদুরের বাসা। সীমা বধা, উ—কাগত্যা ছরী এবং ঐ ছরার উৎপত্তি স্থান হইতে কর্ণফুলীর পাখা চারিখণ্ডের মুখ পর্যন্ত এক সরল রেখা; প—কাইন্দার মুখ হইতে চারিখণ্ডের মুখ পর্যন্ত কর্ণফুলী; দ—চেঙ্গীর মুখ হইতে কাইন্দার মুখ পর্যন্ত কর্ণফুলী; প—চেঙ্গী নদী।

২। বন্দুক ভাঙা—পরি: ২০ ব: মাং, হেড: কুমার শ্রীকান্ত রমণীসার রায়। সীমা বধা, উ—শেলছরী, তৎ করদ ঘিমুখা ছরী এবং উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত বামের শেলছরী; পূ—চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বত শ্রেণী; দ—কাগত্যা ছরী এবং তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে কর্ণফুলীর করদ চারিখণ্ডের মুখ পর্যন্ত এক সরল রেখা; প—চেঙ্গী নদী।

৩। ছরকুড়ি বিল—পরি: ৩ ব: মাং, হেড: শ্রীশ্রীনিবাস চন্দ্র দেওয়ান। সীমা বধা, উ—দোছরী পর্যন্ত সাবেক্কাং এবং এই মৌজার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা কোন্দার পর্যন্ত পর্যন্ত ডানের সাবেক্কাং। পূর্ব ও দক্ষিণ—সাবেক্কাং, কিল্লাছরার সহিত মিলন স্থান পর্যন্ত মাইচছরী ও ছরকুড়ি বিলের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী, তথা হইতে কিল্লাছরার পূর্ব হইতে ডানের সাবেক্কাং পর্যন্ত উত্তর পূর্বদিকে এক সরল রেখা; প—চেঙ্গী নদী।

৪। মাইচছরী—পরি: ৯ ব: মাং, হেড: শ্রীশশিকুমার দেওয়ান। সীমা বধা, উ—কিল্লাছরার সহিত মিলন স্থান পর্যন্ত মাইচছরী এবং ছরকুড়ি বিলের উপত্যকার মধ্যবর্তী পর্বত শ্রেণী, তথা হইতে কিল্লাছরার পূর্ব হইতে ডানের সাবেক্কাং পর্যন্ত উত্তর পূর্বদিকে এক সরল রেখা; পূ—কাচালং ও চেঙ্গীর মধ্যবর্তী পর্যন্ত (এই পর্বত শ্রেণীর সহিত ডানের ও বামের সাপমারার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী এবং বামের শেলছরীর উৎপত্তি স্থানের সম্মিলন স্থান পর্যন্ত) দ—দোছরী পর্যন্ত সাপমারা তথা হইতে দুই সাপমারার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী (কাচালং ও চেঙ্গীর মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত); প—চেঙ্গী নদী।

৫। সাবেক্কাং—পরি: ৭ ব: মাং, হেড: শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দেওয়ান। সীমা বধা, উ—গাইন্দাছরী; পূ—গবমারা মইন এবং বামের সাবেক্কাং; দ—সাবেক্কাং, প—চেঙ্গী নদী।

৬। কাটুলতলী—পরি: ১২ ব: মাং, হেড: শ্রীবাঙ্গালী চান্ তালুকদার। সীমা বধা, উ—দোছরী পর্যন্ত সাপমারা, তথা হইতে ডানের ও বামের সাপমারার মধ্যবর্তী পর্বত শ্রেণী, কাচালং ও চেঙ্গীর মধ্যবর্তী পর্যন্ত (যেখানে বামের শেলছরীর উৎপত্তি স্থান ইহার সহিত মিশিয়াছে); পূ—বামের শেলছরী; দ—দোছরী পর্যন্ত শেলছরী; প—চেঙ্গী নদী।

৭। জাহুখাঁছরী—পরি: ১২ ব: মাং, হেড: শ্রীনেতা তালুকদার। সীমা বধা, উ—জাহুখাঁছরী ও হাজারীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী, পূ—চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বতশ্রেণী; দ—সাবেক্কাংয়ের দোছরী হইতে উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত ডানের সাবেক্কাং। প—হাজারী ও জাহুখাঁছরার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী।

৮। গবছরী—পরি: ২ ব: মাং, হেড: শ্রীবিজয়গিরি তালুকদার। সীমা বধা, উ—চমরা কুট্যা ও ছোট হাজারীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র পর্বত শ্রেণী, তার পর চমরা কুট্যা ও গবছরীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী; পূ—চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বত শ্রেণী; দ—হাজারী ও জাহুখাঁছরার মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী; প—দোছরীর মুখ হইতে যেখানে ছোট হাজারী ও চমরা কুট্যার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্ত নিকটবর্তী হইয়াছে, তৎপর পর্যন্ত সাবেক্কাং।

৯। এগরাল্যা ছরা—পরিঃ ১৪ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীমণিকচন্দ্র তালুকদার। সীমা যথা, উ—চেঙ্গী ও কাচালঙের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী; পূ—ঐ, দ—চমরাকুট্যা ও ছোট হাজাহরীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী এবং তারপর চমরাকুট্যা ও গবছরীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী; প—উৎপত্তিস্থান হইতে যথায় ছোট হাজাহরী ও চমরাকুট্যার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী নিকটবর্তী হইরাছে ততদূর পর্য্যন্ত বামের সাবেক্ষ্যঃ।

১০। শেলছুরী—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীস্বর্ধাধন তালুকদার। সীমা যথা, উ—শেলছুরী; পূ—কাচালং ও চেঙ্গীর মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বতশ্রেণী; দ—শেলছুরীর করদ ঘিমুখাছরা ও বামের ঘিমুখাছরা; প—শেলছুরী।

৩ তিন নম্বর তালুক মহাপ্রস্ম।—

১। চৌধুরীছরী—পরিঃ ৬ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীনীলমণি দেওয়ান। সীমা যথা, উ—দীর্ঘাছরার মুখ হইতে বামের বগাছরার মুখ পর্য্যন্ত মূল বগাছরী এবং জলাক পর্য্যন্ত বগাছরী; পূ—গড়পাহাড়; দ—গড়পাহাড় হইতে মঘাছরীর মুখ পর্য্যন্ত এক সরল রেখা এবং মঘাছরী; প—বাতিমইন।

২। ঘিলাছুরী—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীকবিরাজ দেওয়ান। সীমা যথা, উ—১ নম্বর মৌজাহ চৌধুরীছরীর দক্ষিণসীমা; পূ—গড়পাহাড়; দ—পোহারছরী, ইহার মুখ হইতে গড়পাহাড় পর্য্যন্ত ঝিড়ি, কাবুকছরী এবং ইহার মুখ হইতে টেঙাছরী মইন পর্য্যন্ত পাহাড়; প—টেঙাছরী মইন।

৩। হাজাহরী—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীঅক্ষরমণি তালুকদার। সীমা যথা, উ—পোহারছরী, ইহার মুখ হইতে গড়পাহাড় পর্য্যন্ত এক সরল রেখা, মাচছরী এবং ছোট মহাপ্রস্ম; পূ—ছোট মহাপ্রস্ম; দ—হাজাহরী ও বড় মহাপ্রস্ম; প—টেঙাছরী মইন।

৪। ছোটমহাপ্রস্ম—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীরাজমণি দেওয়ান। সীমা যথা, উ—গড়পাহাড় ও ছোট মহাপ্রস্ম; পূ—ছোটমহাপ্রস্ম; দ—মাচছরী; প—গড়পাহাড়।

৫। বুড়াবাট—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীস্ববরাজ দেওয়ান। সীমা যথা, উ—চেঙ্গী, মংখোলা নালি, মংখোলা নালি হইতে পলিছরা পর্য্যন্ত অঙ্কিত সরল রেখা, পেরাছরার মুখ পর্য্যন্ত পলিছরা এবং জলাক পর্য্যন্ত পেরাছরা; পূ—চেঙ্গী; দ—বড় মহাপ্রস্ম ও ছোট মহাপ্রস্ম; প—হেইদছরা, নরানখাছরা, জলাক পর্য্যন্ত ঝিড়িছরা এবং পেরাছরার উৎপাদক পাহাড়।

৬। নানাকুং—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীপাইলং রোয়াবা (মঘ)। সীমা যথা, উ—নানাকুং; পূ—চেঙ্গী; দ—পলি এবং মংখোলা; প—ছোট মহাপ্রস্ম।

৭। বড়াদম—পরিঃ ৯ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীবাসমণি দেওয়ান। সীমা যথা, উ—তৈচাক্কা; পূ—চেঙ্গী; দ—নানাকুং এবং কুকুরমারা ছরা; প—কুকুরমারা ছরা এবং তৈচাক্কা।

৮। বেতছরী—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীস্বর্ধাধন তালুকদার। সীমা যথা, উ—বেতছরী ও পাহাড়; পূ—চেঙ্গী; দ—তৈচাক্কা; প—ডানের তৈচাক্কা।

৯। বাকছরী—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীরাজচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ—কেঙাইলছরী; পূ—চেঙ্গী; দ—বেতছরী; প—গড়পাহাড়।

১০। তৈচাক্কা—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীনবীনচন্দ্র তালুকদার। সীমা যথা, উত্তর ও পশ্চিম—বেতছরী মইন, কেঙাইল ছরী মইন এবং জিপুরাছরা; দ—বামের বোগাছরী; পূ—তৈচাক্কা।

১১। বগাছরী—পরিঃ ৪১, ২ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীরাজচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ—গড়পাহাড়, তৈচাক্কা এবং কুকুরমারা ছরার এক অংশ; পূ—কুকুরমারা ছরা এবং ছোটমহাপ্রস্মের এক পাখা; দ—ছোটমহাপ্রস্ম; প—ঐ।

১২। কেঙাইলছরী—পরিঃ ১২ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীরাজমণি তালুকদার। সীমা যথা, উ—কেঙাইল ছরী; পূর্ব ও দক্ষিণ গড়পাহাড়; প—কেঙাইলছরী মইন।

### ৪ চারি নম্বর তালুক সর্ত্তা।—

১। দূরছরী—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীঅত্যাচরণ তালুকদার। সীমা বধা, উ—না-ভাড়াছরা, পূ—উত্তরে না-ভাড়া উৎপত্তি স্থান হইতে দক্ষিণে ডানের দূরছরীর উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত ৩ তিন নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ—দূরছরী; প—ধুরুং।

২। বানরকাটা—পরিঃ ২ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকুলচন্দ্র দেওয়ান। সীমা বধা, উ—দূরছরী; পূ—দীঘলছরী এবং নারাপছরী; দ—বানরকাটা; প—ধুরুং।

৩। ছোটধুরুং—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকেওজপ্র রোয়াবা (মঘ)। সীমা বধা, উ—লক্ষীছরী; পূ—১১ নম্বর মৌজা শুকনাছরীর পশ্চিম সীমা; দ—ছোট ধুরুং; প—ধুরুং।

৪। ধুরুং—পরিঃ ৬। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীহুজাঁও চৌধুরী (মঘ)। সীমা বধা, উ—ছোটধুরুং ও ধুরুং; পূ—মরমছরী এবং তথা হইতে উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত ডানের মরমছরী; দ—উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত জাহছরী, তথা হইতে জাহছরী ও কুটাহরীর মধ্যবর্তী পর্বত, উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত কুটাহরী, তথা হইতে বড়লেলাঙের এক শাখা গড়াপাহাড় পার হইয়া বড়লেলাং পর্যন্ত এবং তথা হইতে বড়লেলাং বরাবর গিয়া চেমীটং মহন; প—চট্টগ্রাম ও পার্শ্বতা প্রদেশের সীমা।

৫। মুক্তাছরী—পরিঃ ৩। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীঅনঙ্গমোহন দেওয়ান। সীমা বধা, উ—শুকনাছরী ও মরমছরীর মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী, বর্গাছরীর করদ নিম্নাচ্ছাছরী এবং সর্ত্তার করদ পেকুই; পূ—সর্ত্তা; দ—হাজাছরী, হাজাছরী এবং ত্রিপুরার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী, ত্রিপুরাছরী এবং সর্ত্তা; প—বর্গাছরী।

৬। বর্গাছরী—পরিঃ ৪। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচিলাপ্ররোয়াবা (মঘ)। সীমা বধা, উ—১৩ নম্বর লেলাং মৌজার দক্ষিণ সীমা; পূ—বর্গাছরী ও শুকনাছরী; দক্ষিণ ও পশ্চিম—চট্টগ্রাম ও পার্শ্বতাচট্টগ্রামের মধ্যবর্তী সীমা।

৭। ফটিকছরী—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকমলাদ্য চৌধুরী (মঘ)। সীমা বধা, উ—৫ নম্বর মুক্তাছরী মৌজার দক্ষিণ সীমা; পূ—৫ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ—শিলছরী, বাড়লছরী এবং রক্তছরী; প—চট্টগ্রাম এবং পার্শ্বতাচট্টগ্রামের সীমা।

৮। ডাবুয়া—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীধোপায় চৌধুরী (মঘ)। সীমা বধা, উ—ডাবুয়া নালাতে পতন স্থান পর্যন্ত শিলছরী, অনন্তর দক্ষিণাভিমুখে গিয়া ছোট বাড়লছরীর মুখ হইতে উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত, তারপর রক্তছরী পার হইয়া চট্টগ্রামের সীমা পর্যন্ত এক সরল রেখা; পূ—উত্তরে শিলছরীর উৎপত্তি স্থান হইতে দক্ষিণে সোনাই নালা উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত ৫ নম্বর তালুকের সীমা; দ—সোণাই নালা জলাক; প—চট্টগ্রামের সীমারেখা।

৯। ডানের বানরকাটা—পরিঃ ৬। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীহরিকান্ত তালুকদার। সীমা বধা, উ—দূরছরী, ডানের দূরছরী; পূ—উত্তরে ডানের দূরছরীর উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে ডানের লক্ষীছরীর উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত ৩ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা, দ—ডানের লক্ষীছরী; প—দূরছরী, বানরকাটা ও লক্ষীছরীর করদ দীঘলছরী, মরমছরী, গোধাছরা, লোটিকছরী এবং করল্যাছরী।

১০। লক্ষীছরী—পরিঃ ৩। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীগোপীনাথ তালুকদার। সীমা বধা, উ—বানরকাটা, পূ—গাছছরা, লোটিকছরী এবং করল্যাছরী; দ—লক্ষীছরী; প—ধুরুং।

১১। শুকনাছরী—পরিঃ ৩। বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীশ্রীচন্দ্র দেওয়ান। সীমা বধা, উ—ডানের লক্ষীছরী; পূ—উত্তরে ডানের লক্ষীছরীর উৎপত্তি স্থান হইতে দক্ষিণে ছোট ধুরুঙের উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত ৩ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ—ছোটধুরুং; প—উত্তরে ডানের লক্ষীছরীর মুখ হইতে দক্ষিণে শুকনাছরীর মুখ পর্যন্ত এক সরল রেখা।

১২ মরমছরী—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচাইলাপ্রধামাই (মঘ)। সীমা বধা, উ—ছোটধুরুং; পূ—উত্তরে ছোটধুরুঙের উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে বর্গাছরীর উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত ৫ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ—বর্গাছরী; প—মরমছরী।

১৩। লেলাং—পরিঃ ২ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচাইলা রোয়াবা (মঘ)। সীমা বধা—



উ—৪ নম্বর মুখ্য মৌজার দক্ষিণসীমা; পূ—চেনিটং পর্বতশ্রেণী এবং শুকনাছরী; দ—ছোট মৌজার; প—পার্বত্যচট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী সীমা।

৩৮। কেরেককাবা—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীমন্দিমোহন দেওয়ান। সীমা বখা—  
উ—সর্তা; পূ—উত্তরে সর্তা উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে নাভাড়া এবং কেরেককাবা ছরার  
মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত ৩ নম্বর তালুকের পশ্চিম সীমা; দ—টুনিছরী, এবং নাভাড়া ও  
কেরেককাবার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী। প—সর্তা।

৩৯। নাভাড়া—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীমন্দিচরণ তালুকদার। সীমা বখা—  
উ—১৪ নম্বর কেরেককাবা মৌজার সীমা; পূ—উত্তরে নাভাড়া ও কেরেককাবার মধ্যবর্তী  
পর্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণে ৪ এবং ৫ নম্বর তালুকের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত ৩ নম্বর তালু-  
কের সীমা; দ—৫ নম্বর তালুকের উত্তর সীমা; প—সর্তা, নাভাড়া এবং ডাকাকা লরা।

### ৫ পাঁচ নম্বর তালুক ইচ্ছামতী।—

১। কাসখালি—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ পদ্মচাঁদ। সীমা বখা, উ—সোনাই  
কালা উৎপত্তিস্থান, তথা হইতে ৪ নম্বর তালুকের দক্ষিণ সীমা কটিকছরী পর্বতশ্রেণী, তাহা  
হইতে শিলালবুকা ছরা পর্যন্ত পর্বতশ্রেণী, এবং তথা হইতে শিলালবুকা ছরা যেখানে চট্টগ্রামের  
সীমার লাগিয়াছে তৎপর্যন্ত; পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম—চট্টগ্রামের সীমা রেখা।

২। কলমপতি—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকৃষ্ণাই চৌধুরী (মঃ) সীমা বখা,—  
উ—কোরাখালি; পূ—চট্টগ্রামের সীমা রেখা; দ—শিলালবুকা তথা হইতে নোয়া হাজি  
কটিকছরী পর্বতশ্রেণী; প—উত্তরে কাসখালির উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে শিলালবুকার জলাক  
পর্যন্ত ৪ নম্বর তালুকের পূর্বসীমা।

৩। মুখাছরী—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীভক্তারাম তালুকদার। সীমা বখা,—  
উ—১০ নং তালুকের সীমা; পূ—চাপাহরা ও ইচ্ছামতী নদী; দ—ভৈবনছরা; প—৪ নম্বর  
তালুকের সীমা।

৪। কচুখালি—পরিঃ ১৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র রোয়াবা (মঃ)। সীমা বখা—  
উ—ভৈবনছরা, জলাপাহাড়, এবং ঘিলাছরী; পূ—বেতছরী পাহাড় ও ইচ্ছামতী নদী; দ—বেতছরী  
পাহাড় এবং জোরাখালি; প—৪ নম্বর তালুকের পূর্ব সীমা।

৫। খাণ্ডোরা—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ হেডঃ শ্রীভাগ্যদান তালুকদার। সীমা বখা, উ—বেতছরী  
পাহাড়; পূ—উত্তরে বেতছরী পাহাড় হইতে দক্ষিণে কুর্দাই মইন পর্যন্ত ৬ নম্বর  
তালুকের পশ্চিম সীমা; দ—কুর্দাই মইন; প—চট্টগ্রামের সীমা।

৬। কুর্দাইমইন—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীবেচারাম আমু (টং চক্কা)। সীমা বখা,  
উ—কুর্দাইমইন; পূ—উত্তরে কুর্দাইমইন হইতে দক্ষিণে কর্ণফুলী পর্যন্ত ৬ নম্বর তালুকের  
পশ্চিম সীমা; দ—কর্ণফুলী; প—চট্টগ্রামের সীমা।

৭। ঘিলাছরী—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীরাজচন্দ্র তালুকদার। সীমা বখা, উ—  
৩ নং তালুকের সীমা এবং চাপাহরার উৎপত্তিস্থান; পূ—৬ নম্বর তালুকের সীমা; দ—ঘিলাছরী  
ও জলাপাহাড়; প—ইচ্ছামতী নদী ও চাপাহরা।

### ৬ ছয় নম্বর তালুক রঙামাটি।

১। রঙামাটি—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীজয়কুমার দেওয়ান। সীমা বখা, উ—  
পার্বত্যচট্টগ্রাম হইতে মোহরী পর্যন্ত, তথা হইতে তাদের কাঁটাছরী দিয়া পারোয়াছরীর মুখ পর্যন্ত,  
এবং তথা হইতে কাঁটাছরী ও মাণিকছরীর মধ্যবর্তী গড়াপাহাড় পর্যন্ত এক সরলরেখা; পূ—  
কর্ণফুলী এবং কেশী; দ—রঙামাটি হইতে চট্টগ্রামের সীমাকারী পথ; প—মাণিকছরী ও কাঁটা  
ছরীর মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী।

২। বাকছরী—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচন্দ্রবর দেওয়ান। সীমা বখা, উ—বাকছরীর  
কর্ণফুলীর হইতে ভৈবনছরা পর্যন্ত এক সরলরেখা, তথা হইতে সেই ছরার উপর দিয়া মোহরী

পর্ধ্যন্ত, তাহা হইতে বামের তৈমিহুং দিরা বানচিত্রে চিত্রিত মরা সেগুহরী পর্ধ্যন্ত পর্বতশ্রেণী ; পু—চেঙ্গী ; দ—১ নম্বর রাঙাপানি মৌজার উত্তর সীমা ; প—বানচিত্রে চিত্রিত মরা সেগুহরী পর্বতশ্রেণী পর্ধ্যন্ত ।

৩। ঝগড়াবিল—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীজিগৎ দেওয়ান। সীমা বখা, উ—সরকারী রাস্তা ; পু—কর্ণফুলী ; দ—মাণিকছরী ও কর্ণফুলী ; প—মাণিকছরী এবং ভোয়ালিয়ার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী ।

৪। জীবতলী—পরিঃ ৬ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচৌচরণ দেওয়ান। সীমা বখা, উ—ঝর নালী ; পু—কর্ণফুলী ; দ—ঐ ; প—সীতাপাহাড় কয়েট রিজার্ভ ।

৫। কামিলাছরী—পরিঃ ২ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীনেত্রনাথ দেওয়ান। সীমা বখা, উ—গোলাছরী, জিলোচন দেওয়ানের আবাদী জমি ; পু—কর্ণফুলী ; দ—সীতাপাহাড় কয়েট রিজার্ভ পর্ধ্যন্ত ঝরঝরি ; প—সীতাপাহাড় কয়েট রিজার্ভ ।

৬। বড়াদম—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীজিলোচন দেওয়ান। সীমা বখা, উ—মাণিকছরী এবং জারুলছরী ; পু—কর্ণফুলী ; দ—গোলাছরী, তথা হইতে মৈরমছরীর উৎপত্তিস্থান রামপাহাড় সীমার মইন পর্ধ্যন্ত ; প—দক্ষিণে মরমছরীর উৎপত্তিস্থান হইতে উত্তরে জারুলছরীর উৎপত্তিস্থান পর্ধ্যন্ত রামপাহাড় সীমার স্থান ।

৭। মাণিকছরী—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীহৈরাদন জামু ( টং চন্দা ) সীমা বখা, উ—আমছরী ; পু—মাণিকছরী মইন ; দ—জারুলছরী ; প—রাণ্যছরী মইন ।

৮। সাপছরি—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীরতন মানিক দেওয়ান। সীমা বখা, উ—জলাকপর্ধ্যন্ত শূকরছরী, তথা হইতে এক পাহাড় পার হইয়া নারৈছরীর জলাক পর্ধ্যন্ত ; পু—মাণিকছরী পাহাড় ; দ—আমছরী ; প—ঘাগরা মইন ।

৯। শূকরছরী—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীগঙ্গামাণিক দেওয়ান। সীমা বখা, উ—পূর্বোক্তর আশে তৈমিহুং এর উৎপত্তিস্থান হইতে পশ্চিমে করমইন পর্ধ্যন্ত জীবতলী মইন ; পু—উত্তরে জীবতলী মইন হইতে দক্ষিণে শূকরছরীর মুখ হইতে অঙ্কিত সরলরেখা পর্ধ্যন্ত মাণিকছরী ও কাঁটাছরী গ্রামদ্বয়কে বিভাজিত পর্বত শ্রেণী ; দ—কাঁটাছরী ও মাণিকছরীর মধ্যবর্তী পর্বত শ্রেণী হইতে শূকরছরী মুখপর্ধ্যন্ত সরল রেখা, তথা হইতে ডলুছরী ও নাজীলছরী পার হইয়া খারিকটাছরা দিরা কোরমইন পর্ধ্যন্ত ; প—দক্ষিণে ডানে খারিকটার জলাক হইতে উত্তরে জীবতলী মইন ও কোরমইনের মিলন স্থান পর্ধ্যন্ত কোরমইন ।

কুতুগছরী—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীমুক্তাকিশোর দেওয়ান। সীমা বখা, উ—কুতুগছরী ও চেগেইয়া ছবীর মধ্যবর্তী গড়পাহাড় হইতে উত্তরপশ্চিমাস্থি মুখে আসিয়া কুতুগছরী পার হইয়া ছোট ডলুছরী দিরা ওলামইন পর্ধ্যন্ত ; পু—উত্তরে জীবতলী মইন হইতে, দক্ষিণে ছোটডলুছরীর মুখ হইতে অঙ্কিত সরলরেখার সংযোগস্থল পর্ধ্যন্ত গড় পাহাড় ; দ—পূর্বে তৈমিহুংয়ের উৎপত্তি স্থল হইতে দক্ষিণে কোরমইনের উত্তরপ্রান্ত পর্ধ্যন্ত জীবতলী মইন ; প—কুতুগছরী এবং ইচ্ছামতী গ্রামদ্বয়কে বিভাজিত পর্বতশ্রেণী ।

১০। ডলুছরী—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকান্তনাথ চাক্ষুশী। সীমা বখা, উ—বড় মহাপ্রাং, এবং পূর্বে পাহার মরম হইতে পশ্চিমে হাজাছরীর জলাক পর্ধ্যন্ত হাজাছরী ; পু—একপার্শ্বে চেগেইয়াছরী ও বুঘছরী এবং অপরপার্শ্বে হাজাছরী ও বাহুলছরী—এতৎ মধ্যবর্তী গড়পাহাড় ; দ—উত্তর গড়পাহাড় হইতে কুতুগছরী পার হইয়া ছোটডলুছরী দিরা ওলামইন পর্ধ্যন্ত ; প—ইচ্ছামতী ও হাজাছরী গ্রামদ্বয়কে বিভাজিত ওলামইন ।

১১। তৈমিহুং—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকচরণ দেওয়ান। সীমা বখা, উ—বেখানে গড়পাহাড় মহাপ্রাং পার হইয়াছে, ততদূর পর্ধ্যন্ত মহাপ্রাং ; পু—চেঙ্গী ; দ—ঝাকছরী বাজারের কিঞ্চিৎ উপরের ঢেঁলী হইতে অঙ্কিত সরলরেখা, তথা হইতে নাখা ডোলাছরী পর্ধ্যন্ত তৈমিহুং, তাহা হইতে বামের তৈমিহুং ও কুতুগছরী গ্রামদ্বয়কে বিভাজিত পাহাড় পর্ধ্যন্ত ; প—গড়পাহাড় ।

## ৭ সাত নম্বর তালুক রাজস্ববন ।—

১। বালুখালি—পরিঃ ৬ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীকৃষ্ণ দেওয়ান। সীমা যথা, উ—কর্ণফুলী এবং রাঙামাটি হরার মিলন স্থান হইতে মংফর পাড়া, কাজা, ধনাগারী এবং পালৈয়া। মংফর আবাদী জমীর উত্তর সীমা দিয়া বামের দেওয়ানের ছরা পর্যন্ত রেখা, অনন্তর তাহা ডানের দেওয়ানের ছরা দিয়া পরে বামের দেওয়ানের ছরার উৎপত্তি স্থান হইতে রাঙামাটি হরার উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত এক সরল রেখা; পূ—রাঙামাটি ও কাইল্যার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী; দ—মঘবান নাল, পরে মানিকছরীর মুখ হইতে কাইল্য ও রাঙামাটির মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত এক সরল রেখা; প—কর্ণফুলী।

২। মঘবান—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীকামিনীমোহন দেওয়ান। সীমা যথা, উ—বালুখালি মৌজার দক্ষিণসীমা; পূ—ধনপাতা ও কাইল্যাকে বিভক্তীকৃত পর্বতশ্রেণী; দ—জলাঙ্গ পর্যন্ত ধনপাতা ছরা, প—কর্ণফুলী।

৩। রাঙামাটি—পরিঃ ১১ বঃ মাঃ, রাজা বাহাদুরের খাস। সীমা যথা, উ—কর্ণফুলী ও কাইল্য; পূ—কাইল্য; দ—১ নম্বর বালুখালি মৌজার উত্তর সীমা; প—কর্ণফুলী।

৪। কোশল্যাঘোনা—পরিঃ ৬ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীঘনেশ্বর রাম তালুকদার। সীমা যথা, উ—চোমরাছরী এবং কর্ণফুলী নদী; পূ—হিজাহরী, তলীর শাখা চোমরাছরী এবং পাহাড়; দ—রাইন্ খাং ছরা; প—কর্ণফুলী।

৫। ধনপাতা—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীজগন্নাথ তালুকদার। সীমা যথা, উ—ধনপাতাছরা এবং তলীর করদ ডলুছরী; পূ—ডলুছরী এবং হিজাহরী মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী; দ—চোমরাছরী; প—কর্ণফুলী।

৬। ভার্জাতলী—৫ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীরাইয়ং রোরাঝা (মুকং)। সীমা যথা, উ—রাইন্ খাং; পূর্ব ও দক্ষিণ—হরিণছরা; প—সীতাপাহাড় করেই রিজার্ভ।

৭। ছাক্রাছরী—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীহিচাবন আমু (টিং চ্যা)। সীমা যথা, উ—দীঘলছরী এবং পর্বতশ্রেণী; পূ—উত্তরে দীঘলছরী হইতে দক্ষিণে রাইন্ খাং রিজার্ভ পর্যন্ত পর্বতশ্রেণী; দ—রাইন্ খাং রিজার্ভ; প—রাইন্ খাং ছরা।

৮। কাঙারাহরী—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীকোন্ডটাই রোরাঝা (মঘ)। সীমা যথা, উ—পশ্চিমে চোমরাছরীর উৎপত্তিস্থান এবং পূর্বে ডলুছরীর উৎপত্তিস্থানের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী; পূ—নায়েইছরী; দ—রাইন্ খাং ছরা; প—হাজাহরী এবং চোমরাছরী।

৯। কুতুবদিয়া—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীকর্ণধন দেওয়ান। সীমা যথা, উ—রাইন খাং নদী; পূ—ঐ; দ—ঐ; প—গাছকাটাছরা।

১০। হেমন্ত—পরিঃ ১১ বঃ মাঃ, রাজা বাহাদুরের খাস। সীমা যথা, উ—কাইল্য ও শুভলঙের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী; পূ—ঐ; দ—বসন্ত; প—কর্ণফুলী।

১১। নায়েইছরী—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীতিলকচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ—নায়েইছরী, তলীর করদ ডলুছরী, এবং তাহার উৎপত্তিস্থলের গড় পাহাড় পর্যন্ত; পূ—উচ্চ পর্বতশ্রেণী; দ—ডানের ও বামের তগলক হরার মধ্যবর্তী গড় পাহাড়, বোছরী হইতে নিরদিকে বাঙালকাটিছরীর সম্মুখ পর্যন্ত তগলকছরা, তগলকছরার মুখ হইতে দুই তগলকছরীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত এক সরলরেখা, এবং রাইন্ খাংয়ের করদ কেরণছরী প—রাইন্ খাং নদী।

১২। ফুলগাজিবাগের ছরা—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেওয়ান। সীমা যথা, উ—ফুলগাজিবাগের ছরা; পূ—কাইল্য, ডানের কাইল্য ও মধ্যকাইল্য; দ—পর্বতশ্রেণী; প—ঐ।

১৩। বিলাইছরী—পরিঃ ৩ বঃ মাঃ, হেড্ঃ শ্রীমানিকচাঁদ তালুকদার। সীমা যথা, উ—বিলাইছরী; পূ—উচ্চ পর্বতশ্রেণী; দীঘলছরী; প—রাইনখাং।

১৪। কেরণছরী—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীসিদ্ধান্ত তালুকদার। সীমা বধা—  
উ—কেরণছরী, দুইকেরণছরী মধ্যবর্তী কুজ পর্বতশ্রেণী, এই পাহাড়শ্রেণী হইতে তগলক  
ছরার মুখ পর্যন্ত এক সরলরেখা, মুখ হইতে দোছরী পর্যন্ত তগলক ছরা এবং দুই তগলক  
ছরার মধ্যবর্তী গড়পাহাড়; পূ—উচ্চপর্বতশ্রেণী; দ—বিলাইছরী; প—রাইন্থাং নদী।

১৫। বসন্ত—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচক্ৰ তুই রোরাবা (কুকি)। সীমা বধা,—  
উ—উৎপত্তি স্থান হইতে হাজাছরীর পশ্চিমে যেখানে এক নিম্নপর্বতশ্রেণী রহিয়াছে এবং  
গোবিন্দ-বাগের ছরা নিকটবর্তিনী হইয়াছে, ততদূর পর্যন্ত বসন্ত ছরা; পূ—উচ্চ পুখা পর্বত-  
শ্রেণী; দ—বামের কাইন্দার করদ বাহুলখাটছরা; প—এই মৌজার উত্তরসীমার উল্লিখিত  
নিম্ন পাহাড়শ্রেণী, বামের বাহুলছরী, তদীর করদ বাদর মারা ছরা, ডানের বাহুলছরার করদ  
লেগৈস্তাছরা, তাহার মুখ হইতে খুদা চকের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত এক সরল রেখা, তথা হইতে  
বামের কাইন্দা ও বাহুলখাটছরার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অপর এক সরলরেখা।

১৬। কাইন্দা—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীনবীনচন্দ্র দেওয়ান। সীমা বধা, উ—  
কর্ণফুলী এবং ১৫ নম্বর মৌজা বসন্তের উত্তরসীমা; পূ—উত্তরসীমার নিম্নপর্বতশ্রেণী, বামের  
বাহুলছরী, তাহার করদ বাদরমারা ছরা, ডানের বাহুলছরীর করদ টাগুয়াছরা,  
রাগুয়াছরার মুখ হইতে খোদাচকের পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত এক সরল রেখা, তথা হইতে বামের  
কাইন্দা এবং বাহুর খাটছরার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অপর এক সরলরেখা, বাহুল খাটছরা এবং  
উচ্চ পর্বতশ্রেণী; দ—রাইন্থাংয়ের কাঙারাছরী মৌজার উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তচক পর্বত-  
শ্রেণী; প—মধ্যকাইন্দা, ডানের কাইন্দা এবং মুখেরগীচের কাইন্দা।

১৭। বাকুদগোলা—পরিঃ ১১ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচরণ আমু (টংজ্যা)। সীমা  
বধা, উ—পশ্চিম হরিণছরার মুখ হইতে পূর্বে গাছকাটার মুখ পর্যন্ত রাইন্থাং নদী; পূ—  
গাছকাটা ছরার মুখ হইতে তাহার দোছরী, তথা হইতে জলাক পর্যন্ত ডানের গাছকাটা ছরা;  
দ—উৎপত্তিস্থান হইতে মুখ পর্যন্ত ডানের ও গাছকাটাছরা; প—মুখ হইতে দোছরী পর্যন্ত হরিণ-  
ছরা, তথা হইতে উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত বামের হরিণছরা এবং উত্তরে যে বিন্দু হইতে বামের  
হরিণছরা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে দক্ষিণে ডানের গাছকাটাছরার উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত  
খিলাছরা।

১৮। বলাগছরা—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচন্দ্রান আমু (টংজ্যা)। সীমা বধা,  
উ—রাইন্থাং মুখ হইতে দোছরী পর্যন্ত বহলতলা ছরা, তথা হইতে জলাক পর্যন্ত ডানের  
বহলতলা ছরা, তাহা হইতে এক দিকে বলাগছরা ও তিনকুস্তাছরা, অপরদিকে গাছকাটা—  
এতৎ মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী; পূ—রাইন্থাং নদী ও রাইন্থাং রিজার্ভ; দ—রাইন্থাং রিজার্ভ;  
প—বিলাপাহাড় ও রাইন্থাং রিজার্ভ।

৮ আট নম্বর তালুক শুভলং।—

১। মিত্তিগাছরি—পরিঃ ৪ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকৃষ্ণকিশোর দেওয়ান। সীমা বধা,  
উ—কর্ণফুলী, পূ—শুভলং এবং হাজাছরী; দক্ষিণ ও পশ্চিম—পশ্চিমে হাজাছরীর উৎপত্তি-  
স্থান হইতে উত্তরে যেখানে শুভলং পর্বতশ্রেণী কর্ণফুলীর সহিত মিলিত হইয়াছে, ততদূর  
পর্যন্ত পর্বতশ্রেণী।

২। জুরছরী—পরিঃ ১৫ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের বাস। সীমা বধা, উ—শুভলঙের  
করদ খাগারাহরী; পূ—খাগারাহরীর করদ উপরের বালুখালি, সাইচাল পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত  
নিম্ন পাহাড়সমুদয়, সাইচাল পর্বতশ্রেণী; দ—পানছরী; প—পানছরীর মুখ হইতে নিম্নদিকে  
উপরে শিলছরী পর্যন্ত শুভলং, উপরের শিলছরী, উপরের শিলছরী ও চুমাচুমির  
মধ্যবর্তী পুখা পর্বতশ্রেণী, চুমাচুমি, তাহার মুখ হইতে নিম্নদিকে খাগারাহরীর মুখ পর্যন্ত  
শুভলং।

৩। জাঁধার মাণিক—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের বাস। সীমা বধা,—  
উ—ছোট বাধা, ছোট বাধার উৎপত্তি স্থান হইতে ডানের হাজাছরীর উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত

এক সন্নয়নে, হাজাছরী কর্ণকুলী এবং সাইচাল পর্ণভ্রমণী ; পু—এরেইছরী ; দ—নিরে  
এরেইছরীর উৎপত্তি হান হইতে কৈতর খাইরার মুখ পর্যন্ত শুভলং, কৈতর খাইরার উৎপত্তি  
হান পর্যন্ত বামের কৈতর খাইরা, হাজাছরী, তাহার মুখ হইতে নির দিকে কর্ণকুলীর সহিত  
সন্নয়ন পর্যন্ত শুভলং ; প—কর্ণকুলী ।

৪। জাকুলছরী—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীশরচ্ছ দেওয়ান । সীমা যথা, উ—  
তিন টিলাছরী ; পু—শুভলং ; দ—মযাছরী ; প—উচ্চ পর্ণভ্রমণী ।

৫। এরেইছরী—পরিঃ ৭ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীমদনমোহন দেওয়ান । সীমা যথা, উ—  
এরেইছরী, ডানের এরেইছরী এবং এরেইছরীর উৎপত্তি হান উচ্চ পর্ণভ্রমণী ; পু—উচ্চ-  
পর্ণভ্রমণী এবং খাগরাছরীর করণ কুসুমছরী ; দ—খাগরাছরী ; প—শুভলং ।

৬। পানছরী—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীলালমোহন দেওয়ান । সীমা যথা, উ—  
শুভলঙের করণ পানছরী ; পু—ডানের পানছরী ও সাইচাল পর্ণভ্রমণী ; দ—মৈদং এবং  
বামের মৈদং ; প—শুভলং ।

৭। মৈদং—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীবিজয়মোহন দেওয়ান । সীমা যথা, উ—  
মৈদং এবং বামের মৈদং ; পু—মৈদং এর উৎপত্তি হান উচ্চ পর্ণভ্রমণী ; দ—শুভলঙের করণ  
ভেছরী ; প—শুভলং ।

৮। তিন্দোছরী—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীনীলচন্দ্র কারবারী । সীমা যথা,  
উ—তে-ছরী ; পু—সাইচাল ; দ—হরিণ খাটছরী ; প—শুভলং এবং হরিণ খাটছরী ।

৯। বাঘাছোলা—পরিঃ ২৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীপদ্রাম তালুকদার । সীমা যথা,  
উ—কর্ণকুলী ; পু—কর্ণকুলীর করণ ও বাহা দেওয়ানের চরের কিঞ্চিৎ নিরে আসিয়া পড়িয়াছে,  
সেই হাজাছরী, ডানের হাজাছরী, হাজাছরীর উৎপত্তি হান হইতে ছোট বাবা পর্যন্ত এক সরল,  
রেখা ; দ—কর্ণকুলীর করণ ছোট বাবা এবং কর্ণকুলী ; প—কর্ণকুলী ।

১০। চোখ পতিঘাট—পরিঃ ৩০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকিষ্ণ দেওয়ান । সীমা যথা  
উ—খাগরাছরীর নীচে ও বনজুগীছরীর উপরে শুভলঙে পতিত এক ছোট সিঁড়ি হইতে  
বনজুগীছরার করণ বামের ও ডানের ঢেবাছরীর সংযোগস্থল পর্যন্ত এক সরলরেখা, উৎপত্তি-  
স্থান হইতে বামের ঢেবাছরীর সহিত সংযোগস্থল পর্যন্ত ডানের ঢেবাছরী, ডানের ঢেবাছরীর  
উৎপত্তি স্থানের গড় পাহাড় ; পু—শুভলং ; দ—চুমাচুনী এবং বামের চুমাচুনী ; প—  
উচ্চ পর্ণভ্রমণী ।

১১। ডুবাজারুল—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীজালৈয়া তালুকদার । সীমা যথা,  
উ—উপরের শিলাছরী ; পু—শুভলং ; দ—তিনটিলাছরী ; প—উচ্চ পর্ণভ্রমণী ।

১২। কুসুমছরী—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীবীণাধন দেওয়ান । সীমা যথা, উ—  
খাগরাছরীর করণ কুসুমছরী ; পু—সাইচাল পর্ণভ্রমণী ; দ—উৎপত্তি হান হইতে নিরে  
কুসুমছরীর মুখ পর্যন্ত খাগরাছরী ; প—খাগরাছরী ।

১৩। হেইংছরী—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীপুন্ডরন আমু (উংসো) । সীমা  
যথা, উ—কাঁদেবাছরী ; পু—শুভলং ; দ—হরিণখাটছরী ; প—উচ্চ পর্ণভ্রমণী ।

১৪। বনজুগীছরী—পরিঃ ৪০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচন্দ্রন তালুকদার । সীমা যথা,  
উ—বামের কৈতরখাইরা এবং কৈতরখাইরা ; পু—শুভলং ; দ—১০ নম্বর চোখপতিঘাট  
মৌজার উত্তর সীমা ; প—উচ্চ পর্ণভ্রমণী ।

১৫। ককির-ছরী—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীসেখন দেওয়ান । সীমা যথা, উ—  
মযাছরী ; পু—শুভলং ; দ—কাঁদেবাছরী ; প—উচ্চ পর্ণভ্রমণী ।

১৬। লুলাংছরী—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকৈলাসধন দেওয়ান । সীমা যথা,  
উ—উৎপত্তি হান হইতে উপরের বালুখালির সহিত সংযোগস্থান পর্যন্ত খাগরাছরী ; পু—  
সাইচাল পর্ণভ্রমণী ; দ—সাইচাল পর্ণভ্রমণী হইতে উপরের বালুখালির উৎপত্তি হান  
পর্যন্ত গড় পাহাড় ; প—খাগরাছরীর করণ উপরের বালুখালি ।

৯ নয় নম্বর তালুক বড়কল।—

১। ভূষণছরা—পরিঃ ১৬ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা বধা, উ—রক-  
রিবাপেরছরা, তাহার সহিত সংযোগস্থল হইতে কর্ণফুলীর সহিত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত  
ছোট হরিণা; পূ—কর্ণফুলী; দ—কর্ণফুলী এবং বড়কল পর্ত্তশ্রেণী; প—বড়, ক  
পর্ত্তশ্রেণী।

২। গুইছরী—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা বধা, উ—কর্ণফুলী;  
পূ—ঠেগাখাল; দ—ডুলুছরী; প—সাইচাল পর্ত্তশ্রেণী।

৩। হুমতমা—পরিঃ ২০ বঃ মাঃ, রাজাবাহাদুরের খাস। সীমা বধা, উ—ডুলুছরী;  
পূ—ঠেগাখাল; দ—মোলুছরী; প—সাইচাল পর্ত্তশ্রেণী।

৪। গর্জনতলী—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীকুলচন্দ্র তালুকদার। সীমা বধা, উ—  
ধনজাছরী; পূ—মাতদং পর্ত্তশ্রেণী; দ—উলুছরী এবং তাহার উপস্থিতি স্থান হইতে উচ্চ পর্ত্ত  
পর্ষ্যন্ত এক গড় পাহাড়; প—কর্ণফুলী।

৫। গৌরস্থান—পরিঃ ৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীসন্দনধা দেওয়ান। সীমা বধা, উ—  
হেদয়ারছরা; পূ—মাতদং পর্ত্তশ্রেণী; দ—ধজাছরী; প—কর্ণফুলী।

৬। বড়হরিণা—পরিঃ ১৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীতোজিরার রোয়াখা (ত্রিপুরা)। সীমা  
বধা, উ—মড়হরিণার করদ গাজকাটা ছরা, পূ—নিয়ের পাছকাটা-ছরার সহিত সংযোগস্থল  
হইতে মাহালছরীর সহিত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত বড় হরিণা; দ—বড় হরিণার করদ মাহালছরী,  
প—উচ্চ পর্ত্তশ্রেণী।

৭। আইরা ছরা—পরিঃ ১৩ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীরতন খাঁ দেওয়ান। সীমা বধা, উ—  
করদ বাকছরীর নিয় ও কালাপুনাছরার উপরে পতিত জঘনাছরী, এবং ইহার উপস্থিতিস্থান  
হইতে উচ্চপর্ত্তশ্রেণী পর্য্যন্ত এক গড়পাহাড়; পূ—সাইচাল পর্ত্তশ্রেণী, বিত্তীর দোছরীর  
বামের আইবাছরী, এবং দ্বিতীয় দোছরীর ডানের দোছরী; দ—সাইচাল পর্ত্তশ্রেণী; প—  
কর্ণফুলী।

৮। হেইবড়রাইয়া—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীলক্ষ্মণ দেওয়ান। সীমা বধা, উ—  
ডোলাছরী, এবং ইহার উপস্থিতি স্থান হইতে উচ্চপর্ত্তশ্রেণী পর্য্যন্ত এক গড় পাহাড়, পূ—  
সাইচাল পর্ত্তশ্রেণী; দ—৭ নম্বর আইবাছরা মৌজার উত্তরসীমা; প—কর্ণফুলী।

৯। কুকিছরা—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীচণ্ডীলাল রোয়াখা (কুকি)। সীমা  
বধা, উ—ছোট হরিণা এবং বড়কল পর্ত্তশ্রেণী; পূ—উপস্থিতিস্থান হইতে নিম্নদিকে ডানার  
করদ কুকিছরার সহিত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত ছোট হরিণা; দ—কুকিছরা ও ডানের কুকিছরা;  
প—বড়কল পর্ত্তশ্রেণী।

১০। ছোটহরিণা—পরিঃ ১৫ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীপুটিহাম রোয়াখা (ত্রিপুরা)। সীমা  
বধা, উ—ডানের কুকিছরা, ছোটহরিণার করদ কুকিছরা, ছোট হরিণা, কালাপুনাছরী, পূ—  
ধুবাবং পর্ত্তশ্রেণী; দ—গুইছরী, ছোটহরিণা, ছোটহরিণার করদ রকুবিবাণেরছরী, ডানের  
রকুবিবাণের ছরা; প—বড়কল পর্ত্তশ্রেণী।

১১। মাতদং—পরিঃ ১০ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীভৈরবচন্দ্র দেওয়ান। সীমা বধা, উ—  
কর্ণফুলী; পূ—মাতদং পর্ত্তশ্রেণী; দ—কর্ণফুলীর হেদয়ার ছরা; প—কর্ণফুলী।

১২। ধুমবাংলাং—পরিঃ ৮ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীপবনরাজ দেওয়ান। সীমা বধা, উ—  
তৈবুং এবং তাহার করদ এবং মধ্যবর্তী নিম্ন পর্ত্তশ্রেণী, তপনকছরা, এবং বড় হরিণার সহিত  
সংযোগস্থলের নিম্নদিকে তৈবুং; পূ—বড়হরিণা, এবং বড়হরিণার মুখ হইতে নিম্নদিকে ছোট  
হরিণার মুখ পর্য্যন্ত কর্ণফুলী; দ—মোহনা হইতে উপর দিকে গুইছরীর সহিত সংযোগস্থল  
পর্য্যন্ত ছোটহরিণা; প—মুখ হইতে দোছরী পর্য্যন্ত গুইছরী, তথা হইতে জলাভ পর্য্যন্ত  
ডানের দোছরী, পরেউঠানচওরা এবং দক্ষিণে উঠানচওরা হইতে উত্তরে জলধুং, তপনক  
ছরার মধ্যবর্তী পর্ত্তশ্রেণী পর্য্যন্ত বড়কল পর্ত্তশ্রেণী।

১৩। তৈবুং—পরিঃ ৯ বঃ মাঃ, হেডঃ শ্রীনাথিকা তালুকদার। সীমা বধা, উ—

রাঙাপানি ছরা, এবং ডানের রাঙাপানি ছরা; পু—বড়হরিণা; দ—তগলকছরা; প—  
তৈবং ও তগলকছরার মধ্যবর্তী উচ্চপর্বতশ্রেণী।

১৪। বামের হালধা—পরি: ৬২ ব: মাং, হেড: শ্রীবিদ্যাধর তালুকদার। সীমা  
বধা, উ—বামের মাহালছরা; পু—বড়হরিণা; দ—রাঙাপানিছরা এবং ডানের রাঙাপানিছরা  
প—পাহাড় এবং বড়কল পর্বতশ্রেণী।

১৫। সাইচাল—পরি: ৮ ব: মাং, হেড: শ্রীতাজা রোয়াবা ( পাণ্ডেখারা ) সীমা বধা,  
উ—বামের আইবাছরার দ্বিতীয় দোছরা; পূর্ব ও দক্ষিণ—সাইচাল পর্বতশ্রেণী; প—  
ডানের আইবাছরার দ্বিতীয় দোছরা।

১৬। কলাবস্তাছরা—পরি: ২ ব: মাং, হেড: শ্রীচুর তাং রোয়াবা (পাণ্ডেখারা) সীমা  
বধা, উ—ধুমবাংলাং পর্বতশ্রেণী; পু—ঐ; দ—ছোট হরিণার করদ কলা বস্তাছরা; প—  
ছোটহরিণা।

১৭। চিবা বড়হরিণা—পরি: ৮ ব: মাং, হেড: শ্রীজয়ন্ত তালুকদার। সীমা  
বধা, উত্তর ও পূর্ব—উৎপত্তিস্থান হইতে নিম্নদিকে গাছকাটাছরার মুখ পর্যন্ত বড় হরিণা;  
উত্তর ও পশ্চিম—বড়কল পর্বতশ্রেণী; দ—বড়হরিণার করদ গাছ কাটাছরা।

### বোমাং সার্কেল । \*

১ এক নম্বর তালুক সোণাইছরা ।

১। বংডং—( শ্রীখোয়াই লাউ রোয়াবা ), ২। রেজু—( নাংদ্য রোয়াবা ), ৩। সোণাই  
ছরা—( শ্রীচাইখাও রোয়াবা ), ৪। নাখাংছরা—( শ্রীমংফুই রোয়াবা ), ৫। তুহুদ—  
( শ্রীমাহার আলি ), ৬। জারুয়া—( শ্রীচাইও মুরুং ), ৭। পাগলি—( শ্রীচাইলা কারবারী )।

২ দুই নম্বর তালুক দোছরা ।

১। দোছরা—( শ্রীছানাই রোয়াবা ), ২। তালুক খাইয়া—( শ্রীখোয়াইখাই রোয়াবা ),  
৩। তঙ—(শ্রীআমুইমুরুং)।

৩ তিন নম্বর তালুক বাথখালী ।

১। বাইশাড়ি—( শ্রীকেওমং রোয়াবা ), ২। বাথখালি—( শ্রীথেপং বৈদ্য )।

৪ চারি নম্বর তালুক ইয়ংছা ।—

১। ইটগর—( শ্রীমংলা খাই ), ২। ইয়ংছা—( চাঁপুয়াই রোয়াবা ), ৩। ছজু—  
( শ্রীরাজা মুরুং ), ৪। ফাসাখালি—(শ্রীঅংখোয়াই মব)।

৫ পাঁচ নম্বর তালুক আলিকদম —

১। টোইন—( শ্রীমংচাউ রোয়াবা ), আলিকদম—( শ্রীকাইওয়া মুরুং ), ৩। চোখাং—  
( শ্রী রেফো ), ৪। মংওই—( শ্রীমুইউ রোয়াবা ), ৫। টোইন কা—( শ্রীখাংলিং রোয়াবা ),  
৬। চাইমুক্কা—(শ্রীলোন খুমি)।

৬ ছয় নম্বর তালুক লামা ।—

১। ছাগল খাইয়া—( শ্রীঅংজাই ) ২। দরদরি—( শ্রীহারিক্ত রোয়াবা ), ৪। লামা—  
( শ্রীঅংক্যাই রোয়াবা ), ৪। নাখাং—( শ্রীমংপ্রোং রোয়াবা ), ৫। পোপা—( শ্রীশঙ্কু  
রোয়াবা ), ৬। লংখাং—( শ্রীরেওরারাই মুরুং ) ৭। ছোট বমু—(পাইচাউ রোয়াবা)।

৭ সাত নম্বর তালুক বমু ।—

১। বমু—( শ্রীজিনিও রোয়াবা ), ২। সরই—(শ্রীরাখামোহন ত্রিপুরা), ৩। লুলাই  
—(শ্রীলুওয়াই রোয়াবা), ৪। ডুঙলু—( শ্রীজগদ্বন্ত:ত্রিপুরা ), ৫। লেমুপালাং—( শ্রীআইই মুরুং )।

৮ আট নম্বর তালুক ফাইতং ।—

১। বজাল্যা—( শ্রীখোয়াইং রোয়াবা ), ২। কাইতং—( শ্রীলাইও ), ৩। চাবী—  
( শ্রীইয়লাকু রোয়াবা )।

\* প্রায়শই পরিবর্তনশীল মৌজা-চকবন্দী বড় অধিক প্রয়োজনীয় হইবে না মনে করিয়া  
অন্তঃপর বোমাং ও মঙ সার্কেলের কেবল তালুক, তদন্তরিত মৌজা এবং বন্দনীমধ্যে তত্তৎ হেড  
ব্যবহার নাম দিয়া গেলাম।

৯ নম্বর তালুক তক্তাবতী।—

১। উত্তর হাজর—(শ্রীনীলাধর দে), ২। দক্ষিণ হাজর—(শ্রীচৈবেক মুকং), ৩। তক্তাবতী—(শ্রীমাবল্লভ বারি সিকদার), ৪। হরিণ ঝিড়ি—(শ্রীকিলাই মুকং) ৫। চাকের পানছরী—(শ্রীক্রেতা মুকং)।

১০ নম্বর তালুক বান্দর বন।—

১। বান্দর বন—(রাজার খাস), ২। হুগলক—(শ্রীপুঁইররি রোয়াখা), ৩। বৈদীক্য—(শ্রীরামছরি মুকং), ৪। বৈতছরী—(শ্রীকাজাই চৌধুরী), ৫। কাচলং—(রাজার খাস)।

১১ এগার নম্বর তালুক কামালং।—

১। কুললং—(শ্রীমলাকু রোয়াখা), ২। রাজঘিলা—(শ্রীকইত্যং), ৩। কাকাহরী—(শ্রীচাইংগ রোয়াখা), ৪। রা-খালি (শ্রীগাকু চৌধুরী), ৫। নারায়ণ গিরি—(শ্রীটারী চৌধুরী), ৬। চিংমরং—(শ্রীখোয়াইনু, চৌধুরী), ৭। চেমি—(শ্রীকই, ও রোয়াখা) ৮। কোলাখাং—(শ্রীছাখোয়াইনু)।

১২ বার নম্বর তালুক কান্তাই।—

১। পেকুরা—(শ্রীমোনরাম কারবারী), ২। চেংখাং—(শ্রীকৈমানল জিপুরা), ৩। কপ্তাই—(শ্রীমণিরাম জিপুরা), ৪। হারা—(শ্রীউলকু রোয়াখা), ৬। গাইকা—(শ্রীকুর্ভের রোয়াখা), ৭। জোমরম—(শ্রীখোয়াংখ্যও রোয়াখা), ৮। ঘিলা—(শ্রীহুর্থা বামু), ৯। কুকাহরী—(শ্রীখোয়াইনু রোয়াখা), ১০। ধুহরী—(শ্রীখিলাও কাহি), ১১। আরাহরী—(শ্রীদেবচরণ কারবারী)।

১৩ তের নম্বর তালুক তারাছা।—

১। বালা ঘাটা—(শ্রীমচেইয় চৌধুরী, ২। রোয়াংছরী—(শ্রীচাখোয়াইনু, মথ), ৩। বেখাং—(শ্রীছহুখাই রোয়াখা), ৪। তারহা—(রাজার খাস), ৫। পাংখাং—(শ্রীছহুইং রোয়াখা), ৬। কিসুখাং—(শ্রীরামকুংগ কুকি), ৭। আলি খাং—(শ্রীখ্যাংলেইং কুকি), ৮। কখাং—(শ্রীমংজাই রোয়াখা), ৯। নোয়াপতং—(শ্রী সোংতাং কুকি), ১০। মুকপাং—(শ্রীকাজাই চৌধুরী) ১১। মৈনখাং—(শ্রীখাখোয়াই সরদার), ১২। লাকখাং—(শ্রীমংকুইয় রোয়াখা)।

১৪ চৌদ্দ নম্বর তালুক পাইলু।—

১। ঘরাউ (রাজার খাস), ২। পাইলু—(শ্রীমংখুইলা রোয়াখা), ৩। চাশা (শ্রীখোয়াইনু, চৌধুরী), ৪। মুমখাং (শ্রীছাখাং কু, রোয়াখা)।

১৫। নম্বর তালুক কমা।—

১। কোলাডি—(রাজার খাস), ২। কেজু—(রাজার খাস), ৩। চেক—(শ্রীখংকু, চৌধুরী), ৪। পলি—(শ্রীমংকু, রোয়াখা)।

১৬ ষোল নম্বর তালুক চেমা।—

১। ছাইকছু—পদ্মচাত। ২। খোয়াখাং—(শ্রীরাইয়ং মুকং), ৩। খাইখাং—(শ্রীমংকা রোয়াখা), ৪। খান্দি—(শ্রীলেইতং মুকং)।

১৭ সতর নম্বর তালুক খালিইজা।—

১। আলেকখাং—(শ্রীখংজাউ), ২। খালিইজা—(রাজার খাস), ৩। পানতলা—(শ্রীখাংলাই মুকং) ৪। সেঙ্গু—(শ্রীজানাইনু রোয়াখা)।

১৮ আঠার নম্বর তালুক রেমাফ্রি।—

১। তিনু—(শ্রীকংপ্রং রোয়াখা), ২। মিখুখা—(শ্রীলাংতাই খুমি), ৩। দিঙ্গাপা—(শ্রীখাখোয়াইনু খুমি), ৫। বধু—(শ্রীলেংখুই খুমি), ৬। রেমাফ্রি—(শ্রীকোকাই খুমি)।

মঙ সার্কেল।

১ এক নম্বর তালুক রামাশরা।—

১। আমতলী—(শ্রীরসিকচন্দ্র দেওয়ান), ২। বড়নাল—(শ্রীভৈরবচন্দ্র দেওয়ান),



৩। তুংছরী—(শ্রীকৈলাসচন্দ্র তালুকদার), ৪। তৈলাভাড়া—(শ্রীশশিকুমার দেওয়ান), ৫। আটলা—(শ্রীমাণিকধন তালুকদার), ৬। বড়বিল—(শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেওয়ান), ৭। অঘোষা—(শ্রীধর্মরাম), ৮। বেলছরী—(শ্রীকৃষ্ণ মণি), ৯। গর্গয়া নালী—(শ্রীরত্নচরণ রোয়াবা), ১০। খেদাছরী—(শ্রীরামপদ রোয়াবা), ১১। গোমতী—(শ্রীমধুসূদন), ১২। বান্দর ছরী—(শ্রীমণিরাম রোয়াবা), ১৩। তাইংদং—(রাজার খাস), ১৪। মাকুপ তৈছা—(শ্রীজ্ঞান রোয়াবা), ১৫। রাছলছরী—(শ্রীমজল চান), ১৬। চৌররাকাপা—(শ্রীপূর্ণচন্দ্র পোমাং), ১৭। বাইনাগুমতী—(শ্রীকামরাম তাইমাং)।

### ২ ছই নম্বর তালুক অঘোষা।—

১। নাটরাঙা—(শ্রীমধু তহশীলদার), ২। গুইমারা—(শ্রীমংথে চৌধুরী), ৩। ছনোরাপাড়া—(শ্রীকাজ চৌধুরী), ৪। বাইলাছরী—(শ্রীরাজুধন রিফং), ৫। তৈমাতৈ—(শ্রীকাজারী চৌধুরী), ৬। খল্যা—(শ্রীহনুধন মুকচি), ৭। হাজাছরী—(শ্রীরামকান্ত রোয়াবা), ৮। অত্যা—শ্রীনয়ন সিং রোয়াবা), ৯। আলুটলা—(শ্রীগণনচন্দ্র দেওয়ান), ১০। তৈকাতাং—শ্রীদবিন্দ্র রোয়াবা), ১১। দলদলি—(শ্রীবংশীচরণ রোয়াবা), ১২। ওয়াছু—(শ্রীদোয় চৌধুরী)।

### ৩ তিন নম্বর তালুক রাজবাড়ী।—

১। মাণিকছরী—(রাজার খাস) ২। বড় পিলাক—(শ্রীলাধোয়া চৌধুরী), ৩। জুগারচোলা—(শ্রীমংসা চৌধুরী), ৪। ডাইছরী—(শ্রীমথুরা চৌধুরী), ৫। বৈরতলী—(শ্রীধোয়ারী চৌধুরী) ৬। লুত্র মরম—(শ্রীরেস্তা চৌধুরী), ৭। ডলু—(শ্রীখজুই চৌধুরী), ৮। ডেবলছরী—(শ্রীহইফ চৌধুরী), ৯। গৈছরী—(শ্রীবেকু চৌধুরী), ১০। জারলছরী—(শ্রীচোলাফ চৌধুরী), ১১। জুগাছরী—(শ্রীহইলাফ চৌধুরী), ১২। তুল্যা-তলী—(শ্রীকও চৌধুরী) ১৩। মৈধার খিল—(শ্রীছাং চৌধুরী), ১৪। মংকুতলী—(শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী), ১৫। রাভাপাতা—(রাজার খাস), ১৬। তিন্দোছরী—(শ্রীহলাধু চৌধুরী), ১৭। কুমারী—(শ্রীকোজর চৌধুরী), ১৮। তৈকমা—(শ্রীঐজ চৌধুরী) ১৯। সিন্দুকছরী—(শ্রীজিরাধন রোয়াবা), ২০। হাপছরী—(রাজার খাস), ২১। নাক্রাই—(রাজার খাস)।

### ৪ চারি নম্বর তালুক সোণাই পাথর।—

১। রামগড়—(শ্রীচাইনুগাও চৌধুরী), ২। বাডনাতলী—(শ্রীকাজরি চৌধুরী), ৩। কালাপানি—(শ্রীরামমণি রোয়াবা), ৪। ছত্রখিল—(শ্রীমজাচৌধুরী), ৫। তেমরম—(শ্রীদোয় চৌধুরী), ৬। চাইকুপাড়া—(শ্রীকজাকু চৌধুরী), ৭। নাকাপা—(শ্রীমাহাল চৌধুরী), ৮। পত্তরাম ঘাট—(শ্রীতারি রোয়াবা), নাভাঙা—(শ্রীদিকাও চৌধুরী)।

### ৫ নম্বর তালুক পুঁজগাং।—

১। গাছবান—(শ্রীশ্রীস রোয়াবা), ২। জোরমরম—(শ্রীগণন চন্দ্র রোয়াবা), ৩। বেগুনছরী—(রাজার খাস), ৪। লতিবান—(রাজার খাস), ৫। পুঁজপ—(রাজার খাস), ৬। ঢেঙ্গী—(রাজার খাস), ৭। লোপাং—(রাজার খাস), ৮। পানছরী—(রাজার খাস) ৯। ছোট পানছরী—(রাজার খাস), ১০। যুগলছরী—(রাজা বাহাছর)।

### ৬ নম্বর তালুক মাহালছরী।

১। বুধাছরী—(শ্রীনিতানন্দ থিসা), ২। কাইরংঘাট—(শ্রীরাজকুমার তালুকদার), ৩। সেমুছরী—(শ্রীনবীনচন্দ্র তালুকদার), ৪। চৌররাছরী—(শ্রীকালচাঁদ চৌধুরী), ৫। খৈগাপাড়া—(শ্রীমংকু চৌধুরী), ৬। ত্রুপুর্গানালী—(শ্রীরামমোহন থিসা), ৭। কেরঙা নালী—(শ্রীকিন্তা থিসা), ৮। মাচছরী—(শ্রীল্যেটাই চৌধুরী), ৯। গম্বারী ঢালা—(শ্রীউমাচরণ দেওয়ান), ১০। নুনছরী—(শ্রীগোবর্দন রোয়াবা), ১১। উলটাছরী—(শ্রীহরধন), ১২। দাদকুপা—(নাবালক পকে মংখই), ১৩। ইদছরী—(শ্রীহরধন দেওয়ান), ১৪। দুরছরী—(শ্রীপূর্ণজয়), ১৫। গোলাবাড়ি—(শ্রীরেস্তাচাই), ১৬। ককর ছরী—(শ্রীলালচন্দ্র দেওয়ান), ১৭। জুগাছরী—(শ্রীমোঙ্গলধন কারবাং), ১৮। বাঙাল কাটি—(শ্রীবজ্রধন রোয়াবা), ১৯। পেরাছরী—(শ্রীকুমারিমাং)।





